ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন ও ইসলামী মূল্যবোধের পর্যালোচনা

GIFT

<u>তত্ত্বাবধায়ক</u>

ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

403663
Dhaka University Library
403663
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

<u>গবেষক</u>

মোঃ আবুল বাসার
পিএইচ.ডি.গবেষক
রেজি নং: ১৬/২০০২-০৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন ও ইসলামী মূল্যবোধের পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

403663

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(মোঃ আবুল বাসার)
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, **মোঃ আবুল বাসার,** পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন ও ইসলামী মূল্যবোধের পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করিয়াছে। আমি ইহার পান্ডুলিপিগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা ইহার অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করিতেছি।

২২/৮/০২

(ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

403663

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে **"ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন ও ইসলামী মূল্যবোধের পর্যালোচনা"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং নবী করিম (স.)-এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দিন**, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা ও শারিরীক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়-উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

এসময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া **মা মরহুমা রিজিয়া বেগমকে**। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর দোয়া আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে । সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁর নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁর অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার মায়ের পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। সেই সাথে আরও স্মরণ করছি আমার দাদা মরহুম **মোঃ জোয়াবদী** ও মরহুমা ফুফু **সাফাতুন নেছাকে**। যাঁদের আদর স্নেহ, দোয়া ও অনুপ্রেরণায় শিক্ষার পথে এতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি। আমি মহান আল্লাহর নিকট তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা **মোঃ মোহর আলী**, বড় ভাই **মোঃ রিয়াজ উদ্দীন**, ছোট ভাই **মোঃ আবু সাঈদ, মোঃ আবুল হাশিম, মোঃ আব্দুল হালিম, মোঃ রাশেদুল আলম, মোঃ বেলাল হোসেন** এবং ছোটবোন **লায়লা মারিয়াম ও রাবিয়া সুলতানাসহ** পরিবারের সকল সদস্য ও ছোট ফুফু **মজিরন নেছার প্রতি**। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাদের জুঁড়ি নেই। আমার জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় কাতর আমার বাবা ও ভাই-বোনেরা তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন আমার গবেষণাকর্মের স্বার্থে। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের জীবনে সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে **'পাদটীকা' 'উদ্ধৃতিতে'** সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরেকবার ঐসব লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিতও করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক **ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন**, সহযোগী অধ্যাপক **ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ও ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান**, টংগী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**, সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রভাষক **মোঃ ওয়াজেদ কামাল** প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিউটের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান জনাব **মিনহাজ উদ্দীন আহমদ**, এ্যাসিটেন্ট লাইব্রেরিয়ান জনাব **বেলাল উদ্দীন আহমদ**, সর্টার জনাব **জসীম উদ্দীন মোল্লা** এবং জনাব **সিদ্দিকুর রহমানকে**। তাঁরা আমার গবেষণাকর্মের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আমার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত যারা আমার গষেণাকর্মে মাঝে মাঝেই বেশ উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং কৌতূহল মনে গবেষণাকর্মের অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন তাঁরা হলেন **বেগম আজিজুন্নাহার, পারভিন সুলতানা ও শাহিদা সুলতানা**, পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, **ড. বাসুদেব**, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **মোঃ খায়রুল আহসান সিদ্দিকী**, পিএইচ.ডি.গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, **মোঃ হাবিবুর রহমান খান**, এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, **হাসনা ফেরদৌসী**, প্রভাষিকা, জামালপুর সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, **মোঃ ইবরাহীম খলিল**, প্রভাষক ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, **খন্দকার ফাহমিদা সুলতানা (সনি)**, এম.ফিল গবেষক ও **রোকসানা পারভিন, ছাত্রী**, এম.এ. শেষ পর্ব ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ অন্যতম। এঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতপর্বে যাঁরা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে **মোঃ সাদ্দাম হোসেন মিয়াজী, মোঃ সোহরাব হোসেন, মিসেস. মরিয়ম বেগম, মোঃ দলিলুর রহমান ও মিসেস রহমান**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিপ্লোমা-ইন-সায়েন্স কম্পিউটার অপারেটর **মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া** অন্যতম। তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

যাঁদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও আগ্রহ আমার কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে এবং আমার জীবন মানের উন্নয়নে যারা অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আমার শোকে, দুঃখে, সংকটে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, কালিয়াকৈর থানা বি.এন.পি সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব **মোঃ আব্দুল লতিফ**, পল্লী মঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব **মোঃ শাহাজাহান সিকদার, মিসেস আয়েশা আক্তার**, আমার বন্ধুবর জনাব **মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আঃ কাইয়ুম, মোঃ আসাদুজ্জামান, মোঃ নাজমুল করিম, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ সেলিম আল রেজা, এ.জে. জুয়েল, জেড. আই. সোহেল, আব্দুর রাজ্জাক** প্রমুখ। বিভিন্নভাবে আমি তাদের নিকট ঋণী। তাই তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মোঃ আবুল বাসার
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

যে কোন বিজ্ঞান, মতবাদ, তত্ত্ব বা সংগঠিত প্রচেষ্টারই যেমন নিজস্ব একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকে যাকে কেন্দ্র না করে যেমন কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না, পারে না কোন সুসংগঠিত পদ্ধতিতে কার্যক্রম গড়ে উঠতে তেমনি সমাজকল্যাণ ও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজকল্যাণের নিজস্ব একটি দর্শন রয়েছে। যেসব বিশ্বাস, আদর্শ ও সত্যের উপর ভিত্তি করে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী সুপ্রাচীনকাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে সেগুলোর সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে সমাজকল্যাণ দর্শন। সমাজকল্যাণ বলতে আধুনিককালের সুসংগঠিত সেবা দান কার্যকে বুঝায়। এর লক্ষ্য হল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন। এ কল্যাণসাধন করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, নীতি ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও সমাজকল্যাণের সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন দর্শন আজও গড়ে উঠেনি। কারণ সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। প্রত্যেক দেশেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সেদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এজন্য সমাজকল্যাণ দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, অনুশাসন এবং অনুভূতিই সমাজকল্যাণ দর্শনের সর্বজনীন ভিত্তি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে চিনেছে তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায়ও নিজেকে নিয়োজিত করতে শিখেছে। সমাজকল্যাণ দর্শন চিরায়ত ধর্মীয় নীতির উপর অধিষ্ঠিত বিধায় সর্বজনীন সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে না উঠা সত্ত্বেও অভিন্ন কতকগুলো মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণে কার্যক্রম সব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য সমাজকল্যাণের অভিন্ন ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তথাপি সমাজবদ্ধ মানুষের কতিপয় অভিন্ন সত্তা রয়েছে। এসব সত্তার স্বীকৃতি, লালন ও উন্নয়নই আধুনিক সমাজকল্যাণের স্বকীয়তা ও সর্বজনীনতা দান করেছে। এ স্বকীয়তা দর্শনজ্ঞান সঞ্জাত। তাই সমাজকল্যাণ দর্শন হল-"এমন সব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যা সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য কল্যাণ সাধনের চালিকা শক্তি। যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত অবস্থা নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক মঙ্গল বিধান করে। যার ফলে কতিপয় অভিন্ন বিষয়ে সকল মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যান নিশ্চিত হয়।' শিল্পোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের তাগিদে সমাজকল্যাণে ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজকল্যাণ সংগঠিত ও পরিকল্পিত রূপ লাভ করে। আধুনিক সমাজকল্যাণের দার্শনিক রূপরেখা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ দরদী, সমাজ চিন্তাবিদ এবং মানবহিতৈষী মনীষীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সামাজিক ন্যায়পরায়নতা প্রভৃতি দার্শনিক মূল্যবোদ সমাজকল্যান মূল্যবোধ দর্শন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে তোলা হয়, যাতে সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। তবে মানবতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ও তাগিদই সমাজ কল্যাণের সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রীক কল্যান সাধনই সমাজকল্যাণের মূল দর্শন। মানব সভ্যতার উষালগ্নেই সমাজকল্যাণের শুভ সূচনা হয়। এর পিছনে সর্বদাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজন, ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক চেতনা। আদিকালে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই মানুষ পরস্পরকে বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা করত। প্রাচীনকালে মানুষের বিপদে সাহায্য করার মত যখন কোন ব্যবস্থাই কার্যকর ছিলনা, তখন ধর্মীয় তাগিদেই মানুষ বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। কারণ মানবকল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই প্রতিটি ধর্মের আবির্ভাব।

বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই মানবসেবার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে পারস্পরিক প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতা, মানবতাবোধ, মানিবক চেতনা প্রভৃতি সমাজকল্যাণ দর্শনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরণা সমাজকল্যাণ দর্শনের সর্বজনীন ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছে।

ধর্ম প্রচারকদের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ যেমন স্রষ্টাকে চিনেছে, তেমনি সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার তাগিদও অনুভব করতে শিখেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য দান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন প্রভৃতি সব সমাজে পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো সকল দেশের সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। ধর্মপ্রাণ মানুষ পরকালীন মুক্তির আশায় সমাজে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। এদিক থেকে পীর, ফকির, মুরশীদ, যাজক, পুরোহিত ও ভিক্ষুদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জনগণের দুর্দশা লাঘবে সর্বদাই যেমন ধর্মীয় বাণী প্রচার করেছেন তেমনি মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করেছেন। কারণ, সকল ধর্মেই সমাজকল্যাণের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের 'বদান্যতা' বৌদ্ধধর্মের 'জীবপ্রেম', খ্রীষ্টধর্মের 'মানব প্রেম' এবং ইসলাম ধর্মের 'জনসেবা' বিশ্বব্যাপী মানুষের কল্যাণ সাধনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সমাজকল্যাণের প্রতি তাগিদ দিয়ে ইসলামে বলা হয়েছে, "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি! তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ করবে এবং অসঙ্গত কাজের বিরোধিতা করবে।" (৩:১১০) "উপকারের প্রতিদান উপকারই হয়ে থাকে।" (৫৫:৬০) "তুমি পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (২৮:৭৭) "এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক।" (৫১:১৯) "তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও চাই না।' (৭৬:৮-৯)

মহানবী (স.) বলেন, "মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাসবে, তবেই মুসলিম হবে।" যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" "সেই লোকদের মধ্যে ভাল, যে লোকের উপকার করে।" "পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে স্বর্গবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন।" সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহর প্রিয়তম যে তাঁর এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকার।" (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং দেখা যায়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। এসব কিছুই ইসলামের 'হুকুকুল ইবাদ' নামে পরিচিত এসব ধর্মীয় আদর্শ, বাণী, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টি সমাজকল্যাণের দার্শনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও ইসলামের সমাজকল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাকাত, বায়তুলমাল, ওয়াক্ফ, করযে হাসানা ও সদকায়ে জারিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রেরণাই এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থনিবাস ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে।

সুতরাং আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে ইসলামের অবদান সর্বাধিক তাৎপর্যমন্ডিত। কেননা, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাও বটে। সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। (২:২১৩) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। এজন্য ইসলাম ইহকালীন ও পরকালীন উভয়বিধ উন্নতিতে বিশ্বাসী। পবিত্র কুরআনে মানুষকে উভয় জগতের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে।"আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে ইহজগতে এবং পরবর্তী জগতে কল্যান দান কর।" এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতের কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

ইসলাম মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ বা রক্তের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয় না বরং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার উপরই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই, পূণ্য ব্যতিরেকে একজন অন্যজন হতে বড় নয়। মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ খলিফা প্রেরণ সম্পর্কিত ধারণাই ইসলামী সমাজের মূল্যবোধের উৎস এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের চারিত্রিক রূপের চাবিকাঠি। ইসলামে সমাজ সেবাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট ও দূরপ্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী (মুসাফির) এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে নবী! জানিয়ে দিন মুসলমানগণ যেন তাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে এতদ্ব্যতিত মানুষের উপকারার্থে আরও যত কাজ করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজে মানুষের ভূমিকা প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পরিবার এবং সেই আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিকে সবচেয়ে ভালবাসে।" "তোমাদের সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ যে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, যে প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে পেটপুরে আহার করে সে প্রকৃত মুসলমান নয়।" এভাবেই ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কল্যাণকে তরান্বিত ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। তাছাড়াও মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সমসুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়-বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যা সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে।

ইসলামী সমাজে আল্লাহর খলিফা (প্রতিভূ) হিসেবে মানুষের দ্বিবিধ ভূমিকা রয়েছে। একটি হল 'হক্কুল্লাহ' বা আল্লাহর হক এবং অপরটি হল 'হক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক। মানুষের এ দু'টি ভূমিকাই ইসলামে ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত। যে সমস্ত ইবাদত সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা 'হুকুকুল্লাহ' আর যে সমস্ত ইবাদত বান্দা বা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত তা 'হুকুকুল ইবাদ' নামে পরিচিত। দু'টি ইবাদতের মধ্যে এমন পারস্পরিক অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে যে দু'টিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই। হুক্কুল ইবাদকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র হুক্কুল্লাহ বা আল্লাহর ইবাদত করলে ইবাদত পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। দু'ধরনের ইবাদতই আমাদের উপর ফরজ এবং উভয় ইবাদতই যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা ইবাদতের পূর্ণতা ঘটে। এক ধরনের ইবাদতে আত্মতুষ্টি লাভ করে অন্য ধরণের ইবাদতকে উপেক্ষা করলে পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন-ব্যক্তিগত মানবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সব কিছু উপেক্ষা করে যদি কেউ শুধু আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস পায়, তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে উপেক্ষা করল অথচ আল্লাহই মানুষকে নানা জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন। এমনকি জীব-জন্তু, গাছ-পালা, শস্য প্রকৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করা নাফরমানীর শামিল। মূলতঃ হুক্কুলাহর দাবী শুধু একটি আর হুক্কুল ইবাদত হল সুবিস্তৃত, সীমা সংখ্যাহীন। অতএব, হুক্কুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতাই আসেনা। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধার মহিমান্বিত স্রষ্টার সকল গুণ ও শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্ত আত্মসমর্পন ও স্রষ্টার আদেশ-নির্দেশ মত হালাল-হারামের বিধান মেনে জীবন-যাপন, সর্বোপরি সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সর্বকাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এটাই হক্কুল্লাহ। অন্যদিকে, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক আচরণ করাই হুক্কুল ইবাদ। অতএব, এক অর্থে এটাও আল্লাহর হুকুম পালনের নামই ইবাদত। সেদিক দিয়ে উভয় ধরণের ইবাদতের মধ্যেই পারস্পরিক ঐক্যসূত্র বিদ্যমান। বিশ্বস্ততার সাথে হুকুকুল ইবাদ পালন ইসলামী সমাজে জীবন-যাপনের অপরিহার্য শর্ত। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের হক রয়েছে তাঁর সম্পত্তির উপর। সে জন্যেই ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র মুসলমানদের সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, মত নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। হযরত আবূ বকর (র.)-এর শাসনামলে হীরাবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ রয়েছে- বৃদ্ধ, অক্ষম, আকস্মিক বিপদগ্রস্ত, ভিক্ষুক, হঠাৎ দারিদ্রে পরিণত হলে তাদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজকল্যাণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন এবং বিদি-বিধানের অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

এভাবেই ইসলামের অনুপ্রেরণা, অর্ন্তদৃষ্টি, মূল্যবোধ ও অবদানের জন্যেই সমাজকল্যাণ কালক্রমে আধুনিক রূপ লাভ করে। সমাজকল্যাণের আধুনিক ও সংগঠিত রূপ লাভের পিছনে ইসলামের অনুশাসন, অনুপ্রেরণা, মানবীয় দর্শন এবং মানবকল্যাণের সর্বজনীন নীতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলী সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য ও অবয়বকে সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এটাকে ১০ (দশ)টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** সমাজকল্যাণ দর্শন পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পরিধিসহ সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধারণা যেমন-সমাজকর্ম, সমাজ সেবা, সমাজসংস্কার, সামাজিক নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক আইন, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশের ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করতে গিয়ে এতে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও পাক-ভারত-বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক কাঠামো, শিক্ষা, আদর্শ, মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামে সংস্কৃতি তথা সামাজিক শিক্ষা ও মানবাধিকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামে সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন তুলে ধরতে গিয়ে প্রথমত, ইসলামে সমাজকল্যাণ চিন্তার ধারা; সমাজকল্যাণ দর্শনের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে মহানবী (স.)-এর অবদান, খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে সমাজকল্যাণ চিন্তার রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের সমাজকল্যাণ; ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসক ও সূফী সাধকদের সমাজকল্যাণে অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক সমাজকল্যাণ মূল্যবোধের সাথে ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এতে সেসব সামাজিক মূল্যবোধ পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হল মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সামগ্রীক জীবনবোধ; সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানাদি যেমন, বায়তুল মাল, যাকাত, ওশর, ওয়াক্ফ, করযে হাসানা, সাদাকাহ্ বা দান, ফিতরা ও কুরবাণী, গনিমাত, ফাই, জিজিয়া, খারাজ, খুমুস ইত্যাদির পরিচিতি, বৈশিষ্ট ও প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে সমাজকল্যাণ দর্শনের চর্চায় ও অনুশীলনে সূফী দরবেশগণের অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ধর্মপ্রচারক, পীর আওলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ; অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে দুস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। ধর্মপ্রচারক ও সূফী সাধকগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্, দরগাহ্ বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং এর পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর, দিঘী, কূপ ও খাল খনন, বৃক্ষ রোপনসহ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে সমাজকল্যাণ ও সংস্কারে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তন ও বিকাশে যাদের অবদান চিরস্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে, তারা হচ্ছেন মানবহিতৈষী সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক ও সমাজকল্যাণ কর্মী। সমাজ ও মানব কল্যাণে তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মানবপ্রেম এবং নিরলস অধ্যাবসায়, কর্মপ্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমে তাঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দুস্থ, দরিদ্র, অসহায়, অক্ষম, অসুস্থ, দীন-দুঃখী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসেন এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যা থেকে উদ্ধারকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেন ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। তন্মধ্যে বহু মনীষী, দানবীর ও মানব হিতৈষী ব্যক্তি একক বা যৌথ প্রচেষ্টায় জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হন, যারা সমাজসেবক বা সমাজকল্যাণকর্মী। আবার অনেক সমাজসংস্কারক সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মূল্যোৎপাটনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন-যাপন ও সমাজকল্যাণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব সমাজসংস্কারক, সমাজসেবক ও সমাজকল্যাণ কর্মীগণ আমাদের গৌরব, ঐতিহ্য ও পথপ্রদর্শক। তাদের কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতিতেই সমাজকল্যাণ আজ সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও মনীষীদের মধ্যে ফারায়েজী আন্দোলন ও হাজী শরীয়তুল্লাহ; আলীগড় আন্দোলন ও স্যার সৈয়দ আহম্মদ; মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও নবাব আব্দুল লতিফ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন, পীর মুহসিন আহমদ; নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী; নবাব স্যার সলিমুল্লাহ; শের-এ-বাংলা এ.কে.এম. ফজলুল হক, বেগম রোকেয়া; বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, আঞ্জুমানে হিমায়াতুল ইসলাম, খাদিমুল ইনসান সমিতি; খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর বিস্তারিত অবদান আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহারসহ পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থের তালিকার একটি বিবরণ দিয়ে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

মোঃ আবুল বাসার
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র/রহ.	=	রহমতুল্লাহি আলাইহি
ইং	=	ইংরেজী
বা/বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর
খ.	=	খন্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
অনূ	=	অনূদিত
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
P.	=	Page
Op.cit	=	Operae-citrae
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal.
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.

Dhaka University Institutional Repository

: সূচীপত্র :

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ --	**
অঙ্গীকারনামা ----------------------------------	**
প্রত্যয়নপত্র----------------------------------	(i-ii)
কৃতজ্ঞতা স্বীকার------------------------------	(i-v)
ভূমিকা--	(i)
শব্দ সংকেত------------------------------------	(i-vi)
সূচীপত্র--	
প্রথম অধ্যায়	
সমাজকল্যাণ দর্শন পরিচিতি, এর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট ধারণা	**(১-২৯)**
* উপস্থাপনা------------------------------------	১
* সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা ও পরিচিতি----------------	২
* সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-----------------	৩
* সমাজকল্যাণের পরিধি--------------------------	৮
* সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু------------------------	১০
* সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধারণা বা প্রত্যয়-----	১২
- সমাজকর্ম--------------------------------------	১৩
- সমাজসেবা-------------------------------------	১৫
- সমাজ সংস্কার----------------------------------	১৬
- সামাজিক সমস্যা--------------------------------	১৮
- সামাজিক নিরাপত্তা------------------------------	১৯
- সামাজিক আইন---------------------------------	২১
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-------------------------------	২১
- সামাজিক উন্নয়ন--------------------------------	২৩
- সামাজিক পরিবর্তন------------------------------	২৪
- সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি ----------------	২৭
- সামাজিক ন্যায়বিচার --------------------------	
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আধুনিক সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিকাশধারা	**(৩০-৫৩)**
ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন-	৩০
- সমানকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি--------------------	৩০
- ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দানশীলতা --------------------	৩১
- ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন----------------	৩৩
- ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের পরবর্তী কিছু পদক্ষেপ-------	৩৪
- ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংশোধন------------------	৩৬
- দান সংগঠন সমিতি--------------------------------	৩৭
- দরিদ্র আইন কমিশন-১৯০৫-------------------------	৩৮
- বিভারেজ রিপোর্ট ও সামাজিক নিরাপত্তা----------------	৩৮
- ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী--------------	৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার সমাজকল্যাণের ইতিহাস- ৪০
- দরিদ্রাগার ও ইয়েটস রিপোর্ট ------------------------ ৪০
- ১৮৭৩ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা
ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম---------------------------- ৪২
- ১৯২৯ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার
প্রেক্ষিতে গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম------------------- ৪৩
- আমেরিকার স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী------------ ৪৪
- আমেরিকায় পেশাদার সমাজকর্মের বিবর্তন-------------- ৪৪

ভারত-বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের বিবর্তন- ৪৬
- প্রাচীন ভারতের সমাজকল্যাণ ------------------------ ৪৬
- মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণ------------------- ৪৮
- সরকারী সমাজকল্যাণ-------------------------------- ৪৮
- বেসরকারী সমাজকল্যাণ ---------------------------- ৫১
- বাংলায় সমাজকল্যাণ ------------------------------- ৫১
-আধুনিক যুগ বা বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের সমাজসেবা--- ৫২

তৃতীয় অধ্যায়	
ইসলামের মৌলিক কাঠামো, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য	(৫৪-৭১)

- ইসলাম পরিচিতি------------------------------ ৫৪
- ইসলামের আক্বিদা ও ইবাদাতসমূহের প্রাণ--- ৫৮
- ইসলাম ও তাওহীদ--------------------------- ৫৯
- ইসলামের রিসালাতে বিশ্বাস------------------ ৬১
- ফিরিস্তাদের প্রতি বিশ্বাস--------------------- ৬২
- তকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ------------------------ ৬৩
- নবুওয়াতের সমাপ্তি--------------------------- ৬৪
- পারলৌকিক জীবন----------------------------- ৬৪
- সালাত-- ৬৬
- সিয়াম সাধনা---------------------------------- ৬৭
- যাকাত--- ৬৭
- হজ্ব -- ৬৮
- ইসলামের বৈশিষ্ট্য------------------------------ ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়	
ইসলামে সংস্কৃতি ও মানবাধিকার	(৭২-৯৭)

ইসলামী সাংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক-
- ইসলামী সংস্কৃতির পরিচিতি------------------------- ৭২
-আধ্যাত্মিক জীবনে ---------------------------------- ৭৩
- নৈতিক জীবনে ------------------------------------ ৭৩
-বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ---------------------------------- ৭৪
-সামাজিক জীবনে ---------------------------------- ৭৬
-অর্থনৈতিক জীবনে ------------------------------ ৭৭
-রাজনৈতিক জীবনে------------------------------- ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

* ইসলামে মানবাধিকার-
- মানবাধিকারের সংজ্ঞা ---------------------------------- ৮২
- ইসলামে মানবাধিকার---------------------------------- ৮৩
- জীবনের অধিকার ও নিরপত্তা---------------------------- ৮৩
- দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা লাভের অধিকার--------------- ৮৫
- বিধি বহির্ভূত নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে
মুক্তি লাভের অধিকার---------------------------------- ৮৭
- মানহানিকর আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার------ ৮৮
- আইনগত সমতা লাভের অধিকার--------------------- ৮৮
- ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার---------------------------- ৮৯
- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত
নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার--------------------- ৮৯
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লাভের অধিকার---------------- ৯০
- স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার ------------ ৯০
- রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার------- ৯১
- জাতীয়তার অধিকার------------------------------------ ৯১
- বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার--------------------- ৯১
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার------------------------- ৯২
- বাক-স্বাধীনতার অধিকার------------------------------ ৯৩
- শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার------ ৯৪
- সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার------------------------- ৯৪
- সরকারী কর্মে প্রবেশের সমঅধিকার-------------------- ৯৫
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা
সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার------------------------- ৯৫
- কাজ, ন্যায্য মজুরীসহ শ্রমিকের
ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার----------------------------- ৯৬
- বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার----------------- ৯৭
- শিক্ষা লাভের অধিকার -------------------------------- ৯৭
- গণতান্ত্রিক অধিকার ------------------------------------ ৯৭
* - ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকর--------------------------- ৯৭

পঞ্চম অধ্যায়	
* ইসলামে সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন	(৯৮-১২২)

- ইসলামে সমাজকল্যাণ চিন্তারধারা ------------------------ ৯৮
* - সমাজকল্যাণের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে মহানবী (স.)-------- ১১১
- খুলাফা-ই-রাশিদার যুগে সমাজকল্যাণ--------------------- ১১৬
- উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সমাজকল্যাণ------------------- ১১৯
- মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণ---------------------- ১২০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়	
আধুনিক সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ পর্যালোচনা	(১২৩-১৫০)

- মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ---------------------- ১২৩
- ইসলাম ও মূল্যবোধ ------------------------------- ১২৩
- মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি------------------------------ ১২৫
- আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার------------------------------------ ১২৮
- সামগ্রিক জীবনবোধ---------------------------------- ১২৯
- সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্র ----------------------------- ১৩০
- সকলের জন্য সমান সুযোগ-------------------------- ১৪০
- সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন---------------------- ১৪৩
- সামাজিক দায়িত্ব ------------------------------------- ১৪৪
- সামাজিক ন্যায়বিচার------------------------------------ ১৪৭

সপ্তম অধ্যায়	
ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠান	(১৫১-২১১)

বায়তুলমাল- ১৫১

- বায়তুলমাল পরিচিতি -------------------------------- ১৫১
- বায়তুলমালের সূচনা----------------------------------- ১৫১
- বায়তুলমালের উৎস ও প্রকার ------------------------ ১৫২
- সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমালের বৈশিষ্ট্য ও অবদান---------------------- ১৫৩

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা- ১৫৫

- যাকাত পরিচিতি -- ১৫৫
- যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ ---------------------------- ১৫৫
- বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের নিসাব------------------------- ১৫৬
- যে সকল সম্পদে যাকাত নেই-------------------------- ১৫৭
- কাদের উপর যাকাত ফরজ? ---------------------------- ১৫৭
- বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত--------------------------------------- ১৫৯
- যাকাতের ব্যয় খাতসমূহ------------------------------------ ১৫৯
- যেসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে? --------- ১৫৯
- যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য---------------------------- ১৬০
- সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব ----------- ১৬১
- বাংলাদেশে যাকাতের ব্যবহার ও কার্যকারিতা -------------- ১৬২
- বাংলাদেশে যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা --------------------- ১৬৫
- বাংলাদেশে যাকাত ভিত্তিক সমাজকল্যাণ------------------- ১৬৬

ইসলামে ওশর ব্যবস্থা- ১৬৯

- ওশর পরিচিতি-- ১৬৯
- ওশরী ও খারাজী জমি--------------------------------------- ১৭০
- ওশর ফরজ হওয়ার শর্তাবলী------------------------------ ১৭১
- ওশর ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত------------------------ ১৭২
- ওশরী ফসল-- ১৭২
- ওশরের নিসাব বা পরিমাণ-------------------------------- ১৭৩
- সরকারী খাজনা ও ওশর--------------------------------- ১৭৪
- সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে ওশরের গুরুত্ব--- ১৭৫
- বাংলাদেশের জমি ওশরী কিনা------------------------------ ১৭৫
- বাংলাদেশের জমি, ফসল ও ওশর------------------------- ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে খারাজ ব্যবস্থা- ১৭৯
- খারাজ কি? ---------- ১৭৯
- খারাজের সূচনা ও তাৎপর্য ---------- ১৮০

ইসলামে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা- ১৮২
- ওয়াক্ফ পরিচিতি ---------- ১৮২
- ইসলামে ওয়াক্ফ নীতিমালা ---------- ১৮৩
- ওয়াকফের শর্তসমূহ---------- ১৮৩
- ওয়াকফের বিষয়বস্তু---------- ১৮৪
- ওয়াকফ করার নিয়ম---------- ১৮৫
- কিভাবে ওয়াকফ সম্পূর্ণ হয়? ---------- ১৮৬
- ওয়াক্ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্ত সাপেক্ষ ওয়াক্ফ---------- ১৮৭
- ওয়াকফের উদ্দেশ্যাবলী---------- ১৮৭
- অবৈধ উদ্দেশ্য---------- ১৮৮
- ওয়াকফের প্রকারভেদ---------- ১৮৯
- মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি---------- ১৯০
- সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াকফের বিবর্তন ও তাৎপর্য-- ১৯১
- বাংলাদেশে ওয়াকফ ও সমাজকল্যাণে এর অবদান---------- ১৯৩
- ওয়াকফের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম---------- ১৯৫
- বাংলাদেশে ওয়াকফের সম্ভাবনা---------- ১৯৫

সাদাকা বা দানশীলতা- ১৯৭
- সাদাকা বা দান প্রথা পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য---------- ১৯৭
- সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে সাদাকার তাৎপর্য ---------- ১৯৯

সাদাকাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়া- ২০০
- সাদাকাতুল ফিতর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য---------- ২০০
- কুরবানীর চামড়ার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন---------- ২০১
- সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে এর মূল্যায়ন---------- ২০১

করযে হাসানা---------- ২০২

মালে গানীমাহ্---------- ২০৪

খুমুস---------- ২০৫

আল ফাই---------- ২০৫

জিযিয়া---------- ২০৫

ইসলামে সর্বগ্রাসী সুদপ্রথার উচ্ছেদ- ২০৬
- সুদ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত---------- ২০৬
- সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী---------- ২০৬
- সুদ সম্পর্কে হাদীস---------- ২০৭
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া---- ২০৮

অষ্টম অধ্যায়	
ভারত-বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ও সংস্কারে সূফী সাধক ও দরবেশগণের অবদান	(২১২-২৩৭)

- উপস্থাপনা ---------- ২১২
- ভারতে ইসলাম বিকাশের ধারা---------- ২১২
- অবিভক্ত বাংলার ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট--- ২১৫
- অবিভক্ত বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রভাব---------- ২১৮
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সূফীদের অবদান---------- ২২৩
- শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান---------- ২২৫
- সমাজ জীবনে তাঁদের প্রভাব---------- ২২৮
- শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব---------- ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

* নবম অধ্যায়	
সমাজকল্যাণ ও সমাজসংস্কারে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান	(২৩৮-২৭১)

-হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩)----------------- ২৩৮
-হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২) ------------------- ২৩৯
-ফরায়েজী আন্দোলন ও
হাজী শরীয়াত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ------------------- ২৪০
-মুহাম্মদ মুহসীন উদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০)----------- ২৪৪
-আলীগড় আন্দোলন ও
স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ---------------- ২৪৫
-মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও
নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ----------------- ২৪৯
-সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ----------------------- ২৫১
-নওয়াব ফয়জুন্নেসা (১৮৩৪/৪০-১৯০৩) ------------------- ২৫৩
-বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১)--------- ২৫৪
-বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ---------------- ২৫৬
-নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)-------------------- ২৫৭
-শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৮৬২)----------- ২৫৮
-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ---------------- ২৬০
-খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) ---------------- ২৬২
-মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)--------- ২৬৬
-মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)--------- ২৬৮
-আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম ---------------------------- ২৬৮
-আঞ্জুমান-ই-হিমায়াত-ই-ইসলাম ------------------------- ২৬৯
-খাদিমুল ইনসান সমিতি -------------------------------- ২৭১

দশম অধ্যায়	
সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার	(২৭২-২৮৫)

- সমাজকল্যাণ দর্শন ও ইসলামের সম্পর্ক------------------ ২৭২
- সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধের সম্পৃক্ততা--- ২৭৭
* - সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইসলামের সমাজকল্যাণ
প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি------------------------------------- ২৮২

গ্রন্থপঞ্জি	(২৮৬-২৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ দর্শন পরিচিতি, এর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট ধারণা-

* উপস্থাপনা
* সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা ও পরিচিতি
* সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
* সমাজকল্যাণের পরিধি
* সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু
* সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ধারণা বা প্রত্যয়-
- সমাজকর্ম,
- সমাজসেবা,
- সমাজ সংস্কার
- সামাজিক সমস্যা
- সামাজিক নিরাপত্তা
- সামাজিক আইন
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
- সামাজিক উন্নয়ন
- সামাজিক পরিবর্তন
- সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি
- সামাজিক ন্যায়বিচার।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা:

'সমাজ' (Society) ও 'কল্যাণ' (Welfare) এ দু'টো শব্দের সমন্বয়ে সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টি গঠিত। এদু'টো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে সমাজকল্যাণের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। সমাজ বলতে অনুভূতিক্ষম জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা তাদের একই মনোভাবের কথা জানে ও অনুভব করে এবং যে কারণে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবেতভাবে কাজ করে থাকে। বস্তুত: সমাজে সমস্যা ও প্রয়োজন আছে আর সে সব সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজন পূরণে সমাজের মানুষ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে।[১] আর 'কল্যাণ' একটি মানসিক ধারণা এবং তা পরিবর্তনীয় ও গতিশীল। স্থান, কাল, পাত্র শ্রেণীভেদে এ ধারণাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সাথে এটি সম্পর্কিত। মানুষের মানসিক বা মনোজগতের যে তৃপ্তি তা শুধুমাত্র বিশেষ দিক থেকে নয়, বরং সার্বিক দিক থেকে বিচার্য। সার্বিক তৃপ্তি বলতে মানুষের নৈতিক, সামাজিক, দৈহিক ও আর্থিক ইত্যাদি সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এজন্য 'কল্যাণ' প্রত্যয়টি সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই বলা যায়, সমাজকল্যাণ হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টি। আর 'সমাজকল্যাণ' সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত একটি ধারণা। সমাজের ধারণা যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি 'সমাজকল্যাণ' প্রত্যয়টিও সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুপ্রাচিনকাল থেকে মানুষ তার স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। তবে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার পেছনে সামগ্রিকভাবে কল্যাণমূলক চিন্তাই মূলত: কাজ করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে কিভাবে উন্নত পর্যায়ে জীবন-যাপন করা যায়, তারই অব্যাহত প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে সমাজ। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ ইত্যাদি মানুষকে একে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করে। ধর্মীয় আদর্শ ও অনুপ্রেরণা মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টাকে আরও সুসংহত ও সুসংগঠিত করে। কালের আবর্তনে মানব সমাজের সম্প্রসারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক পরিবর্তন, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে ব্যাপক, বহুমুখী ও জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এরই ফলশ্রুতিতে পরোপকার, দানশীলতা ও মানবতাবোধকে সুসংগঠিত করে সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধানে উদ্ভব ঘটে আধুনিক সমাজকল্যাণের। যা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত উপায়ে সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। এটি মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধান করে এমন এক বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গঠন করতে চায় যাতে সকল মানুষ সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করতে পারে। প্রত্যেক বিষয়েরই (Descipline) বহু ব্যবহৃত কিছু ধারণা বা প্রত্যয় (Conception) থাকে, যেগুলো ঐ বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধারণা বা প্রত্যয় হচ্ছে এমন কিছু বিষয় বা উপাদান যে সম্পর্কে কল্পনা, অনুধাবন বা চিন্তা করা যায় (Thing Concieved) । অর্থাৎ ধারণা বা প্রত্যয় হচ্ছে একটি বিমূর্ত অবস্থা বা উপাদান যা মানসিক অনুভূতি বা প্রত্যক্ষণ দিয়ে উপলব্ধি করা হয়। এটি কোন বাস্তব ঘটনা, বিষয়, ক্ষেত্র, দল বা শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বা বর্ণনা। যেমন- সমাজ, মানুষ, গণতন্ত্র, ভালবাসা, উন্নয়ন ইত্যাদি। একটি সমন্বয়ধর্মী অনুশীলনের বিজ্ঞান (Science of Practice) হিসেবে সমাজকল্যাণেরও বহু ধারণা বা প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণের উদ্ভব, বিকাশ, জ্ঞান ও দক্ষতা, মূল্যবোধ গঠন, পেশার মর্যাদায় উন্নয়ন এবং অনুশীলনে সহায়ক ধারণা বা প্রত্যয়গুলোকে সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট ধারণা প্রত্যয় বলে। যেমন- সমাজসেবা, সমাজকর্ম, সমাজসংস্কারক, সামাজিক আইন, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক নীতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি। সুতরাং সমাজকল্যাণকে সুগভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য এধারণাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। মূলত: মানুষের সামাজিক সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন করে একটি সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ কাঠামো গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

---

১. MacIver and Page, Society, Indian Print, 1972, P.8

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা ও পরিচিতি:

'সমাজকল্যাণ' মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ প্রচেষ্টারই সুসংবদ্ধ বহি:প্রকাশ। যুগ যুগ ধরে মানুষের কল্যাণে গৃহীত সেবামূলক প্রচেষ্টার সমষ্টিকেই সমাজকল্যাণ বলে। এটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি সাহায্যকারী পেশা, একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া ও একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই সমাজকল্যাণের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সময়, কাল ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন- সমাজকল্যাণ সম্পর্কে এলিজাবেথ উইকেনডেন (Elizabeth Wickenden) বলেন, "সমাজকল্যাণ হল এমন এক ধরণের কর্মসূচী, আইন, সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়; যেগুলো সমাজের মানুষের কল্যাণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এটি সমাজের অবস্থান্তর পর্যায়ে সৃষ্ট অপ্রতুলতা থেকে অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য এবং বর্ধিত বৈপ্লবিক প্রত্যাশা দ্রুত পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের এক রূপান্তরিত ব্যবস্থা।" (Social welfare is a system of laws, programmes, benefits and services which strengthen or assure provisions for meeting social needs recognised as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order. The system is undergoing rapid transformation in response to the transiction of our society from scarcity to relative abundance and to the revolution of rising expectation.)[১]

রোনাল্ড সি. ফেডেরিকো (Ronald C. Federico) বলেন, "সমাজকল্যাণ হল মানবিক প্রয়োজন পূরণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। .... নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোর সকল স্তরে আর্থিক ও সমাজসেবা কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক ক্রিয়ার উন্নয়ন এবং দূর্ভোগ হ্রাসের সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে সমাজকল্যাণ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"[২]

এইচ.এল. উইলেনস্কী এবং চার্লস এন. লেবো (H.L. Wilensky and Charles N Lebeaux) বলেছেন, "সমাজকল্যাণ বলতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত এবং সামাজিক সমর্থনপুষ্ট সে সব প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি এবং কর্মসূচীর সমষ্টিকে বুঝায়, যেগুলো কোন জনসংখ্যার সামগ্রিক বা অংশবিশেষের আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়োজিত।" (Social Welfare is those formally organized and socially sponsored institutions, agencies and programes which function to maintain or improve the economic conditions, health and interpersonal competence of some parts or all of a population.)[৩]

সমাজকর্ম বিশ্বকোষের সংজ্ঞা মতে, "স্বীকৃত সামাজিক সমস্যাদির সমাধান, প্রতিরোধ বা লাঘবের অথবা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠিত কার্যাবলীর সমষ্টিই সমাজকল্যাণ।" (The term social welfare denotes the full range of recognised activities of valuntary and governmental agencies, that seek to prevent, alleviate or contribute to solution of recognised social problems or to improve the well being of indeviduals, group, or communities.)[৪]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছে, "সমাজকল্যাণ বলতে শুধু নির্দিষ্ট জীবনের উন্নতিকে বুঝায় না, বরং সামগ্রিকভাবে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাকেই বুঝায়। বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নির্বিশেষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জীবনমান লাভ করা প্রতিটি মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। সকল মানুষের কল্যাণ সাধনই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের মূলভিত্তি।" (Social welfare is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the amelioration of specipic life. The enjoyment of the highest attainable standard of life is one of the foundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic and social condition. The welfare of all people is foundamental to the attainment of peace and security.)" [৫]

---

১. Elizabeth Wickenden, **Social Welfare in Changing World**, Washington, Department of Health Education and welfare, 1965, P.VII.

২. Ronald C. Federico, **The Social Welfare Institution**, Lexinton, D.C, Health and Co, 1983, P.21.

৩. H. L. Wilensky & Charles N lebeaux, **Industrial Society and Social Welfare**, Newyork, Russel sage foundation, 1958, P.17.

৪. **Encyclopedia of Social Work**, Newyork, The National association of social workers of U.S.A, 1965, P.3.

৬. উদ্বৃত: মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, **সমাজকল্যাণ পরিক্রমা**, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৪

সমাজকল্যাণের বহুল পরিচিত সংজ্ঞা দিয়েছেন আমেরিকার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার আর্থার ফ্রিডল্যান্ডার। তিনি বলেছেন, "সমাজকল্যাণ হল সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের (সামাজিক) এমন এক পরিকল্পিত ও সংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যক্তি এবং দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে। এটা তাদের পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভে সক্ষম করে তোলে।" (Social welfare is the organised syestem of social service and institutions designed aid indeviduals and groups to attain satisfying standard of life and health and personal and social relationship which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.)[১]

পর্যালোচিত সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমাজকল্যাণ সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সকল সমস্যা দূর করে সমস্যামুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সমাজকল্যাণ মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ, নিজস্ব সম্পদ, সামাজিক সম্পর্ক লাভ প্রভৃতির উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাই বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণ এমন এক সংগঠিত প্রচেষ্টা যা সমাজ জীবন থেকে সকল ধরণের সামাজিক, ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা দূর করে মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন, নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং উন্নত সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনমান লাভে সহায়তা করার মাধ্যমে এমন এক বাঞ্চিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় সেখানে সবাই সুখ ও শান্তিতে বাস করতে পারে।

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য হল সাহায্য প্রার্থীকে তাদের মনোভাবও আচরণের বাঞ্চিত পরিবর্তনে সহায়তা করা। সাহায্য প্রার্থী বলতে ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন, সমষ্টি প্রভৃতিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে তাদের পক্ষে সামাজিক কর্মকান্ড ও ভূমিকা পালন সহজতর হয়। সামাজিক কর্মকান্ড বা ভূমিকা পালনে যে সব সমস্যা রেয়েছে সেগুলো সমাধান করাও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যভূক্ত। নিম্নে নমূনার সাহায্যে সমাজকল্যাণের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যেতে পারে।[২]

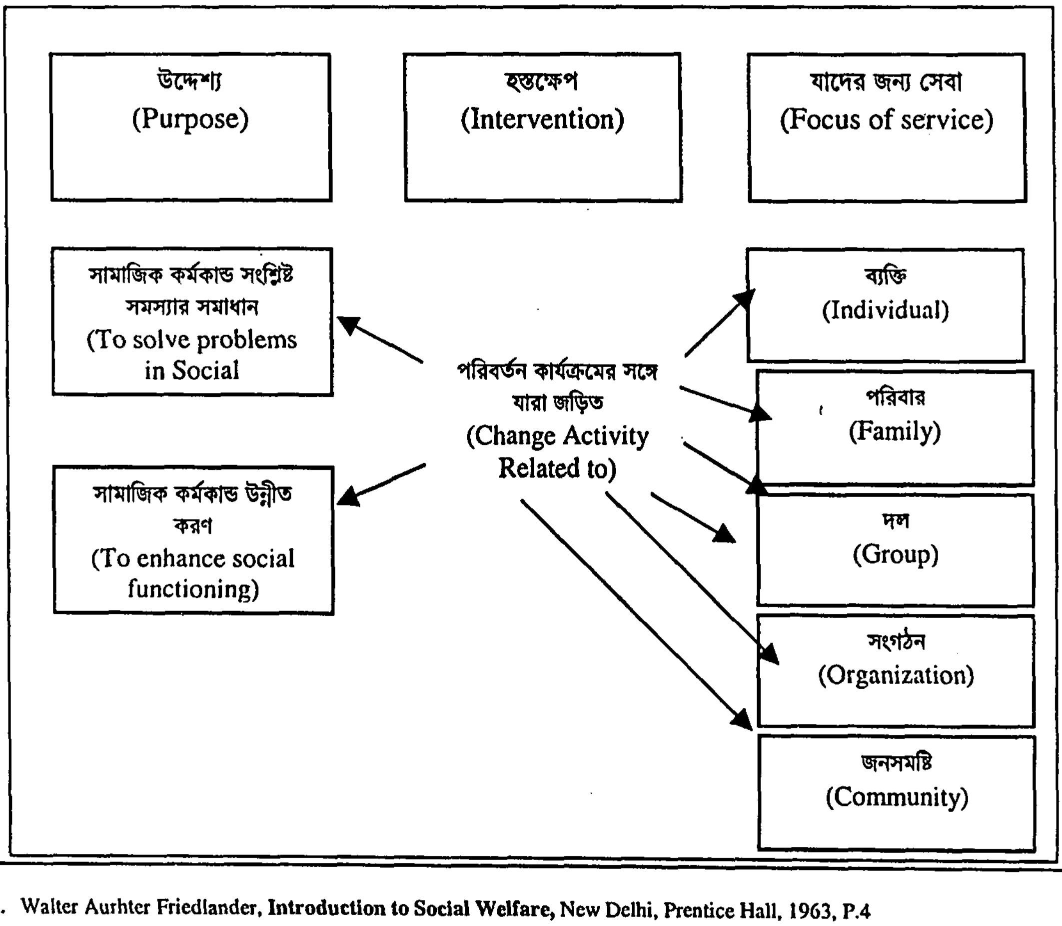

১. Walter Aurhter Friedlander, **Introduction to Social Welfare**, New Delhi, Prentice Hall, 1963, P.4

২. Bradford W.Sheafor, Charles R.Horesji, Gloria A. Horesji, Tecknique and Guidliness for Social Work Practicc, Allyan and Bucox. Boston. 1988. P.13.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত :

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য প্রসঙ্গে চার্লস ডি. গারভিন বলেছেন "The goal of social work, social policy and social welfare is to improve the quality of life for persons, individually and in organizations, communities, and societies through social intervention." (সমাজকর্ম, সামাজিক নীতি এবং সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে, সমষ্টিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে মানুষের জীবন মান উন্নত করা।)[১]

জাতিসংঘের মতে, "Social welfare is an organization activities aimed at helping individuals or communities to meet their basis needs and at promoting their well-being in harmony with the interests of their families and communities." (সমাজকল্যাণ এমন এক সংগঠিত কর্মপ্রচেষ্টা যার লক্ষ্য হল ব্যক্তি অথবা সমষ্টিকে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করা এবং তাদের পরিবারও সমষ্টির প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতী রেখে কল্যাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।)[২]

Charles Zastraw বলেছেন, "The objectives of social welfare is to meet the social, economical, health and recreational need of all men of the society." (সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত ও চিত্ত বিনোদনমূলক সকল প্রয়োজন পূরণ করা।)[৩]

Federico আমেরিকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণের সুস্পষ্ট ও সুপ্ত দু'রকম উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমন: সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

১. জনগণের ভূমিকাকে অধিকতর কার্যকর করতে সহায়তা দান,
২. জীবনের লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সহায়তা করা
৩. ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা এবং
৪. সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলা

সুপ্ত উদ্দেশ্যগুলো হল :

১. ন্যূনতম পর্যায়ে নির্ভরশীল হতে পারে এমন সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে জনগণের (বিশেষ করে গরীব ও সংখ্যালঘুদের) আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
২. মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতী রেখে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা,
৩. সেবা কার্যক্রমের মাঝে ক্ষমতা ও পছন্দ নির্দিষ্ট করে পেশাগত স্বায়ত্ত্বশাসন রক্ষা করা।[৪]

মোহাম্মদ আলী আকবর ও সৈয়দ আহম্মদ খান স্বাধীনতাউত্তর পর্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণের কতিপয় লক্ষ্য উল্লেখ করেন। যেমন-

১. জনগণের জীবনমানের প্রগতিশীল উন্নয়ন
২. সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সামঞ্জস্য স্থাপনে জনগণকে শিক্ষা দান
৩. জনসমষ্টি সম্পদের সংগঠন ও কাজে লাগানো এবং
৪. শোষিত মানুষের কল্যাণ সাধন ও সংরক্ষণ এবং জনসমষ্টির দায়িত্বের আওতাভূক্ত হিসেবে বিবেচিতদের প্রতি যত্নবান হওয়া।[৫]

নিচে সমাজকল্যাণের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

* **সকল মানুষের কল্যাণ :**

সমাজকল্যাণ সমাজ জীবনের অন্তর্গত সকল মানুষেরই কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, বয়স-লিঙ্গ-শ্রেণী, সাদা-কালো যাই মানুষের অবস্থান হউক না কেন সবাই সমান। মানুষের চাহিদা যাই হোক না কেন, সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতায় সকলেই অন্তর্ভূক্ত। সেজন্য সমাজকল্যাণ সম্পর্কে অর্ধশতাব্দী পূর্বে বলা হয়েছিল যে, এটি সকল মানুষের জন্য সকল মানুষের সংগঠিত তৎরপতা। Charles Zastraow এর ভাষায়, "The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health and recreational needs of every one in a society."[৬]

---

১. Charles D. Garvin, Social Work in Contemporary Society, 2nd ed. 1998, P.2
২. As qouted by W.A. Friedlander, op.cit, p.4
৩. Charles Zastraw, Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problems, Services Current Issues, 1982, p.7
৪. Federico, op.cit, p. 42
৫. Md. Ali Akbar and Sayed Ahmed Khan, "Private Investment in Social Welfare, College of Social Welfare and Research, University of Dhaka-1971, P.3
৬. Charles Zastraw, op.cit, P.3

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে W.A. Friedlander বলেছেন, "The objective of social welfare is to secure for each human being the economic neccessities, decent standard of health and living conditions, equal opportunities with his fellow citizens and the highest possible degree of self-respect and freedom of thought and action without interfering with the same rights of others."[১]

(খ) **মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণে সহায়তাকরণঃ** মানুষের মৌলিক চাহিদা (Need) পুরণ করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। স্থান, কাল, পাত্রভেদে চাহিদার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে মৌলিক প্রয়োজনগুলোর ভিন্নতা দেখা দেয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণ সব অবস্থায় মানুষের (ব্যক্তি, দল, সমষ্টির) কল্যাণে নিয়োজিত। প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন (need) নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার (Situation) উপর। সুতরাং সেবা তখনই সম্ভব, প্রকৃত অর্থে ব্যক্তির (individual) অনুভূত চাহিদা (felt need) কি? তার উপর। Luise C. Johnson and Charles L. Sehwartz) এর মতে মানবীয় চাহিদা হলঃ

1. Sufficient food, clothing and shelter for physical survival;
2. A safe environment and adequate health care for protection from and treatment for illness and accidents.
3. Relationships with other people that provide a sense of being cared for, of being loved and of belonging.
4. Opportunities for emotional, intellectual and spiritual growth and development, including the opportunity for individuals to make use of their innate talents and interests
5. Opportunities for participation in making decisions about the common life of one's own society, including the ability to make appropriate contributions to the maintenance of life together.[২]

সমাজকল্যাণ মানবীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি সুসংগঠিত তৎপরতা। Friedlander 1955, Wilnesky and lebeavx 1958, Wickenden 1965, Barker 1995 এবং Macarov 1995 সকলেই সমাজকল্যাণের চিন্তায় মানবীক চাহিদা পূরণ এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। R.E.Goodin তাঁর এক গবেষণামূলক লেখায় এরও পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, সকল সমাজে সমাজকল্যাণ অভাবের বদলে চাহিদা পূরণের সাথে জড়িত এবং প্রায় সকল সমাজে সমাজকল্যাণ কর্মসূচীসমূহ চাহিদা পূরণকারী হিসেবে নিজেদের নির্দিষ্ট করেছে। Charles D. Garvin বলেছেন, "Social welfare is the pattern of ways that society organizes to provide for its members basis needs: food, clothing shelter and personal care"[৩] জাতিসংঘ-এর মতে, "In Social welfare includes organized activities aimed at helping individuals or communities to meet their basic needs and to promote their well-being in harmony with the interests of their families and communities."[৪]

* **সমাজবাসীর সামগ্রিক মঙ্গল বিধানঃ**

মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে কোন এক বিশেষ দিক নিয়ে সমাজকল্যাণ কাজ করে না, সমাজকল্যাণ মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ বিধানে নিয়োজিত। সমাজকল্যাণ তৎপরতা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত ইত্যাদি সকল দিকের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। আবার মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা যেমনঃ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা এবং অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমাধানে কাজ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) ব্যাখ্যা হল "Social welfare is a state of complex and not merely the amelioration of special life. The enjoyment of the highest attainable standard of life is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic and social condition. The welfare of all people is fundamental to the attainment of peace and security." (সমাজকল্যাণ বলতে শুধু নির্দিষ্ট জীবনের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থা বুঝায় না, বরং সামগ্রিক দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাকে বোঝায়। ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জীবন মান লাভ করা অন্যতম মৌল অধিকার। আর সকল মানুষের কল্যাণ সাধন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের মূল ভিত্তি।[৫]

---

১. W.A. Friedlander, op.cit, P.5

২. Luoisc C and others, Social Welfare, 4th, (ed), P.4

৩. Charles D. Garvin, op.cit, p.3

৪. W.A. Friedlander and apte, op.cit, P. 4

৫. As qouted by Sampa Das, op.cit, p. 39

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ শ্রেণীর দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদানঃ

প্রত্যেকটি সমাজেই বিশেষ শ্রেণীর দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী থাকে, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা নিজ পরিবারের মাধ্যমে মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারী-বেসারকারী সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র শ্রেণীর মৌল চাহিদা পূরণ করা। Robert Morris সমাজকল্যাণের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "Social welfare is .... the sum of those efforts by governments and other organization to relieve the poverty or distrees of a people who are more or less helpless, that is unable to meet their basic needs by their own labour or by their families."[১] সমাজকল্যাণ হল সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত যে সব কার্যক্রম যে গুলো দারিদ্র ও দুঃস্থবস্থা হ্রাসে মানুষকে সাহায্য করে। যে অবস্থা সংশ্লিষ্টদের শ্রম দ্বারা অথবা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মৌল চাহিদা পূরণে অক্ষম করে তোলে।

সামাজিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করাঃ

সমাজকল্যাণ পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে মানুষ যাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সাহায্য করে থাকে। Federico-এর ভাষায় "The goal of social welfare is to help people function effectively in their social environment. This means not only providing for peoples basic survival needs but meeting all those needs necessary for them to be psychologically well and socially productive."[২] (সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশে কার্যকর ভূমিকা পালনে মানুষকে সাহায্য করা, এর অর্থ সমাজকল্যাণ শুধু বেঁচে থাকার জন্য মৌল চাহিদাগুলো পূরণে মানুষকে সাহায্য করে না, বরং মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক উৎপাদনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় সব চাহিদা পূরণে মানুষকে সাহায্য করে। যাতে মানুষ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিজস্ব সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।)

ব্যক্তি ও পরিবেশের উন্নয়নঃ

ব্যক্তি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিথষ্ক্রিয়া সমাজকল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজকল্যাণে ব্যক্তি এবং পরিবেশের কার্যকর মিথষ্ক্রিয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে মানুষ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয় Men is the by product of his environment মানুষ যে পরিবেশে বড় হয় সেই পরিবেশের প্রভাব তার ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। পরিবেশ যদি ব্যক্তির জীবনে অনুকূলে হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ইতিবাচক হবে এবং পরিবেশ যদি ব্যক্তির জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নেতিবাচক হবে। পাশাপাশি পরিবেশ যাতে সমাজকল্যাণ উপযোগী হয় সেই দিক নিয়েও সমাজকল্যাণ কাজ করে থাকে। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও পরিবেশের যুগপৎ উন্নয়ন, যাতে ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে ও শক্তিশালী করণে মানুষকে সাহায্য করা সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যার্জনের জন্য সমাজকল্যাণে ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যা সমাধানঃ

সমাজকল্যাণের বিকাশধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি শুধু মানবীয় চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই উদ্ভব ও বিকশিত হয় নি। পরিবর্তনশীল সমাজে স্বীকৃত সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ দূরীকরণের লক্ষ্যেও গঠিত ও পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান সমাজকল্যাণ Caring, curing Preventive ধারায় কাজ করে যাচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

সমাজকল্যাণ বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত ক্ষমতা (Dorment potenalities) রয়েছে। যদি এই সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত করা যায়, তাহলে ব্যক্তি (client) নিজেই নিজের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ দান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে সমাজকল্যাণ। সামাজিক ভাবে উৎপাদনশীল (Social productive) হতে মানুষকে সাহায্য করে, যাতে সে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। Ronald C. Federico-এর ভাষায়, "Social welfare's task is to help people function more effectively so that they become productive members of society."[৩]

১. Robert Morris as qouted by Sampa Das, P.40

২. R.C. Fedrico, Social Welfare in Todays World, 1990, P. 25

৩. Ibid, P. 27

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পরিবর্তন সাধন:

সমাজকল্যাণ শুধু সমস্যার প্রতিকার নিয়ে ব্যাপৃত নয়, বরং যে সব অবস্থা সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী, যে সব অবস্থার পরিকল্পিত পরিবর্তনে সাহায্য করে সমাজকল্যাণ। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো। সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা অবাঞ্চিত পরিবর্তনের প্রতিরোধ এবং প্রত্যাশিত পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষকে সাহায্য করে, যে পরিবর্তন মানুষের সার্বিক জীবন মানোন্নয়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও জোরদার করে, সে ধরনের পরিবর্তনকে সমাজকল্যাণ উৎসাহিত করে।

সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন:

সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাবে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা মানুষের সংহতি বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগীতা, সহানুভূতি ও সমানুভূতির অভাবে সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। এমতাবস্থায় সমাজকল্যাণ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। R.M.Titmus -এর মতে, " সমাজকল্যাণের বিবেচ্য বিষয় হল সমাজে মানুষের সুশৃঙ্খল ও যথাযথ সম্পর্ক (Right order of relationship in society) প্রতিষ্ঠা।[১]

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:

সমাজকল্যাণের বিশেষ লক্ষ্য হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ Gambrill -এর মতে, ঐতিহাসিক ও পরিপ্রেক্ষিতগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ তিনটি মূখ্য কাজের সাথে জড়িত। তা হল: মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুগত চাহিদা থেকে পরিত্রান দেয়া, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজসংস্কার। এগুলোর মধ্যে তিনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে Maintaining Social order, and descipline, regulating the labour market ইত্যাদির কথা বলেছেন।[২] সমাজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার্থে সমাজে এমন মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের অস্বাভাবিকতার কারণে সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে।

সমাজের নিম্ন ও নির্যাতিত শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ:

সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সমাজের নিম্ন ও নির্যাতিত শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ। সমাজের পশ্চাৎপদ ও নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে তাদের কারিগরী দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বেসরকারীভাবে পরিচালিত-'ইউসেপ' বাংলাদেশের কথা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি। 'ইউসেপ' সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান করে তাকে। শুধু তাই নয় ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার পর চাকুরীর মাধ্যমে পুনর্বাসন করে থাকে। সমাজকল্যাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হল দরিদ্র, অসহায়, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করা।

সামাজিকীকরণের সাহায্য করা:

সমাজকল্যাণ মানব কল্যাণে সামাজিকীকরণের (Socialization) ভূমিকাকে সুসংহত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বৃহৎ সমাজের আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়মনীতি, বিধিবিধান আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া হল সামাজিকীকরণ। সমাজকল্যাণ মানুষের সাথে মানুষের আন্ত:সম্পর্ক (inter personal relationship) তৈরিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্ত:সম্পর্ক হচ্ছে, (বাবা-মা)-এর সাথে সন্তান এর সম্পর্ক, ভাই-বোনের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক। আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ইতিবাচক হবে আর সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক না হয় তা হলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে সামাজিকীকরণে সাহায্য করা। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ জীবনের একটি নির্দিষ্ট ছকে জীবন যাপন করে থাকে। সুতরাং প্রতিটি মানুষ যাতে সুষ্ঠু সামাজিক জীবন লাভ করতে পারে সেজন্য সমাজকল্যাণ সামাজিকীকরণে সাহায্য করে থাকে।

---

১. R.M. Titmus, as qoutcd by Sampa Das, op.cit, P. 41

২. lieen Garmbrill, Social Work practics, A Critical thinkers Guide, Oxford University Press, NewYork.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন:

সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। C.Murray সমাজকল্যাণ পরিভাষাটি সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, "Social welfare as ....the system of distributing valued resources, such as money, jobs, housing and educational health and social services." (সমাজকল্যাণ সমাজের মূল্যবান সম্পদ যেমন- অর্থ, কর্মসংস্থান, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজসেবার মতো মূল্যবান সম্পদ বন্টনের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাই সমাজকল্যাণ)[১]

জনগণকে সমস্যা মুকাবিলা ও সমৃদ্ধি অর্জনে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা:

সমাজকল্যাণ একটি সুসংগঠিত সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সমস্যার প্রকৃতি, বা আঙ্গিক যাই হউক না কেন, সমাজকল্যাণ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করে থাকে যাতে সে তার সমস্যা নিজেই বুঝতে পারে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমাধান করতে পারে। সমাজকল্যাণ ব্যক্তিকে তার সুপ্ত ক্ষমতার (dorment potentialities) বিকাশে সহযোগিতা করে থাকে। W.A. Friendlander -এর মতে "Social welfare is the organized system cf social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health and personal and social relationship that permit them to develop their full-capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of thir families and the community" অর্থাৎ সমাজকল্যাণ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজসেবা প্রদানের সুসংগঠিত কর্মপদ্ধতি যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক জীবনমান ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়নে সহায়তা করা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন করা এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের কল্যাণের পথ সহজতর করা।[২]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক। সমাজ জীবন যত গতিশীল এবং পরিবর্তিত হচ্ছে পাশাপাশি সমাজকল্যাণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ততদূরই বিস্তৃত হচ্ছে। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায়, সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা হল এমন একটি হাতিয়ার, যা মানবকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনে সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। Charles Zastrow বলেছেন, "The purpose of social welfare institutions are to prevent alleviate or contribute to the solution of recognized social problems so as to improve the well-being of individuals, groups and communities directly. অর্থাৎ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ, বিমোচন বা সমাধানে অবদান রাখা, যাতে ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টির কল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩]

সমাজকল্যাণের পরিধি :

সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজকল্যাণের পরিধি বলতে এর জ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে বুঝানো হয়ে থাকে। অন্যকথায়, সমাজকল্যাণের জ্ঞান বা বিষয়বস্তুর প্রয়োগের সীমাই হল এর পরিধি। তবে কোন দেশের স্বীকৃত সামাজিক সমস্যা, জনগণের অপূরিত চাহিদার ধরন এবং যেগুলো মুকাবিলার চেষ্টা, দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন এবং প্রশাসনিক কাঠামো সে দেশের সমাজকল্যাণের পরিধির ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণের পরিধি অনেক ব্যাপক। এর ব্যাপক পরিসরের মধ্যে সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে গৃহীত সকল প্রকার কার্যাবলীকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৪]

আধুনিক সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নে মানুষকে সাহায্য করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে গৃহীত সকল প্রচেষ্টায় সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির্ভূক্ত। সমাজের কোন বিশেষ দিকে এর পরিধি সীমিত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত সেবাকর্ম যেমন সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্ভূক্ত; তেমনি মানবিক ও ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর বিচ্ছিন্ন সেবাকর্মও সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধির আওতাভুক্ত। এলিজাবেথ উইকেনডেন সমাজকল্যাণের পরিধি প্রসঙ্গে বলেন, "সমাজকল্যাণের অন্তর্ভূক্ত হল যেসব আইন, কর্মসূচী সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম যেগুলো জনগণের জন্য স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণের নিশ্চয়তা বিধান বা জোরদার ও উত্তম সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত।"[৫]

---

১. Encyclopedia of Social Work, op.cit, p. 220
২. W.A. Friedlander, Introduction to Social Welfare (3rd ed), 1969, P.4
৩. Charles Zastrow, op.cit, P. 13
৪. আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৭
৫. Elizabeth Wikenden, op.cit, P. 7

Dhaka University Institutional Repository

মিনাহান (Minahan) সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন-(১) মানুষের সক্ষমতা ও সমস্যা-সমাধানে যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।

(২) সম্পদ অর্জনে মানুষকে সহায়তা করা

(৩) মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তোলা

(৪) সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করণে সহায়তা করা

(৫) সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করা

(৬) সামাজিক ও পরিবেশগত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা।[১]

মানব জীবন একটি অবিচ্ছেদ্য সত্তা। এর বিভিন্ন দিক যথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর যে কোন একদিকে অসুবিধা দেখা দিলে সমগ্র মানুষটিই অসুখী হয়ে পড়ে এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। যার প্রতিফলন ঘটে সমাজ জীবনেও। একই কারণে মানব জীবনের কোন একটি দিককে বাদ দিয়ে কিংবা উপেক্ষা করে অন্যদিকের উন্নতি বা অন্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই সমাজকল্যাণ সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানে পরিচালিত। তাই বৃহত্তর দৃষ্টিতে সকল সামাজিক সমস্যা মুকাবিলার সকল কর্মতৎপরতা এর আওতাভূক্ত। সমাজ জীবনে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক অনেক সমস্যা রয়েছে। এ পর্যায়ে বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেকারত্ব, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, পঙ্গুত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। এসব সমস্যা পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির প্রতি গুরুত্ব দিলে সমস্যার সার্থক মুকাবিলা সম্ভব নয় এবং সমাজের সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করা যায় না। সে জন্য সমাজকল্যাণ সমাজ জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করে সমাজের সার্বিক অবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট।[২] তাই আর.এ. স্কীডমোর এবং এম.জি. থ্যাকারী (R.A. Skidmore and M.G. Thackery) বলেন, "বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক চাহিদা পূরণ এবং কল্যাণ সাধনই সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।"[৩]

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "Social welfare includes those organized, activities, aimed at helping individuals or communities to meet their basic need and promoting their well being in harmony with the interests of their families and communities."[8]

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মূলত: তিন প্রকারের। যেমন প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক ও উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরেই কোন না কোন ধরনের সমস্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাবলী প্রতিকারমূলক সমাজকল্যাণের (Curative aspect of social welfare) পরিধিভূক্ত। প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পঙ্গু পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পূর্নবাসন, অপরাধ সংশোধন, চিকিৎসা সমাজকর্ম ইত্যাদি কার্যক্রম। এছাড়া দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা মুকাবিলা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম প্রতিকারমূলক সমাজকল্যাণের পরিধিভূক্ত।[৫]

সামাজিক সমস্যার মূল উৎস হল সমাজ। সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির সামঞ্জস্যহীনতা এবং অবক্ষয় হতেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা। সমস্যা সৃষ্টির উৎস এবং সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় বোধ করে সম্ভাব্য ভবিষ্যত বিপর্যয়ের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলী প্রতিরোধমূলক সমাজকল্যাণের (Preventive aspects of social welfare) পরিধিভূক্ত। প্রতিরোধমূলক সমাজকল্যাণের মধ্যে রয়েছে সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম, গ্রামীণ সমাজসেবা, পরিবার ও শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, দু:স্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রতিবন্ধিদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব গঠনমূলক ও পরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয় সেসব কার্যাবলী উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের (Preventive aspect of social welfare) পরিধিভূক্ত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলী উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের অন্তর্ভূক্ত। মানব সম্পদ উন্নয়ন সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের বাঞ্চিত পরিবর্তন আনয়ন, সমাজকল্যাণ কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, শহর সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিভূক্ত।[৬]

---

১. B.W. Sheafor, C.R. Horesji, Teckniques and Guidlines for Social Work Practice, Allyn and Bacon, Inc, Boston-1988, P. 13-14

২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৪

৩. Skidmore and Thackery, Introduction to Social Work, 1991, P.3

৪. The development of National Social Welfare Programes, NewYork, 1959.

৫. মো: আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোন সমস্যা সাধারণত ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধানের লক্ষ্যে একই সাথে তিনটি পর্যায়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। তিনটি পর্যায় থেকে সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য সমাজকল্যাণের নিজস্ব তিনটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social case work), দল সমাজকর্ম (Social group work) এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন (Community organization and development) । এ সকল পদ্ধতির সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য আবার তিনটি সাহায্যকারী পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- সামাজিক গবেষণা (Social research) ; সামাজিক প্রশাসন (Social administration) এবং সামাজিক কার্যক্রম (Social action)। ইদানীংকালে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সকল পদ্ধতির মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমন্বিত পদ্ধতি (Integrated method) নামে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার সকল পর্যায় যেমন-ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক পর্যায় থেকে সমস্যা মুকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[১] এ মৌলিক ও সাহায্যকারী ছয়টি পদ্ধতিই আধুনিক সমাজকল্যাণের আওতাভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণের দু'টি প্রধান শাখার একটি হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্ম এবং অপরটি হচ্ছে অপেশাদার সমাজকর্ম। জনগণের কল্যাণে উভয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকল সরকারী এবং বেসরকারী সমাজকল্যাণ কার্যক্রম (স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক) বৃহত্তর পরিসরে সমাজকল্যাণের আওতায় আসে। তাছাড়া কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রসারের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন ও শিক্ষা ইত্যাদিতেও সমাজকল্যাণের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকল্যাণের পরিধি ও ক্ষেত্রও পরিবর্তনশীল। সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক সমস্যার জটিলতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বে সমাজকল্যাণের পরিধি ও ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে জনকল্যাণকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ায় সমাজকল্যাণের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু :

সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু বলতে যে তাত্ত্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণ একটি সামাজিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজকল্যাণ হল একটি সমন্বয়ধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকল্যাণের তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ নিজস্ব জ্ঞানভান্ডার রয়েছে। যা সমাজস্থ মানুষের সার্বিক সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজের মানুষের সার্বিক সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজের মানুষের সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু আবর্তিত। সমাজের মানুষের সমস্যা, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানে সমাজকল্যাণে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি (Inter disciplinary approach) প্রয়োগ বলা হয়। ফলে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। মোটামুটিভাবে সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান
(২) বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবার কর্মসূচীর পর্যালোচনা
(৩) ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার দক্ষতা এবং
(৪) জ্ঞানের প্রয়োগ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ।[২]

মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান :

মানুষ এবং সমাজকে ঘিরে সমাজকল্যাণ আবর্তিত। সেজন্য মানুষ ও তাদের সামাজিক আচরণ, সমস্যা প্রভৃতি দিক এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি, দল, পরিবার, জনসমষ্টি, সম্পদ, সামাজিকীকরণ, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নীতি, সামাজিক আইন, সামাজিক শৃংখলা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজকল্যাণের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজকল্যাণ সমাজবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃ-তত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, আইন, মনোচিকিৎসা প্রভৃতি বিজ্ঞান থেকে আহরিত জ্ঞান সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছে। তাই ফ্রীডল্যান্ডার বলেছেন, "Social work draws scientific knowledge and insight from several discipline-sociology, economics, political science, phychology, psyciatry, anthropology, biology, history, law, education and philosophy but it has synthesized them into a unique science."[৩]

---

১. মো: আব্দুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১০
২. মুহাম্মদ আলী আকবর, "সমাজকর্ম প্রশিক্ষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও অবদান" সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ সমাজকর্ম শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী-১৯৯০, পৃ. ৯২-৯৩.
৩. Friedlander and Apte. Introduction to Social Welfare, New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1982, P. 5

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে-দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীত, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, যুব অসন্তোষ, নারী নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান ভিত্তিক আলোচনাও সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য। সমাজের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তিতে মানব আচরণ এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য সমাজকল্যাণ মানব আচার-আচরণ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি, আবেগ, আত্মরক্ষামূলক কৌশল, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে।[১]

বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবা কর্মসূচীর পর্যালোচনাঃ

অতীতে যেমন সমস্যা ছিল বর্তমানেও তেমনি সমস্যা রয়েছে। তবে কালের বিবর্তনে সমস্যা যেমন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তেমনি সমাধান প্রক্রিয়াও যুগোপযোগীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাক-শিল্পযুগে মহানুভবতা, দানশীলতা, ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় মানুষ সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করত। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগে সমস্যা সমাধানের গতানুগতিক ধারণায় পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজকল্যাণের নতুন তথা আধুনিক দর্শনের জন্ম হয়। ফলে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন, আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব একটি অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত। প্রাক্-শিল্প যুগের সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজকল্যাণের, দর্শন, বিভিন্ন ধর্মের সামাজিক মূল্যবোধ, শিল্পায়ন ও শহরায়ন, সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারকদের অবদান প্রভৃতি এর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।[২]

এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সমাজসেবা কর্মসূচী যেমন- গ্রামীণ ও শহর সমাজসেবা কর্মসূচী, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, নারী কল্যাণ, বৃদ্ধ কল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হাসপাতাল সমাজসেবা, মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম সবকিছুই সমাজকল্যাণের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ব্যক্তি, দল ও জনসমষ্টির সাথে কাজ করার দক্ষতাঃ

এ দক্ষতা অর্জনের পূর্ব শর্ত হল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন। সে লক্ষ্যে সমাজকল্যাণের কতিপয় নীতি, মূল্যবোধ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জটিল সমস্যাসমূহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধান দেয়া সম্ভব হয়। ফলে সমাজকল্যাণের যেসব নীতি, মূল্যবোধ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমষ্টি এবং গঠন ও উন্নয়ন এবং আরও তিনটি সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা, সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতিসমূহের আলোচনা সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।[৩]

জ্ঞানের প্রয়োজন ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণঃ

সমাজকল্যাণের জ্ঞান যেমনি এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত তেমনি সে জ্ঞান প্রয়োগ করে-কিভাবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনোভাব সৃষ্টি ও কৌশল প্রয়োগের জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান এর বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিবেচিত।[৪]

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণ হল একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নাম। যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার আলোকে মানব সমাজের সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণই সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তুর পরিধিভূক্ত। যেহেতু সমাজকল্যাণের লক্ষ্য সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়ন; সেহেতু সমাজের সার্বিক দিকই এর বৃহত্তর পরিধিভুক্ত। বর্তমান সমস্যার সমাধান, ভবিষ্যত সমস্যার প্রতিরোধ এবং সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সমস্যার সামগ্রিক দিক, সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সমাজসেবা কার্যক্রমের বর্তমান ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজকল্যাণে আলোচনা করা হয়। বাস্তবায়িত প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার সমাজকর্ম যেমন এর পরিধিভূক্ত ; তেমনি মানবিক ও ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত সেবাকর্ম ও সমাজকল্যাণের আওতাভূক্ত। সমাজকল্যাণের সাহায্য প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম। সমাজকর্মের মৌল ও সহায়ক পদ্ধতিগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য সমাজস্থ মানুষের মানসিক গঠন, বিকাশ ও সামাজিক দল ও সমষ্টিগত আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে হয়।

---

১. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩. মুহাম্মদ আলী আকবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৪. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২-৫

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রত্যয় বা ধারণা

সমাজকল্যাণ একটি সমন্বয়ধর্মী ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকল্যাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে এমন কতকগুলো মৌলিক ধারণা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন ব্যতীত সমাজ কল্যাণকর্মীদের পক্ষে আধুনিক সমাজকল্যাণের জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। প্রত্যয় বা ধারণাগুলো যতই সুস্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর অর্থ ব্যক্ত করবে সমাজকল্যাণকর্মী ও সংশ্লিষ্টদের কাছে ততই গ্রহণযোগ্য এবং এগুলোর সহজ প্রয়োগ সম্ভব হবে। এখানে তাই সমাজকল্যাণের সে সব অতীব প্রয়োজনীয় কিছু ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সমাজকর্ম (Social Work) :

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি গতিশীল পেশা হিসেবে স্বীকৃত। শিল্প সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যার সমাধানে ধর্মীয় অনুভূতি ও পরোপকারকে সুসংগঠিত করে সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। এজন্যই সমাজকর্মকে বলা হয় মানবসেবামূলক পেশা। এটি হচ্ছে সমাজকল্যাণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও কৌশলগত প্রক্রিয়া। যা সমাজের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থেকে আধুনিক উপায়ে সমাজকল্যাণ সাধন করে। ডব্লিউ এ. ফ্রিডল্যান্ডার (W.A. Fried Lander) বলেন, "সমাজকর্ম মানব সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার সেবা যা কোন ব্যক্তি, দল, সমষ্টিকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সন্তুষ্টি লাভ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে।"[১]

সমাজকল্যাণ অভিধানে বলা হয়েছে, "সমাজকর্ম হল অভ্যন্তরীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৌশলের নৈতিক ও উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ যা ব্যক্তি, দল বা প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যা সকলের কল্যাণের জন্য সহায়ক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োগিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়।"[২]

জাতিসংঘ সচিবালয় দেয়া সংজ্ঞা মতে, "সমাজকর্ম এমন এক ধরনের কার্যাবলী যা ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বারা তাদের সাহায্য করতে চায়।"[৩]

স্কিডমোর ও থ্যাকারীর ভাষ্য মতে, "Social work may be defined as an art, a science, a professon that helps people to solve personal, group (especially family) and community problems and to attain satisfying personal, group and community relationships through socialwork practice, including casework, groupwork, community organization, administration and research."[৪]

ওয়ার্নার ডব্লিউ. বোয়েম (Werner W. Boehm) বলেন, "Social work seeks to enhance the social functioning of individuals singularly, and in group, by activities focused upon their social relationships which constitute interaction between individuals and their environments. These activities can be grouped into three founctions, restoration to impaired capacity, provision of individuals and social resource and prevention of social disfunction."[৫]

হার্বার্ট বিসনোর (Herbert Bisno) মতে, "সমাজকর্ম হচ্ছে সেই সেবা ব্যবস্থা বা সমাজে পূর্ণ এবং কার্যকরী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আসতে পারে সেগুলো দূরী করণে মানুষকে একক কিংবা দলীয়ভাবে সাহায্য করে।"[৬]

সুতরাং সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে বলা যায়, সমাজকর্ম এমন একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া ও পেশা যা মানুষকে কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে তাদের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে এবং ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম করে তোলে।

---

১. "Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations, which helps individuals, groups or communities obtain social or personal satisfaction and independence" (W.A.Friedlandar and R.Z. Apte. Op.cit. P. 4)

২. "Social work is the purposeful and athical application of personal skill in interpersonal relationship directed towards inhancing the personal and social functioning of individual, family, group or neighbourhood which necessarily involves using evidence obtained from practice to help create a social environment conductive to the well-being of all." (Noel and Ritta timms, Dectionary of Social Welfare, Routledge and kegan Paul, Great Britain, 1977, P.184)

৩. "Social work is an activity designed to help towards a better mutual adjustment of individuals and their social environment." (As qouted by W.A. Friedlander, op.cit, p.3)

৪. R.A. Skidmore, M.G. Thackery and W. Farely, Introduction to Social Work, 5th (ed), 1991, P.8

৫. As quoted by R.A. Skidmore, Op.cit, P.5

৬. Herbert Bisno, Philosophy of Social Work, P. 1

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকর্মের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক :

সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ধারণা। সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ উভয়েরই লক্ষ্য সামাজিক সমস্যা নিরসন করে ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সন্তোষজনক জীবন লাভের ব্যবস্থা করা। সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিমন্ডলে পেশাদার সমাজকর্মের অন্তর্ভূক্তি ঘটায় সমাজকল্যাণ একটি সুসংগঠিত সেবামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক সমাজকল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি তাই মূখ্যভাবে পেশাদার সমাজকর্ম-নির্ভর।[১] তাছাড়া সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণকে পৃথক করে দেখলেও উভয় ধরনের সেবামূলক ব্যবস্থাতেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান-নির্ভরতা, মানব জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাবলম্বন নীতি-নির্ভরতা, বিশেষ নীতিমালা ও পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়াদির উপর গুরুত্ব আরোপ লক্ষ্য করা যায়।

সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণে সম্পর্কযুক্ত ধারণা হলেও এদের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। সমাজকর্ম বিশ্বকোষের ভাষ্যমতে, "The terms social work and social welfare are often confused and sometimes used synonymously. Actually social welfare has a broader meaning and encompasses social work, public welfare, and other related programs and activities ----- Social welfare in a broad sense, encompasses the well being and interests of larger numbers of people, including their physical, mental, emotional, spritual, and economic needs."[২]

কর্ম ও কল্যাণের ইংরেজী শব্দ যথাক্রমে 'Work' ও 'Welfare' । Work হল কাজ বা কর্মে জড়িত হওয়া, অন্যদিকে Welfare হল সুখকর জীবনযাপন (Comfortable living) । সমাজকর্ম হল ব্যক্তি, দলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পেশাগত সেবাদানের বিজ্ঞান ও কলা। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ হল সমাজের মানুষের সমস্যা নিরাময় ও উন্নতি লাভে সাহায্য করার জন্য গৃহীত ও সমাজের মানুষের সমস্যা নিরাময় ও উন্নতি লাভে সাহায্য করার জন্য গৃহীত ও পরিচালিত সেবামূলক ব্যবস্থা। সে আলোকে পদ্ধতিগত ও পরিধিগত-এ উভয় দিক থেকেই সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

(১) সমাজকর্ম হচ্ছে সেবা দানের পদ্ধতি, অপরদিকে সমাজকল্যাণ হল বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত ফল।[৩] মানবীয় মঙ্গল কামনায় পরিচালিত সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম সমাজকর্মের পরিচয় বাহক, আর মানবীয় মঙ্গল সাধনে গৃহীত ও পরিচালিত সেবামূলক তৎপরতার কার্যকারিতা ও সার্থকতার মাঝে কল্যাণের পরিচয় নিহিত। সমাজকর্ম সন্তোজনক জীবনমান লাভের উপায়, কিন্তু সমাজকল্যাণ হল জীবনমানের সন্তোষজনক অবস্থা বা কর্মের মাধ্যমে অর্জিত ফল।

(২) সমাজকল্যাণ পেশা নয়; পেশাগত যোগ্যতারও অপরিহার্যতা নেই। কিন্তু সমাজকর্ম বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও নিপুণতা নির্ভর একটি পেশা। তাই সমাজকর্মে পেশাগত যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য।

(৩) সমাজকল্যাণে পেশাদার অপেশাদার সকল কর্মীরাই সেবাদানের সচেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজকর্মের সেবাদান পেশাদার কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

(৪) সমাজকল্যাণের পরিধি সমাজকর্মের পরিধির চেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত।[৪] সমাজকর্মের পরিধি যেখানে সুশৃঙ্খল পেশাদার সেবাকর্মের মধ্যে সীমিত সেখানে সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিতে পেশাদার-অপেশাদার, সরকারী বেসরকারী, সংগঠিত অসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মতৎপরতাই অন্তর্ভূক্ত।

সমাজসেবা (Social Service) :

সমাজসেবা প্রত্যয়টি সমাজের মতই পুরাতন। যখন থেকে সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি তখন থেকেই সমাজসেবা ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে মানুষের কল্যাণের জন্য যে কোন ধরণের কাজকেই সমাজসেবা বলে ধরা হত। এ ধরনের কার্যক্রমগুলা সে সময়ে কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবার কখনওবা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মানুষের কল্যাণের জন্য নি:স্বার্থভাবে করা হত। তাই স্কিডমোর ও তাঁর সহকর্মীগণ বলেছেন "Social service came first and methods of social work developed out of Social Welfare."[৫]

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকর্মে সংশ্লিষ্ট ধারণা ও তত্ত্ব, রোহেল পাবিলকেশন্স, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৩৪
২. Encyclopedia of Social Work, NASW, New York, 1968, Preface, VIII,
৩. W.A. Friedlandar, op.cit, P.4
৪. Ibid, P.4
৫. R.A. Skidmore and others, op.cit. p.4

Dhaka University Institutional Repository

অতীতের আর্ত, অসহায় ও দু:স্থ ভিত্তিক সমাজসেবা ব্যবস্থা সময়ের বিবর্তনে যেমন সংগঠিত ও বৈজ্ঞানিকরূপ ধারণ করেছে তেমনি এর কর্ম পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। মানবীয় সমাজসেবা (Human social service) এখন শিশুর গর্ভকালীন পর্যায় থেকে (Prenatal phase) শুরু করে বৃদ্ধ বয়স বা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই দীর্ঘ মানব জীবনচক্রে (life cycle) সকলের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় বিকাশের সুযোগসহ আর্থ-সামাজিক সমস্যা, সমাধান এবং উন্নয়নই সমাজসেবার পরিধিভূক্ত। সাম্প্রতিক আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজসেবা ক্ষেত্র হিসেবে জনকল্যাণ সেবা, শিশু কল্যাণ সেবা, অপরাধ সংশোধনমূলক সেবা, বৃদ্ধদের জন্য সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, শারীরিক স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, মানুষ ও পরিবেশের সময় উপযোগী চাহিদার ভিত্তিতে সমাজের যাবতীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান, মানবীয় বিকাশ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং মানব সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমই সমাজসেবা।"[১]

সমাজকর্ম অভিধানে বলা হয়েছে, "সমাজসেবা হচ্ছে সমাজকর্মী ও অন্যদের দ্বারা পরিচালিত ও কার্যাবলী যা মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উন্নতি সাধন করে এবং মানুষকে অধিকতর স্বাবলম্বী, পরনির্ভরতা প্রতিরোধ ও শারীরিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণে সহায়তা করে এবং ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সমষ্টির ফলপ্রসূ সামাজিক ভূমিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।"[২]

Encyclopedia Britanica -এর ভাষ্য মতে, "The term social service is defined broadly as the provisions made by governmental or voluntary efforts to meet income maintenence, medical care, housing and receational needs and provisions for the care and protection of social groups which have become recognized as essential community responsibilities in industrial society."[৩]

এইচ. এম. ক্যাসিডি (H.M. Cassidy) বলেন, "Social services are those organized activities that are primerily and directly concerned with the conservation the protection and the improvement of human resources."[৪]

Economic and social commission of UN এর সংজ্ঞা মতে, "Social service is an organized activity that aims at helping towards a mutual adjustment of individuals and their invironment."[৫]

ফ্রিডল্যান্ডারের ভাষায়,"সমাজসেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনসমূহের যথাসম্ভব নিশ্চয়তা বিধান, যথোচিত স্বাস্থ্যবান ও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমসুবিধা সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদা ও চিন্তার স্বাধীনতার সুযোগ সৃষ্টি।"[৬]

সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, "সমাজসেবা হচ্ছে এক ধরণের সামগ্রিক সমাজকল্যাণ (Total social well-being) ব্যবস্থা যা সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে আর্থ-সামাজিক সহায়তা ভিত্তিক হতে পারে, কিংবা পেশাদার সমাজকর্মী, অন্যান্য পেশাদার ও অপেশাদার জ্ঞান ও দক্ষতা ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়নমুখী হতে পারে। তবে মানবীয় সুষ্ঠু বিকাশ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যক্তি ও পরিবেশের (Person in environment or person in situation) কার্যকরী আন্ত:সম্পর্ক সৃষ্টি এবং মানব সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু প্রতিপালন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সেবামূলক কার্যক্রমকেই আধুনিক অর্থে সমাজসেবা বলা হয়।

সমাজকল্যাণের সাথে সমাজসেবার সম্পর্ক :

সমাজকল্যাণ, সমাজকর্ম ও সমাজসেবা এক গভীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ ধারনার মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে ধারণা দু'টিকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব তা উপর।

(১) সমাজসেবাকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করলে সমাজসেবার ব্যাপক পরিধিতে সমাজকল্যাণ একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচী হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) সমাজসেবাকে ক্ষুদ্রতর অর্থে গ্রহণ করলে সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিতে তা এক ধরণের সেবামূলক তৎপরতা হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজসেবাকে ক্ষুদ্রতর দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করলে আরও যেসব পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে তাহল প্রধানত (ক) সমাজসেবা শুধুমাত্র অপেশাদার সেবাকর্ম, কিন্তু সমাজকল্যাণ পেশাদার-অপেশাদার উভয় ধরনের সেবাকর্মই অন্তর্ভূক্ত (খ) সমাজসেবা অসংগঠিত, কিন্তু সমাজকল্যাণ সুসংগঠিত সেবাকার্যক্রম (গ) সমাজসেবা হল প্রাথমিকভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যাণে শ্রমদান, আর সমাজকল্যাণ হল ঐ রূপ নিয়োজিত, শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত ফলসহ সন্তোষজনক মানবীয় অবস্থা (ঘ) সমাজসেবায় বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা-নিপুনতা দরকার হয় না, কিন্তু সমাজকল্যাণে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার অন্তভূক্তি রয়েছে।[৭]

---

১. রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৮২-৮৩
২. Dictionary of Social Work, P.
৩. Encyclopedia of Britanica, Vol-20, 1944, P. 901
৪. As qouted, Sampa Das, op.cit, p. 51
৫. Ibid, P. 51
৬. W.A. Friedlander and apte, op.cit, p.5
৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্কার (Social refoms) :

সমাজ সংস্কার ধারণাটি মূলত ব্যাপক পরিবর্তনের ইংগিত প্রদান করে। সাধারণ অর্থে কোন কিছুর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা পুনর্গঠনকে সংস্কার বলা হয়। সমাজ সংস্কার বলতে সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে বঞ্চিত ও গঠনমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিকে বুঝায়।

সমাজবিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের অভিধানে বলা হয় যে, "The general movement or any specific result of the movement, which attempt to eliminate or mitigate the evil that result from the malfunctioning of the social system or any part of it" অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা বা এর কোন অংশের ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত ক্ষতিকর অবস্থা অপসারণ বা নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট সাধারণ আন্দোলন বা উক্ত আন্দোলনের নির্দিষ্ট ফল।[১]

ভারতীয় সমাজকর্ম বিশ্বকোষের ভাষায়, "Social reform involve a deliberate effort to bring about a change in social attitude, culturally defined role expectations and actual patterns of behaviours of people in a desired direction through processes of persuation and public education." অর্থাৎ জনশিক্ষা প্ররোচিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যাশিত লক্ষ্যাভিমুখীতায় জনগণের আচরণের প্রকৃত নমুনা, সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত প্রত্যাশিত ভূমিকা ও প্রকৃত নমুনার পরিবর্তন প্রয়াসের সাথে সমাজ সংস্কার সংশ্লিষ্ট।[২]

ড.আলী আকবর-এর মতে, "সামাজিক প্রগতি ও মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের মধ্যে মৌল পরিবর্তন সুচনা করাকে সমাজ সংস্কার হিসাবে নির্দিষ্ট করা যায়।"[৩]

"Social Work Dictionary"-এর ভাষায় সমাজ সংস্কার হল, "An activity designed to re-arrange social institutions or the way they are managed to achieve greater social justice or other social change." অর্থাৎ সমাজ সংস্কার হলু এমন একটি কর্মতৎপরতা যা বৃহত্তম ন্যায়বিচার কিংবা অন্যান্য প্রত্যাশিত পরিবর্তন অর্জনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির পুন:বিন্যাস কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের পন্থা হিসেবে পরিকল্পিত।[৪]

সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, সমাজে বিদ্যমান যে সকল ক্ষতিকর প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, রীতিনীতি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয় এবং সমষ্টি জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলোর প্রতিকার বা মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন বা তার ফলশ্রুতিকে সমাজ সংস্কার বলে।

সমাজ সংস্কার সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সাধিত হয়। সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন দু'ভাবে পরিচালিত হতে পারে। তা হল, সংস্কারের পক্ষে জনমত গঠন করে আন্দোলন পরিচালন এবং সংস্কারের জন্য আইন প্রণয়নে আইন প্রণেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার আন্দোলন। সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সংগঠন ও এর গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, এরূপ আন্দোলন কয়েকটি সাধারণ পর্যায়ক্রমিক কর্মধারায় সম্পন্ন হয়। সমাজসংস্কার আন্দোলনের এসব ধারাবিহক পর্যায়গুলো হল নিম্নরূপ:

১. সামাজিক অনুভব উপলব্ধিতে সমাজ সংস্কারের বিষয় বা দিক চিহ্নিতকরণ।
২. একটি জাগরণ-পুন:জাগরণের মধ্যে সমাজবাসীর সচেতনতা আসা।
৩. সংস্কারের পক্ষে জনমত গঠন।
৪. আইন ও বিধি-বিধান প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি।
৫. আইন ও বিধি-বিধান প্রবর্তন।
৬. আইন ও বিধি-বিধান কার্যকরীকরণে।
৭. সমাজের সংস্কার সাধনপূর্বক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জন।[৫]

---

১. Henry Pratt Fairchild (ed.) "Dictionary of Sociology and Related Sciences, "Littlefeld, Adams & Co. New Jersy, 1964, P. 291
২. "Encyclopaedia of Social Work in India, "Vol 2, Ministry of Social Welfare, Govt. of India, 1987, P. 83
৩. Dr. Md. Ali Akbar, "Element of Social Welfare,"CSWRC, Dhaka-1965, P.3
৪. Barker (ed.), Social Work Dictionary, P. 355
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

সমাজ সংস্কার যেভাবে যে প্রক্রিয়াতেই সাধিত হোক না কেন এর লক্ষ্য হল সমাজবাসীর কল্যাণ সাধন। আর এ কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজের ক্ষতিকর ও কু-প্রথা দূর করার দরকার পড়ে। এতে করে সুস্থ্য সমাজ গঠিত হয়। সুস্থ্য ও সন্তোষজনক সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। ফলে তাদের জীবনযাপন সুখ সমৃদ্ধির পথে সহজে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রকৃতি ও ফলাফল ব্যাখ্যা করলে এ বাস্তবতাই খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: আমাদের সমাজে সতীদাহ্ প্রথা, হিন্দুবিধবা পুন:বিবাহ্ এবং ফরায়েজী আন্দোলন ইত্যাদির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অর্জিত সাফল্য সমাজ জীবনে ক্ষতিকর কু-প্রথা দূর করে সুস্থ্ সমাজ জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল বিধান করেছে।

সমাজ সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতার সংগঠন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল বিবেচনা করলে মূখ্যভাবে এর নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।[৫]

১. সমাজ-প্রগতি ও কল্যাণের জন্য সমাজ ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন তথা প্রধানত সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তনই সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য।

২. এটি সমাজে যুক্তিবাদ, মানবতা ও কল্যাণমুখী জাগরণে উদ্ভুত ও পরিচালিত জনমত ভিত্তিক সচেতন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

৩. সমাজসংস্কারের সংঘবদ্ধ তৎপরতা সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয় বলে এটি একটি আন্দোলন ভিত্তিক কর্ম ও এর মাধ্যমে অর্জিত ফল।

৪. সমাজসংস্কার চিরাচরিতভাবে সমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক পরিবর্তন আনয়নমূলক কল্যাণধর্মী তৎপরতা।

সামাজিক সমস্যা (Social Problem) :

সমাজবাসীর নিকট অসহনীয় হিসেবে বিবেচিত এবং সমবেত প্রচেষ্টায় মুকাবিলা করার দরকার বলে অনুভূত হয় এমন সামাজিক পরিস্থিতিকে সাধারণত সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১] লক্ষ্যণীয় যে, 'সামাজিক সমস্যা' শব্দটি 'সামাজিক' ও 'সমস্যা' এ দু'টি প্রত্যয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। এখানে সামাজিক শব্দটির দ্বারা সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজস্থ মানুষের কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। এ বিষয়গুলো সরাসরি সমাজস্থ লোকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জীবন ধারাগত আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে 'সমস্যা' প্রত্যয়টির মাধ্যমে এখানে অবাঞ্ছিত , দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম এবং জটিল এক অবস্থা, শর্ত, পরিস্থিতি বা আচরণকে বুঝনো হয়েছে। তাই বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হচ্ছে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজকাঠামো প্রভৃতির এক কথায় সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত এর অনাকাঙ্খিত, অবাঞ্ছিত ও ক্রটিপূর্ণ অবস্থা বা আচরণ। এরূপ অবস্থা সমাজের উন্নতিকে ব্যাহত করে এবং সমাজের অন্তর্গত মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিসবার্ট যেমন বলেছেন, "These (Social Problems) are called social problems since these are directily related to human relationship and the accepted system of society . We may call them problems since these create hurdles in expected plans and pointant upheavals in the regular life of community."[২]

The Dictionary of Social Science -এ বলা হয়েছে, "A social problem may be defined as a situation affecting a significant number of people that is believed by them and/or by a signinficant number of others in the society to be a source of difficult or unhappiness and one that is capable of amelioration. Thus a socail problem consist of both an objective situation and a subjective social enterpratation."[৩]

সমাজ বিজ্ঞানী হর্টন ও লেসলী (P.B. Horton and J.R. Lesely) বলেন, "সামাজিক সমস্যা হল সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা, যা সমাজবাসীর বৃহৎ অংশকে আক্রান্ত করে, যা অবাঞ্ছিত মনে করা হয় এবং যার প্রতিকারের জন্য সমাজবাসী সচেতন হয় এবং দলগত প্রচেষ্টায় এর প্রতিকার সম্ভব।"[৪]

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকর্মে সংশ্লিষ্ট ধারণা ও তত্ত্ব, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৪৭
৩. Dr. Rajendra Kumar Sharma, Social Problems and welfare, Atlantic Publishers and distrtibutiors, New Delhi, 1998, P.1
৪. The Dictionary of Social Science, P. 662
৫.Samuel Koening, Sociology, an introduction to science of society, Barness and noble inc. New York, 1969, P. 303.

ড্রেসলার (Dressler) এর মতে, "সামাজিক সমস্যা হল, মানবীয় সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি অবস্থা যা প্রতিকার বা প্রতিরোধ পন্থায় অবশ্যই সমাধান করা দরকার বা সমাধান হতে পারে এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কাছে অনাকাঙ্খিত হিসেবে বিবেচিত হয়।"[১]

ওয়ালেস ওয়াইভার (Wales Wiver) বলেন, "সামাজিক সমস্যা হল সেই ধরনের অবস্থা যা সমাজ জীবনে বিরোধ, দ্বন্দ্ব, অস্বাভাবিক চাপ, উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে এবং তা যে কোন মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা নৈতিক প্রয়োজন মেটাতে বাধার সৃষ্টি করে।"[২]

মোটকথা, সামাজিক সমস্যা বলতে যেসব প্রতিকূল অবস্থা বা পরিস্থিতিকে বুঝায় যা সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের জন্য ক্ষতিকর। সে সব পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকর হয় এবং তা সমাধান যোগ্য। সামাজিক সমস্যা মানুষের বৈধ চাহিদা পূরণ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথে বাধাস্বরূপ এবং সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক।

উল্লেখ্য যে, কোন একক কারণে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না। তাই সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক, জৈবিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উপাদানের যে কোন একটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে যেমনঃ

সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসনস (Tallcatt Parsons) তাঁর An Introduction to modern social problems গ্রন্থে বলেন, "পার্থিব সম্পদের সাথে মানুষের অসামঞ্জস্যই সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণ।"

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন (Ogburn) বলেন, "সদা পরিবর্তনশীল মানব সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের আদিম প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান না হওয়ার ফলে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী গিলীন ও তাঁর সহকর্মীরা বলেন, "বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সমন্বয় সাধনের সমস্যা হতে বিবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে।"

সি.এম. কেস (C.M.Case) তাঁর Analysing Social Porblems গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক সমস্যার প্রধান প্রধান উৎসগুলো হল, (ক) প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ; (খ) ত্রুটিপূর্ণ জনসংখ্যার প্রকৃতি; (গ) ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগঠিত সামাজিক বিন্যাস এবং (ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব।"[৩]

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যার পেছনে বহুবিধ কারণ জড়িত। এর মধ্যে কিছু সরাসরি দায়ী এবং কিছু সমস্যার প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে। তবে কারণসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Problem):

সামাজিক সমস্যা সমাজেই জন্ম, সমাজেই এটাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং সমাজেই এর মুকাবিলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও সামাজিক সমস্যা সমাজের ব্যাপার তথাপি সমাজভেদে এর স্বরূপ,প্রকৃতি, ধরণ ও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে তারতম্যপূর্ণ হয়। সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার এরূপ বৈচিত্র ও বহুমুখীতার মধ্যেও সকল সমস্যার ক্ষেত্রে কতিপয় সাধারণ দিক খুঁজে পাওয়া যায়। আর সেব সাধারণ দিকগুলোই এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। যেমনঃ

ক) সমাজের মধ্যেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
খ) সামাজিক সমস্যা সমাজের শৃঙ্খলা বিপন্নকারী একটি পরিস্থিতি।
গ) সামাজিক সমস্যা সমাজে অসস্তিকর অবস্থা হিসেবে অনুভূত হয়।
ঘ) সমাজের অধিকাংশ লোক সামাজিক সমস্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঙ) পরিবর্তনশীল সমাজে সামাজিক সমস্যাও রূপ বদলায়।
চ) সামাজিক সমস্যা জটিল ও বৈচিত্রধর্মী।
ছ) সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ প্রকৃতি তারতম্যপূর্ণ হয়।
জ) সামাজিক সমস্যাবলী পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।
ঝ) সামাজিক সমস্যার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দিক আছে।
ঞ) দলগত উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মুকাবিলার প্রয়াস আছে।
ট) সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য।
ঠ) সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায়।[৪]

---

১. David Dressler, Sociology The study of Human Interaction, Alfred A. Knopt, New York, 1969, P. 465
২. As qouted by Abdul Hoque Talukdar, Op.cit, P.59
৩. উদৃতঃ আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৪. সৈয়দ শওকুতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) :

সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বা ধারণা হল সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক নিরাপত্তা মূলত প্রতিকূল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ব্যবস্থাকে বুঝায়। নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা। সে অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সমাজবাসীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বুঝায়।

সামাজিক নিরাপত্তা মানব জীবনের এমন একটি অবস্থা (Situation) যেমন: বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য, কর্মকালীন দুর্ঘটনা প্রভৃতি যা মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য প্রতিকূল ও ঝুঁকিপুর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক অবস্থায় স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজের সামর্থ্য দিয়ে পূরণ করতে পারেন। যার প্রেক্ষিতে সমাজ বা রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে মরিস স্ট্যাক (Maurice Stack) বলেছেন, "Social security is a programme of protection provided by society against those contigencies of modern life sickness, unemployment old age dependency, industrial accidents and individualisms agianst which the individual cannot be expected to protect himself and his family by his own ability or foresight." অর্থাৎ আধুনিক জীবনের বিপর্যয় যথা: অসুস্থতা, বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও পঙ্গুত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যখন নিজ ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে অপারগ হয় সে অবস্থায় সমাজ কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সে সব কর্মসূচিকে বোঝানো হয়ে থাকে।[১]

ড. আলী আকবরের কথায়, "Social security is a general concept with generally refers to social insurance, social assistance, family allowances and a variety of social services disigned to reduce economics burdens of a family."[২]

Encyclopedia of Social Work in India (1967) তে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Social security ensures a person against economic distress resulting from various contingencies and assures him a minimum level of living consistant with the nations capacity to pay."[৩]

সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে Robert L. Baker তাঁর The social work Dictionary -তে বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা হল, "The provisions society makes to provide income support for citizens whose incomes are lost because of countering statutory defined hazards. Such as being old, sick, young or unemployement"[৪]

William Beveridge-এর মতে, পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন দূর্যোগে আয়ের পথ বন্ধ হলে আয়ের নিশ্চয়তা দান করার জন্য গৃহীত কর্মসূচী হল সামাজিক নিরাপত্তা। তিনি বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি কর্মক্ষম তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া এবং যখন কেউ কাজ করতে অক্ষম তখন তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তার কাজ।"[৫]

স্কটল্যান্ড (১৯৬৩) স্টেক (১৯৪৮) কোহেন্দ (১৯৭৭) প্রমুখের উদ্বৃতি দিয়ে ফ্রীডল্যান্ডার ও এপট বলেন, "অসুস্থতা, বেকারত্ব, উপার্জনকারীর মৃত্যু, বার্ধক্য কিংবা নির্ভরশীলদের অক্ষমতা এবং দূর্ঘটনা ইত্যাদি ব্যক্তি যখন নিজের চেষ্টায় মুকাবিলা করতে পারে না তখন সামাজিক আইনের মাধ্যমে যে সব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"[৬]

সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (Interntional Labour Organization) বক্তব্য হচ্ছে, "সামাজিক নিরাপত্তা এমন এক ব্যবস্থা যা বিপন্ন মানুষকে যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক প্রদান করা হয়। এমন সব বিপদ-আপদ বা আকস্মিক দূর্ঘটনা যা স্বল্প আয়ের লোকেরা তাদের নিজের সামর্থ্য ও দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেরা যথাযথভাবে মুকাবিলা করতে পারে না।"[৭]

---

১. Maurice stock in Walter A. Friendlander, Introduction to Social Welfare, Prentice Hall, New Jersey, 1968. P.5
২. Md. Ali Akbar "Element of Social Welfare, "(2nd ed), college of Social Welfare and Research Centre, Dhaka, 1965, P. 185
৩. Encyelopadia of Social Work in India Vol-2, 1967, P. 302
৪. Robert L. Barker, The Social Work Dictionary, NASW, Press washington D.C, 1995, P.355-56.
৫. Beveridge Report, P. 10 উদ্বৃত, আ.স. ম. নূরুল ইসলাম ও মো: হাবিবুর রহমান, কল্যাণনীতি ও কর্মসূচী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩২
৬. W.A. Friedlander and Robert Z. Apte. Introduction to Social Welfare, "Prentic Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1979, P. 5
৭. International Labour Office, "Aproach has to social security. An International survey, "Geneva, 1942, Preface.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় বলা যায়, যে সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ মানুষ নিজের সম্পদ, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা মুকাবিলা করতে পারে না সে সব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হল সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করে জীবনযাত্রার একটি নূন্যতম মান বজায় রাখতে সাহায্য করা।

মোটকথা, যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের নিয়ন্ত্রণে বর্হিভূত কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন এ অবস্থা মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয় সে সকলের সমষ্টিই সামাজিক নিরাপত্তা। দেশ, কাল, প্রয়োজন ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে এ নিরাপত্তার প্রকারভেদ দেখা যায়। W.A. Friendlander সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দু'টি প্রধান দিকের কথা বলেছেন।[১]

১. সামাজিক সাহায্য (Social assistance)

২. সামাজিক বীমা (Social insurance)

সামাজিক সাহায্য :

এটা মূলত সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এক ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা সেখানে সরকার তার রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকে এই ধরনের কর্মকান্ডে অর্থায়ন করে থাকে। সামাজিক সাহায্যের আওতায় সাহায্য লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থীকে কোন অবদান রাখতে হয় না। মূলত সামাজিক বীমার আওতায় সকলকে আনা সম্ভব হয় না বিধায় সামাজিক বীমার আওতা বর্হিভূত সাধারণ মানুষকে সামাজিক সাহায্যের আওতায় এনে সেবা প্রদান করা হয়।

সামাজিক বীমা :

সামাজিক বীমা এমন এক সাহায্য দান ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির অবদান সাপেক্ষে তাকে তার বিপদকালীন সময়ে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। সামাজিক সাহায্য ব্যক্তির অবদান থাকলেও সে বিপদকালীন সময়ে সাহায্য লাভ করে থাকে। কিন্তু সামাজিক বীমার আওতায় সাহায্য পেতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আর্থিক অবদান রাখতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল:

- সামাজিক নিরাপত্তা মূলত শিল্পবিপ্লবের প্রতিশ্রুতি
- সামাজিক নিরাপত্তা অসহায় ও অক্ষম মানুষের জীবন যাত্রার নূন্যতম মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি মূলত ত্রিমুখী। এর আওতায় রয়েছে সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য ও জনসেবা।
- সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সাহায্য করা।
- কোন কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক হতে হলে অবশ্যই তা সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক হতে হবে।

সামাজিক আইন (Social Legislation) **:**

আইন হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্থা থেকে প্রবাহমান সামাজিক বিধি-বিধানের সমষ্টি।[২] আইনের মূল কাজ হল শাসনের মাধ্যমে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করা, সংহতি সাধন ও শৃঙ্খলা আনয়ন। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সমতা আনয়ন, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং নির্যাতিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান প্রণীত বিধি-বিধানকে সামাজিক আইন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবর্তনশীল সামাজিক অগ্রগতি, জটিলতা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সরকারের ইচ্ছায় কিংবা জনমতে চাপের ফলে সরাসরি সমাজ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় সেগুলোকেই সামাজিক আইন বলে।[৩]

সমাজকর্ম অভিধানের বর্ণনা মতে, "Social legislation is laws and resources allocation providing for human welfare needs, Income, security, education and cultural progress, civil riglads, consumer protection and programes that address social problems."[৪]

সি.এন. শঙ্কর রাও বলেন, "Laws become legislation when they are made and put into force by law making body or authority."[৫]

---

১. Walter A. Friendlander, op.cit, P. 7

২ রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১০৩

৩. রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৪. The social work Dictionary, 1995, P.354

৫. Ibid, P.354

সামাজিক বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহের অভিধান মতে, "সমাজের যে সমস্ত লোক লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুত্বের কারণে অথবা অক্ষমতার কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনে অক্ষম তাদের রক্ষার জন্য এবং উন্নয়নের জন্য প্রণীত আইনকেই সামাজিক আইন বলে।"[১]

সমাজকল্যাণ অভিধানের বর্ণনা অনুযায়ী, "অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সেবা দানের জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা শারীরিক পঙ্গু, দরিদ্র বা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার জন্য সন্তোষজনক জীবন যাপনে অক্ষম তাদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবর্তিত আইনই সামাজিক আইন।"[২]

সুতরাং সামাজিক আইন বলতে সমাজ কর্তৃক গৃহীত সেই সকল প্রতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ বুঝায় যা সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে ক্ষতিকর উপাদান সমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে।

সামাজিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সামাজিক আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। তবে এর সুনির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন-

* সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা
* সমাজ সংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করা
* সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়তা করা
* আদর্শ ও মূল্যবোধ জনিত দ্বন্দ্বের আপোষ করা
* অবহেলিত সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা
* সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় রাখা
* খাপ খাওয়াতে ও সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা
* সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করা
* সমাজ থেকে গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করা
* সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধণ করা।[৩]

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক আইনের সম্পর্ক :

সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধান করা সমাজকল্যাণের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক আইন সহায়ক এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সমাজকল্যাণের অন্যান্য লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা, সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা, বাঞ্চিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি। সমাজকল্যাণের এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামাজিক আইনের লক্ষ্য পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের স্বার্থসংরক্ষণ করা, সমাজ সংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন করা; সামাজিক সাম্য ও সুবিচার এবং সাম্য বজায় রাখা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি বজায় রাখা, সামাজিক সামঞ্জস্য বিধানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৪]

সামাজিক আইনের মাধ্যমেই সামাজিক নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। সমাজকল্যাণ সুনির্দিষ্ট সামাজিক নীতির আলোকে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৫]

সমাজকল্যাণে বঞ্চিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে জনগণকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে থাকে। সামাজিক আইন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে নতুন পরিস্থিতির সাথে জনগণের সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজকল্যাণের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

সমাজকল্যাণ তার আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সামাজিক আইন আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে ক্ষতিকর উপাদানসমূহ দূর করে সমাজকল্যাণের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যই সমাজকল্যাণ এবং সামাজিক আইনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

---

১. Dictionary of sociology and related sciences, Fairchild, Henry pratt, Littlefield, Adam and Com. New Jercy, 1964, P.285
২. Dictionary of Socialwelfare, Social services publishers Inc. New York, 1948, P.209
৩. মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৬২-৬৩
৪. আব্দুল তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, ঢাকা-২০০৪, পৃ.৭৪
৫. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) :

সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, সংস্কৃতি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজকে সংগঠিত ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

অন্যকথায়, "কোন সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও নিয়মাচার কাঠামোর প্রতি সকল সদস্যের আনুগত্য এবং একাত্মতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক মাধ্যমসমূহের কার্যকলাপের সমষ্টিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।"[১]

সমাজকর্ম অভিধানে বলা হয়েছে, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সমাজ বা সমাজের কিছু সদস্যের সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সুসংগঠিত প্রয়াস।"[২]

ডেভিড রেপেনো (David Repenoe) বলেন, "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের উপর সীমা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং সমাজ বা দলের আদর্শের প্রতি অনুগত হতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।"[৩]

ড. হাবিবুর রহমানের মতে, "যে পন্থা-পদ্ধতি সমাজের সদস্যদের অসংযত ও সমাজবিরোধী আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি দমন করতে এবং সামাজিক সংহতি ও শৃংখলাবোধ জাগিয়ে তুলে সমাজকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে তার নাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।"[৪]

সমাজবিজ্ঞানী অগর্বান ও নিমকফের মতে, "The social control is the pattern of pressure which a society exerts to maintain order and eshtablished rules."[৫]

সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যার মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতি, সংহতি ও সমাজবিরোধী আচরণ বা বিপথগামীতা রোধ করে সমাজকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করে। এটি সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরূপ আচরণ সংশোধন করে ও নিরবচ্ছিন্ন সমাজপ্রবাহ অব্যাহত রাখে।

সামাজিক উন্নয়ন (Social development) :

উন্নয়ন বলতে সাধারণত অনুন্নত স্তর হতে উন্নত স্তরে উত্তরণ বুঝায়। এটা মূলত: একটি আপেক্ষিক ধারণা (relative concept) । কারণ আজকে যাকে 'উন্নত স্তর' বলা হয়েছে কালক্রমে তা আবার 'অনুন্নত' স্তর হিসেবে আখ্যায়িত হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া (Development process) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আর সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং এর নির্ধারক গুলোর বিচার তাৎপর্য এত জটিল যে সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞাগত পরিপূর্ণতা খুবই কঠিন। সমাজের সুশৃংখল পরিবর্তন নির্দেশ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। তাই বলা যায়, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের পূর্বাবস্থা থেকে তুলনামুলকভাবে উন্নততর অবস্থার পরিবর্তন বা অবস্থান্তর। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন।[৬] অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়নে আওতায় একটি সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সকল কর্মকান্ডের উন্নয়ন অন্তর্ভূক্ত। যার দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্য; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য; উন্নয়ন ও বণ্টন সম্পর্ক নৈতিকতা ও আদর্শ, প্রশাসন ও পরিচালনা, পুরুষ ও মহিলার কার্যাবলী সবকিছুকেই বুঝায়- যা মানুষের জীবন মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৭] তাই বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন-

---

১. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ৪০৮
২. The Dictionary of Social work, P. 352
৩. As quated, মো: নূরুল ইসলাম, সমাজকর্ম, ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৬
৪. ড. হাবিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১৫১
৫. Ogburn and Nimcoff, A Hand book of sociology, P. 182
৬. মো: আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৭. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

জে.এফ.পেইভা (J.F.Paiva) বলেন, "Social development has two inter related dimensions: The first is the development of the capacity of the peopel to work continously for their welfare and that of the societies. The second is the atteraction or development of society's institutions. So that human needs are metal all levels."[১] অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়নের পরস্পর সম্পর্কিত দু'টি ধারার একটি হল জনগণের নিজেদের ও সমাজের কল্যাণে ধারাবাহিক কাজ করার সামর্থের উন্নয়ন এবং অন্যটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বা উন্নয়ন যাতে সকল পর্যায়ের জনগণের মৌল চাহিদা পূরণ হয়।

অর্থনীতিবিদ অমর্তসেন বলেন, "জনসাধারণের সক্ষমতার বিকাশই সামাজিক উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে সত্ত্বাধিকারের উপর। অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রিতে মানুষ তার দখল বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে তার উপর।"[২]

মিডলে (Midley) বলেন,"সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে এক ধরনের পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় জনকল্যাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়।"[৩]

জেমস্ বিলাপস (James Billups) বলেন, "সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে এক ধরণের সমৃদ্ধ বহুমাত্রিক প্রত্যয় (a rich multidimensional concept) যা সমাজকর্মের মানব উন্নয়নমূলক ধারণা থেকে উন্নত ও পৃথক। সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে অধিকতর বিস্তৃত ধারণা যাতে ব্যক্তি সমষ্টির কল্যাণই শুধু বুঝায় না, সামগ্রিকভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয়, সমষ্টিগত ও সামাজিক মানবীয় উপলব্ধিগত সম্ভাবনার সম্ভাব্য পরিপূর্ণ বিকাশকে বুঝায়।"[৪]

আর. পান্ডে (R. Panday) বলেন, "সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন, সম্পদের সমবন্টন, জনগণের ব্যাপক অংশায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ যার মাধ্যমে প্রান্তিক গোষ্ঠী ও সমষ্টি একটি মানসম্মত জীবনধারার দিকে অগ্রসরে সক্ষম হয়।"[৫]

কানাডীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (সিডা)র ভাষ্য মতে, "Social development is development that equitable, socially inclusive and therefore sustainable it promotes local, national and global institutions that are responsive, accountable and inclusive and it empowers poor and vulnerable people to participate effectively in development is to support the empowerment of poor people by increasing their social assets and capacities and to promote inclusive institute there by increasing poor peoples opportunities for more secure."[৬]

সামাজিক উন্নয়নের বেশ কিছু উপাদান বা পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন, শিক্ষার প্রসার, মানব সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তি, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা, সামাজিক বুনিয়াদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ধর্মীয় উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন, নেতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, আত্মকর্মসংস্থান, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনোদন ইত্যাদি।[৭]

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অসম্পূর্ণতার মাঝে সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব নিহিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানুষের কল্যাণের অন্যতম উপাদান; কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে সম্পদ যদি ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরা যায় না। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সুষম বন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা সামাজিক উন্নয়নের পরিধিভূক্ত।[৮]

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে বাঞ্ছিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠনে মানুষকে সহায়তা করা। সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের জ্ঞান ব্যতীত সমাজকর্মীদের সমাজ উন্নয়নে কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজকল্যাণের সামগ্রিক কার্যাবলীর লক্ষ্যই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা। কারণ সমাজকল্যাণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুকল্যাণ। এগুলোর সবই আধুনিক সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিভূক্ত।[৯]

সামাজিক উন্নয়নের প্রত্যয়টির মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সমাজের বিভিন্ন অংশের অসম পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফলে কম ও স্বল্পোন্নত এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। তেমনি সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রমের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের সার্বিক দিকে বাঞ্ছিত কল্যাণ সাধনের নিশ্চয়তা বিধান।[১০] সেজন্য সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়ের গুরুত্ব সমাজকল্যাণে অত্যাধিক।

১. Encyclopedia of social work, 1995, P. 2168
২. অমর্তসেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, কলকাতা, ১৩৯৭ বা. পৃ. ১২১
৩. Encyclopedia of Social Work, Vol-111, 1995, P. 2171
৪. Ibid, P. 2169
৫. Ibid, P. 2169
৬. as quoted by Samap Das, op.cit, P. 53
৭. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৮. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৯. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১০. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পরিবর্তন (Social Change) :

পরিবর্তন বলতে সাধারণভাবে পূর্বের চেয়ে ভিন্নতর কোন অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকে পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবর্তনশীলতা সমাজের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তাই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, "Society exists as a time sequence. It is a becoming not a being, a process not a product. In other words, as soon as the process causes, the product disappears." অর্থাৎ সমাজের মধ্যে একটা কালের ধারাবাহিকতা রয়েছে। এটা প্রবহমান ধারা। এটা ইট কাঠের ইমারত বা অচলায়তন নয়।"[১] সুতরাং সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলে সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সমাজবিজ্ঞানী টি.বি. বটমোর (T.B. Bottomore) সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞায় বলেছেন, "ব্যবহারিক অর্থে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের আয়তন ও কাঠামোর পরিবর্তন অথবা বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন (It is useful to define social change as a change is social structure (Including changing in the size of the society) or in particular social instritutions or in the relationships between institutions.)[২]

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সময়ের ব্যবধানে একটা সমাজের আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যে পরিবর্তন আসে তাকেই বুঝায়। সমাজকর্ম অভিধানে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Variations over time in a society laws, norms, values and Institutional arrangement."[৩]

আবার সমাজবিজ্ঞানী শ্যামুয়েল কোয়েনিং সামাজিক পরিবর্তন বলতে মানুষের জীবন-যাপন রীতিতে সংঘটিত পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদানের কারণে হয়ে থাকে। তার ভাষায়, "Social change refers to the modification which occurs in the life patterns of a people. These modifications are caused by multitude of factors either enternals or external in charcter, i,e. by forces arising from conditions within the groups or outside it."[৪]

মরিস জিন্সবার্গ বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোকে এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিবর্তনসহ যে সব আদর্শ, মূল্যবোধ বা বিধি সমাজকাঠামোকে সংহত এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, সেগুলোর পরিবর্তনকেই বুঝানো হয়ে থাকে।"[৫]

অপরদিকে ম্যাকলং লি (Meclong Lee) সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বলেন, "Social change are not essentially changes in social life, they after not the essence of social life, but it forms and the functions and structures of various social institutions or social systems. Social change is the process in which we discern an essential change in the structure and functions of social systems" অর্থাৎ, সমাজ জীবনে অপরিহার্য পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন নয়, আবশ্যিকভাবে তা সমাজ জীবনের রূপান্তরও নয়; বরং বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির কাঠামো ও ক্রিয়াকে নবরূপে গঠন করে। সামাজিক পরিবর্তন একটি প্রক্রিয়া যা আমরা সামাজিক ব্যবস্থাদির কাঠামো ও ক্রিয়ার অপরিহার্য পরিবর্তনে উপলব্ধিকারী।[৬]

সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো, আচরণবিধি, সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক কার্যাবলীসহ সকল ক্ষেত্রের পরিবর্তন বুঝায়। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে সংঘটিত যে কোন ধরনের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের আওতাভুক্ত।

---

১. R.M. MacIver and Charles H. Page, Society: An Introductory Analysis, Macmillan Press Ltd. London-1949, P.511
২. অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, সমাজবিজ্ঞান পরিচয়, পৃ.২২৭
৩. R.L. Barker (ed.), The Social Work Dictionary, NASW, Press Washington-1995, P. 352
৪. Samuel Koeing, Sociology: An Introduction to the science of society. Burness and noble Inc. NewYork-1957, P. 279
৫. Moris Ginsberg, 'Social Change' Sociology and social philosophy, British Journal of Sociology, Sept. 1958, P.120
৬. Mcclung Lee, 'New Outline of the principles of sociology.' Longmans, New York-1951, P. 263

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকল্যাণ :

সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রধান প্রত্যয় বা ধারণা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। তাই সমাজকল্যাণ ও সামাজিক পরিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কারণ সমাজকল্যাণ নিজেও সমাজে বাঞ্চিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে প্রচেষ্টা চালায়। কাজেই বাঞ্চিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের সাথে সমাজকল্যাণের সুসম্পর্ক রয়েছে। যেমন:

* বাঞ্চিত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এজন্য অবশ্যই পূর্বের পরিবেশের মাঝে গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ পূর্বের পরিবেশ পরিবর্তন সাধন করে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।[১]

* সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার ফলে সমাজে দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা। তাছাড়া পুরনো সমস্যাও জটিল এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে সমস্যা মুকাবিলার জন্য যুগে যুগে সমাজকল্যাণের ধারণা, কর্মসূচী ও কলাকৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বস্তুত: আধুনিক সমাজকল্যাণের জন্মই হয় শিল্পায়ন, শহরায়ন ও কলা কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জটিল সামাজিক সমস্যার সার্থক মুকাবিলার জন্য।[২]

* সমাজকল্যাণ সমাজ থেকে সকল সামাজিক সমস্যা দূর করতে চায়। এজন্য সমাজকর্মীদের সামাজিক পরিবর্তনসহ সমাজ ও সমাজকাঠামোর সকল বিষয়ে যেমন সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয় তেমনি যে কোন ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসুক না কেন সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিবর্তনের সাথে জনগণের খাপ-খাওয়ানো অত্যাবশ্যক। সকল ধরনের পরিবর্তনের সাথে জনগণকে খাপ-খাওয়ানো আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই সমাজকল্যাণের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি (Social values and social nroms) **:**

সমাজকর্মে সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। কোন সমাজকে পূর্ণভাবে জানতে হলে এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করতে হলে সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদি জানতে হয়। সমাজকর্ম মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। আবার সামাজিক রীনীতি বাদ দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সামাজিক রীতিনীতি মূল্যবোধের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্র ভিন্ন। জে.বি. চিটাম্বর এর মতে, 'সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ একটি সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সংহতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।"[৩]

আরমান্দো মোরেলস-এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ শুধু আচরণের সাধারণের নির্দেশনা দান করে। যেমন: ব্যক্তির নির্জনতা একটি সামাজিক মূল্যবোধ কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারিণ করে দেয় সেই নির্জনতা কিভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হবে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অন্যতম উপায়। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতম মানদন্ড (higher order norms) হিসেবে সমাজের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদন্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে, সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।'[৪]

---

১. মো: আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
২. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৩. উদৃত: সম্পা দাস, সমাজকর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১৪১
৪. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

মনীষী মিল্টন (Milton Rokeach) তার The nature of Human values (১৯৭৩) গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যবোধের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তারমতে, মূল্যবোধ হল এক ধরণের বিশ্বাস, যা ব্যক্তি মানুষের সার্বিক বিশ্বাস ব্যবস্থার (Total belief system) কেন্দ্রে অবস্থান করে একজনের কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং কিরূপ করা উচিত নয় সে সম্পর্কে অথবা মর্যাদা করা বা না করা সম্পর্কে বিশ্বাসবোধের জন্ম দেয়। মূল্যবোধগুলোর প্রত্যেক মানুষের অন্তর থেকে জীবন কিরূপ হওয়া উচিত এবং ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার কার্যাবলীর নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তার ভাষায়, "Values are type of belief centrally located within ones total belief system about how one ought or ought not-behave of about some and state of existence worth or not worth attainding. Values are at the heart of each persons view of how life ought to be and they serve to guide that person's action towards those ends."[১]

Leslic, Larson and Gorman এর মতে, 'কোন কিছুর আপেক্ষিক প্রত্যাশার দলীয় ধারণা হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ '(A value is the group conception of the relative desirability of a thing of idea)'[২]

সমাজ জীবনে, ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দলীয় লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা বিচার বোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ এবং সমাজ অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হল প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য :

সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যই নিহিত থাকে সমাজের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত ধারণা। মূল্যবোধের মধ্য ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বর্তমান থাকে। সমাজ জীবনে মূল্যবোধের গড়ন, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলতা ও সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সামাজিক মূল্যবোধের মধ্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

P.E.Jacob -এর মতে, সমাজ জীবনে মূল্যবোধের গড়ন, প্রকৃতি ও ক্রিয়াশীলতা ব্যাখ্যায় নৃ-বিজ্ঞানে মূল্যবোধের নিম্নরূপ মূখ্য বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।[৩]

(১) মূল্যবোধ নির্বাচনমুখিতার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে। তাতে সহজলভ্য বিভিন্ন অবস্থার মধ্য গুণগত ধারাক্রমে পছন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ থাকে।

(২) মূল্যবোধে বংশানুক্রমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চলমানতা থাকে।

(৩) যদিও অনেক মানুষ শক্তভাবে মূল্যবোধের ধারক তথাপি এটির পরিবর্তন হয়।

(৪) সমাজের মানুষ হিসেবে নিজ ভূমিকার পূর্ণতা বা প্রত্যাশার সন্তুষ্টির সাথে ব্যাপকভাবে মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট। এতে চাপিয়ে দেয়া বাধ্যবাধকতা অথবা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকা জড়িয়ে থাকে।

(৫) মূল্যবোধ আত্মমূল্যায়নে প্ররোচিত করে। তাহল নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য লব্দমানের সূত্রে ব্যক্তির নিজ আচরণ বিচারের ক্ষমতা মূল্যবোধে থাকে। এরূপ আচরণগত মান সামাজিক দলের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির মধ্যে সাধারণত উদ্ভব হয়।

(৬) মূল্যবোধে আত্ম ধারণা থাকে। এটি আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা ভ্রান্তক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে। মানবীয় আচরণ ধারায় মূল্যবোধের কার্যকারিতা পরিস্ফুট হলেও সমাজকাঠামোর অন্যতম উপাদান হিসেবে সামাজিক মূল্যবোধ কতিপয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

(৭) সময় ও সময়ভেদে মূল্যবোধ তারতম্য পূর্ণ হয়।

(৮) সময় ও সময়ভেদে মূল্যবোধ তারতম্য আচরণ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে।

(৯) এটির লক্ষ্য হল পছন্দ ও আচরণ বিচারের মান তথা সামাজিক মানদন্ড।

---

১. As quoted by Armando Morales, op.cit, P. 200
২. Leslic Larson and Gorman, Introductory Sociology, 3rd ed. P. 71
৩. P.E. Jacob (ed.), Values and their functions in decision making, "Pennsylvania Studies of social values and public policy. 1962, P.19

Dhaka University Institutional Repository

(১০) মানবীয় চাহিদা ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে এর পরিবর্তন হয়।
(১১) আদর্শবোধ ও নৈতিকবোধের সাথে মূল্যবোধ জড়িত।
(১২) সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে এমন লোক নির্ধারণ সম্ভব হয় না বলে মূল্যবোধ পরিমাপ যোগ্য নয়।
(১৩) মূল্যবোধ সহজাত নয়, অর্জিত।
(১৪) ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবোধকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যেমন- ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

সামাজিক রীতিনীতির সংজ্ঞা (Definition of social Norms) :

অধ্যাপক অগবর্ন ও নিমকফ (Ogbar and Nimcoff) এর মতে, সামাজিক নিয়মনীতি হল সামাজিক মূল্যমানযুক্ত এক ধরনের সামাজিক আচার ব্যবহার যার থেকে উৎসারিত ব্যবহার সমাজে প্রশংসিত হয়। এমনকি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাঁরা আরও বলেন, "A social norm is a type of social behaviour that is socially valved and a departure from which is socially condemned and perhaps punished severly."[১]

সমাজের যে কোন দলের সদস্যদের আচার ব্যবহার সাধারণত কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহারের নির্দিষ্ট এ সব নিয়ম বা ধারাগুলোকেই সামাজিক নিয়ম-নীতি বলা হয়। সামাজিক নিয়ম-নীতির মধ্যে মূল্যবোধের ধারণা বর্তমান থাকে। সমাজের সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো সর্বজন স্বীকৃত মূল্যবোধের দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়।

সমাজের মধ্য বসবাসরত কতিপয় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় কতগুলো সামাজিক মূল্যবোধের। এসব মূল্যবোধ দ্বারাই ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ম-নীতির মাধ্যমেই দলীয় বা গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারের ধরণগুলো অনুভব করা যায়। দলীয় আচার-ব্যবহারের এরূপ মূল্যবোধকেই সামাজিক নিয়ম বলা হয়। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেবের মতে, "Social norms represent standarized generalization concerning expected modes of behaviour. As standarized generalizations they are concepts which have been evaluated by they group and in corporate value judgements"[২] সামাজিক নিয়ম-নীতি হল সমাজের অভিপ্রেত বা আদর্শমূলক ব্যবহার। সামাজিক নিয়ম-নীতির সাথে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক বিদ্যমান। সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি নির্মাণের অন্যতম মাধ্যম। কোন সমাজই এবং কোন দলই সামাজিক রীতিনীতি বর্হিভূত জীবন যাপন করতে পারে না। সামাজিক রীতিনীতিই সমাজের মানুষের সামাজিক সংহতি (Social order) উৎস হিসেবে কাজ করে।[৩]

সুতরাং রীতিনীতি হচ্ছে সেই সমস্ত দলীয় আচরণ যা সমাজকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক রীতিনীতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আইন মান্য করা (respect of law), পেশাজীবিদের পেশার মানদন্ড মেনে চলা (any profession must follow the professional ethics)

সমাজকল্যাণ, সমাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি :

সমাজকল্যাণে সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে বাঞ্চিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন করা। এ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতিকে সমাজকল্যাণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ

প্রথমতঃ সমাজকল্যাণ যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট সেক্ষেত্র সম্পর্কে জনগণের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি কি তা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। কারণ পরিবর্তনের ক্ষেত্র যদি তাদের মূল্যবোধের পরিপন্থি হয় তবে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় জনগণ অংশগ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন পরিবর্তন সাধনের পর তার সাথে জনগণকে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা সমাজকল্যাণের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনবোধে জনগণের মূল্যবোধে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়তে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ জনগণের মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ সমাজকল্যাণ সব সময় বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে। জনগণের মূল্যবোধের পরিপন্থি কোন কর্মসূচী কখনও সফল হয় না। এজন্য কর্মসূচী প্রণয়নের সময় জনগণের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।"[৪]

---

১. William Ogburn, Culture and social change, Chicago University Press, USA-1964
২. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৩. Leslic Larson and Gorman, op.cit, P. 76
৪. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ সমাজকর্ম নিজেও কতিপয় মূল্যবোধের অধিকারী। এ সকল মূল্যবোধ যেমন-ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সমান সুযোগের অধিকার, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি। এসকল মূল্যবোধ অধিকাংশ সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অপর দিকে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সর্বাধিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য সামাজিক সমস্যার প্রকোপ দূর করে বা লাঘব করে গঠনমূলক ও সুষ্ঠু সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সামাজিক-অর্থনৈতিক সকল দিকই সামাজিক নীতির আওতায় পড়ে। এ কারণেই সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী সামাজিক নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।[১]

আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পিত উপায়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হচ্ছে নীতি। সুষ্ঠু নীতির উপর পরিকল্পনার ভিত রচিত না হলে কোন পরিকল্পনাই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সামাজিক নীতি হচ্ছে দর্পনস্বরূপ, সমস্যার বহি:প্রকাশের পূর্বেই সমস্যা সম্পর্কে ধারণা বা প্রকৃতি ফুটে উঠে। সামাজিক নীতি হচ্ছে একটি প্রত্যাশা যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে সার্বিক মানবকল্যাণ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। সমাজকল্যাণ কর্মসূচী তথা সমাজকর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পথনির্দেশিকা হচ্ছে সামাজিক নীতি। এটি সমস্যা নির্ণয়-বিশ্লেষণ, সমাধানের উপায় সম্পর্কে সঠিক পথ নির্দেশ এবং সমস্যাগত সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সামাজিক নীতি সুপ্তাবস্থায় থেকে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। কেননা, সুনির্দিষ্ট সামাজিক নীতি ব্যতীত সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায় না।[২]

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকল্যাণের মূল চালিকা শক্তি যেমন-সামাজিক নীতি, তেমনি সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত সামাজিক নীতি প্রণয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সমাজকল্যাণ। তাই উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice):

সামাজিক ন্যায়বিচার কথাটি মূলত: এমন এক ভাবধারা ভিত্তিক যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যকার পার্থক্য ব্যতিরেকে সমাজে সকল মানুষের সমতা নির্দেশ করে। তাছাড়া সকল মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিতেও এর অর্থবোধ লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়বিচার মানুষের চিরন্তন প্রত্যাশা। মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে সমাজে বাঁচতে চায়, চায় প্রাপ্য স্বাধীনতা। মানুষের এই যে অধিকার স্বাধীনতা, এগুলো কোন জাগতিক উৎস হতে উদ্ভূত নয়, বরং ঐশীভাবে প্রাপ্ত। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এই অধিকারগুলো নিয়ে। সুতরাং এগুলো কেড়ে নেয়ার অধিকার অন্য কারও হাতে থাকতে পারে না। এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণই হল সামাজিক ন্যায়বিচার।[৩] অধিকারগুলোর সংরক্ষণের জন্যই প্রণীত হয়েছে জাগতিক আইনসমূহ; এগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচার বিভাগ, যার মূল দর্শন-দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। সমাজের প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয়। সমাজ হয়ে উঠে অশান্ত। এই অশান্ত অবস্থায় মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরী।[৪]

ন্যায়বিচার কথাটি নৈতিক ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে মানুষের কতিপয় নৈতিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে ন্যায়বিচার ধারণা ব্যাখ্যাত হতে পারে। এতে নৈতিক অধিকার হিসেবে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ সন্ধানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব অধিকারে মর্যাদার স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা বিধানের সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা ও ভিত্তি গড়ে তোলার মধ্যে ন্যায়বিচার কথাটি মূর্তরূপ পায়।[৫] সামাজিক ন্যায়বিচার হল একটি আদর্শমূলক ধারণা। এ ধারণা মতে, সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হবে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথকে সুগম করে তোলা। সাধারণভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার সামাজিক নিরপেক্ষতার একটা সাধারণ অবস্থাকে নির্দেশ করে থাকে, যা ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতা বা আইনগত ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।[৬]

---

১. আবদুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২. মো: আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ.৫৪
৩. ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, মানবাধিকার ও সমাজকর্ম, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ.১২.
৪. গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪, প. ৬.
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কল্যাণ, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৩.
৬. David Jary and Julia Jary, Callins Dictionary of Sociology 3rd edition. (social Justice general conceptions of social fairness which may or may not be at with conceptions of individual justice with conception of legal justice).

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ন্যায়বিচারকে অনেকে সম্পদের সুষম বণ্টনকে বুঝিয়ে থাকেন। অনেকে আবার একে সুযোগ-সুবিধার সমতাকে নির্দেশ করেন। অধ্যাপক রবার্ট এল. বার্কার এর মতে, সামাজিক ন্যায়বিচার হল স্বাধীনতা, সমতা ও মৈত্রীর সংশ্লেষণ। ন্যায়বিচারে আছে মানবীয় মর্যাদার স্বীকৃতি।[১] একথার অর্থ এই নয় যে, স্বাধীনতার নীতি ন্যায়বিচারের নীতিকে নিশ্চিত করে। বরং ন্যায়বিচার তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন স্বাধীনতা সমাজে কাম্য হয় এবং সকলে সমভাবে তা ভোগের সুযোগ পায়। ফলে ন্যায়বিচারে কোন মানুষের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি স্বীকৃত নয়। মার্কসীয় দর্শনে ন্যায়বিচারকে দেখা হয়েছে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের সমতায়। হিতবাদীদের কাছে ন্যায়বিচার হল, সাধারণ সুখ বা স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা। আবার কারও কারও মতে, ন্যায়বিচার হল শক্তিশালীর ক্ষমতা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে জড়িত ব্যক্তিগণ নিজ স্বার্থে যে শক্তি প্রয়োগ করে তা সামাজিক প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নির্দেশ করে।[২] সামাজিক ন্যায়বিচার ধারণা এরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও একথা স্বীকৃত যে, সকল সমাজই ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। কেননা তার ভিত্তিতেই সমাজ জীবনে ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা পায়।

সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা প্রসঙ্গে Encyclopedea of Social Work-এ বলা হয়েছে, "Social justice is the embodiment of fairness (whether peoples are dealt with reasonably), equity (whether similar situation are dealt with similary) and equality (whether people and situations are dealt with in the same manner.)"[৩]

International Encyclopedia of Social Science - এ সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে "Justice means the active process of preventing or remedying what would arous the sense of injustice. Thus the experience of the sense of injustice is itself a dramatic species of social transformation, because it incites men to join with one another in percieving danger, in resisting it, and in exuiting over an achieved success all of which are public acts solidarity. Jutice is more than a static equalibrium or a quality of the human will, it is as common usage has always hinted, an active process or agenda or enterprise. The meaning of the term comes alive whenever one confronts injustice and does injustice."[৪]

সামাজিক ন্যায়বিচার কথাটি সমাজে সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনার ভাবধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা। Justice Gajendra Gadkar এর ভাষায়, "The concept of social justice takes within its sweep the object of removing all inequalities and affording equal opportunities to all citizens in a social affairs as well as economic affairs"[৫] সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে এরূপ মতামত, ধারণাটির একটি সাধারণ অবহিতমূলক পরিচিতি তুলে ধরলেও বাস্তবে ব্যবহারিক দিক থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারকে জানা ও ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদিও এক্ষেত্রে সাধারণভাবে বন্টনমূলক ন্যায়বিচারকে সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিচয়বাহীরূপে গণ্য করা হয়, তথাপি কতিপয় ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

আবার এটা আইনগত ন্যায়বিচার থেকেও পৃথক হতে পারে যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজের মৌল কাঠামোর বণ্টনমূলক দিক ভিত্তিক হয়। রলস-এর ভাষায়, "The justice of social scheme depends essentially on how foundamental rights and duties are assigned on the economic opportunities and social conditions in the various sectors of the society"[৬] অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার সকলের মধ্যে বণ্টনের সমতাকেই শুধু অধিশ্রায়িত করে না, পাশাপাশি বঞ্চিত ও দুর্বল মানুষের সমতা লাভেও সমর্থন যোগায়।[৭] সেজন্যই স্কারম্যান (Scarman) বলেন, "Social Justice means justice indepth not only penetrating and destroying in inequlities of sex, race, wealth but also supporting the weak and the exposed, which is belived by some to be beyond the reach of traditional combination of common law, rule and equitable relief supplemented, where necessary by status. It appeals to need a new law, new principles, new remedies, new masonary and new men."[৮]

---

১ Robert L Barker (ed.). "The Dictionary of Social Work," NASW Printing Press, Washington, D.C.1995. P. 354.
২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩.
৩. Encyclopedia of Social Work. vol-iii. NSAW New York, 1995, P. 2176.
৪. International Encyclopedia of Social Sciences. vol. 8. Macmillan company press, New York, 1968. P. 347.
৫. উদ্ধৃতঃ Dr. Gukulesh Sharma, Human Rights and Social Justice, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1997. PP.394-395.
৬. Ibid, P. 397.
৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫.
৮ Dr. Gukulesh Shara, op.cit. P. 398.

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে সুবিধাবঞ্চিত, নিঃস্ব, সংখ্যালঘুর স্বার্থসংরক্ষণকে যেমন বুঝায় ঠিক তেমনি সমাজ থেকে অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র, অপরাধ প্রবণতা তথা অবাঞ্চিত পরিস্থিতি দূর করাকেও বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার সকলের মধ্যে শুধুমাত্র সুযোগ-সুবিধার বণ্টনের সমতাকেই নির্দেশ করে না, বরং সমাজের অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমতা লাভের পথ উন্মোচন করে থাকে। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার হয়ে দাঁড়ায় অধ্যাপক বার্কার-এর ভাষায়, "এমন একটি আদর্শিক ব্যবস্থা, সেখানে একটি সমাজের সকল ব্যক্তির অভিন্ন মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, সুযোগ-সুবিধা, বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।"[১]

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সম্পর্ক :

সামাজিক ন্যায়বিচার হল সমাজের ভারসাম্যের ধারক-বাহক। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার বিভিন্ন অধিকারের দাবি অনুসারে তা যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। পরস্পর বিরোধী দাবির মধ্যে এই সামাজিক ন্যায়বিচার ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন অপরিহার্য। কারণ ব্যক্তি যদি সমাজিক ন্যায়বিচার ও সমান সুযোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠা সম্ভব নয়। অথচ আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যেই ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ নিহিত। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যক্তি যদি নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে না পারে তবে সে নিজের কাছে, পরিবারের কাছে, এমনকি সমাজের কাছে বোঝা ও সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে। আধুনিক সমাজকল্যাণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এবং গঠনমূলক আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাকে স্বাবলম্বী হতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে। এজন্য সমাজ কল্যাণের কতকগুলো নীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে, যার অনুসরণ করেই সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। আর তা হল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টননীতি। মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ যেমন জীবন ধারণের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, সমান সুযোগের অধিকার প্রভৃতি মূলতঃ সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। তেমনি এসব অধিকার আধুনিক সমাজকল্যাণেরও অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং আধুনিক সমাজকল্যাণে অন্যতম প্রদান একটি প্রত্যয় হল সামাজিক ন্যায়বিচার, যা একে অপরের পরিপূরক।

১. Robert L. Barker, op. cit. P. 354.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিকাশধারা

ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন-

* সমানকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি,
* ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দানশীলতা,
* ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন,
* ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের পরবর্তী কিছু পদক্ষেপ,
* ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংশোধন,
* দান সংগঠন সমিতি,
* দরিদ্র আইন কমিশন-১৯০৫,
* বিভারেজ রিপোর্ট ও সামাজিক নিরাপত্তা,
* ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী।

আমেরিকার সমাজকল্যাণের ইতিহাস-

* দরিদ্রাগার ও ইয়েটস রিপোর্ট,
* ১৮৭৩ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম,
* ১৯২৯ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম,
* আমেরিকার স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী,
* আমেরিকায় পেশাদার সমাজকর্মের বিবর্তন।

ভারত- বাংলাদেশে সমাজকল্যাণের বিবর্তন-

* প্রাচীন ভারতের সমাজকল্যাণ,
* মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণ,
* সরকারী সমাজকল্যাণ,
* বেসরকারী সমাজকল্যাণ,
* বাংলায় সমাজকল্যাণ,
* আধুনিক যুগ বা বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের সমাজসেবা।

Dhaka University Institutional Repository

ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তন :

আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশধারায় যুক্তরাজ্যের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত যুক্তরাজ্য বা ইংল্যান্ড হচ্ছে আধুনিক সমাজকল্যাণের সূতিকাগার। সুপ্রাচীনকাল হতে দানশীলতা, পরোপকার বা বদান্যতা ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা চলে আসছিল, কালের পরিক্রমায় বাস্তবতার আলোকে তাই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে। উদ্ভব হয় আধুনিক সমাজকল্যাণের। তবে এর মূল বীজ অঙ্কুরিত হয় ইংল্যান্ড তথা গ্রেট বৃটেনে। দুস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, প্রবীন, বিধবা, অসুস্থ প্রভৃতি শ্রেণীকে সহায়তা, দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব নিরসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডই মূলত পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন (দরিদ্র আইন সহ), বাস্তবায়ন, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে ইংল্যান্ডই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং এসব ক্ষেত্রে সমষ্টিগত সহযোগিতা ও সরকারী দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটায়। এ সমস্ত পদক্ষেপ ও দৃষ্টান্তসমূহ যুক্তরাজ্যে দীর্ঘকাল যাবত অনুশীলিত হতে থাকে এবং তাকে কালক্রমে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করে, যা পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গৃহীত ও অনুসৃত হয়। সুতরাং যুক্তরাজ্যের সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি ও সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমি :

মানব সমাজের সূচনালগ্ন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মানুষের পারস্পরিক সাহায্য এবং সহযোগিতা সমাজ জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রথমিক পর্যায়ে মানুষ দুঃখে-দৈন্যে, বিপদে-আপদে একে অপরকে সহায়তা করত। পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মের আবির্ভাব মানুষকে তাদের পারস্পরিক কল্যাণে আর একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক ধর্মে ক্ষুধার্তকে খাদ্য, বিবস্ত্রকে বস্ত্র, অত্যাচারিতকে সহায়তা, ভীতুকে অভয় দান এবং আর্ত-পীড়িতের সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলশ্রুতি স্বরূপ ধর্মীয় দানশীলতাই পরবর্তীতে একটি শক্তিশালী সাহায্য এবং মানবহিতকারী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাচীন সুমেরীয়, আজটেক, ব্যবিলনীয়, মিসরীয়, ইনকা, মায়া, গ্রীক, রোমান, চীনা, ভারতীয় প্রভৃতি সকল সভ্যতায় ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এবং পরবর্তীকালে রাজন্যবর্গ অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, ইয়াতিম, বিধবা, বয়স্ক প্রভৃতি শ্রেণীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। জনসেবাকে তাঁরা পরকালে আত্মার মুক্তি ও স্রষ্টার করুণা লাভের উপায় বলে মনে করতেন। ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই দুঃস্থ নিবাস, অনাথ আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অতীতের সহজ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মূলত মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবিক চেতনাপ্রসূত কর্মকান্ডের দ্বারাই পরিচালিত হত।[১]

প্রাচীন যুগ পেরিয়ে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম মধ্যযুগে প্রবেশ করলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্য জগতে খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হলে গীর্জা ও পোপ সর্বসময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। এসময় দরিদ্রের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- ইয়াতিমখানা, বৃদ্ধনিবাস, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গৃহহীন প্রভৃতি শ্রেণীকে সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গীর্জা ও গীর্জার আশে-পাশে গড়ে উঠে। এ সময়কার (৭ম শতাব্দীর) এক উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা আরবের বুকে ইসলামের আবির্ভাব, যা মানবজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উন্নয়ন সাধন করে। সমাজকর্ম অভিধানে তাই সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণের বিকাশে ইসলামকে মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, "The followers of the Prophet Mohammad are told they have an obligation to poor people and that paying a Zakat (Purification tax) to care for poor people is one of the five pillars (obligatory duties) of Islam."[২]

মধ্যযুগে বিশেষ করে সেন্ট ফ্রান্সিস কর্তৃক ভিক্ষা বিতরণ কেন্দ্র ও গাই ডি মন্টপিলারস (Guy de Montpilliers) কর্তৃক হাসপাতাল সমাজকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও সমগ্র ইউরোপে ভিক্ষাবৃত্তি ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন থেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার কথা উচ্চারিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কারণ ভিক্ষাবৃত্তি বা দানশীলতার ব্যবস্থাপনা, ফলাফল, তহবিল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ে গীর্জাকে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে দানকার্য পরিচালনায় রাষ্ট্র এগিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন শুরু হয়। ঐ সময়কালে রাষ্ট্রক্ষমতা সমাজতন্ত্র, পোপতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও পরিশেষে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এক সময় পোপতন্ত্রের অবসানের মাধ্যমে ইউরোপে রেনেসাঁ গড়ে ওঠে এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে ।

---

১. মোঃ নূরুল ইসলাম, সমাজকর্ম : ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৪১

২. The Dictionary of Social Work. op.cit, P. 415.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে পুরাতন দৃষ্টান্তসমূহ :

* ১৫২০ সালে জার্মানির মার্টিন লুথার (Martine Luther) ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণ ও 'যৌথ তহবিল' (Common Chest) গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ফ্রান্স, অষ্টিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়।

* ১৯২৫ সালে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারক আলরিক ঝিংলি (Ulrich Zwingli) কর্তৃক সুইজারল্যান্ডে লুথারের অনুরূপ ত্রাণকার্য গৃহীত হয়।

* ষোড়শ শতাব্দীতে স্প্যানিশ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জুয়ান লুইস ভিভ্স (Juan Luis Vives) দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য 'ডি সাবভেনশন পাপারাম' (De Subventione Pauperum) শিরোনামে একটি মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বেলজিয়ামের ব্রুজেস (Bruges) নগরীর সিনেটরের কাছে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি (Concise program) পেশ করেন। দরিদ্রদের স্বনির্ভরতা অর্জন, নিজের উদ্যোগে সমস্যার সমাধান, নগরীকে কয়েকটি স্থানীয় শাখায় বিভক্তিকরণ (Parish Quarter), প্রতি প্যারিসে একজন সচিব ও দু'জন সিনেটর নিয়োগ, সক্ষম ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও অক্ষম ব্যক্তিদের দুস্থ নিবাস (Alms house) প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখেন।

* ১৭৮৮ সালে ভিভসের মতবাদ ইউরোপে প্রয়োগ করা হয়। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী অধ্যাপক বুঁশ (Busch) এর প্রস্তাব মোতাবেক হামবুর্গ (Hamburg) নগরীকে ৬০ কোয়ার্টারে বিভক্ত করা হয় এবং বিধি মোতাবেক লোক নিয়োগ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গৃহীত হয়।

* ১৯৭০ সালে আমেরিকার (টোরি) বেঞ্জামিন থম্পসন (Tory, Benjamin Thompson) মিউনিখে অনুরূপ সাহায্যদান কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। তিনি দারিদ্র নিরসনকল্পে সামরিক কর্মশিবির (Military Workhouse) স্থাপন করেন। এখানে সক্ষমদের সামরিক বাহিনীর জন্য পোষাক তৈরির কাজে লাগানো হয়। তাছাড়া স্বগৃহে কাজে ইচ্ছুকদের কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করা হয়।

* ১৮৫৩ সালে এলবারফিল্ড (Elberfeld) শহরে একই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় এবং এটি পরিচালিত হয় 'গণ কর' (Public taxation) এর মাধ্যমে। বাস্তবায়নকারী স্বেচ্ছাসেবকগণ দরিদ্রদের সাথেই বসবাস করতেন। এতে তাঁরা তাদের অবস্থা উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। পরবর্তীতে ইউরোপের অন্যান্য বহু নগরে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়। এটি যদিও প্রথমে হামবার্গে প্রবর্তিত হয় তথাপিও এলবারফিল্ড পদ্ধতি হিসেবেই অভিহিত করা হয়।

* সপ্তদশ শতাব্দীতে কর্মরত একজন বিখ্যাত সংস্কারক হলেন ফ্রান্সের ফাদার ভিনসেন্ট ডি পল (Vincent de Paul) যিনি যৌবনে তিউনিসিয়ায় জলদস্যু কর্তৃক ধৃত ও বিক্রিত হন্ন। মুক্তির পর তিনি দানশীলতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষত বন্দী ও তাদের পরিবার, অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশু, অসুস্থ ও ক্ষুধার্তদের সাহায্যার্থে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু লোক দরিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং বহু হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা, দুস্থ নিবাস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর উদ্যোগকে আরও সফল করার জন্য 'ল্যাডিস অব চ্যারিটি' (Ladies of Charity) নামক সংগঠন গড়ে তোলেন। এর সদস্য উচ্চস্তরের মহিলাদের কাজ ছিল দরিদ্রদের সাহায্য করা। কিন্তু এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে তিনি ১৬৩৬ সালে 'ডটার অব চ্যারিটি' (Daughter of Charity) নামে অন্য এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কৃষক যুবতীদের নিয়ে গঠিত, যারা দরিদ্রদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তারা হয়েছিলেন আধুনিক সমাজকর্মীদের অগ্রদূত (Forrunner)। সামগ্রিক দানশীলতা কার্যক্রমে ফাদার ভিনসেন্টের সংস্কার কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দানশীলতা :

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে গির্জার মাধ্যমে দানকার্য পরিচালিত হত। মানুষ পরকালে আত্মার মুক্তি ও স্রষ্টার করুণা লাভের জন্য দুস্থ-অসহায়, অন্ধ, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীকে সাহায্য করত। কিন্তু দান গ্রহীতাদের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হত না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাদের গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তখন দরিদ্রদের সক্ষম (যারা কাজ করে জীবন ধারণে সক্ষম) এবং অক্ষম (অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রুগ্ন, শিশু, গর্ভবতী মহিলা) এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এদের সাহায্যার্থে গির্জার সংগৃহীত অর্থের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হত। এক হাজারেরও বেশি আশ্রম, মঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি দানকার্যে নিয়োজিত ছিল।[১]

---

১. W. A Friedlander, Introduction to Social Welfare, 5th ed. 1982, P. 12

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধনিক ও বণিক শ্রেণীর সহায়তায় গিল্ড (Guid) নামক সংঘ গড়ে ওঠে। এ সংঘ দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। রাজা বা পার্লামেন্ট গির্জা বা গিল্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে আর্থ-সামাজিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন-

* সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত।
* শিল্প বিপ্লবের সম্প্রসারণ ও বেকারত্ব বৃদ্ধি।
* ফ্রান্স যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের শহরে বসবাসের আগ্রহ।
* ১৩৪৮ সালের প্লেগ বা কালো মৃত্যুতে (Black Death) ব্রিটেনের দু-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু এবং শ্রমিক সংকট।[১] এরূপ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন শুরু হয়। যেমন -

শ্রমিক আইন, ১৩৪৯ (Statute of Laborers of 1349) : রাজা ৩য় এডওয়ার্ড কর্তৃক এ আইন প্রণীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল :

* সক্ষম ব্যক্তিদের কাজে বাধ্য করা,
* শ্রমিককে নিজ এলাকায় থাকতে বাধ্য করা,
* ভবঘুরেমি ও ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা,
* আইন অমান্যকারীকে মৃত্যুদন্ডসহ অন্যান্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা।

১৫৩১ সালের আইন : রাজা অষ্টম হেনরি (Henry VIII) এ আইনের মাধ্যমে দারিদ্র মুকাবিলায় গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে -

* যাচাই ও তদন্ত সাপেক্ষে ভিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়।
* ভিক্ষুকদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
* লাইসেন্সবিহীন ভিক্ষুকদের শাস্তি প্রদান করা হয়।[২]

১৫৩৬ সালের আইন : রাজা অষ্টম হেনরি কর্তৃক প্রণীত আইন যা দরিদ্র আইনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।[৩] এর পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে -

* কমপক্ষে ৩ বছর অবস্থানের পর ভিক্ষুক হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রিকরণ।
* ভিক্ষুক বা অক্ষমদের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থায় (Parish) প্রদান।
* সক্ষমদের কাজে বাধ্য করা এবং
* ৫-১৪ বছর বয়সী অলস শিশুদের মাতাপিতা থেকে দূরে রাখা ও চুক্তিবদ্ধ (দত্তকরূপে) করা।

এ আইনে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয় এবং অনেক সংশোধনাগার স্থাপন করা হয়।

১৫৬২ সালের স্ট্যাটুট অব আর্টিফিসার্স (Statute of Artificers) : এ আইনের কার্যক্রম হচ্ছে -

* কাজের সময় ও নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ,
* প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ,
* ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের কঠোর পরিশ্রম করানো,
* ১২-৬০ বছর বয়সী বেকার ও ভিক্ষুকদের গৃহভৃত্যরূপে নিয়োগ।

১৫৬৩ সালের আইন : এ আইনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্যার্থে প্রতি সপ্তাহে পরিবারের আয় ও সম্পত্তির ভিত্তিতে কর ধার্য করা হয়।

সাধারণ কর প্রবর্তন :

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরও সার্বিক অবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। দরিদ্রদের সাহায্য ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয় (Voluntary collections proved to be insufficient for the support of the poor)। দরিদ্রদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাজার হাজার পরিবার আশ্রমগুলোতে ভিড় জমাতে থাকে। এমতাবস্থায় কর্মহীনতা বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে ১৫৬৩ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আরও একটি আইন পাস হয়। আইনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে তাদের সম্পত্তি ও আয়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক দরিদ্রকর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৫৭২ সালে ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ আর একটি নতুন আইনে স্বাক্ষর করেন, যা 'The Statute of 1572' নামে পরিচিত। এই আইনে দরিদ্র সাহায্যের অর্থ সংগ্রহের জন্য সাধারণ কর প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের বাস্ত বায়নের জন্য ওভারশিয়ার (overseer) নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়। ওভারশিয়ারগণ সাধারণত কর আদায় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান ও সাহায্য দান করত।[৪]

---

১. Ibid, P. 13

২. Ibid, P. 13

৩. Ibid, P. 13 (With the confiscation of church property by Henry VIII, it became necessary to provide other way of caring for the poor. Therefore the statute of 1536 established the first plan of public relief under the auspices of he government in England.")

৪. Ibid, P. 14

Dhaka University Institutional Repository

এই আইনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে অক্ষম দরিদ্রদের ভরণপোষণকে সরকারি দায়িত্ব বলে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়। (This statute marked the final recognition that the government was responsible for providing aid to people who could not maintain themselves.)[১]

সক্ষম দরিদ্রদের স্বভাবগত পরিবর্তন : ১৫৭৬ সালে সংশোধনাগার (House of correction) স্থাপন করে সক্ষম দরিদ্রদের স্বভাবগত পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের সংশোধনাগারে সক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ করে যুবকদের কাজ করতে বাধ্য করা হত। সংশোধনাগারে Wool, hempflax and iron যোগানের ব্যবস্থা ছিল।

ওভারশিয়ার নিয়োগ :

১৫৯৭ সালে আর একটি আইনের (Statute of 1597) মাধ্যমে বিচারকদের দ্বারা চার্চ ওয়ার্ডেনদের এবং চারজন স্বচ্ছল গৃহকর্তা সমন্বয়ে ওভারশিয়ার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের আওতায় বৃদ্ধ, অন্ধ, খোঁড়া এবং কাজে অক্ষমদের জন্য ভিক্ষুক নিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া পিতা-মাতা এবং সন্তানদের প্রতি পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের বিধান করা হয়।

ইংল্যান্ডের প্রাথমিক সমাজসেবার ক্রমউন্নয়নের উপরোক্ত ধারা পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নত সমাজ ব্যবস্থার নির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। মূলতঃ পাথমিক পর্যায়ের বিচ্ছিন্ন ও ধর্মনির্ভর দান ব্যবস্থা এক সময় সরকারিভাবে গৃহীত হওয়া এবং তার ক্রমউন্নয়নই আজকের উন্নত যুক্তরাজ্যের ভিত্তি। যা জনগণের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্রের সমস্ত সুবিধা প্রদান করছে। ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে দমনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুস্থতা ও দারিদ্র দূরা করা সম্ভব নয়। তবে জনগণের সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই দারিদ্র দূর করা সম্ভব।

১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন (The Elizabethan Poor Law of 1601) **:**

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন হচ্ছে দরিদ্র জনগণের কল্যাণে গৃহীত সুচিন্তিত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ। ১৩৪৮ সালের প্লেগ রোগের মহামারীর প্রেক্ষাপটে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড কর্তৃক প্রণীত '১৩৪৯ সালের শ্রমিক আইন' (Sttute of Labourers of 1349) থেকে শুরু করে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Statute of 1597) পর্যন্ত ৪২টি প্রয়াসের মাঝে সমন্বয় সাধন করে ৪৩তম প্রয়াস হিসেবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয়। এ জন্য একে '৪৩ এলিজাবেথ' (43 Elizabeth) নামেও অভিহিত করা হয়।

১৩৪৯ সাল থেকে ১৫৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে দমনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুঃস্থতা ও দারিদ্র দূরা করা সম্ভব নয়। তবে জনগণের সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই দারিদ্র দূর করা সম্ভব। শাসক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং বাস্তবতা উপলব্ধি ১৬০১ সালেরদরিদ্র আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আইন ইংল্যান্ডের দরিদ্র আইনের চূড়ান্তরূপ দানে সক্ষম হয়।[২]

দরিদ্র জনগণের শ্রেণীবিভাগ :

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন মোতাবেক দরিদ্র জনগণকে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন -

* **স্বজনওয়ালা দরিদ্র :** যে সকল দরিদ্রদের আত্মীয়-স্বজন (সন্তান বা ঘনিষ্ঠ কেউ) ছিল তাদের সাহায্য করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের বাধ্য করা।

* **স্বজনবিহীন দরিদ্র :** যে সকল দরিদ্রদের সাহায্য করার মত কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না তাদের দায়িত্ব ভার স্থানীয় সমষ্টির (Local Community) উপর প্রদান করা হয়। তবে সাহায্য লাভের জন্য শর্ত হচ্ছে কমপক্ষে ঐ সমষ্টিতে তিন বছর বসবাস করা এবং সাহায্যের তালিকাভুক্ত হওয়া।

সাহায্য প্রার্থীদের শ্রেণীবিভাগ : এই আইন মোতাবেক তালিকাভুক্ত করার পর সাহায্য প্রার্থীদের আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন -

* **সক্ষম দরিদ্র** (The Able-bodied Poor)
* **অক্ষম দরিদ্র** (The Impotent Poor)
* নির্ভরশীল শিশু (Dependent Children)[৩]

---

১. R. A. Skidmore and Thackeray, Introduction to Social Work, 5th edn., 1991, P. 39

২. De Schweinitz, 1601 সালের দরিদ্র আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "The poor laws has reached the form in which it is to influence thought and operation for the next three centuries and more. The 43rd Elizabeth is the parent of governmental relief in England and the United States, the parent in relation to which our present system of social security expresses both development and revolt." (C. D. Garvin, Social Work in Contemporay Society, 2nd edn. 1998, P. 4)

৩. Aurther E. Fink, The field of Social Work, 1949, P. 6

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম দরিদ্র (The Able-bodied Poor) :

সক্ষম দরিদ্র ব্যক্তিরা **'সবল ভিক্ষুক'** (Sturdy beggars) নামে পরিচিত ছিল। এ শ্রেণীর দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তাদেরকে জোরপূর্বক **'সংশোধনাগার'** (House of Correction) অথবা **'কর্মশালায়'** (Work house) কাজ করতে বাধ্য করা হত। এদেরকে ভিক্ষা দান থেকে জনগণকে বিরত রাখা হয় এবং যে সকল ভবঘুরে বা ভিক্ষুক এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আগমন করত তাদেরকে নিজের এলাকায় (যেখানে কমপক্ষে এক বছর যাবৎ বসবাস করেছে) ফেরৎ পাঠানো হত। যে সকল ভিক্ষুক বা ভবঘুরে 'সংশোধনাগার' বা 'কর্মশালায়' কাজ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত তাদেরকে সংশোধন করার জন্য শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হত বা জেলে পাঠানো হত।

অক্ষম দরিদ্র (The Impotent Poor) :

যারা কাজ করতে অসমর্থ ছিল তাদের বলা হত 'অক্ষম দরিদ্র'। এ শ্রেণীর আওতায় আসত পীড়িত, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির, মূক, উন্মত্ত এবং ছোট শিশুসহ মাতা। অক্ষম শ্রেণীকে 'আমস্ হাউজে' (Alms Hosue) রাখা হত এবং তাদের সাধ মুতাবিক সহায়তা করতে হত। যদি কোন অক্ষম ব্যক্তির নিজস্ব থাকার ব্যবস্থা থাকত এবং তা যদি আমস হাউজের চেয়ে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ হত হবে তাকে 'আউট-ডোর রিলিফ' (out-door relief) দেয়ার ব্যবস্থা করা হত। এ ধরনের রিলিফ সাধারণত খাদ্য, বস্ত্র এবং জ্বালানির মধ্যে সীমিত থাকত।[১]

নির্ভরশীল শিশু (Dependent Children) :

এই শ্রেণীর আওতায় পড়ে ইয়াতিম, অনাথ এবং পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অথবা অত্যন্ত দরিদ্র পিতামাতার সন্তানগণ। যে সকল নাগরিক কোন প্রকার বৈষয়িক সহায়তা ব্যতিরেকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল তাদের কাছে এ সকল শিশুকে হস্তান্তর করা হয়। এ ধরনের কোন নাগরিক পাওয়া না গেলে যারা সবচেয়ে কম ব্যয়ভার দাবি করত তাদের কাছে এ সকল শিশুকে প্রদান করা হত। আট বছর বা তার চেয়ে অধিক বয়স্ত বালক-বালিকাদের (যারা বাসাবাড়ীর বা অন্য কোন কাজ করতে সক্ষম) নগরবাসীর কাছে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হত। এই চুক্তি মুতাবিক বালকদেরকে তার মনিবের কাজ (Trade) শিখানো হত এবং চব্বিশ বছর পর্যন্ত সেখানে কাজ করতে হত। বালিকাদের একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত গৃহ পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে হত।

'দরিদ্রদের উপদর্শকগণ' (Overseers of the poor) বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র আইন বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত থাকত। এ সকল 'উপদর্শক' ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত হত। উপদর্শকদের কাজ ছিল দরিদ্র শ্রেণীর কাঝ থেকে সাহায্য লাভের দরখাস্ত গ্রহণ, দরখাস্তকারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার তদন্ত করা এবং তদন্তের ভিত্তিতে সাহায্য গ্রহণের উপযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া তাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য প্রদান করা উচিত সে বিষয়েও তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। **'দরিদ্র কর'** সংগ্রহের দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। **'পুয়র রিলিফ'** কর্মসূচীর আয়ের প্রধান উৎস ছিল 'দরিদ্র কর'। অবশ্য সরকারী, বেসরকারী দান ও অনুদান, আইন ভঙ্গের জরিমানা প্রভৃতিও এ কর্মসূচীতে ব্যয় করা হত।

১৬০১ সালের আইন অনুসারে পুরাতন ও অব্যবহৃত বিল্ডিংসমূহ 'আমস হাউস' ও 'ওয়ার্ক হাউস' হিসেবে ব্যবহার করা হত। উপদর্শক কর্তৃক নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এখানে অবস্থানরতদের কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত থাকতে হত।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের পরবর্তী কিছু পদক্ষেপ

১৬৬২ সালের বসতি আইন (The Settlement Act of 1662) :

যুক্তরাজ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুসারে দরিদ্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থা প্যারিসের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু অন্যান্য এলাকা থেকে স্থানান্তরিত দরিদ্ররা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। এমনকি কৃষি কাজে শ্রমিক সংকট দেখা দেয়। ফলে রাজা ২য় চার্লস ১৬৬২ সালে বসতি আইন প্রবর্তন করেন।[২] এর উল্লেখযোগ্য ধারণাসমূহ হচ্ছে -

* দরিদ্রদের পরিদর্শকের সুপারিশক্রমে বিচারকগণ নবাগতকে পূর্বের স্থানে ফেরত পাঠাবে।
* ৪০ দিনের মধ্যে দরিদ্রদের অবস্থা অনুসন্ধানপূর্বক বহিষ্কারের সুপারিশ প্রদান।
* বার্ষিক ১০ পাউন্ডের বিনিময়ে নবাগত বহিষ্কার থেকে অব্যাহতি পাবে।

---

১. W. A. Friedlandar and other, op.cit, P. 15

২. Ibid, P. 18

Dhaka University Institutional Repository

এসব শর্তসাপেক্ষে শ্রমিকদের নিজ এলাকা বা গ্রামে থাকতে বাধ্য করা হয়। এতে গ্রামাঞ্চলে ফসল কাটার মৌসুমে এবং শহরাঞ্চলে কল-কারখানায় শ্রমিক সংকট সৃষ্টি হয়। উপরন্তু স্থানান্তরের জন্য পরিদর্শকগণ কর্তৃক ঘুষ আদান-প্রদানে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। ফলে ২য় জেমস ১৬৮৬ সালে নবাগতদের আগমনের পর গীর্জায় দরখাস্তের দিন থেকে ৪০ দিন গণনার বিধান জারি করেন। ১৬৯১ সালে রাজা ৩য় উইলিয়াম গীর্জায় নবাগতদের তালিকা ঝুলিয়ে রাখার বিধান করেন। ১৭৯৫ সালে এ আইনের সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে 'সনদ' প্রদান করে স্থানান্তর সহজ করা হয়।[১]

কর্মশালা বা শ্রমাগার (Workhouse) :

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের সাথে ওলন্দাজদের (Dutch) বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ওলন্দাজগণ বেশ সাফল্য অর্জন করেন। এ সময় ওলন্দাজদের উৎপাদনমুখী দরিদ্র নিবাস ও ভিক্ষুকমুক্ত সমাজের প্রতি ইংরেজ অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ফলে ১৬৯৬ সালে 'কর্মশালা আইন' প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিস্টল ও অন্যান্য নগরে কার্যশালায় শিশু ও বয়স্কদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে এ কর্মসূচি সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।

১৭৭২ সালে কর্মশালাসমূহে পরিদর্শক নিয়োগ ও বেসরকারি উৎপাদন সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়। কর্মশালায় দরিদ্রদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাজে বাধ্য করা হয়। জোনাস হ্যানওয়ে কর্মশালাসমূহে কয়েক বছর ধরে গবেষণা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৭৬১ সালে পার্লামেন্টে সকল শিশুদের নিবন্ধকরণ এবং ১৭৬৭ সালে অনূর্ধ্ব ৬ বছরের শিশুদের কর্মশালার বাইরে দত্তক পরিবারে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।[২]

বহিঃসাহায্য (Outdoor Relief) :

বহিঃ বা বাহ্যিক সাহায্য যুক্তরাজ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্দশ শতাব্দীতে 'জমি ঘেরাও আন্দোলন' এ অভিজাত শ্রেণী বেশিরভাগ জমি দখল করে। সুবিস্তৃত চারণভূমি তৈরি করে ভূস্বামীরা মেষ পালন শুরু করায় দরিদ্র কৃষকদের স্বত্ব নষ্ট হয় ও তারা ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। এ সময় শিল্প-কারখানা সম্প্রসারণের ফলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পও বিলুপ্ত হয়। ফলে ভূমিহীন, বেকার, ভবঘুরে ও দরিদ্রের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে 'দরিদ্র আইন সংশোধন, ১৭৮২' প্রণীত হয়। এ আইন প্রণয়নে বিখ্যাত অধ্যাবসায়শীল সমাজসংস্কারক টমাস গিলবার্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কর্মশালা ও দরিদ্র নিবাসের উন্নয়নকল্পে পার্লামেন্টে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। এজন্য ১৭৮২ সালের দরিদ্র আইন সংশোধনীকে গিলবার্ট আইনও বলা হয়ে থাকে। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে -

* পূর্ববর্তী ঠিকাদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন।
* অবৈতনিক পরিদর্শকের (overseer) পরিবর্তে বেতনভুক্ত দরিদ্রদের অভিভাবক নিয়োগ।
* কর্মশালায় রেখে আন্তঃসাহায্য (Indoor relief) ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্মে ইচ্ছুক বেকারদের কর্মসংস্থান পর্যন্ত নিজ গৃহে বহিঃসাহায্য (Outdoor relief) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৩]

আংশিক সাহায্য (Partial Relief) :

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) কারণে ফ্রান্সে ১৭৯৩-১৮১৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধে ইংল্যান্ডে ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে দরিদ্র জনসাধাণের জীবন ধারণ দু:সাধ্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু যুদ্ধফেরত বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পরিবারসহ দরিদ্রাগারে না গিয়ে বহি:সাহায্যের আবেদন জানায়। এমতাবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট ও অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হন ও মজুরি বৃদ্ধি বা ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তার বিবেচনা করেন। ১৭৯৫ সালের মে মাসে স্পীনহ্যামল্যান্ডে 'বার্কশির কাউন্টি'তে এক সম্মেলনে 'সার্বজনীন অনুশীলন সূচি' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় রুটির স্থানীয় মূল্যের ভিত্তিতে সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে। এ রুটি সীমার নিম্ন উপার্জনকারীকে পরিপূরক (আংশিক) সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এ নতুন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে 'স্পীনহ্যামল্যান্ড আইন, ১৭৯৫' নামে অভিহিত হয়। এ আইনানুসারে পরিবারের আকারের ভিত্তিতে তাদের ভরণপোষণ অথবা পরিপূরক হিসেবে নিম্ন মজুরদের বহিঃসাহায্য প্রেরণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অক্ষমদের জন্য বহিঃসাহায্যের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়।[৪]

---

১. Ibid, P. 19
২. Ibid, P. 20
৩. Ibid, P. 20
৪.C. D. Garvin, op.cit, P. 6

১৭৯৫ সালের আইনে সন্তোষজনক ফল অর্জিত হয়নি। এর ফলে কতিপয় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। যেমন-

* মজুরি ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়।
* অধিক লোক পূর্ণ ও আংশিক ত্রাণ সাহায্য গ্রহণ করতে থাকে।
* উচ্চতর দরিদ্র কর ধার্য হয়।
* মালিক ও নিয়োগকারীরা শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে থাকে ও শ্রমিকরাও আংশিক সাহায্যের আশায় এতে সন্তুষ্ট থাকে।
* নিম্নতম মজুরি সীমা নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
* ত্রাণ সাহায্য শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা ধ্বংস করে দেয় এবং মজুরিকে রুটি সীমায় আবদ্ধ করে ফেলে।

এসবের ফলশ্রুতিতে এবং সুষ্ঠু ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবে আইনের কার্যকারিতা ম্লান হয়ে যায় এবং এটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথসহ জেরেমি বেন্থাম, জোসেফ টাউনসেন্ড, টমাস ম্যালথাস প্রমুখ মনীষী স্মিথের বক্তব্য সমর্থন করে ত্রাণ-সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব করেন।[১]

রেভারেন্ড টমাস চালমার্স (১৭৮০-১৮৪৭) (Reverend Thomas Chalmers) :

টমাস চালমার্স সমাজকল্যাণের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বেসরকারী এক দানশীল সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৮১৪ সালে চালমার্স গ্লাসগোতে গিয়ে জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর ও গির্জার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে পরিচালিত ব্যয়বহুল দরিদ্র ত্রাণকার্য পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সম্মেলনে এরূপ ব্যয়বহুল অথচ অদক্ষ ত্রাণ কার্যক্রমের বিরোধিতা করেন এবং জনগণের তিনি ব্যক্তিগত সাহায্য, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী ও দান সংগঠন সমিতি (COS) এর বিকাশ ঘটান।

চালমার্স কিলমানিতে প্রত্যেকের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন ও গ্লাসগোতে তা প্রবর্তন করেন। তাঁর প্যারিসের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,০০০। ৪ বছর কার্য সম্পাদনের পর তিনি গ্লাসগোর 'সেন্ট জন' প্যারিস সংগঠিত করার আমন্ত্রণ পান। তিনি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ও এটিকে ৪০০ অধিবাসী সমন্বয়ে ২৫ জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় একজন করে উপধর্মযাজক নিযুক্ত করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ৪ বছরে ৮,০০০ অধিবাসীর মাত্র ২০ জন সাহায্যের আবেদনকারী পাওয়া যায়।

চালমার্স বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ঘোষণা করেন যে, পূর্ববর্তী সরকারী সাহায্য কর্মসূচি ছিল অপচয়মূলক ও দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীলতার পরিপন্থী। এজন্য তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করেন :

* প্রত্যেক দরিদ্রের অবস্থা সতর্কতার সাথে অনুধাবন এবং নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি।
* নিজস্ব সম্পদে সমস্যা সমাধান না হলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সহায়তায় অনাথ, বৃদ্ধ, অক্ষম প্রভৃতিদের সহায়তা।
* এভাবে প্রয়োজন পূরণ না হলে সম্পদশালী ব্যক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান।
* উপরিউক্ত কোন ব্যবস্থায় সম্ভব না হলে উপধর্মযাজক ধর্মসভায় দরিদ্রদের সাহায্যের আবেদন জানাবেন।[২]

সমাজসেবা বা সাহায্যের ক্ষেত্রে চালমার্স 'ব্যক্তিগত সাহায্য' ও 'বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী' দর্শনের বিকাশ ঘটান। পরবর্তীতে তাঁর দর্শনের আলোকে দান সংগঠন সমিতি (Charity Organization Society-COS) ও ব্যক্তি সমাজকর্মের ভিত্তি রচিত হয়।

১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংশোধন (Poor Law Reform of 1834) **:**

ভিক্ষাবৃত্তি ও দরিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ইংল্যান্ডে যে সকল আইন প্রণীত হয়েছিল কালক্রমে সেগুলো কার্যকারিতার দিক থেকে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং দরিদ্র আইনসমূহের বাস্তবমুখী সংশোধন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। ফলে দরিদ্র আইন সংশোধনের জন্য ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে একটি **'রাজকীয় কমিশন'** (Royal Commission) গঠন করা হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর এন. ডব্লিও. সিনিয়র (Prof. N. W. Senior) এবং তরুণ আইনজীবী এডউইন চেডউইক (Edwin Chadwiek) যথাক্রমে এই কমিশনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কমিশন দু'বছর যাবত ইংল্যান্ডের প্রতিটি কাউন্টিতে দরিদ্র আইনের বিভিন্ন দিকসমূহের উপর ব্যাপক জরীপ চালিয়ে তার উপর ভিত্তি করে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে সুপারিশমালাসহ 'রিপোর্ট' পেশ করেন।[৩]

১.Ibid, P. 6
২. W. A. Friedlandar and Apte, op.cit, P. 23
৩. Ibid, P. 25

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানের 'দরিদ্র রিলিফ কর্মসূচী' যুবক ও সক্ষম দরিদ্র শ্রেণীকে স্বাবলম্বী না করে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করে তুলেছে। এ অবস্থার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কমিশন যে ছয়টি সুপারিশ প্রদান করে তা হল:

* আংশিক সাহায্য দান (Partial relief) কর্মসূচী বিলুপ্ত করা।

* দরখাস্তকারী সকল সক্ষম ব্যক্তির 'কর্মশালায়' (work house) ভর্তি করা।

* শুধু অসুস্থ, বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং শিশু সন্তানসহ বিধবাদের জন্য 'আউটডোর রিলিফ' (outdoor relief) বরাদ্দ করা।

* 'দরিদ্র আইন সংঘ' (Poor Law Union) সৃষ্টি করে সকল অঞ্চলের ত্রাণ কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

* সাহায্য গ্রহীতাদের সামাজিক মর্যাদা নিম্নতম আয়ের শ্রমিকদের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ে রাখা।

* দরিদ্র আইন বাস্তবায়নের জন্য রাজা কর্তৃক একটি 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (Central Board of Control) গঠন করা।

রয়েল কমিশনের উপরে উল্লিখিত সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে ১৮৩৪ সালের ১৪ই আগষ্ট একটি আইন পাস করা হয়, যা ইংল্যান্ডে এক শতাব্দী যাবৎ 'নতুন দরিদ্র আইন' (The New Poor Law) নামে পরিচিত ছিল। এই নতুন দরিদ্র আইন ১৮৩৪ সালের 'সংশোধিত দরিদ্র আইন' নামেও পরিচিত।[১]

১৮৩৪ সালের 'সংশোধিত দরিদ্র আইন' বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন- বিভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চলের (neighbouring parish) সমন্বয়ে 'দরিদ্র আইন সংঘ' (Poor Law Unions) গঠন করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'অভিভাবক বোর্ড' (Board of Guardians) গঠন করা হয়। এই বোর্ডের উপর দরিদ্র আইন সংঘের প্রশাসনিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। একটি 'সুষম দরিদ্র আইন নীতি' (Uniform Poor Law Policy) উদ্ভাবনের জন্য তিনজন কমিশনার সমন্বয়ে একটি 'স্থায়ী রাজকীয় দরিদ্র আইন কমিশন' (Permanent Royal Poor Law Commission) নিযুক্ত করা হয়। এডউইন চেডউইক ও 'জর্জ কুড' (George Coode) যথাক্রমে এ কমিশনের প্রথম সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৩৪ সালের 'নতুন দরিদ্র আইন' সফলতার স্বাক্ষর বহন করে। কারণ ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে 'ত্রাণ কর্মসূচীর ব্যয়ভার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক কমাতে সক্ষম হয়'। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে দুইশত 'কর্মশালা (Work House) নির্মাণ করা হয় এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সাধন করা হয়।

দান সংগঠন সমিতি :

এত সব দরিদ্র আইন প্রবর্তন করেও সমস্যার সমাধান না হয়ে সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এমনকি গির্জা এবং অন্যান্য সাহায্য সংস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় ১৮৬৯ সালে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সমন্বয়ে লন্ডনে "ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ ও ত্রাণ সংগঠিতকরণ সমিতি" গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই সংগঠন "দান সংগঠন সমিতি বা COS এ রূপান্তরিত হয়। সমিতির উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল দরিদ্র ব্যয় হ্রাস, সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়, দরিদ্রদের পুনর্বাসন, ব্যক্তি সমাজকর্ম চালু ও সমষ্টি সংগঠনের উদ্ভব ঘটানো। লন্ডন দান সংগঠন সমিতির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মত বড় বড় শহরে দান সংগঠন সমিতি (COS) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমনকি ৯ বৎসর পর ১৮৭৭ সালে London COS এর অনুকরণে আমেরিকাতেও দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠে। মূলত সমাজকল্যাণ কার্যাবলীর উন্নয়নে ব্রিটেনের COS যেমন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি সমাজকর্ম পেশার বিকাশে আমেরিকার COS গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফ্রিডল্যান্ডারের ভাষায় বলা যায় "It formed the groundwork for case work as individual aid, on the one hand, and for community organization, on the other."[২]

১.Ibid, P. 24

২. W. A. Friedlandar, op.cit, P. 26

দরিদ্র আইন কমিশন :

১৯০৫ সালে একটি দরিদ্র আইন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সুপারিশ ছিল সাহায্য সংস্থার সংখ্যা হ্রাস, মানবিক ও কল্যাণধর্মী সরকারী কর্মসূচি প্রবর্তন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বেকার ভাতা, কর্মসংস্থান এবং অক্ষম ভাতাসহ বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন। এ ব্যবস্থা সমাজকল্যাণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশসমূহ ইংল্যান্ডের সমাজসেবা ব্যবস্থায় একটি মানবীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। পূর্বের দরিদ্র আইনের যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্রদের শাস্তি দানের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা বন্ধ করা। কমিশনের সুপারিশের পর আইনগত ব্যবস্থা দ্বারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করে পুনর্বাসনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে Arthur E. Fink বলেছেন, "If the principle of 1834 provided a frame work of repression, those 1905 may be characterized in the Webb's terms as the Frame work of prevention." "অর্থাৎ সেখানে ১৮৩৪ সালের আইন ছিল দমন নীতির কাঠামো সেখানে ১৯০৫ সালের ব্যবস্থা ছিল প্রতিরোধমূলক কাঠামো।"[২২]

বিভারেজ রিপোর্ট ও নিরাপত্তা :

লর্ড উইলিয়াম বিভারেজের নেতৃত্বে গঠিত আন্তঃবিভাগীয় কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমানে সে দেশ একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare State) মর্যাদা লাভ করেছে। এর উৎস হিসেবে কাজ করেছে বিভারিজ রিপোর্ট। মূলত সেখানকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা হিসেবে উক্ত রিপোর্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক ফ্রিডল্যান্ডার বলেছেন, "The Beveridge Report became the foundation of the modern social welfare legislation of Great Britain and a model for other countries." অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের আধুনিক সমাজকল্যাণ আইনের ভিত্তি হিসেবে এবং অন্যান্য দেশের জন্য মডেল হিসেবে বিভারিজ রিপোর্ট বিবেচিত হয়।[২৩] এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা আইন, ১৯৪৬ সালের জাতীয় বীমা আইন, ১৯৪৬ সালের শিল্প দুর্ঘটনা বীমা আইন, ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইন, ১৯৪৬ সালের স্বাস্থ্য আইন প্রভৃতি ইংল্যান্ডের সমাজকল্যাণে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে।

ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী :

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর কাঠামো মূলত স্যার উইলিয়াম বিভারিজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়।[২৪] জাতীয় বীমা মন্ত্রণালয় (The Ministry of National Insurance) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করে। কর্মসূচী প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত; যেমন-

(১) **১৯৪৬ সালের জাতীয় বীমা আইন** (National Insurance Act of 1946) মুতাবিক বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ব্যাপক 'সামাজিক বীমা' এবং 'স্বাস্থ্য বীমা' কর্মসূচী গ্রহণ।

(২) **১৯৪৬ সালের শিল্প দুর্ঘটনা আইন** (Industrial Injuries Act of 1946) মুতাবিক 'শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কর্মসূচী' গ্রহণ।

উপরোক্ত কর্মসূচী ছাড়া আরও কতিপয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যেমন-

(ক) ১৯৪৫ সালের পরিবার ভাতা আইন (Family Allowance Act of 1945) মুতাবিক 'পারিবারিক ভাতা কর্মসূচী'।

(খ) ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইন (National Assistance Act of 1948) মুতাবিক 'জাতীয় সাহায্য বোর্ডের' মাধ্যমে 'সরকারী সাহায্য কর্মসূচী'।

(গ) ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন (National Health Service Act of 1946) মুতাবিক 'জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Health) কর্তৃক ব্যাপক 'জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী'।

এসব কর্মসূচীর মধ্যে 'পারিবারিক ভাতা কর্মসূচী' ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট থেকে চালু করা হয় এবং বাকি কর্মসূচী ১৯৪৮ সালের ৫ জুলাই থেকে চালু করা হয়। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(১) **সামাজিক বীমা** (Social Insurance);
(২) **শ্রমিক ক্ষতিপূরণ** (Workmen's Comensation);
(৩) **পারিবারিক ভাতা** (Family Allowances);
(৪) **সরকারী সাহায্য** (Public Assistance);
(৫) **জনস্বাস্থ্য** (Public Health)।

---

১. Aurther E. Fink, op.cit, P.
২. W. A. Friedlandar, op.cit, P. 40
৩. See for details, W. A. Friedlandar and Apte, Introduction to Social Welfare, 1982 and Social Service in Britain, Reference Division, Control office of information, London, 1959

সামাজিক বীমা (Social Insurance) :

সামাজিক বীমা পদ্ধতি মূলত সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ভিত্তিভূমি হিসেবে স্বীকৃত। কারণ এর আওতায় আসে 'স্বাস্থ্য বীমা', 'বেকার বীমা,' 'বার্ধক্য ও পঙ্গু বীমা', 'বিবাহ', 'শিশুর জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য বিশেষ ভাতা' প্রভৃতি। এই কর্মসূচী চালু করার পর ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোককে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি যেমন- অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্য, পঙ্গুত্ব, পরিবার প্রধানের মৃত্যু, শিল্প দুর্ঘটনা প্রভৃতিতে ব্যাপক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

বীমাকৃত জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন (ক) চাকরিজীবী (employed person); (খ) আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তি (Self-employed person) এবং (গ) বেকার জনগণ (unemployed person) বিশেষ করে বিবাহিত মহিলা।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ (Workmen's Comensation) :

১৯৪৬ সালের শিল্প দূর্ঘটনা আইন মুতাবিক এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মরত অবস্থায় কোন শিল্প-শ্রমিক আহত হলে এবং পেশাগত রোগে আক্রান্ত হলে দূর্ঘটনা ও রোগের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ করে। তাছাড়া কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার উত্তরাধিকারিগণও আইনের আওতায় অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ করবে।

পারিবারিক ভাতা (Family Allowances) :

১৯৪৫ সালে 'পারিবারিক ভাতা আইন' মোতাবেক এই কর্মসূচী চালু করা হয়। পরিবারের দরখাস্ত মুতাবিক ১৬ বছরের কম বয়সের দুই বা ততোধিক সন্তান থাকলে নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদান করা হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন প্রত্যেক পরিবারকে এই ভাতা দেয়া হয়। সন্তান যদি স্কুল বা শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত থাকে তবে সতেরতম জন্ম দিবসের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাতা তার মায়ের নিকট প্রদান করা হয়।

সরকারী সাহায্য (Public Assistance) :

১৯৪৮ সালের 'জাতীয় সাহায্য আইন' মুতাবিক এই কর্মসূচী চালু করা হয়। এই কর্মসূচীর প্রধান দু'টি দিক আছে। যেমন-

(ক) অর্থনৈতিক দূরবস্থায় নিপতিত জনগণকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা।

(খ) কাউন্টি কাউন্সিলের (County Council) ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) এবং ব্যক্তিগত (individual) সেবা প্রদান করা।

'সরকারী সাহায্য কর্মসূচী' দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে মূলত দরিদ্র আইনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য (Public Health) ঃ

১৯৪৬ সালে 'জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা আইন' মুতাবিক জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাই এই কর্মসূচী চালু করা হয়। এই কর্মসূচী সমগ্র বৃটেনবাসীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচীর প্রশাসন ব্যবস্থা তিনটি শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। যেমন-

(ক) সাধারণ চিকিৎসা ও দন্ত সেবা (General Medical and Dental Service);

(খ) হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞ সেবা (Hospital and Specialist Services); এবং

(গ) স্থানীয় সরকার সেবা (Local Goverment Services)।

উপরোক্ত কর্মসূচী ছাড়াও ইংল্যান্ডে আরও অনেক নিরাপত্তা কর্মসূচী বিদ্যমান। ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা কর্মসূচী অত্যন্ত সুসংগঠিত। আর এই সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর জন্যই ইংল্যান্ড বিশ্বের আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত।

পরিশেষে দেখা যায়, ইংল্যান্ডের আধুনিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রবর্তনে বিভারিজ রিপোর্ট যে পথ নির্দেশিকা প্রদান করে তা অতুলনীয়। যা পরবর্তীতে আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র অনুসৃত হয়। ফ্রিডল্যান্ডার যথার্থই বলেছেন, "The Beveridge Report became the foundation of modern social welfare legislation of Great Britain and a model for other countries".[১] খালিদের ভাষায়, "It was aturning point in the evolution of welfare state since the Biveridge Report became a model for other aspiring countries."[২]

---

১. W. A. Friedlandar and Apte, op.cit, P. 40

২. Mohammad Khalid, Welfare State: A case study of Pakistann, Royal Book co., Karachi, 1968, P. 22.

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার সমাজকল্যাণের ইতিহাস :

আমেরিকার সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংল্যান্ডের সমাজকল্যাণ ধারায় অনুসরণেই আমেরিকার সমাজকল্যাণ ধারা গড়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সব ঔপনিবেশিকগণ আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করে, তাদের অধিকাংশই ইংল্যান্ড থেকে আগত। ঔপনিবেশিক আমলে ইংল্যান্ডের প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, আইন, রীতি-নীতি, আদর্শ, সমাজসেবা কার্যক্রম ইংল্যান্ডের ধারা অনুসরণ করেই গড়ে উঠে।[১]

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় দরিদ্র আইন বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত, ইংল্যান্ডে দরিদ্রদের সাহায্য করার সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে দরিদ্রাগার এবং শ্রমাগারে (Poor house & work house) প্রেরন করা হত। পক্ষান্তরে, আমেরিকায় শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বড় শহরে দরিদ্রাগার ও সংশোধনাগার (House of Correction) স্থাপন করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডে সমাজসেবার ক্ষেত্রে হাসপাতাল, আশ্রম, ইয়াতিমখানা প্রভৃতি বেসরকারী পর্যায়ে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে আমেরিকায় অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ তেমন একটা ছিল না।

আমেরিকার সর্বপ্রথম দরিদ্রাগার (Alms house) নিউইয়র্কে স্থাপিত হয় ১৬৫৭ সালে এবং ১৬৫৮ সালে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমাগার (Work house)। ১৬৯৯ সালে ম্যাচাচুয়েটস-এ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের সংশোধনাগারে (House of Correction) কাজ করতে বাধ্য করা হয়।[২] আমেরিকায় দুস্থ দরিদ্রদের ভরণপোষণের জন্য কম খরচে অন্যের বাসায় রাখার ব্যবস্থা (Lowest Bidder System) প্রচলিত ছিল। ১৬৪৪ সালে দরিদ্রদের সাহায্য করার লক্ষ্যে Boston latin school প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার অবৈতনিক স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের সাহায্য করা। ১৭২৯ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যে পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সালেও অনুরূপ একটি ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮১৭ সালের মধ্যে আমেরিকায় মুক বধিরদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মানসিক রোগীদের কল্যাণের প্রয়াসে Dorothea Lynde Dix এর মানবিক আবেদন ও আমেরিকার সমাজকল্যাণের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] এসব পদ্ধতি অতিরিক্ত দরিদ্র করের বোঝা লাঘব এবং অপ্রত্যাশিত ব্যয় হ্রাস করলেও দরিদ্রদের প্রতি অমানবিক আচরণ, অপর্যাপ্ত সেবা-যত্ন, ক্ষুধা, বঞ্চণা প্রভৃতি হতে রক্ষা করে পারেনি।[৪]

দরিদ্রাগার ও ইয়েটস রিপোর্ট :

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষার্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমেরিকায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্ম সাহায্য (Self Help) ভাবধারার জাগরন গুরুত্ব পায় এবং দাসত্ব প্রথার বিলোপ, সধারণ গণশিক্ষা, নারী অধিকার, মানসিক অসুস্থ ও দরিদ্রদের অধিকতর ভাল চিকিৎসা, কয়েদখানার সংস্কার এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদির জন্য মানবিক আন্দোলন উৎসারিত হয়। এতে বিভিন্ন কর্মকান্ড ও সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। এর অন্যতম হল ১৮৩০ সালে ফিলাডেলফিয়ার কোয়াকার স্টিফেন গিরার্ড (S Girard) স্থাপিত ইয়াতিম খানা।[৫] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে প্যারিস ও কাউন্টিগুলো দরিদ্রদের সাহায্যার্থে বর্ধিত ব্যয়ের অভিযোগ উপস্থাপন করে। বস্তুতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফসলহানী, মহামারী, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে ব্যয়ভার অনেক বৃদ্ধি পায়। পূর্বাঞ্চলের বড় শহরগুলোতে দরিদ্রাবাস (Poor house) স্থাপিত হওয়ায় দরিদ্রদের দেখাশুনা করা সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও কার্যকরী উপায়রূপে গণ্য হয়। ১৮২১ সালে ম্যাসাচুয়েটসের আদালত সাধারণতন্ত্রের দরিদ্র আইনসমূহ তদন্তের জন্য জুসিয়া কুইন্সির নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি আইন প্রণেতাদের পাঁচটি নীতি গ্রহণের সুপারিশ করে। যেমন-

* বহিঃসাহায্য অপচয়মূলক, ব্যয়বহুল এবং দরিদ্রদের নৈতিকতা ধ্বংসকারী;
* দরিদ্রাবাস সর্বাধিক স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ ত্রাণকর্মসূচী। কারণ এখানে প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত;
* দরিদ্রদের কৃষি কাজে নিয়োগ দেওয়া উচিত;
* একটি নাগরিক পরিষদ (Board of Citizen) দ্বারা দরিদ্রাবাস তত্ত্বাবধান করা;
* দরিদ্রদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বজনীন কারণ হচ্ছে অমিতাচার।[৬]

---

১. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৮৩
২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩. সম্পা দাস, সমাজকর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩২৮
৪. W. A. Friendlander and R. Z. Apte, op.cit, P. 56-57
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১৮৮
৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৩ সালে নিউইয়র্ক আইনসভার সেক্রেটারী জে. ভি. এন ইয়েটস (J. V. N. Yates) কে দরিদ্র আইন বাস্তবায়ন এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। ১৯২৪ সালে ইয়েটস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে দরিদ্রদের স্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী এ দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়। রিপোর্টে ভবঘুরেমী এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করার জন্য ওভারসিয়ার কর্তৃক যথাযথ অনুসন্ধান ব্যতীত দরিদ্রদের সাহায্য দানকে দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্রদের প্রতি সাহায্য কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের নির্মম আচরণ, শিশুদের শিক্ষা ও নৈতিকতা উন্নয়নের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, কারাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং দরিদ্রদের কাজ করার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো ইয়েটস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। দরিদ্র আইন এবং সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইয়েটস রিপোর্টে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হয়।

* প্রতিটি কাউন্টিতে 'কর্মসংস্থান কেন্দ্র' (House of employment) স্থাপন, শিশু শিক্ষার সুযোগ এবং কৃষি কাজের জন্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
* শ্রমাগার (Work house) ব্যবস্থা চালু রেখে সবল ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিশ্রম করতে বাধ্য করা।
* দরিদ্রদের সাহায্যর্থে ত্রাণ তহবিল গড়ে তোলার জন্য হুইস্কী তৈরির উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা।
* আইনগত দিক হতে বসতি স্থাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠার শর্ত হিসেবে নিউইয়র্কের যে কোন কাউন্টিতে এক বছর অবস্থান করার প্রথা চালু করা।
* দরিদ্রদের বহিষ্কার আদেশ এবং দরিদ্র আইন সংক্রান্ত মুকাদ্দমার আপীল পদ্ধতির বিলোপ সাধন।
* ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের কোন সবল পুরুষের নাম দরিদ্র তালিকায় না রাখার নির্দেশ জারী করা।
* রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করা এবং রাজ্যে দরিদ্রতা সরবরাহের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

কুইন্সী এবং ইয়েটস রিপোর্টের সুপারিশের আলোকে আমেরিকায় দরিদ্রাগার ও শ্রমাগার প্রতিষ্ঠা করে সাহায্য সংক্রান্ত দরখাস্ত গ্রহণের দায়িত্ব এগুলোর উপর ন্যাস্ত করা হয়। ইয়েটস রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮২৪ সালে নিউইয়র্ক 'Country Poor House Act' প্রণয়ন করে দরিদ্রাগারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাউন্টির উপর অর্পণ করা হয়।[১]

এতদ্বসত্ত্বেও দরিদ্রদের ভাগ্য উননয়নে দরিদ্রাগার ব্যবস্থা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ জন্য বহুবিধ কারণই দায়ী ছিল। যেমন- (ক) জোরপূর্বক দরিদ্র পরিবারকে দরিদ্রাগারে আনয়ন। (খ) বয়স, লিঙ্গ, সুস্থ-অসুস্থ, অপরাধী-নিরাপরাধী প্রভৃতি ভেদাভেদ না করে সব শ্রেণীর দরিদ্রদের একত্রে বসবাস করতে বাধ্য করা। (গ) পরিত্যক্ত ও নিলামে প্রাপ্ত অস্বাস্থ্যকর দালানে দরিদ্রাগার স্থাপন। (ঘ) কর্মহীন রাজনৈতিক সমর্থকদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োগ করা ইত্যাদি কারণে দরিদ্রাগার ব্যবস্থা দরিদ্রদের উন্নয়নে ব্যর্থ হয়।[২]

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কার্যক্রম কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত না হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালে ম্যাচাচুয়েটস-এ 'স্টেট বোর্ড অব চ্যারিটি' গঠন করা হয়। এ বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে ছিল-

(ক) নির্ভরশীল শিশুদের সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। (খ) বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার জন্যে একই ধরনের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন (গ) মানসিক অসুস্থদের জন্য অধিকতর সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করা (ঘ) বিভিন্ন জাতির উপনিবেশবাসীর আর্থিক সংকট দূর করা। ১৯০৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী তদারক এবং সমন্বয় সাধনের জন্য বিধান সভা **'স্টেট বোর্ড অব ট্যারিটিজ এন্ড কারেকশনস'** (State Board of Charities and Corrections) গঠন করে। ১৯১৩ সালে শিশু কল্যঅণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী তদারক করার জন্য **'চিলড্রেন এজেন্ট'** নিয়োগ করা হয়। ১৯২৫ সালে সরকারী পর্যায়ে সকল সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কার্যাবলী তত্ত্বাবধায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের ভার **"জনকল্যাণ বিভাগ"** (Department of Public Welfare) এর উপর অর্পণ করা হয়। ১৯২৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে **'রাষ্ট্রীয় সমাজকল্যাণ বিভাগ'** (State Department of Social Welfare) রাখা হয়।[৩]

---

১. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২. W. A. Friendlander and R. Z. Apte, op.cit, P. 60
৩. বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, Encyclopedia of Social Work, 1995, USA. International Social Work, 1989, London. Friedlandar, Introduction to Social Welfare etc.

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৩ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :

পেশাদার সমাজকর্মের ঐতহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৮৭৩ সালের আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যা মুকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচীই সমাজকল্যাণকে পেশার পর্যায়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা আমেরিকার সমাজ জীবনে বহু ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সমস্যার সৃষ্টি করে। অনাহার, অসুস্থতা, নিরাশা সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

উদ্ভুত সমস্যাবলী মুকাবিলায় প্রচলিত সরকারী-বেসরকারী সাহায্য কার্যক্রম প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতির অনুসরণে আমেরিকাতে দান সংগঠন আন্দোলন (Charity Organistion Movement) গড়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭৭ সালে R. H. Gurteen ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতির অভিজ্ঞতার আলোকে নিউইয়র্কের ব্যাফেলো শহরে সর্বপ্রথম **দান সংগঠন সমিতি** (Charity Organization Society-C.O.S) গঠন করেন। এর লক্ষ্য ছিল প্রচলিত দরিদ্র তহবিলের অপব্যয় রোধ, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার অর্থহীন প্রতিযোগিতা ও কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সাহায্য করা।[১]

দান সংগঠন সমিতি (C.O.S) নীতিমালা ছিল -

(ক) স্থানীয় সাহায্য সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার পারস্পরিক সহযেগিতা বৃদ্ধি করা।

(খ) গোপন কেন্দ্রীয় রেজিষ্ট্রী বোর্ড গঠন করে দরিদ্রদের একাধিকবার সাহায্য গ্রহণের প্রবণতা বন্ধ করা।

(গ) সাহায্য প্রার্থীর সমস্যা, চাহিদা, প্রয়োজন ইত্যাদি অনুসন্ধানের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন পরিদর্শক (Friendly Visitors) নিয়োগ করা।

দান সংগঠন সমিতিগুলোর পরিদর্শকগণ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করে দারিদ্রের কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত অলসতা, অবহেলা, মদ্যপান, জুয়া, ঋণগ্রস্ততা, নিম্নতম মজুরী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতিকে চিহ্নিত করেন।

দান সংগঠন সমিতিগুলো (C.O.S) দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা চালায়। দরিদ্রদের গৃহ পরিবেশ উন্নয়ন, বস্তি এলাকার সংস্কার, যক্ষা প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। অন্ধ, পঙ্গু, বধিরসহ অক্ষম ও বিকলাঙ্গদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেও দান সংগঠন সমিতিগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে। শিশুশ্রম আইন এবং কিশোর ও যুব অপরাধীদের জন্য পৃথক আদালত স্থাপনের আন্দোলনকে দান সংগঠন সমিতিগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করে।

দান সংগঠন সমিতির (C.O.S) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে, ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার তথ্য সংগ্রহ ও কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দান সংগঠন সমিতির কিছু সংখ্যক সক্রিয় কর্মী বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার প্রেক্ষিতে **এনা. এল. ডয়েস** (Anna. L. Dhawes) ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমাজকর্মের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে ১৮৯৭ সালে **ম্যারী রিচমন্ড** (Mary Richmond) "Training School for Applied Philanthropy" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত স্কুল এবং দান সংগঠন সমিতির (C.O.S) যৌথ সহযোগিতায় সমাজকর্মের উপর ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। যা পরবর্তীতে "New York School of Social Work" এ উন্নীত হয় এবং ১৯৪০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে **'সেটেলম্যান্ট হাউজ'** (Setlement House) অন্যতম। দরিদ্র বসতি এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন এবং দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের অনুকরণে এটি গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম সেটেলম্যান্ট হাউজ স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৯ সালে শিকাগো শহরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **হাল হাউজ** নামে সেটেলম্যান্ট হাউজ (Hull House) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেটেলম্যান্ট হাউজ স্থাপনের ফলে আমেরিকার দরিদ্রদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিভিন্ন সেটেলম্যান্ট হাউসের প্রচেষ্টায় দরিদ্রদের বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের স্বাস্থ্য সুবিধা, শিক্ষার সুযোগ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, আইনগত সুবিধার নিশ্চয়তা প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়ে উঠে।[২]

---

১. W. A. Friendlander and R. Z. Apte, op.cit, P. 17

২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা মুকাবিলার লক্ষ্যে আমেরিকায় গৃহীত সরকারী ও বেসরকারী সমাজসেবা কার্যক্রম পেশাদার সমাজ কর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। R. A. Skidmore তাই বলেছেন, "With the depression of 1873 after the civilwar in the United States of came chaos and many personal, family and community problems. The charity organization movement in America was started, patterned in the main after Europian innovations."[১]

১৯২৯ সালের আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে গৃহীত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :

১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গণ বেকারত্ব, অনাহার, স্বাস্থ্যহীনতা, হতাশা প্রভৃতি সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সমাজে দারিদ্র ও ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। এসব অবস্থা মুকাবিলায় প্রচলিত সরকারী-বেসরকারী সাহায্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এসব অবস্থা মুকাবিলার জন্য বিশেষ করে বেকার সমস্যা প্রতিরোধের জন্য প্রেসিডেন্ট হুবার (Hoover) ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে গভর্ণরদের সম্মেলনে **"জরুরী কর্মসংস্থান কমিটি"** (Emergency Committee of Employment) গঠন করেন। এ কমিটি বেকারদের সাহায্যার্থে কমিউনিটি চেষ্ট এবং শিল্প কারখানার মালিকদের অর্থ সাহায্যের অনুরোধ জানায়। কিন্তু কমিটির অনুরোধে তেমন সাড়া না পাওয়ায় কমিটি ব্যর্থ হয়।

বেসরকারী সাহায্য সংস্থা এবং দানের মাধ্যমে বেকারত্ব মুকাবিলা করা সম্ভব না হওয়ায় সরকারী পর্যায়ে অভিজ্ঞ সমাজকর্মী **হ্যারী এল হপকিন্স** (Harry L. Hopkins) এর নেতৃত্বে নিউইয়র্কে অস্থায়ী জরুরী ত্রাণ প্রশাসন (Temporary Emergency Relief Administration) গঠন করেন। এ নীতির সফলতার প্রেক্ষিতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ২৪টি রাজ্যের ত্রাণকার্যে উক্ত নীতি গৃহীত হয়।

এতদ্বসত্ত্বেও ১৯৩২ সালে অর্থনৈতিক মন্দা চরম পর্যায়ে পৌছে। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট **ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট** (Franklin D. Rosevelt) পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য ১৯৩৩ সালে **'ফেডারেল ইমারজেন্সী রিফিল এ্যাক্ট'** (Federal Emergency Relief Act) নামে নতুন আইন পাস করেন। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য এল. হপকিন্সকে প্রশাসক নিযুক্ত করে **"ফেডারেল ইমারজেন্সী রিলিফ এডমিনিস্ট্রেশন"** (Federal Emergency Relief Administration) সংক্ষেপে (FERA) গঠন করা হয়। মূল লক্ষ্য ছিল (১) বেকারত্বের জন্য প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী তত্ত্বাবধান করা (২) অনুদান ও মঞ্জুরীর অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বেকারত্বের সেবার মান উন্নয়ন করা।[২] FERA-র কার্যক্রমকে অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য পাঁচটি পৃথক বিভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

* ফেডারেল কর্ম বিভাগ (Federal work division)
* রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বিভাগ (Division of relations with states)
* বিশেষ কর্মসূচী বিভাগ (Division of special programme)
* গবেষণা, পরিসংখ্যান ও অর্থ বিভাগ (Division of research, statistics & finance)
* পল্লী পুনর্বাসন বিভাগ (Rural rehabilitation division)

১৯৩৩ সালে মজুরী ভিত্তিক কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট "Civil Works Administration" গঠন করেন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট Work Progress Administration (WPA) নামে বিভাগ খোলেন। ১৯৩৯ সালে এর নাম "Works Projects Administration" রাখা হয়। কারণ FERA ছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে বেকার সমস্যা মুকাবিলার একটা জরুরী পদক্ষেপ। ১৯৪০ সালের পর সমরাস্ত্র কারখানায় সম্ভাব্য সকল শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন WPA-এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বেকার ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে FERA এবং WPA এক বাস্তবমুখী ভূমিকা পালন করে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যুবকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিভিলিয়ান কনজারভেশন কোর (Civilion Conservation Corps- CCC) এবং ন্যাশনাল ইয়ুথ এডমিনিষ্ট্রেশন (National Youth Administration-NYA) নামক দু'টি কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[৩]

১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মুকাবিলার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যেসব বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেগুলো আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ন্ত্রণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি আমেরিকার সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

---

১. Rex, A, Skidmore and Thackeray, Introduction to Social Work, 5th edn. 1991, P. 41.
২. See for details, W. A. Friedlander, Encyclopedia of Social Work, 1995. Aurther E Fink, The Fiedd of Social Work, 1949, etc.
৩. আরও দ্রষ্টব্য, সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪, Charles Zastrow, Introduction to Social Welfare Institutions, মোঃ নুরুল ইসলাম, সমাজকর্ম : ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০৫, রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০৫, আবদুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, ঢাকা-২০০০ ইত্যাদি।

আমেরিকার স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী :

আমেরিকার ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অস্থায়ী কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব পদক্ষেপ উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভবিষ্যত বিপর্যয় রোধ কল্পে স্থায়ী কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৩৪ সালে তিনি মিস. ফ্রান্সেস ফারকিন্সকে সভাপতি করে একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কমিটি (Committee on economic security) গঠন করেন। উক্ত কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯৩৫ সালের ১৫ই আগষ্ট 'সামাজিক নিরাপত্তা আইন-১৯৩৫' (Social security act 1935) পাস করা হয়।[১] আমেরিকার সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম সুসংহত মৌলিক আইন (Fundamental federal law)।

সামাজিক নিরাপত্তা আইনের আওতায় নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

(১) **সামাজিক বীমা (Social Insurance) :** এ কর্মসূচীর আওতায় বৃদ্ধ এবং বেকারদের জন্য বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

(২) **শ্রেণীভিত্তিক সরকারি সাহায্য (Categorical Public Assistance Programme) :** এটি অনুদান ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী। অনুদানের ভিত্তিতে বৃদ্ধ, অন্ধ এবং নির্ভরশীল বালক-বালিকা এ তিন শ্রেণীকে সহায়তা প্রদান করা হত।[২] ১৯৫০ সালে সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে অক্ষমদের সহায়তা দান এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়।

(৩) **স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সেবা (Health and welfare services) :** এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পঙ্গু শিশু সেবা, শিশু কল্যাণ, বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন এবং জনস্বাস্থ্য। তবে ১৯৪৩ সালের "Rehabilitation Act" এবং ১৯৪৫ সালের "Public Health Service Act" অনুযায়ী বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও জনস্বাস্থ্য সেবা এ দু'টি পৃথক করে নেয়া হয়।

এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে **'সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড'** (Social security board) গঠন করা হয়।[৩]

১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন ১৯৫০ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বৃদ্ধদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, বৃদ্ধ এবং অক্ষমদের ভাতা বৃদ্ধি, ১৮ থেকে ২১ বছরের স্কুল ছাত্রদের ভাতা দানের অন্তর্ভুক্তকরণ প্রভৃতির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আমেরিকার সামাজিক আইনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় ১৯৬২ সালে প্রণীত Public Welfare Amendments of 1962 এর মাধ্যমে। সংশোধিত আইনের মাধ্যমে জনকল্যাণে প্রতিরোধমূলক, সংরক্ষণমূলক এবং পূনর্বাসনমূলক কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে। ত্রিমুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য আমেরিকার ফেডারেল সরকার ৭৫% ভাগ ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বলেছেন, "This measure embodies a new approach stressing services in addition of support, rehabilitation instead of relief, and training for useful work intend of prolonged dependency, our objective is to prevent or reduce depedency and to encourage self care and self support to maintain family life where it is adequate and to restore it where it is deficient."[৪]

সামাজিক নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন সংশোধন সরকারী সাহায্য কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলোকে অধিক কার্যকরী এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে।

আমেরিকায় পেশাদার সমাজকর্মের বিবর্তন :

আধুনিক সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত রূপদানে ইংল্যান্ডের অবদান সর্বাধিক হলেও পেশা হিসেবে সমাজকর্মের বিবর্তনে আমেরিকার অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আমেরিকায় সমাজকর্ম পেশার বিবর্তনে ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

---

১. Aurther E Fink, The Fiedd of Social Work, 1949, P. 41

২. Ibid, P. 42

৩. Charles S. Sckottland, The Social Security Program in United States, New York, 1966, P. 93.

৪. R. A. Skidmore and Thackery, op.cit, P. 44 হতে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৩ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মুকাবিলায় প্রচলিত সমাজসেবা কার্যক্রমের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে দান সংগঠন আন্দোলন (Charity Organization Movement) শুরু হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭৭ সালে ইংল্যান্ডের অনুকরণে আর. এইচ. গার্টিন এর নেতৃত্বে নিউইয়র্ক শহরে আমেরিকার সর্বপ্রথম দান সংগঠন সমিতি (C. O. S) গঠিত হয়। দান সংগঠন সমিতির পরিদর্শন এবং স্বেচ্ছাসেবীগণ সমস্যাগ্রস্ত দরিদ্রদের সমস্যা সামগ্রিক দিক গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এর প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত সমাজকর্মী এনা. এল. ডয়েস (Anna L. Dawes) ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত "International Congress of Charities, Correction & Philanthropy" সম্মেলনে সমাজকর্মের উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ দনের প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন।[১] ১৮৯৭ সালে ম্যারী রিচমন্ড (Mary Richmond) সমাজসেবার উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য "Training School for Applied Philanthropy" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দান সংগঠন সমিতি এবং উক্ত স্কুলের যৌথ উদ্যোগে ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের উপর ছয় সপ্তাহের এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ কোর্সের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে এটি ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে বর্ধিত করা হয়। পর্যায়ক্রমে এটি "New York School of Social Work" – এ উন্নীত হয়ে ১৯৪০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। এ সময় শিকাগো, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি শহরে সমাজকর্মের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (School of Social Work) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে 'New York School of Social Work' – এর নাম পরিবর্তন করে 'Columbia University School of Social Work রাখা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার Professional Schools of Social Work' এর সংখ্যা ৮৮টিতে উপনীত হয়।[২]

সমাজ সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং কার্যক্রম জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য C. O. S. ১৯৮১ সালে 'Charities Review' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯১০ সালে এটি সমজাতীয় অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে "The Survey" নামে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পেশাদার সমাজকর্মের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যে কোন বৃত্তিকে পেশার মর্যাদা লাভ করতে হলে পেশাগত সংগঠন বা পেশাগত প্রতিষ্ঠান থাকা অপরিহার্য। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সার্বিক উন্নয়ন ও পেশাদার ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় "Association of Hospital Social Workers" গঠনের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের পৃথক সাতটি পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৪৯ সালে আমেরিকার পেশাদার সমাজকর্মীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠিত সমাজকর্ম সংগঠনগুলোর সাধারণ স্বার্থ রক্ষা এবং কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনয়িতা অনুভব করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালের ১লা অক্টোবর ৭টি সমাজকর্ম সংগঠনের সমন্বয়ে আমেরিকায় "National Association of Social Workers" সংক্ষেপে 'NASW' গঠন করা হয়। সমাজকর্মের দক্ষতা, সেবার মান এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে এটি গঠিত হয়। NASW' প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে সমাজকর্মের পেশাগত মান উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। আমেরিকার "National Association of social Workers" বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মান উন্নয়নে (১) The Social Work (২) Social Work Year Book এবং (৩) Encyclopedia of Social Work নিয়মিত প্রকাশ করছে। ১৯৮৯ সালের তথ্যানুযায়ী 'NASW' এর সদস্য সংখ্যা ছিল এক লাখ ষোল হাজার।[৩]

---

১. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২. R. A. Skidmore and Thackery, op.cit, P. 47
৩. David Macarov, Social Welfare: Structure and Practise, Sage Publication Inc. California, 1995. P. 16

Dhaka University Institutional Repository

যে সাতটি সংগঠন নিয়ে (NASW) গঠিত হয়েছিল সেগুলো হল (1) American Association of Group Workers (2) American Association of Medical Social Workers (3) American Association of Psychiatric Social Workers (4) American Association of Social Workers (5) National Association of School Social Workers (6) Association for the Study of community organization and (7) Social Work Research Group.[১]

১৯৫২ সালে আমেরিকার "Council of Social Work Education" প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন সমাজকর্মী তৈরি করাই ছিল কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য।

যে কোন পেশার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদন্ড (Professional code of ethics)। ১৯৫১ সালে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজ কর্মের পেশাগত নৈতিক মানদন্ড নির্ধারণ করে। যেগুলো ১৯৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৬৭ এবং ১৯৭৯ সালে সমাজকর্মের পেশাগত নৈতিক মানদন্ডগুলোর সংশোধন করা হয়।

পেশার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। পেশাগত লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পেশার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ১৯৩৩ সালে 'California Conference of Social Work' কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা পাসের পর বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকর্মীদের রেজিষ্ট্রি সার্টিফিকেট প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সাল হতে রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬১ সাল হতে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সমাজর্মীদের স্বেচ্ছাভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ব্যবস্থা করে। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ১৯টি রাজ্যে সমাজকর্মীদের পেশাগত মান বজায় এবং পেশাগত যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ৪৪টি রাজ্যের সমাজকর্মীদের জন্য The Academy of Certified Social Workers (ACSW) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একাডেমীর সদস্যভুক্ত পেশাদার সমাজকর্মীগণ আমেরিকার অন্যান্য পেশার লোকদের মত পরিপূর্ণ পেশার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকল্যাণের ইতিহাস :

বহুজাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকের আবাসস্থল হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশ এক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। অতীতের ভারতবর্ষের (বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার ও অন্যান্য এলাকা বিস্তৃত) সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিচিত্র ও বহুজাতিক চরিত্রের সমন্বয় ছিল। সুদূর অতীতের ভারতবর্ষের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং সমাজকল্যাণের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সুদূর অতীতের চিন্তাধারা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে মানবপ্রেম, ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই যে সমাজ কল্যাণের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।[২] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী সমন্বয়কে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এ তিন যুগে বিভক্ত করা যায়। এ যুগগুলোতে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এক তাৎপর্যময় স্থান অধিকার করে আছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজকল্যাণ :

সুদূর অতীতকাল হতে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্য ছিল। ফলে এ সমস্ত ধর্মের অনুশাসন ও প্রেরণা সেখানকার সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সূচনাকে প্রভাবিত করেছে। মূলত উক্ত ধর্মসমূহের অনুশাসন ভিত্তিক মূল্যবোধ, মানবপ্রীতি ও সহযোগিতামূলক প্রেরণা থেকে সৃষ্ট দানশীলতা, আর্তের সেবা, অন্নহীনে অন্ন দান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, আশ্রয়হীনে আশ্রয় দান ছিল তখনকার সমাজ কল্যাণের ভিত্তিস্বরূপ।[৩] আর এ ধরনের ব্যবস্থা কখনও পরিচালিত হয়েছে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, কখনও বা পরিচালিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে দানশীলতার (Charity) মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের সূচনা হয়। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একে অপরের ভালমন্দে এগিয়ে আসে, প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিবারের ভূমিকাই ছিল প্রধান। পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, বিধবা এদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরিবারের মাধ্যমেই সম্পাদিত হত। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা চালু

---

১. *Armondo Morales, Social Work: A Profession of Many Faces, Allyn and Bacon Inc. 1986. P. 46*
২. *রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৫৫*
৩. *রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫*

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় এ ধরনের নিরাপত্তা দানে পরিবারের স্বত:স্ফূর্ত সহযোগিতা ছিল। এ ছাড়াও স্বচ্ছল পরিবার তাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায়ও ভূমিকা পালন করত। গ্রামের পঞ্চায়েত নামক একটি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানও গ্রামের রুগ্ন, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্তদের সেবায় কাজ করত। সে সময়কার নিয়মানুযায়ী পরিবার প্রধান, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরাই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করত।[১]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মকে আশ্রয় করেই মুখ্যত সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটে। ধর্ম ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজা, ধনী ব্যক্তি, ভূমিপতি ও ধর্মপ্রাণ মনীষীরা মানবসেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে এবং সমাজবাসী সকলেই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেদের অভাব পূরণে সচেষ্ট হয়েছে। এ পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের ধরন ছিল সন্ন্যাসীর আশ্রম নির্মাণ, জীবনযাত্রা নির্বাহে তাদের ভাতা দান, সন্ন্যাসীর আবাসস্থল নির্মাণ এবং ছন্নছাড়া অসহায় মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের সাহায্য দান মূলক ব্যবস্থা।[২] ধর্ম বদান্যতা ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে। দু:স্থদের খাদ্য ও সাহায্য দান একটি ধর্মীয় কর্ম হিসেবে বিবেচিত হত। ধর্ম মন্দির আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়েছে। জনসমষ্টির সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অসহায়দের প্রয়োজন মুকাবিলার ব্যবস্থা করত। যৌথ পরিবারের মাধ্যমে পঙ্গু ও মানসিক বিপর্যস্তরা সাহায্য লাভ করত। ব্যক্তিগত সাহায্য লাভের প্রয়োজন পূরণ ছিল বর্ণপ্রথা ও জনসমষ্টি পরিষদের দায়িত্ব। এ সময়ে সামন্তবাদী অর্থ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সামন্ত কর্মীদের সামন্তরীতিতে দেখাশুনা করা হত।[৩] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গ্রামের জনগণ যৌথভাবে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যে কোন গঠনমূলক কাজে জড়িত হত। গ্রাম পঞ্চায়েত বালকদের তত্ত্বাবধান এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন এদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে জড়িত ছিল।[৪] গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা গ্রামের অভিভাবক ছিল। সামাজিক সংহতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণে গ্রামের প্রধান 'গ্রামীন' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেন। গোত্রীয় ব্যবস্থায় গোত্রপ্রধান গোত্রভুত বিভিন্ন সমস্যাদি নিরাময়ে সচেষ্ট হতেন।

বৈদিক যুগের সমাজ ছিল মুখ্যভাবে পরিবার কেন্দ্রিক। ফলে সমাজের উন্নতি-অবনতি পরিবারের কার্যাবলীর উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। পরিবার শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়, বিধবা, পঙ্গু, অসুস্থ ও অপরাপর নির্ভরশীল লোকজনের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। অবিবাহিত মেয়েরাও পিতা অথবা তার অবর্তমানে বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। বিয়ের সময় মেয়েদের নিরাপত্তা হিসেবে দেয়া হত উপঢৌকন বা যৌতুক। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিধানে পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত গ্রামসমূহের একটি ভূমিকা ছিল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে সমাজসেবার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হত। হিন্দুশাস্ত্র মতে দানশীলতা হল তিন রকম। তাহল- অর্থদান, অভয়দান ও বিদ্যাদান। এসব দানের মধ্যে বিদ্যা দান হল সর্বোৎকৃষ্ট। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণদের অবৈতনিক বিদ্যাদান (Free education) কে সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ধরন হিসেবে বিবেচনা করা হত। ব্রাহ্মণ বা বিজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ বিদ্যাদানকে ধনী-গরীব সকলে অনুপ্রেরণা যোগাতো। ধনীরা এবং কোন কোন শিক্ষাগুরু সেজন্য শিক্ষাদানের আশ্রম বা মঠ নির্মাণ করত।[৫] সে সময়েই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাগুরুরা তক্ষশীলা, বানারসী ও নালান্দা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এসব কেন্দ্রসমূহে তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীরা শিক্ষা দান করতেন। এর মধ্যে একমাত্র তক্ষশীলাতেই চতুর্থ শতাব্দীর ব্যাকরণ বিশারদ পাণিনি, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য, মধ্যযুগীয় ভারতের বিজ্ঞান বিশারদ চন্দুরকার প্রমুখের মত জ্ঞানী-গুণীদের বসবাস ছিল।

প্রাচীন ভারতের সমাজ সেবামূলক তৎপরতার উন্মেষ-বিকাশে ধর্ম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মগ্রন্থ বেদ ছিল জ্ঞান অর্জনের মুখ্য উৎস। ফলে বেদান্ত নির্দেশনা মানবীয় চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণকে কল্যাণমুখী ধারায় প্রবাহিত করেছে। ভারতের সমাজকল্যাণের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বদান্যতা নির্ভর সেবা দানের কেন্দ্র হিসেবে মঠ ও আশ্রম সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এসব কেন্দ্র ছিল একদিকে শিক্ষা দানের এবং অপরদিকে মানবতার সেবায় উৎসর্গিত। মধ্যযুগীয় পর্যায়ে এসে অনেক মঠই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে এবং হিন্দু দর্শন, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়।

---

১. সম্পা দাস, সমাজকর্ম : প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৫৯
২. R. C. Mojumdar, "Social Work in Ancient and Mediaval India", in History and Philosophy of Social Work in India, (Wadia ed.), 1961, P. 22
৩. M. S. Gore and I. E. Soares, "Historical Background of Social Work in India", in Social Welfare in India, Planning Commission of India, New Delhi, 1955, P. 2
৪. G. R. Madan, "Indian Social Problems" Vo-2, New Delhi, 1980, P. 66
৫. Ibid, P. 66

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হিসেবে সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নজিরও প্রাচীন ভারতে লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক পন্ডিত কৌটিল্য লিখিত অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, 'প্রজাদের সুখই রাজার সুখ, তাদের কল্যাণই তার কল্যাণ এবং রাজা এতিম, বৃদ্ধ, অক্ষম, ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন।[১] রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজ সেবামূলক তৎপরতায় প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলে অশোক ও হর্ষবর্ধণের রাজত্বকালে। বৌদ্ধধর্মের পাকাপোক্ত অনুসারী মানবপ্রেমিক অশোক প্রজাদের মঙ্গল নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি তার সাম্রাজ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পথিকদের বিশ্রামের জন্য বড় বড় বৃক্ষরোপন ও বিশ্রামাগার স্থাপন করেন এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য কুপ খনন করেন।[২] প্রাচীন যুগে সমাজবোর ইতিহাসে বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের নাম অবিস্মরণীয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বাত্মক সচেষ্ট ছিলেন। তিনি প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছদ্মবেশে রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আমলে করভার ছিল লঘু এবং প্রজাসাধারণও বসবাস করত সুখে শান্তিতে। হর্ষবর্ধন পাঁচ বছর পর পর যাবতীয় উদ্বৃত্ত সম্পত্তি আনুষ্ঠানিকভাবে গরীব-দু:খীদের মধ্যে দান করে দিতেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩] হর্ষবর্ধনের পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত সমাজসেবার তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বরং সে সময় হতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব সমাজ জীবনে ব্যাপক হয়ে উঠলে বর্ণভেদ প্রথার বেড়াজালে সামাজিক জীবনযাত্রা আরও জটিল হয়ে উঠে।

মধ্যযুগে বা মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণ :

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রকট বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও এর আক্রমণাত্মক প্রভাব প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় সিন্ধু আক্রমণকারী আরবদের (৭১২ খ্রী.) স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সহজ-সরল রীতি-নীতি, সহিষ্ণুতা ও উন্নত সমাজব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরব বণিক, ধর্মপ্রচারক, পীর-দরবেশ, শাসকবর্গ প্রমুখ উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সুদীর্ঘ ৮শ' বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে।[৪] মধ্যযুগে সুলতানী (তুর্কী আফগান) ও মুঘল এ দু'ধরায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এতে ইসলামী মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

সরকারীভাবে সমাজকল্যাণ :

মধ্যযুগে সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১০ খ্রী.)। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিঃস্বার্থভাবে সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত হন। হাসান-উন-নিজামী বলেন, "He dispensed evenhanded justice to the people and exerted hismelf to promote the peace and prosperity of the strain.[৫]

মধ্যযুগে সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-৩৬ খ্রী.)। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাজপ্রসাদে ঘন্টা স্থাপন, শিক্ষা ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষকতা, দিল্লীতে কলেজ নির্মাণ ও নাসিরিয়া মাদ্রাসা স্থাপন, বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বন-জঙ্গল অপসারণ।[৬]

মধ্যযুগে সরকারি সমাজ সেবার ক্ষেত্রে নাসিরউদ্দিনি মাহমুদও (১২৪৬-৬৬) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মসজিদ, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। গিয়াসউদ্দিন বলবনের (১২৬৬-৮৭) অবদানসমূহ হচ্ছে- সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দূর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইসলামী শরিয়াত প্রবর্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি।[৭]

---

১. M. I. Gazdar, "Charities – Their Past, Present and Future" in Social Welfare in India, PCI, New Delhi, 1955, P. 190
২. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ৫৪
৩. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২
৪. মোঃ নুরুল ইসলাম, সমাজকর্ম : ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৮৯
৫. হাসান উন নিজামীর বরাত দিয়ে সম্পা দাস, সমাজকর্ম : প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৩৬৪
৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯১।
৭. দ্রষ্টব্য আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের সরকারী সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন আলাউদ্দীন খিলযী (১২৯৬-১৩১৩)। সমাজকল্যাণে তাঁর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে ভূমি জরিপের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যেমন- গম, যব, ধান, ডাল, চিনি, মাছ, মাংস, তেল, লবণ, পশু প্রভৃতির মূল্য নির্ধারণ, সরবরাহ ও পরিবহন এবং খামার ও বাজার প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্যোগের সময় পণ্যের বরাদ্দ নির্ধারণ (rationing) যা প্রতিভাবান শাসকের সমাজকর্মে এক অভিনব উদ্ভাবন। খাদ্য ঘাটতি মুকাবিলায় গুদাম নির্মাণ ও খাজনার পরিবর্তে শস্য সংগ্রহ, চোরাচালান রোধ, মদ্যপান, মাদকদ্রব্য, পতিতাবৃত্তি, ব্যাভিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন, শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার সম্প্রসারণ, মসজিদ, প্রসাদ, সরাইখানা, বাঁধ, মিনার প্রভৃতি নির্মাণ ও পুরাতন স্থাপত্যের সংস্কার সাধন।[১]

মধ্যযুগের সরকারী সমাজ সেবায় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রী.) ও মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সমাজকর্মে তাঁদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হল- কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থা, খাল-খনন, পতিত জমি আবাদকরণ ও ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাজস্ব সংস্কার ও জায়গীরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আনয়ন, দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মওকুফকরণ, রাজপথ, সেতু ও বাগান নির্মাণ, দরিদ্রদের জন্য বৃত্তি প্রদান, জনবিরোধী প্রথা ও আইন-কানুন বিলোপ সাধন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ, পুলিশ বিভাগ সংস্কার ও দুর্বৃত্তদের থেকে জনগণকে রক্ষাকল্পে দূর্গ নির্মাণ, ইয়াতিম, অসহায়, দুস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কৃষি উন্নয়নে 'দিওয়ান-ই-কোহি' নামে পৃথক বিভাগ সৃষ্টি, পতিত জমি আবাদকরণ, কৃষকদের 'তাকাভী' ঋণদান, দুর্ভিক্ষকালে দুস্থদের সাহায্য দান প্রভৃতি পদক্ষেপ নেয়া হয়।[২]

সরকারী সমাজসেবায় ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রী.) এর অবদানও কম নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রদক্ষেপসমূহ হল কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সেচের ব্যবস্থাকরণ, সুদীর্ঘ ৪টি খাল ও ১৫০টি কূপ খনন, পতিত ও অনাবাদি জমি আবাদকরণ, কৃষি ঋণ ও অন্যান্য কৃষি সহায়তা প্রদান, ২৩ প্রকার কর রহিতকরণ ও অনেক পীড়াদায়ক কর থেকে অব্যাহতি প্রদান, কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক মাত্র ৪ প্রকার করারোপ খারাজ, খুমুস, জিজিয়া ও যাকাত, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, রাজপথ ও সেতু নির্মাণ, বেকার সমস্যা সমাধানে 'চাকরি দপ্তর' (Employment Bureau) প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র কন্যাদের বিবাহ এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণ-পোষণে 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' বিভাগ স্থাপন, চিকিৎসালয় (দারুস সাফা), হাসপাতাল নির্মাণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান, শিক্ষা বিস্তারে ৩০টি কলেজ, বহু মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় স্থাপন, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা, ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ, বিচার ব্যবস্থা সংস্কার ও অঙ্গহানি রহিতকরণ। শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন, যা আধুনিক সমাজকর্মের 'অপরাধ সংশোধন' কার্যক্রমের সাথে তুলনীয়, পর্যটকের জন্য ২০০ সরাইখানা এবং ১০টি স্নানাগার নির্মাণ ও খাবারের সুব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের জন্য ১,২০০ বাগান নির্মাণ ও ৩০টি বাগান সংস্কার, সৈনিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, ফিরোজবাদ, জৌনপুর, ফাতেহাবাদ প্রভৃতি বহু শহর প্রতিষ্ঠা, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সংস্কার এবং পূর্ত বিভাগ স্থাপন এবং ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দেওয়ান-ই-বন্দেগাণ' বিভাগ স্থাপন, ১,৮০,০০০ দাসদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে কারিগর, পাহারাদার প্রভৃতি কাজে নিয়োগ ইত্যাদি।[৩]

সুলতানী আমলের অবসানের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মুঘল সম্রাটগণ সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। তবে সম্রাটগণ ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করায় সকল ধর্ম ও বর্ণের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। জনকল্যাণে শেরশাহের অবদান অসমান্য। তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন করে মধ্যযুগে ভারতের সমাজসেবার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্বল ভূমিকা পালন করে গেছেন। শেরশাহ্ বলতেন, "The essence of royal protection consists in protecting the life and property of the subjects. They (kings) should use the principles of justice and equality in all their dealings with all classes of people. He patronised art and letters and help the poor and the need."[৪]

---

১. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
২. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৬৫
৩. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭
৪. Ishwari Prasad, A Short History of India, P. 219

Dhaka University Institutional Repository

শেরশাহ্ প্রজাদের নিরাপত্তা, তাদের নৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করাই প্রধান রাজ কর্তব্য বলে মনে করতেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। শেরশাহ্ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো-ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ ও প্রজাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রাজস্ব মওকুফ ও সরকারী ঋণ কবুলিয়ত (কৃষকদের থেকে) ও পাট্টা (কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে সরকার) প্রথার প্রচলন, অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনী গঠন এবং অপরাধ দমনে স্থানীয় দায়িত্ব নীতি অবলম্বন, নৈতিক উন্নতি বিধান ও অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে 'মুহ্তাসিব বিভাগ প্রতিষ্ঠা', আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে গুপ্তচর প্রথা প্রবর্তন ও নিরাপত্তা বিধান, যাতায়াত ব্যবস্থা সম্প্রসারণে বাংলায় সোনারগাঁও থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ বিস্তৃত গ্রান্ড ট্রাংক রোডসহ্ অন্যান্য দীর্ঘ ও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ, রাস্তার পাশে ফলবান ও ছায়াবৃক্ষ রোপণ এবং সরাইখানা ও মসজিদ নির্মাণ ও কূপ খনন। প্রায় ১,৭০০ সরাইখানায় হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ব্যবস্থা ছিল, যোগাযোগের সুবিধার্থে ডাক ব্যবস্থার সংস্কার, দুস্থ ও নিঃস্বদের জন্য 'লেংরে ফুকায়া' স্থাপন। প্রতিটি লঙ্গরখানায় বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ৮০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (আশরাফী), আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক রহিত করে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তারে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও মাদ্রাসা) স্থাপন ও ছাত্রদের বৃত্তিদান, স্থানীয় শাসনের জন্য পঞ্চায়েত গঠন, সর্বজনীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সুচিকিৎসার্থে হাসপাতাল স্থাপন, সামরিক সংস্কার ও অশ্ব চিহ্নিতকরণ এবং ঘোড়ার ডাক প্রথা প্রচলন, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতি।

শেরশাহ্ প্রবর্তিত শাসন ও সংস্কার ব্যবস্থা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ঐতিহাসিক Keene বলেন, "No Government, not even the British Government has shown so much wisdom in administration as this Pathan."[১] ড. কে. কে. দত্ত বলেন, "He (Sher Shah) wanted to build his greatness on the happiness and contents of his subjects."[২]

শেরশাহের পর পুনরায় ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল শাসক আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রজা সাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৩] সম্রাট আকবর সমাজ সেবায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, যেমন- কৃষি উন্নয়নে জায়গীর প্রথা বিলোপ সাধন করে সমস্ত জায়গীর খাস করেন, হিন্দুদের তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। এছাড়াও তিনি বহুবিধ কর ও ফি রহিত করেন। যুদ্ধবন্দীদের দাস করার পূর্ব রীতি নিষিদ্ধ ও বিজিত সৈনিকের পরিবারের প্রতি নির্যাতন বন্ধের আদেশ দেন। জমির উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী কর নির্ধারণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কর হ্রাস বা মওকুফ করেন। সকল জাতি ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণীকে একইসূত্রে গ্রোথিত করার প্রচেষ্টা চালান।

সমাজকল্যাণে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর সমাজ সেবায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য দান খয়রাত ইত্যাদি। পত্নী নুরজাহান কর্তৃক শিশু ও নারীকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, বন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সমাজ সেবায় তার অবদান হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি বিধানে বহু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন, নিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা, স্থাপত্য শিল্পে চরম উৎকর্ষতা সাধন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- (ক) আগ্রার তাজমহল (খ) মতি মসজিদ (গ) শাহজাহানাবাদ রাজধানী (ঘ) লালকেল্লা দিল্লী জামে মসজিদ (ঙ) ময়ুর সিংহাসন প্রভৃতি।

আওরঙ্গজেব সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তার গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ- প্রজাদের কল্যাণে ৮০ প্রকার কর ও শুল্ক বিলোপ সাধন, উচ্চ কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি রাজকোষে জমার বিধান বন্ধকরণ, মদ, জুয়া, প্রাতঃকালে সম্রাটের মুখদর্শন, গুণকীর্তন প্রভৃতি অনৈসলামিক কার্যকলাপ রহিতকরণ, কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে বহু রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ হিন্দুদের অধিক পরিমাণে নিয়োগ ও সতীদাহ প্রথা বেআইনী ঘোষণা ইত্যাদি।

---

১. উদ্ধৃতঃ ড. মোহাম্মদ রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২. উদ্ধৃতঃ সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় সমাজকল্যাণ :

মধ্যযুগে বাংলার শাসকগণও সমাজকল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। বখতিয়ার খলজী (১২০১) বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, খানকাহ্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। সিকান্দার শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় আদিনা বড় মসজিদ নির্মিত হয়।[২] গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বহির্বাণিজ্য, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক, ন্যায়বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধিত হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রজাহিতৈষী ও জনদরদী ছিলেন। তিনি রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, লঙ্গরখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে জাতীয়তাবাদী চেতনা (বাংলা) ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামায়ন, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্য বাংলায় অনূদিত হয়। ঐতিহাসিকরা তাঁর আমলকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেন।[৩]

মুঘল আমলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুবেদারগণও বিভিন্ন জনকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইসলাম খাঁ, মীর জুমলা, শায়েস্তা খাঁ প্রমুখ এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, উপাসনালয়, রাস্তাঘাট, স্থাপত্য, সেতু, কূপ, খাল প্রভৃতি নির্মাণ ও খনন করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মন চাউল পাওয়া যেত। তখন মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত।

সুতরাং মুসলিম শাসনামলে সমাজকল্যাণে ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। মোহাম্মদ খালিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "It can safely stated that the Muslim rulers took all possible measures for the material and moral development of the people."[৪] মুঘল ও পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে পরিব্রাজকদের বর্ণনায় অনেক ঘটনা জানা যায়। কর্ণেল স্লিম্যান (Col. Sleeman) শেখ সাদী'র একটি বক্তব্য তাঁর 'Rambles and Recollection' গ্রন্থে উপস্থাপন করে বলেন, "The man who has left behind him great works in temples, bridges, reservoirs, and caravansaries for the public good, not die. And this does apply to the Mughals."[৫]

মধ্যযুগে বেসরকারী সমাজকল্যাণ :

সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ধর্ম প্রচারক, পীর-আউলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে দুস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

ধর্ম প্রচারক ও সূফী-দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্, দরগা বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং এর পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর, দিঘি, কূপ ও খাল খনন, বৃক্ষ রোপনসহ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ইসলামী প্রথা প্রতিষ্ঠান-যাকাত, দান, সদ্‌কা, ফিতরা, ওয়াক্‌ফ, ওশর প্রভৃতিও এক্ষেত্রে পভাব বিস্তার করে।[৬] সূফী ও দরবেশদের মধ্যে বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ, বদরপুরের শাহ মুহাম্মদ রুমী, মহাস্থানের শাহ সুলতান শাহী, আজমীরের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি, পাভুয়ার শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরিজী, দিল্লীর নিজাম উদ্দিন আওলিয়া, সিলেটের শাহজালাল (র.), বিহারের মাখদুম-উল-মুলক, খুলনার খান জাহান আলীর নাম বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। এঁদের জনকল্যাণের গৌরবগাঁথা আজও জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। শায়খ জালাল উদ্দিন তিবরিজী (র.) ভারত উপমহাদেশের সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বপ্রথম পান্ডুয়ায় একটি স্কুল ও একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করে দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের সেবার ব্যবস্থা করেন।[৭] হযরত আলাউল হক (র.) পান্ডুয়াতে লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই পুত্র হযরত কুতুব-উল-আলম সেখানে একটি কলেজ ও একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন।[৮]

---

১. মিনহাজ-ই-সিরাজ, তাবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৬৫
২. আসকার ইবনে শায়খ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮
৩. দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৪. Mohammad Khalid, Welfare State: A case study of Pakistan, Royal Book Co. Karachi, 1968, P. 78
৫. উদ্ধৃতঃ মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৬. উদ্ধৃতঃ মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৭. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং, পৃ. ৯৮
৮. আবদুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিবার, দিল্লী, ১৩৩২ হিঃ, পৃঃ ১৪৩, ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (র.) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বাগেরহাটে খেলাফতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে কল্যাণরাষ্ট্রের (Welfare state) সূচনা করেন। তিনি জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পুকুর ও দিঘি খনন, রাস্ত াঘাট নির্মাণ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন মসজিদগুলো জনকল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। তাঁর অন্যতম ব্যতিক্রমী মসজিদগুলো জনকল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। তাঁর অন্যতম ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছিল সুন্দরবনকে মানুষ বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা।[১] হযরত শাহ্ জালাল (র.) সিলেটে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল তৎকালীন জমিদারদের হাত থেকে অত্যাচারিত মুসলমানদের রক্ষা করা।[২] হযরত শাহ্ আদম (র.) শান্তাহারে একটি বিরাট দিঘি খনন করেন। আদমদিঘি নামে পরিচিত সেই দিঘি আজও শান্তাহারের অন্যতম কীর্তি। নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) এবং খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (র.) এর সমাজসেবা কার্যাবলী এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩] এখনও খাজা বাবার নামে সমাজসেবা পরিচালিত হয়ে থাকে।

মধ্যযুগীয় সমাজসেবায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মানবপ্রেমিকের অবদানও স্বীকৃত। তাঁরাও ধর্মীয় প্রেরণঅয় উদ্বুদ্ধ হয়ে মঠ, মন্দির, চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দিঘি খনন প্রভৃতির মাধ্যমে জনকল্যাণ কার্য পরিচালনা করেছেন। মূলত ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সমাজসেবা কার্যক্রমে একটি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অস্থায়ী সাহায্য নির্ভর ব্যবস্থার চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

আধুনিক যুগ বা ব্রিটিশ আমলের ভারতবর্ষের সমাজসেবা :

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ঐতিহ্যগত ধারার সমাজসেবা (Traditional Social Service) বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে সমাজকল্যাণে এক নতুন অধ্যায় সূচীত হয়। দানশীলতার (Charity) পাশাপাশি মুক্ত যুক্তিবাদী ভাবধারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণের পটভূমি গড়ে তোলে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। তাই ব্রিটিশ শাসিত সময়কেই আধুনিক সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের সূচনাকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বেসরকারী সমাজসেবা :

ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্রীস্টান মিশনারীগণ তাদের সেবা কার্যক্রম শুরু করেন। ১৭৮০ সালে বাংলার শ্রীরামপুরে খ্রীস্টান মিশনারীরা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ধর্মীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁরা বর্ণভেদ প্রথার বিরোধিতা, নারী অধিকার রক্ষা ও চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতার জাগরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালান। তাদের প্রচেষ্টায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করে। সরকারের পাশাপাশি নব্য জমিদার শ্রেণীরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, কুপ ও দিঘি খনন, রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৪]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথক যুক্তিবাদী মানবতাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলে সে প্রেক্ষিতে বিভিন্নমুখী সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এক্ষেত্রে সে সমস্ত মনীষীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন। নারীর নিরাপত্তায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে নারী সমাজকে জঘন্য সামাজিক কুপ্রথার হাত থেকে রক্ষা করেন। রামমোহন রায় আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও কাজ করেন। তৎকালীন সময়ে আর্য সমাজ যুক্তিবাদি আলোচনার আয়োজন, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সাহায্য প্রদান, নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও দান সংগঠনে সাহসী ভূমিকা নেয়। এ সময়ে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনগুলোর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন, নওয়াব আব্দুল লতিফের মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক ঋণ মুক্তি আন্দোলন পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, শোষিতদের শিক্ষা, জাতীয় জাগরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে।

---

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬১, পৃ. ২০৩

২. দেওয়ান মুহাম্মদ নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, দ্রষ্টব্য।

৩. Sayed Athar Abbass Resvi, A History of Sufism in India, Vol-2, New Delhi, 1983, P. 279

৪. সম্পা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্কারক হিসেবে মহিয়সী বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল। তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষায় তিনি বিশেষ অবদান রাখেন এবং সাখাওয়াত গার্লস হাই স্কুল, কলকাতার মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ঐ সময়ে সমাজকর্মমূলক তৎপরতা হিসেবে হাজী শরিয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপকতর ভূমিকা পালন করে।[১]

ব্রিটিশ আমলে সরকারী সমাজসেবা :

ব্রিটিশ আমলে সরকারী পর্যায়ে জনসন্তুষ্টি নীতি এবং হিন্দু-মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর যৌথ প্রচেষ্টা সমাজকর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় নারী, শিশু কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ সংস্কার এবং নারীকল্যাণে রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড বেন্টিংকের উদ্যোগে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লর্ড ডালহৌসির সরকারী সমর্থনে ১৮৮৫ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়। উল্লেখ্য এ দু'টি আইন ছাড়াও ১৮৫০ সালের শিক্ষানবিশ আইন, ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরী স্কুল আইন, ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন, ১৯৩৩ সালের কারখানা আইন, ১৯৩৩ সালের পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন নারী ও শিশু কল্যাণে অবদান রাখে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ড বেন্টিংক এবং লর্ড ডালহৌসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন, ১৯৪১ সালের মাতৃকল্যাণ আইন উল্লেখযোগ্য।[২] এ আইনগুলো শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তা বিধান, মাতৃত্ব সুবিধা প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন, ১৭৮২ সালে হিন্দু সংস্কৃত চর্চার জন্য বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা, এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেন। লর্ড ওয়েলসলি ইউরোপীয়দের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন যা ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিংক কলকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ে এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউট গঠন করেন। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির প্রচেষ্টায় একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ চালু করা হয় ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন কলকাতা বেথুন কলেজ। এছাড়াও সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নয়নে অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ক্যানিং ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিফোর্ড ম্যানশার্ডের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে দক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সমাজকর্মের প্রয়াসে, দক্ষ সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠার জন্য Tata Graduate School of Social Work প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬৬ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এবং সমাজকর্মের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

---

১. এ সম্পর্কিত স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রয়েছে।

২. See details, Narendra Krishna Sinha (ed.), The History of Bengal (1757-1905), Vol.-2, Calcutta, University of Calcutta, 1967, P. 584

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের মৌলিক কাঠামো, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য

* ইসলাম পরিচিতি
* ইসলামের আক্বিদা ও ইবাদাতসমূহের প্রাণ
* ইসলাম ও তাওহীদ
* ইসলামের রিসালাতে বিশ্বাস
* ফিরিস্তাদের প্রতি বিশ্বাস
* তকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ
* নবুওয়াতের সমাপ্তি
* পারলৌকিক জীবন
* সালাত
* সিয়াম সাধনা
* যাকাত
* হজ্ব
* ইসলামের বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পরিচিতি :

ইসলাম আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পন করা, শান্তির পথে চলা, মুসলমান হওয়া। শরীয়াতের পরিভাষায়-আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করেন তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা, রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম ধর্মের মর্ম হল আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আর প্রত্যেক নবী-পয়গম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য থাকার সাথে সাথে উম্মতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন তাই সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম। ইসলাম শব্দটি 'সলম' ধাতু হতে উৎপন্ন। 'সলম' ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে শান্ত হওয়া, বিশ্রামে থাকা, কর্তব্য নিস্পন্ন করা, পূর্ণ শান্তিতে থাকা।[১] এর বুৎপত্তি গত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। কুরআনে এর কয়েকটি পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন-

১। যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব;
২। ইসলামী বিধান;
৩। যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব;
৪। শান্তি অথবা শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন;[২]

সুতরাং ইসলাম অর্থ (১) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা।[৩] (২) শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পনে আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সাথে একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৪]

ইসলাম একটি 'দীন' এবং দীন অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। এই দীনের প্রধান উৎস কুরআন। কুরআনে বিধৃত দীন ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে।

ইসলাম মানব জাতির জন্য চিরন্তন ধর্ম। এর মূল কথা- (ক) আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস (খ) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং (গ) সৎকর্মে (আমালে সালেহ) আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায়ে আল্লাহর সাথে যোগসূত্ররূপে (১) ফিরিস্তাগণ (২) আসমানী কিতাবসমূহ (৩) সকল নবী-রাসূল (৪) আল্লাহর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাকদীর)-এ বিশ্বাস ও উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। আদি পিতা ও নবী হযরত আদম (আ.) হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত কুরআনে উল্লেখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূলগণ পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে উপরিউক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এই তিনের ভিত্তিতে কুরআন সমসাময়িক ইহুদী, খ্রীষ্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিল[৬] এবং এই আহবানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করেছিল। এখনও সে আহবান কার্যকর।

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, ইসলাম একটি দীন এবং দীন শব্দের অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। কুরআনে বিধৃত দীন ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিকতত্ত্ব ইত্যাদি। এটা মানুষের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। উপরে ইসলাম শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর ব্যাপকার্থক হওয়ার আরও একটি প্রমাণ এই যে, ইসলামকে দীন নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত: দীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। দীন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে মিল্লাত ও শরীআত।[৭] আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।" এভাবে কুরআনে আল্লাহ্ ইসলামকে সত্যের দীন, আল্লাহর দীন, এবং মজবুত দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

১. Sayed Amir Ali. The spirit of Islam, Delhi, 1947, P.168.
২. আল-কুরআন, ৮:৬১, ২:২০৮, ৪:৯০-৯১, ১০:২৫, ৫১: ২৫
৩. আল-কুরআন, ২:১১২
৪. বুখারী শরীফ (২য় খন্ড), ৩য় বাব।
৫. আল-কুরআন, ৩:১৮
৬. আল-কুরআন, ৩:১৮, ৪০:৭৮, ১০:৪৭, ২:৬২
৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

দশম হিজরীতে যে আয়াতে আল্লাহ্ দীনের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবার সুসংবাদ শোনান, সেখানে ইসলামকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে 'দীন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[১] ইমাম আবু হানিফার মতে, দীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম এবং শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২]

সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম আকীদা, মৌখিক স্বীকৃতি, ঈমান, আমল, আবার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও। আর উহাদের সবগুলোর সমষ্টির নাম হচ্ছে দীন। এই দীনে রয়েছে- (১) আকীদা (২) ইবাদাত এবং (৩) পারস্পরিক সম্পর্ক (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক)।

মূলত: মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান অনুমোদন করেছেন তাই ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন। অন্যকোন দীন বা জীবন বিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩] মহান আল্লাহ্ তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) ধারণা অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন। কিন্তু যাবতীয় কর্মকান্ডের পথনির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এই শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পারলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (স.) মানব জাতির জন্য এই ইসলাম প্রচার করেছেন। মহান আল্লাহ্ আল-কুরআন নাযিল করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[৪] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ্ এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পরযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সেজন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৫]

'ইসলাম' এর শাব্দিক অর্থ শান্তি। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হল ইসলাম।[৬] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে সাম্য নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ্ ও মানবাত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হল মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে; "হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[৭]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা। এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য দু'টি। আল্লাহর একত্ব ও মহানবী (স.)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান।[৮]

---

১. আল-কুরআন, ৩:১৯, ৯:৩৩, ১১০:২, ৩০:৩০, ৫:৩
২. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), পৃ. ২৯৯
৩. আল-কুরআন, ৩:১৯ ও ৮৫
৪. আল-কুরআন, ৪২:১৭
৫. আল-কুরআন, ৩০:৩০
৬. আল-কুরআন, ২:১১২
৭. আল-কুরআন, ২:১১২
৮. কে আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ.) ছিলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নয়, হযরত আদম (আ.)-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শেষ প্রচারক এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি। এর নাম হয়েছে ইসলাম। হযরত আদম (আ.)-এর পর যত নবী-রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছে, "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, য়া'কুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[১]

মুসলমানগণ শুধু তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)- কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, "আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে: এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।"[২] মুসলমানগণই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এই মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে; মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তাই ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো। মানুষকে সবচেয়ে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানূন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানূন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে।[৩] যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। আল্লাহ বলেছেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিযক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"[৪] এজন্যই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়।[৫] সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদাত করবে, তাঁর নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[৬] এভাবে আল্লাহ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। ইসলাম শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে যার মূলমন্ত্র হল মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এই মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য

---

১. আল-কুরআন, ২:১৩৬
২. আল-কুরআন, ৩৫:২৪
৩. কে, আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫
৪. আল-কুরআন, ১৭:৭০
৫. আল-কুরআন, ২:৩০
৬. আল-কুরআন, ৪:৪৮

করা হয়। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধক্ষম নয় যথা; অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না। বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন, "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।"[১] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না।[২] উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করতে হয়।[৩] যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[৪]

পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এসকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।

সুতরাং ইসলাম যেমন একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সজ্জায়িত করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তজার্তিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে ঐশীবাণী এলেও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ জীবন বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৫] মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই কুরআন থেকে বাদ দেয়া হয় নি। এ কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয় নি। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান সর্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের অপরাপর স্তরগুলির এক অবিভাজ্য পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিতরূপ। ইসলাম পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। কুরআন অনুসৃত নীতিমালার বিপরীতে কোন মৌলিক আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকে না কারও হাতে। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্থ করেছে। সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখন্ডতা, পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (স.)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবে ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।[৬]

ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তাওহীদ ভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনও আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবর্হিভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলামী আইন-কানূনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের মৌল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইসলাম শুধু সাধু-পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনীষীদের কথাই বলে না, বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে পাপ-পূন্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[৭]

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের আন্তর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে সম্পর্কে অবহিত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যে কোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। সৈয়দ

---

১. আল-কুরআন, ৮:৫৮
২. আল-কুরআন, ৯:৬
৩. আল-কুরআন, ৮:৭২
৪. আল-কুরআন, ৭৬:৮
৫. আল-কুরআন, ৫:৩
৬. মুজিবুর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ- সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ১০৮
৭. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২৫

আমীর আলী বলেছেন, "সর্বকালের ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিসমূহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, মনুষ্য হৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি এসব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী।" তিনি আরও বলেছেন: "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালের জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১] গিবের ভাষায়; "বাস্তবিক ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী, এটা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। .... ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তর সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"[২]

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এতে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশের কোন অবকাশ নেই। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদিগের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৩]

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৪] যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মীমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিওনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, আংশিক বর্জন করা এবং মধ্যপথ ধরে চলাও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী একজন কাফিরের কাজ বলে বিবেচিত এবং তার জন্য অপমানজনক শাস্তির বিধান রয়েছে।[৬] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার শামিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্তক করে দেওয়া হয়েছে: "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদিগের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনমতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।"[৭]

ইসলামের আকীদা ও ইবাদাতসমূহের প্রাণ :

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যে সব প্রধান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে (১) আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, ক্ষমাশীলতা ও পরম প্রেমের প্রতি বিশ্বাস; (২) দান ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব; (৩) রিপু দমন; (৪) যিনি সব কল্যাণ ও নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং (৫) পরলোকে মানুষের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহির ধারণা।[৮] আর ইসলামী আকীদা ও ইবাদাতসমূহ একদিকে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কে সুদৃঢ় করার মাধ্যম ও উপায়, অন্যদিকে তা উক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে জীবনের কার্যাবলীকে সুমহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যের ধারকও বটে। এরূপ কার্যাবলী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করে। মোট কথা, ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আত্মার শান্তি লাভ, অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান।

---

১. Sayed Amir Ali, Opcit, P.175.
২. Gibb, Whither Islam হতে উদ্ধৃত, রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির বগুড়া, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১০
৩. আল-কুরআন, ৪:৫৯
৪. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬
৫. আল-কুরআন, ২: ২০৮
৬. আল-কুরআন, ৪:১৫০-৫১
৭. আল-কুরআন, ২:৮৫
৮. Sayed Amir Ali, Op.cit, P.176.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও তাওহীদ :

ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদই বুনিয়াদী আকীদা। তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য হল আল্লাহ এক, তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত; তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও পালনকর্তা; জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁরই অধিকারে রয়েছে; তিনিই সকল প্রয়োজন পুরণকারী, তিনিই ইবাদত পাবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তারই নিকট চাইতে হবে। তার কোন শরীক নেই। তাওহীদ সুক্ষ্ম ও স্থুল সর্বপ্রকারের শিরকের সম্পূর্ণ বিরোধী। তা সর্বপ্রকার শিরকের বাতিল ঘোষণা করে। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করার এবং মাথা উচু করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সাহস সৃষ্টি করে। তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিশৃংখলা হতে মুক্ত হয়ে শৃংখলা ও সংযমের গুণে বিভূষিত হয়। তাওহীদে বিশ্বাস বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাকে মজবুত করে। তাওহীদে বিশ্বাসের কল্যাণে মানবাত্মা জীবনের সম্ভাবনাসমূহ সমন্ধে তাওয়াক্কুল ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। আল-কুরআনের মূল সূর হল আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের প্রচারকে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন। রাসূল (স.) তাঁর মক্কা জীবনের তেরটি বছরে বিশেষত তাওহীদের প্রচার করেছেন। আল-কুরআন আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সৃষ্টিকে ইবাদাতে শরীক করাকে শিরক বলেছে এবং শিরককে জঘন্য পাপাচাররূপে নির্দেশ করেছে। অনুরূপভাবে তা মুশরিক ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার জন্য জান্নাত হারাম এ ঘোষণা দিয়েছে।[১]

তাওহীদের আকীদা ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে, যা 'আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম গুণবাচক) নামে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল গুণবাচক নামের মধ্যে রাব্ব (প্রতিপালক), হায়াত (প্রাণ), ইলম (জ্ঞান), কুদরত (শক্তি), ইরাদা (ইচ্ছা), সাম (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), বাচন (কালাম) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রেম আল্লাহর একটি বিশিষ্ট গুণ। কুরআনে তাই আল্লাহকে বলা হয়েছে প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) বলে। এসব গুণ অনাদি, অনন্তকাল ধরে আল্লাহর অন্তঃসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি আদি স্রষ্টা, বিশ্বজগতের চালক ও নিয়ন্তা। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মধ্যে কাজ করেন। তিনি একাধারে জগতের অন্তর্গত ও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ তিনি জগতে যেমন উপস্থিত তেমনি উপস্থিত জগতের বাইরেও।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে যে উচ্চ ও মহান ধারণা কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, তার তুলনা অন্য কোন ভাষায় নেই। অত্যন্ত কাব্যময় ও চিত্ত আলোড়নকারী অনুচ্ছেদগুলির বিরাম-বিচ্ছেদহীন মূলসুর হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, তার বিমূর্তা, মহিমা ও ক্ষমাশীলতা। জীবন, জ্যোতি আর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহে যার শেষ নেই। কিন্তু আগা-গোড়া কোথাও অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। আবেদন রাখা হয় শুধু মানুষের অন্তরের বিবেকের কাছে, তার সহজাত যুক্তির কাছে।[২]

"বল! তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ, কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি জন্ম দান বা জন্মগ্রহণ করেন না, আর কিছুই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।"[৩]

"তিনিই আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যাতে করে জাহাজসমূহ তাঁর আদেশের মধ্য দিয়ে চলতে পারে; যাতে করে তোমরা তার কৃপা ভিক্ষা করতে পার এবং তোমরা হতে পার কৃতজ্ঞতা ভাজন। আর তিনি তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সমগ্র বস্তুকে। দেখ, এর মধ্যে রয়েছে যথার্থ নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"[৪]

"এক ইলাহ; তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; তিনিই পরম দয়ালু ও দাতা। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে আর দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে, আর সাগরের বুকে চলমান মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্যবাহী জাহাজের মধ্যে; আর আসমান থেকে আল্লাহর প্রেরিত বৃষ্টির পানিতে যা মৃত মৃত্তিকা আর মৃত্তিকার বুকে বিচরণকারী সব রকম জীব জন্তুকে আবার সঞ্জীবিত করে তোলে; আর আসমান ও যমীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী বায়ূ ও মেঘের সঞ্চালনে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। তবুও কতক মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ বলে অপরকে গ্রহণ করে আর আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে।"[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৩১:১৩; ৬:৬৮; ৫:৭২
২. Sayed Amir Ali, Op.cit, P.176.
৩. আল-কুরআন, ১১২ : ১-৫
৪. আল-কুরআন, ৪৫: ১২-১৩
৫. আল-কুরআন, ২:১৬৩ - ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই-চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনের সবকিছু তো তাঁরই জন্য। এমন কে আছে তার কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? তিনি জানেন যা আগে ঘটে গিয়েছে আর যা ঘটবে পরে; কিন্তু তিনি না চাইলে তাঁর জ্ঞানের কণামাত্রও তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর কুরসী বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তিনি আনায়াসেই করে থাকেন।"[১]

"তিনিই তো দিবসের উপর রাত্রির পর্দা পরিয়ে দেন আর দ্রুত এই অনুক্রম চলতে থাকে। আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকা তাঁরই আদেশের বশবর্তী। জেনে রেখো, গোটা সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তাঁরই। সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ বড়ই বরকতময়।"[২]

"তিনিই তো তোমাদেরকে দেখান বিজলী তোমাদের ভীতি ও আশা সঞ্চারের জন্য আর তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেস্তাগণ উভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন। তবুও ওরা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে।"[৩]

"তিনিই সঠিকভাবে আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন; ওরা যা কিছু তাঁর সঙ্গে অংশীদার করে তিনি তা থেকে কত মহান! তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ক্ষুদ্র শুক্র কণা থেকে, আর দেখ! সে একজন প্রকাশ্য বিতন্ডা সৃষ্টিকারী। আর তোমাদের জন্য তিনি গবাদি পশুও সৃষ্টি করেছেন,------ পশুগুলিকে যখন সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন আর প্রভাতে চরাতে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। ---- তিনি রাত্রি আর দিন, সূর্য আর চন্দ্র তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আর তারকারাজীও তারই বিধানে ক্রিয়াশীল আছে।"[৪]

"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে চাও, তবে তা হিসেব করে শেষ করতে পারবে না; আল্লাহ বাস্তবিক ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা যা গোপন কর, তার সবই আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং এগুলোকে তো সৃষ্টি করা হয়, মৃত ও প্রাণহীন।"[৫]

"আল্লাহ সব জিনিসের স্রষ্টা, সবকিছুর অভিভাবক। তিনিই আসমান ও যমীনের চাবির মালিক।"[৬]

"তোমার কণ্ঠস্বর উচু করার প্রয়োজন নেই, কারণ গোপন ফিসফিস আর তারচেয়েও বেশী গুপ্ত কথা তিনি জানেন। বল, আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার? বল, আল্লাহর; করুণা তিনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।"[৭]

"আল্লাহ তো শস্যকণা আর আঁটি ভেদ করে অঙ্কুরের পথ নির্গম করেন। তিনি জড় থেকে জীবন আবার জীবন থেকে জড়কে নির্গত করেন। ইনিই তো তোমাদের আল্লাহ। তারপরেও তোমরা পথহারা হয়ে কোথায় যাচ্ছ? অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো ফুঁটিয়ে তোলেন তিনিই; তিনি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের হিসাবের জন্য স্থাপন করেছেন; এ হচ্ছে মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানবান আল্লাহর অলঙ্গ নিয়তি।"[৮]

"ইনি তো হচ্ছেন আল্লাহ্, তোমাদের রব! তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই; তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তারই ইবাদাত কর, কারণ তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[৯]

"দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পায় না কিন্তু তিনি সব দৃষ্টিকেই দেখতে পান, এবং তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"[১০]

"বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই; আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম।"[১১]

---

১. আল-কুরআন, ২: ২২৫
২. আল-কুরআন, ৬:৫৪
৩. আল-কুরআন রাদ, ১২ - ১৩
৪. আল-কুরআন, ৪ : ৩-১১
৫. আল-কুরআন, ৪৫: ২১
৬. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৩ - ৬৪
৭. আল-কুরআন, সূরা-আনআম, ১২
৮. আল-কুরআন, আনআম, ৯৫-৯৬
৯. আল-কুরআন, ১০২
১০. আল-কুরআন, ১০৩
১১. আল-কুরআন, ১৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি কি দেখ না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা, এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকূল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আল্লাহর অধীনেই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহর সমীপেই ফিরে যেতে হবে।"[১]

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক পরম দয়াশীল ও করুণাময়, শেষ দিনের মালিক, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, কেবল তোমরই সাহায্য চাই। তুমি আমাদের সরল-সহজ পথে চালাও তাঁদের পথ যাঁদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, যারা পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত তাদের পথে নয়।"[২]

"তারাই পূণ্যবান, যারা আল্লাহ প্রেমে নিজেদের রিযিক থেকে মিসকীন, ইয়াতীম আর বন্দীদেরকে আহার করায়, আর বলে আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাওয়াই, তোমাদের থেকে পুরস্কার বা শুকরিয়া আশা করি না।"[৩]

"মানুষে মানুষে বিচার করবে সত্যের মাপকাঠি দিয়ে; আর রিপুর অনুসরণ কর না, কারণ রিপু তোমাকে আল্লাহর পথে বিভ্রান্ত করতে পারে।"[৪]

"অবশ্যই আমার রব হারাম করেছেন গোপন ও প্রকাশ্যে সব রকম অশ্লীল কাজ, পাপকর্ম, আর অসংযত বিরোধীতা।"[৫]

"তোমাদের রবকে বিনীতভাবে আর নিরবে আহবান কর; যারা বাড়াবাড়ী করে তাদের তিনি ভালবাসেন না। আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর আবার সেখানে বিপর্যয় ঘটিও না, আর ভীত চিত্তে তাঁকে আহবান কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ করুণাকামী লোকদের খুবই নিকটবর্তী।"[৬]

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। সে তার পূণ্য কর্মের পুরস্কার পাবে, আর দুষ্কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। হে আমার রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা অপরাধ করি; সে জন্য আমাদের শাস্তি দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে ভার চাপিয়েছিলে, তা আমাদের উপর দিও না। হে আমাদের রব! আরও যা আমাদের বহন করার শক্তি নেই, তাও আমাদেরকে বহন করতে দিও না; আমাদেরকে পাপমুক্ত কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি করুণা কর।"[৭]

এভাবেই চলছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের বর্ণনা। আর মহানবী (স.) এর প্রচারের বিষয়বস্তুও এই। বৃহত্তর জগত আর অধিকতর অগ্রগামী মানব সমাজের প্রতি এই ছিল তাঁর দাওয়াতের ভাষা। বিশ্ব মানবের মহান প্রেমাকুল চিত্তের কাছে সত্য, বিশুদ্ধ আর পবিত্রের জন্য কঠোর সাধনা ও ব্যাকুলতার কাছে এ বাণী ছিল উচ্চ পর্যায়ের এক কোমল আবেদন। এ বাণী আবেদন করছে মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে, তাঁর অন্তর চেতনা ও তার নীতিবোধের কাছে; আর প্রমাণ করছে, প্রকাশ করে দেখাচ্ছে পৌত্তলিক বিশ্বাসের অস্বাভাবিকতা। এমন কোন অধ্যায়ই বলতে গেলে নেই যাতে আল্লাহর ক্ষমতা, দয়া আর একত্ব সম্পর্কে দু-একটি প্রদীপ্ত অংশ না আছে। ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সাদরে অঙ্গীভূত আল্লাহর ক্ষমতা, দয়া, একত্ব ও স্নেহ কোমলতা সম্পর্কিত এই উপদেশমালা ইসলামী জগতের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কর্তব্য হিসেবে নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

রিসালাতে বিশ্বাস :

রিসালাতে বিশ্বাস ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকীদা। আল্লাহর সত্তা অদৃশ্য। তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রচারের জন্য কোনও দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন (আল্লাহর) দীনের প্রচারের উক্ত মাধ্যম। তাঁর আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণীর (অহী) সাহায্যে লোকদের চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে সঠিক ও নির্ভুল পথে আনয়ন করেন। একথা সত্য যে, ইসলামে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্ত াকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মানবীয় বুদ্ধিকে জ্ঞান লাভের ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের একমাত্র উৎস বলে নির্দেশ করা হয়নি, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সুক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম উৎস হচ্ছে অহী, নবুওয়াত ও রিসালাত।[৮]

---

১. আল-কুরআন, আন-নূর, ৪১-৪২
২. আল-কুরআন, আল-ফাতিহা, ১-৭
৩. আল-কুরআন, আদ্ দাহর, ৮-১০
৪. আল-কুরআন, আস্সাদ, ২৬
৫. আল-কুরআন, আল-আরাফ, ৩৩
৬. আল-কুরআন, আল আরাফ, ৫৫-৫৬
৭. আল-কুরআন, আল আরাফ, ২:২৬১-৬৩
৮. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র আল্লাহ্ প্রেরিত অহীর সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়াঙ্গম ও উপলব্ধি করতে পারে এবং পাপাচার, অন্যায়, ফ্যাসাদ ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনাচার সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল মানব জাতির হিদায়াত এবং তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথনির্দেশ। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন সমাজ হতে গোমরাহী ও সর্বপ্রকার অনাচার দূর করার জন্য, লোকদেরকে আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে; পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিণতির সাথে সম্পর্কিত অহীর মারফত প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পদকে তাদের নিকট পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে যে সকল মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয় তৎসম্বন্ধে তাকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। উক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও বুনিয়াদী তথ্য আমাদের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ভান্ডারে নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলই লোকদিগকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।[১] দীনের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণ নিজ হতে কিছুই বলেন না, বরং তাঁরা কেবল আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রচার করেন।[২] রিসালাতে বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র শিক্ষা ও হিকমাতের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

ফিরিস্তাদের প্রতি বিশ্বাস :

ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়াও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে ফিরিস্তাদের সম্পর্কে। জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল, আযরাঈল সহ্ অসংখ্য ফেরেস্তায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনি (আল্লাহ্) স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্দেশসহ্ ফিরিস্তাদেরকে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।[৩] "---- বরং সৎকাজ হ্ল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং ফিরিস্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর।"[৪]

ফিরিস্তাদের মধ্যে পদমর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কাজই হ্ল আল্লাহ্র হুকুম তামিল করা এবং আল্লাহ্র প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। এছাড়া তাঁরা নিয়োজিত থাকেন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে। এঁরা মানুষের মত মাটি থেকে সৃষ্ট নয়, সৃষ্ট আলোক দ্বারা। এদের মধ্যে কোন লিঙ্গ ভেদ নেই এবং কোন রকম পাপও তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

আল্লাহ্র আদেশ পালন, প্রশংসা জ্ঞাপন এবং মানুষের কল্যাণ বিধান ফিরিস্তাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হলেও তিনি সরাসরি কিছু করেন না। আল্লাহ্র নির্দেশে ফিরিস্তাগণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্যে রত থাকেন এবং নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে এবং পৃথিবীর বিবর্তন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশকে মেনে চলেন এবং সে সব নির্দেশকে কার্যকর করেন।

আদিতে ফিরিস্তাদের শিরোমনি ছিল ইবলিস। সে আল্লাহ্র প্রতি খুবই অনুগত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশে সব ফিরিস্তা মানুষকে সিজদা করলেও ইবলিস তা করল না। সে নিজেকে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরী সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় মনে করত। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল। বহিস্কৃত হল বেহেস্ত হতে এবং মানুষের ঈমান নষ্ট করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল।[৫]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শুভ-অশুভ এ দু'টি দ্বন্দ্ব বর্তমান। শুভশক্তির পরিচালক ফিরিশতাগণ আর অশুভ শক্তির চালক শয়তান। ফিরিশতাগণ মানুষকে অশুভ আচরণ থেকে বিরত রাখে এবং শুভ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এটা সত্য যে, এ সব অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সত্তা আল্লাহ্র সন্তান নয়, এঁরা আসলে তাঁর দূতস্বরূপ। এঁরা আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ এবং তাঁর প্রতি অনুগত। আল্লাহ্ এঁদেরকে তাঁর সৃষ্টি বিশ্ব শাসনে নিযুক্ত করেন। নিজেদের বিচার বুদ্ধি মত স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। এরা নিজেদের প্রণীত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা আল্লাহ্র কাছে পেশ করতে পারে না। এমনটি এরা মানুষের হয়ে আল্লাহ্র কাছে কোন সুপারিশও করতে পারে না। তাই মহানবী (স.) ফিরিস্তাদের উপাসনা করাকে এবং তাদের আল্লাহ্র সঙ্গে যুক্ত করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

---

১. আল-কুরআন, ১৬:৩৬
২. আল-কুরআন, ৫৩: ৩-৪
৩. আল-কুরআন, ১৬ : ২
৪. আল-কুরআন, ২: ১৭৭
৫. আল-কুরআন, ২: ৩০-৩৭

তিনি জানিয়েছেন যে, এসব ফিরিস্তা আমাদের চারদিকেই আছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছে। তাঁরা আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করছেন, তারা প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কর্মের পূর্ণ তালিকা রক্ষা করেন। মৃত্যুর পর আমাদের যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন তারা পৃথিবীতে আমাদের সব প্রকাশ্য ও গোপন কৃত কর্মের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "দু'জন লিখক ফিরিস্তা মানুষের ডান ও বাম পাশে বসে প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছে। এমন কোন শব্দ তাঁরা মুখে উচ্চারিত হয় না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন সদা উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওযূদ না থাকে। সেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এই অবস্থায় আসবে যে, তার সাথে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষ্যদাতা ফিরিস্তা বর্তমান থাকবে।"[১]

তাকদীর বা ঐশীনির্বন্ধ :

ইসলাম এমন এক পরম বুদ্ধিমান সত্তার উপস্থিতি স্বীকার করে যিনি সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেন। সেই বুদ্ধিমান পরমসত্তাই আল্লাহ্। একমাত্র আল্লাহ্ই প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই আদি সক্রিয় কারণ। তাই আল্লাহর ইচ্ছার কাছেই জগতের সব ব্যক্তি, বস্তু ঘটনাকে নির্দেশ করতে হবে। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রিত সত্তা হতে পারে না কারণ, তাহলে জগতে যত মানুষ আছে, ঠিক ততটি আদি কারণ স্বীকার করতে হয় এবং তাতে করে আল্লাহর ক্রিয়াপরতাকে সীমিত ও বিঘ্নিত করা হবে। কিন্তু ইসলামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তা পরম ঐশী শক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীনতার সংযোগ ও সমন্বয় সাধনে সক্ষম। ইসলামের মতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই হল আল্লাহর নির্দেশ বা বিধান। আর প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এ সব প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক কার্যকারণ অগ্রসর হয়ে থাকে। মানুষ প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তার কার্যকলাপ কতিপয় বাহ্য ও আন্তর নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও মানুষ তার সীমিত অস্তিত্বের আওতায় তার কর্ম ও আচরণের কর্তা। সে একটি নৈতিক সত্তা, আর সুনীতি ও দুর্নীতির পার্থক্য করা এবং স্বেচ্ছায় ভাল কিংবা মন্দ কর্মপন্থা নির্বাচন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।[২] মানুষ যে কর্মপন্থাকে শুভ ও সঙ্গত বলে নির্বাচন করে, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এর জন্য আল্লাহ্ নয়, সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ কাউকে এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে যা ভাল উপার্জন করে সেটা তারই এবং সে যা মন্দ উপার্জন করে সেটাও তারই।"[৩]

মানুষ তার কার্যবলীর জন্য এবং তার শক্তির সদ্ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী। সে ইচ্ছা করলে যেমন পারে উত্থাপন করতে তেমনি পারে অধঃপতিত হতে। কুরআনের মতে, মানুষ সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সে একটি স্বাধীন দায়িত্বশীল কর্তব্য এবং নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা।[৪] প্রত্যেক মানুষ জন্মায় স্বাধীন ও নিষ্পাপ হয়ে এবং একটি নৈতিক কাঠামো নিয়ে। কিন্তু জন্মের পর তাকে নানা রকম কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে তাঁর নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকশিত করতে হয়। মানুষের নিজস্ব আচরণই তাকে দোজখে কিংবা বেহেস্তে নিয়ে যাবে এবং তার কোন আচরণই তকদীর বা অদৃষ্টের ফল নয়, কিংবা সে বেহেস্ত বা দোযখে যাওয়ার কোন অনিবার্য ডিক্রী নিয়ে জন্মায় না। তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তারই কর্ম ও আচরণ দ্বারা। তাই আল্লাহ্ বলেছেন,"যে সৎ পথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে। আর যে বিপথে চলে সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তা করে। একের বোঝা অপরে বহন করবে না। সর্তককারী না পাঠিয়ে আমি (কোন জাতিকে) শাস্তি প্রদান করি না।"[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৫০ : ১৭-২১
২. S. Rahman, An Introduction to Islamic Culture and philosophy, Mullick Brothers, Dhaka-1963, P.52.
৩. আল-কুরআন, ২: ২৮৬
৪. আল-কুরআন, ৪২ : ১১১ ও ৩০
৫. আল-কুরআন, ১৬ : ১৫

"জেনে রেখো, যতদিন পর্যন্ত কোন জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থারও পরিবর্তন করেন না।"[১]

সুতরাং দেখা যায় যে, জগত একটি আত্ম গঠনের স্থান। এখানে ভাল-মন্দ উভয় পথই রয়েছে। এ দু'য়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মানুষের। আর মানুষ তা নির্ধারণ করবে প্রজ্ঞার সাহায্যে। জীবন মানুষকে কাজ করার এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করে। একমাত্র কর্মই মানুষের উত্থান কিংবা পতনের জন্য দায়ী। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্তি কিংবা অধঃপতন মানুষের নিজেরই কর্মফল। তাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনকে ইসলাম দেখে এমন অসীম শক্তি হিসেবে, যা কোন রকম অনতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি স্বীকার করে না।

নবুওয়াতের সমাপ্তি :

নবুওয়াতের চূড়ান্ততায় বিশ্বাস ইসলামের অপর একটি মৌল উপাদান। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও অনুভূতিতে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রাচীন বাইবেলে নতুন নবীর আগমনের পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু কুরআনে তা নেই। কুরআনে বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর তরফ হতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণ মুহাম্মদ (স.)-এ সমাপ্তি হয়েছে।[২] মহানবী (স.) স্বয়ং বলেছেন,"যখনই কোন নবী পরলোক গমন করেছেন, তারপর অবতীর্ণ হয়েছেন অন্য একজন। কিন্তু আমার পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না।"[৩]

ইসলামের এই নির্দেশ নিয়ে মতদ্বৈততার কোন অবকাশ নেই। একে যে-ই অন্যভাবে বা অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করবে, সে-ই পরিগণিত হবে অবিশ্বাসী বলে।[৪] মহান আল্লাহ যুগে যুগে পথহারা দিগভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন এ ধরাধামে। আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সুসংবাদ কিংবা সতর্ক করার জন্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাও ছিল অন্যান্য নবীর পালিত সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বেরই অংশ, যদিও এখানে এসে নবুওয়াত উপনীত হয়েছে তার শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-পয়গাম্বরের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে যে ধর্মীয় সত্য বা ভাবাদর্শ প্রেরণ করেছেন এবং যা নিয়ে ধর্মবিশ্বাস গঠিত, তাই পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা অর্জন করেছে শেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এ। আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-এর উপর দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন এজন্য যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির সবচেয়ে মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।[৫]

মহানবী (স.) যে বাণী বহন ও প্রচার করেছিলেন, তা ছিল পৃথিবীতে নবী-পয়গাম্বরদের শিক্ষা। আর এ বাণীই সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনে, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।'[৬] শেষনবী (স.) এর অমীয় বাণী ও শিক্ষা অতীতের ন্যায় আজও সজীব এবং তা চিরভাস্কর হয়ে থাকবে মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস ও প্রাণ শক্তি হিসেবে।

পারলৌকিক জীবন :

ফিরিশতায়, ভাল-মন্দ বিষয়ক তকদীরে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দেয় এবং তাকে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে। এতদ্বারা মানব জীবন উদ্দেশ্য বিহীন একটি চলন্ত তরী আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বা অস্তিত্ববাদীদের ধারণা বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না?"[৭] ইসলামে মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত রয়েছে। যা আখিরাত বা পরকালের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা গড়ে উঠেছে একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। সে হচ্ছে পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে, আর ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ নির্ভর করবে স্রষ্টার আদেশ কতখানি কী প্রকারে পালন করেছে তার উপর। এতদসত্ত্বেও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম আর তার সৃষ্টি জীবের উপর তা সমভাবেই বর্ষিত হবে। এই কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপরই ইসলামের সমস্ত পারলৌকিক জীবনের ধারণাটি আবর্তিত হচ্ছে। আল-কুরআনের বহু আয়াতে কিয়ামাত বা শেষ দিবসের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে

---

১. আল-কুরআন, ১৩ : ১৯
২. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০
৩. বোখারী শরীফ (১ম খন্ড), পৃ. ৪১৯
৪. S. Mahmudunnasir, Islam: Its concepts and History, New Delhi, 1981, P. 52.
৫. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
৬. আল-কুরআন, ৫ : ৩
৭. আল-কুরআন, ২৩ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহ সব মানুষের বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা তিরস্কৃত করবেন। তারও আগে কবরে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে আত্মাকে। মুনকার ও নকির এই দু'ফিরিস্তা হাজির হবেন কবরে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন তার ইহজাগতিক কৃতকর্ম সম্পর্কে। কেবলমাত্র নেক ব্যক্তিগণই পারবেন সঠিক উত্তর দিতে। বিশ্বাসীগণ নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করবেন শান্তি ও সুসুপ্তিতে; আর অবিশ্বাসীগণ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তার পার্থিব জীবনের আমলনামা। পূণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ডান হাতে[১] আর পাপাত্মাদের বাম হাতে[২] এবং এর ভিত্তিতেই আল্লাহ সকলের বিচার করবেন।

পরকালে নেককার লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বদকার লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি। কুরআনে বেহেস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে পাহাড়, নদী, ছায়াময় বৃক্ষ ও প্রীতিদায়ক জলবায়ূ পরিবৃত একটি নয়নাভিরাম উদ্যান হিসেবে।[৩] আর দোযখকে (জাহান্নামকে) চিত্রিত করা হয়েছে একটি উত্তপ্ত বিভীষিকাময় স্থান বলে। নেককারগণ পাবে বেহেস্তের চির শান্তি, আর পাপাত্মাগণ ভোগ করবে দোযখের অসহ্য যন্ত্রণা। বেহেস্তের অধিবাসীগণ থাকবেন এক অত্যন্ত প্রীতিকর ও মনোরম পরিবেশে এবং তারা উপভোগ করবে সুখ। তাদের মুখে ভেসে উঠবে আনন্দের ছায়া এবং তাঁরা পরম তৃপ্তি লাভ করবেন। তাদের পরিশ্রম থেকে।[৪] তারা কোন অলস আলাপচারিতা শুনবে না। কোন মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করবে না।[৫] নিস্ফল কোন কিছুতেই তারা জড়িত হবে না, বরং পেতে থাকবেন শুধু শান্তি আর শান্তি।[৬] তাদের স্বাগত জানানো হবে শান্তির বার্তা দিয়ে।[৭] "ফিরিস্তাগণ তাদেরকে স্বাগত জানাবে এই বলে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনারা এসেছেন এক আনন্দময় পরিবেশে সুতরাং প্রবেশ করুন এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করুন।"[৮] তারা গরম বা ঠান্ডায় কোন ক্লান্তিকর অনুভূতি বোধ করবেন না।[৯] আল্লাহ তাদের বিশুদ্ধ পানীয় প্রদান করবেন।[১০] তারা বাগান ও ঝর্ণা পরিবৃত অবস্থায় বসবাস করবেন।[১১] কোন রকম দুশ্চিন্তা বা অবসাদ তাদের থাকবে না। তারা পরিপূর্ণ আরাম ও আনন্দের সুরভী উপভোগ করবেন।[১২]
"তারা অভিভূত থাকবেন পরম উল্লাস বা আনন্দঘন অনুভূতিতে।"[১৩] "তাদের মুখমন্ডলে অভিব্যক্তি ঘটবে প্রশান্তির এবং তাদের পরিবেশন করা হবে কস্তুরীর মোড়কে আঁটা বিশুদ্ধ পানীয়।"[১৪] তারা তখন অবস্থান করবেন এক পরম প্রশান্তি ও আনন্দের রাজ্যে এবং তখন তারা বলবেন,"সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের বসবাসের জন্য প্রদান করেছেন এ পরমানন্দের বাগান।"[১৫]

অন্যদিকে দোজখের শাস্তি কেমন কঠোর হবে এ ব্যাপারে কুরআনে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পাপীগণ যখন যন্ত্রণা ভোগ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, শাস্তি বিধানে তিনি কঠোর।[১৬] তাদের ফুটন্ত পানি পরিবেশন করা হবে। সেই পানিতে তারা চুমুক দিবে বটে কিন্তু সহজেই তা গিলতে পারবে না।[১৭] "শুধু ফুটন্ত গরম পানি ছাড়া ঠান্ডা কোন কিছুই তারা পাবে না। তাদের দেয়া হবে এক ধরনের শুকনো তেতো ও কন্টকময় তৃণ জাতীয় খাদ্য।"[১৮] এখানে"যেমন থাকবে না কোন পুষ্টি তেমনি তাতে ক্ষুধাও নিবৃত হবে না। পাপীদের এ সঙ্গে শৃঙ্খলিত অবস্থায় যখন বন্দী করে রাখা হবে, তখন তারা ছটফট করতে থাকবে অসহ্য যন্ত্রণায় এবং কামনা করতে থাকবে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছে আসবে না।[১৯]

---

১. আল-কুরআন, ১৭ : ১৪
২. আল-কুরআন, ৬৯ : ১৯-২৫
৩. আল-কুরআন, ১৩ : ৩৫
৪. আল-কুরআন, ৮৮: ৯-১০
৫. আল-কুরআন, ৭৮ : ৩৬
৬. আল-কুরআন, ১৯ : ৬৩
৭. আল-কুরআন, ২৫ : ৭৬
৮. আল-কুরআন, ৩৯ : ৭৪
৯. আল-কুরআন, ৭৬ : ১৪
১০. আল-কুরআন, ৭৬ : ২২
১১. আল-কুরআন, ১৫ : ৪৬
১২. আল-কুরআন, ৫৬ : ৯০
১৩. আল-কুরআন, ৭৬ : ১২
১৪. আল-কুরআন, ৮৩: ২৫-২৭
১৫. আল-কুরআন, ৩৯ : ৭৫
১৬. আল-কুরআন, ২ : ১৬৬
১৭. আল-কুরআন, ১৪: ১৭-১৮
১৮. আল-কুরআন, ৮৮ : ৭ - ৮
১৯. আল-কুরআন, ২৫ : ১৪

ইসলামে বেহেস্তের সুখ-শান্তি ও দোজখের দুঃখ-কষ্টের যে ধারণা পেশ করা হয়েছে সে ধারণার সঙ্গে গুনাহ্ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর ধারণাও ইসলামের একটি অন্যতম দিক। এ বিষয়েও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এমন মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনও গুনাহ্ করে বসে এবং অতপর সে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। আর এটাই হচ্ছে তার রহমত ও মাগফিরাতের দাবী। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা তার জন্য সব সময় খোলা থাকে এবং আল্লাহ্ তাওবাকারীদিগকে ভালবাসেন।

সালাত :

ইসলামে সালাত বা নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত বা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র করে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় চেতনা মাত্রই নিজের অপূর্ণতা সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি এবং জগতের সাথে নৈতিকভাবে যুক্ত ও জীবন সংগ্রামে মানুষের সহায়তা প্রদানকারী এক অধিকতর শক্তিশালী সত্তার উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে বুঝায়। এই অনুভূতিই মানুষকে চালিত করে সেই সত্তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার কাজে এবং সেই সত্তার প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে। প্রার্থনা বলতে উল্লেখিত অনুভূতিসমূহের প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে বুঝায়। যথার্থ অর্থে ইসলামী প্রার্থনা আল্লাহর ও মানুষের মধ্যে এক ধরণের যোগাযোগ স্বরূপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হিসেবে প্রার্থনার মূল্য সব মহলে স্বীকৃত। ইসলামী প্রার্থনা খুবই সহজ। উইলিয়াম হান্টার বলেছেন,"ইসলামের একটি গৌরব এই যে, এর উপাসনালয়সমূহ মানুষের হাতের তৈরী নয় এবং আচরণাদি স্রষ্টার স্বর্গ বা মর্তের যে কোন স্থানে সম্পন্ন করা যায়।"[১]

সালাত প্রবর্তন করে হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রতি মানবাত্মার প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুলতাকে স্বীকৃতি দান করেন, আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে তিনি ইবাদাতে এমন একটি শৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন যা মনকে বস্তুজগতের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সালাতের প্রক্রিয়াসমূহ তাঁর নিজের উদাহরণ তার আচরণের মাধ্যমেই পবিত্রতা লাভ করেছে, আর প্রক্রিয়াগত বিধান সম্পর্কে দ্বন্দ্বের কুফল থেকেও মুসলিম জগতকে রক্ষা করেছে এবং তাতে বান্দার জন্য সর্বশক্তিমানের দরবারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভক্তি ও বিনয় প্রকাশের ব্যাপকতম সুযোগ রাখা হয়েছে। "তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর। আর সালাত কায়িম কর; সালাত অশ্লীলতা আর অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর আল্লাহর যিকর সর্বশ্রেষ্ঠ।"[২]

ইসলামের জন্মভূমির স্মৃতিকে মুসলিম জগতের মনে জাগ্রত রাখবার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) নির্দেশ দেন যে, সালাতের সময়ে প্রত্যেক মুসলমান মুখ করে দাঁড়াবে মক্কার দিকে যে মক্কা, যে গৌরবময় কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত সত্যের প্রথম আলোক রশ্মি দেখেছিল। নবুওয়াতের সহজাত প্রবণতা দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেন যদি একটি স্থানকে কেন্দ্র করে চিরকাল তাঁর উম্মাতের ধর্মানুভূতি আবর্তিত হয় তবে তাঁর সংহতিমূলক প্রভাব কতটা বড় হতে পারে। এ জন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আদেশ করেন যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, মুসলমান সালাত আদায় করবে কাবার দিকে মুখ করে।[৩]

ইসলামে সমষ্টিগতভাবে সালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরূপ সালাত আদায় সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগত্র ও সংরক্ষণ করে। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানগণ যখন নিয়মিত প্রার্থনায় মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সমতাবোধ সৃষ্টি হয়। এই একতাবোধ রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণ একতাবোধে সীমিত থাকে না। বরং সব শ্রেণীর ও সব স্থানের মুসলমানদের একতাবোধে পরিণত হয়। এখানে পরিবার ও বংশ, সম্পদ ও ক্ষমতার অহমিকা, গরীব ও দূর্বলদের প্রতি ঘৃণা এসবই বিলীন হয়ে যায় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক আলিঙ্গনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমতাভিত্তিক আনুগত্য গড়ে উঠে। এভাবেই সালাতের মাধ্যমে সংকীর্ণ পারিবারিক বা গোত্রীয় ঐক্যের স্থলে গড়ে উঠে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর চেতনা ও ঐক্যবোধ।[৪]

---

১. W.W. Hunter, Our Indian Musalmans, P.179.
২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩ - ৮৫
৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৪. S. Rahman, Op.cit, P. 38-39.

Dhaka University Institutional Repository

সিয়াম সাধনা :

বছরে একমাস রোযা রাখার বিধান ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। কুরআনে সিয়ামের বিধান সংক্রান্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লক্ষণীয়। "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেয়া গেল,------ যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সিয়াম কয়েকটি নির্ধারিত দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয় অথবা ভ্রমণে থাকে, তবে তার জন্য অন্য সময়ে সমসংখ্যক দিন পূরণ করতে হবে; আর এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য-এর পরিবর্তে ফিদয়া হচ্ছে একজন মিসকীনকে খাওয়ানোয়।---- তোমরা যদি বুঝতে, তবে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য ভাল। ---- তোমাদের পক্ষে যা সহজ, আল্লাহ তাই-ই চান।"[১]

সিয়ামের বিধান হচ্ছে দিবাভাগে যাবতীয় জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ থেকে এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা। রাত্রিকালে ইবাদাত বন্দেগীর ও ভক্তি নিবেদনের ফাঁকে মুসলমান কিছু পানাহার করে বা অন্যপ্রকার আইনসঙ্গত ও আনন্দ উপভোগ করে দেহ-মন সতেজ করে নিতে পারে। সম্ভবত নিতে সে বাধ্য। নবীর সত্যিকার নীতি অনুসরণ করে ফকীহগণ অলঙ্ঘনীয় নিয়ম করেছেন যে, সিয়াম পালনকালে শারীরিক বর্জনের মত মন থেকেও মন্দ চিন্তা বর্জন করা বাধ্যতামূলক।[২]

যাকাত :

ইসলামের পূর্বে কোন ধর্ম যাকাত দান, বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায় দরিদ্রের ভরণ-পোষণকে নীতিমালায় বিধিবদ্ধ করে ধর্মের অঙ্গে পরিণত করেনি। যাকাতের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা স্বার্থপরতার দিকে। এ প্রবণতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন তা থেকে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহায্যার্থে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ইসলামের বিধান মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির কিয়দংশ তার অধিকতর হতভাগ্য প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য দান করতে বাধ্য। এ অংশ হচ্ছে যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির, উৎপন্ন শস্যের, ব্যবসায়ে লাভের, মজুদ মালের ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ। কিন্তু এ দান বা যাকাত দিতে হবে যদি সম্পত্তির মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হয়[৩] আর তা মালিকের হাতে পুরা এক বছর থাকে। আর যে সব পশু কৃষিকাজ ও ভার বহনে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া রমযান মাসে সীয়াম শেষে আর ঈদুল ফিতরের দিনে প্রত্যেক পরিবারের প্রধানকে তার নিজের, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আর রমজান মাসের তার বাড়ীতে সিয়াম পালন করে ইফতারকারী ও রাত্রি যাপনকারী এমন অতিথিদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, খেজুর, কিসমিস, চাউল বা অন্য যে কোন জিনিস অথবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে দিতে হয়। ইসলামের বিধান মতে, এ সব দানের ন্যায্য অধিকারী হচ্ছে- (১) দরিদ্র আর অভাবগ্রস্থ, (২) যাকাত আদায় ও বিতরণে যারা সাহায্য করে, (৩) ক্রীতদাস-দাসী, যারা নিজেদের স্বাধীনতা খরিদ করতে চায়, কিন্তু সঙ্গতী নেই, (৪) ঋণগ্রস্ত, যার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নেই, (৫) মুসাফীর আর বিদেশী।[৪]

নামাজ ও রোজার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যাকাত ও হজ্জের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন সার্থের দ্বন্দ্ব থাকা অনুচিত। কিন্তু এ ধরনের দ্বন্দ্ব নিরন্তর লেগেই আছে। যেহেতু ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমান সুযোগ সুবিধাসহ এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়ে তোলা, সেজন্যই নিজের স্বার্থকে সমাজের তথা মানবতার স্বার্থের অধীনস্ত করার জন্য তা মানুষকে পরামর্শ দেয়। মানুষে মানুষে যে প্রভেদ বিদ্যামান তা হ্রাস করা ইসলামের লক্ষ্য এবং জীবনে সবাইকে সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহায্যার্থে রাজভান্ডারে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির পক্ষে তার বছরান্তে সঞ্চিত সম্পদের $\frac{১}{৪০}$ ভাগ দরিদ্রের জন্য পৃথক করে রাখা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থা দরিদ্রদের শোষণের উপর বিত্তবান সমাজ গড়ে উঠাকে বন্ধ করতে না পারলেও অন্তত নিরুৎসাহিত করে।

---

১. আল-কুরআন, ২:১৮৩-৮৫

২. সৈয়দ আমির আলী (অনু. দরবেশ আলী খান), দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২০৬

৩. সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমমূল্যের পরিমাণ।

৪. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

সমাজের সব মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলাম সুদ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে ইসলাম মানুষকে সামাজিক সমতা প্রদানের চেষ্টা করে। গরীবদের দেখা শোনা করা একটি পবিত্র দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ব্যক্তিকে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হয়নি। যাকাত বাধ্যতামূলক। একে সংগ্রহ করে জমা দিতে হয় কেন্দ্রীয় রাজভাভারে এবং একে বন্টনও করতে হয় রাজভাভার (বায়তুলমাল) থেকে। প্রত্যেক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান, যাকাত প্রবর্তন ও সুদ প্রথা বিলোপের মাধ্যমে ইসলাম তা দূর করার চেষ্টা করেছে। এসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদের অতিশয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনিয়ম ও অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ। মোটকথা ইসলাম এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনকে উৎসাহিত করে যেখানে সব মানুষকে মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে সমতা প্রদান করা হয়ে থাকে।[১]

হাজ্জ্ব :

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজ্জ্ব উদযাপন করা মানুষের জন্য ফরজ- অবশ্য যে ব্যক্তি পথ ভ্রমণে সমর্থ। যদি কেহ এ দায়িত্ব অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব মানবের মুখাপেক্ষী নন।"[২] মক্কায় ও কাবায় বাৎসরিক হজ্জের কালজয়ী প্রথা ইসলামে অঙ্গীভূত হয়েছে; আর এই হাজ্জ মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে ঐক্য আর বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব সঞ্চারিত করেছে। সেই অন্ধকার যুগে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছিল একটি বেহেশতের জ্যোতি, সমগ্র মুসলিম জগত কাবার কেন্দ্রবিন্দুতে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে হৃদয়ে জাগিয়ে রাখে সেই জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। এখানেও আবার সেই অনুপ্রাণিত বিধানদাতার জ্ঞানবত্তার আলোক রশ্মি দেখতে পাই হাজ্জের শর্তাবলী প্রণয়নের মধ্যে (১) বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির পরিপক্কতা, (২) পূর্ণ ও অবারিত স্বাধীনতা, (৩) ভ্রমণকালে যান বাহনে ও আহার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের মালিক থাকা, (৪) হাজ্জ যাত্রীর অনুপস্থিতিকালে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট সম্বল থাকা এবং (৫) ভ্রমনের সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা- এই শর্তাবলী পূর্ণ হলে হাজ্জ করা বাধ্যতামূলক হবে।[৩]

মক্কায় হজ পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল জীবনের প্রথা প্রচলনের দিক থেকে যাদের মধ্যে খুব বেশি মিল ছিল না, এমন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের ইসলাম গ্রহণের ফলে নতুন ধর্মের অনুশীলনের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্নতার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এজন্যই পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ বছরে একবার যেন মিলিত হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্মিলনে সবরকম মতবিরোধ নিরসনেও পরস্পর বিরোধী ধারণা নিয়ন্ত্রণের পথ উদ্ভাবন করা হয়। এদিক থেকে বলা যায় যে হজ্জের উদ্দেশ্যই হল সামাজিক ঐক্য বিধান ও সংহতি অর্জন। সারা পৃথিবী মানুষের নিজের দেশ, সমগ্র মানবজাতি তার ভাই এবং অপরের মঙ্গল সাধন তার ধর্ম এসব ধারণা সৃষ্টিও হজ্জের লক্ষ্য। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাই যেহেতু ইসলামের লক্ষ্য, সেজন্যই তা এমন ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী, যা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যকার বিরাজমান সব অস্থিরতা, সংঘর্ষ ও সর্বনাশা যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে ছিল। যে উদ্ধত জাতীয়তাবাদ অপর জাতিকে ধ্বংস করে তার নিজের লোকজনকে সাহায্য করতে চায়, তা ইসলামের কাংখিত আদর্শ নয়। ইসলাম বর্ণগত জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে, কারণ তা আরব ও পারসিক, মিসরীয় ও সিরীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। ইসলাম তার অনুসারীদের এসব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠার শিক্ষা দেয় এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেয়, যেখানে জাতিগত ও ভৌগোলিক বৈষম্য মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধের উচ্চতর আদর্শে মিশে যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, হজ্জ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূলনীতিই হচ্ছে একটি উদার ও মহান নীতি এবং মুসলিম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধানই এর প্রধান লক্ষ্য।[৪]

---

১. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৩৬-৩৭
২. আল-কুরআন, ৩: ৯৭
৩. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
৪. ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

শরীয়াতের প্রত্যেকটি বিধানের একটি প্রগাঢ় অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। সালাত বা নামায বলতে বুঝায় বিস্মৃতির স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়া তথা আল্লাহর ও মানুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করাকে। রোযা সচল ও সুদৃঢ় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছাকে এবং নির্দেশ করে প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির এক নতুন পবিত্রতার শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়াকে। যাকাত নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক বদান্যতা ও মহত্ত্বকে এবং তাতে করে তা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। হাজ্জ নির্দেশ করে আপাত অস্তিত্বের পর্যায় থেকে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রীয় অস্তিত্বে উত্তরণ লাভকে। সূফীদের ভাষায় এই কেন্দ্রীয় অস্তিত্ব অধিষ্ঠিত সেই অন্ত:করণে যা কিনা পরিচিত আধ্যাত্মিক কাবা বলে। মানুষের মধ্যে এ ধরনের আধ্যাত্মিক গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেয়াই ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য।[১]

ইসলামের বৈশিষ্ট্য :

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাগুলি হতে বহু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠী বা অপর ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভূক্ত করার ফলে ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে চিহ্নিত করা হল-

(১) ইসলামে আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক, কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানবগোষ্ঠির উপাস্য নয়। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত সর্বশক্তিমান নিরাকার এবং সাদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আসমাউল হুসনা'য় যা সীমিত শক্তির আওতায় মানবের অনুকরণীয়।[২] সুতরাং তিনি একাধারে মানবের উপাস্য এবং আদর্শ।

(২) ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি মানব নন, তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত বিধান দেয়ার কোন অধিকার লাভ করেনা, অনুসারীরা পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌরহিত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না। কুরআন অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যা দান কোন বিশেষ গোষ্ঠীর আওতার্ভূক্ত নয়, বরং ইবাদাত এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কিছুটা কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

(৩) সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দীনের ঐক্য এবং বিবর্তনমূলক শরীয়াত বিকল্প ঘোষণা করে, মানব চরিত্রের উৎকর্য সাধন এবং মানবজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অহী প্রসূত প্রজ্ঞার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে।[৩]

(৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্তা উৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্ট; পাপের পঙ্কে তার জন্ম নয়, আদি পিতার পাপের বোঝাও সে বহন করে না। সে তার আপন কর্মের জন্য দায়ী; মানবসত্তা সসম্মানিত; জ্ঞানে-গুণে সে ফিরিশতাকে অতিক্রম করতে পারে; সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভা; সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে।[৪]

(৫) ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারত্রিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, এতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না।

(৬) ইসলাম মানবাধিকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দান করেছে-

(ক) নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা বিধান ইসলামের বিধান। সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করেছে। স্বামী ও পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেক্রামেন্টের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করে সামাজিক চুক্তির আওতায় (বিবাহ) তার ব্যক্তি সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত পেয়েছে।

(খ) গোলাম ইসলামী বিধানে তার মানবিক মর্যাদা পেয়েছে। গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামের একটি পূণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।

---

১. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২. আল-কুরআন, ১:১; ৭ : ১৮০
৩. আল-কুরআন, ২:২৮৫; ৫:৪৪ - ৪৭
৪. আল-কুরআন, ৯৫:৪; ২:২৮৬; ১৭:১০; ৭:১১; ২:৩০; ৩০:৩০

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমনকি অমুসলিমের ধর্ম মন্দির রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমের উপর বর্তায় যদি কেউ তা ধ্বংস করতে উদ্ধত হয়। কাবায় উপাসনার অধিকারে হস্তক্ষেপকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদকামী মুশরিকদের বিচারেও হেরফের করা যাবে না।[১] ইসলামী আইনের শাসন অপর ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

(ঘ) যুদ্ধরত বিধর্মীরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধক্ষম নয়-যথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ, অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা যাবে না।

বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে না দেয়া হয় ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না। উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[২] ফলকথা ইসলাম অতি পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিকতার ধারক ও বাহক।

(৭) ইসলামে ধন বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সূদ হারাম, যাকাত ওয়াজিব, উত্তরাধিকার আইন সম্পদ বণ্টনমূলক।

(৮) ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ; প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় খিলাফত নীতিতে; খলিফা আইনের উর্ধ্বে নয়; তার বিশেষ কোন সুবিধা নেই; জনগণের রায়ের উপর তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি; প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরামর্শে সেই ক্ষমতার পরিচালনা করতে হবে। খলিফা জনগণের আনুগত্য দাবী করতে পারেন-যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।[৩]

(৯) ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। এতে পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। কল্যাণকর সবকর্মই ইবাদাত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা করা হয়। সব কর্মের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।

(১০) ইসলামে কোন জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব নেই-এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো খুবই সহজ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। এতে কোন অহমিকা ও কুসংস্কারের স্থান নেই। আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মদের (স.) রিসালাত এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলোই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। এগুলো নিখুঁত প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সকল শিক্ষা এসব মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ সরাসরি আল্লাহর কিতাব থেকে বিধান অনুসরণ করতে পারেন। ইসলাম মানুষকে তার প্রজ্ঞা শক্তি জাগ্রত করতে শেখায়, বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষ সবকিছু বাস্তবের আলোকে দেখতে শিখে।[৪] এজন্যই ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র বিশ্বাস করার বিষয় নয়, জীবনের চালিকা শক্তি। আল্লাহতে বিশ্বাস মানুষকে অবশ্যই সদাচরণ শেখাবে। ধর্ম কখনও মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ধর্ম জীবনের মাঝেই প্রতিফলিত হবে। সুতরাং ইসলাম অত্যন্ত সরল, যৌক্তিক ও বাস্তবতার ধর্ম।

(১১) ইসলাম মানুষের জীবনে ভাব ও বস্তু এ দু'টির কোন পৃথক সত্তার কথা বিবেচনা করে না। জীবন বিমুখতা নয়, বরং জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম কখনও বৈরাগ্যে বিশ্বাস করে না। পার্থিব জীবনকে এড়িয়ে চলা নয়, বরং জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে তাকওয়ার সাথে জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে আত্মিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব; সংসার ত্যাগ করার মাধ্যমে নয়। ইসলাম পার্থিব জীবন এবং নৈতিক জীবন, সংসারী জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কোন আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বরং সুস্থ নৈতিক ভিত্তির উপর জীবনকে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

১. আল-কুরআন, ২২:৪০; ৫:২ ও ৮
২. আল-কুরআন, ৮ : ৫৮; ৯ : ৬; ৮ : ৭২; ৭৬:৮
৩. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭; ৩ : ১৫৭
৪. আল-কুরআন, ৩৯:৯; ৭:১৭৯; ২:২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

(১২) ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, পার্থিব, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন, সংস্কৃতি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পথ নির্দেশ রয়েছে। আল-কুরআন মানুষকে ইসলামে পূর্ণভাবে অর্থাৎ কোন অংশ পৃথক না রেখে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বলে।[১]

(১৩) ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, ব্যক্তিবাদ ও সমষ্টিবাদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে এবং বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে। ইসলাম ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সেগুলোর ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামের শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সাধন এবং সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে পরামর্শ দেয় না।

(১৪) ইসলামের আহবান সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্য। ইসলামের স্রষ্টা আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের এবং মহানবী (স.) সমগ্র মানবতার জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও জাতীয়তাভেদে সব মানুষ সমান। ইসলাম নিজেকে বিশ্বমানবতার বিবেকরূপে দাবি করে এবং গোত্র মর্যাদা ও সম্পদের ভিত্তিতে সৃষ্ট মিথ্যা বাধাসমূহ অপসারিত করে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইসলাম এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে এবং দাবী করে যে, সকল মানুষ এক আল্লাহর পরিবার ভূক্ত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেদন আন্তর্জাতিক। বর্ণ, গোত্র, রক্ত সম্পর্ক অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভেদকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম সব মানুষকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। জাতিগত শত্রুতা ও কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে ইসলাম আহবান জানায় জীবন ও আশার পথে এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে।

ইসলামের এসব বিশিষ্ট রূপগুলোই ইসলামকে মানবতার ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম আজকের দিনের ধর্ম এবং আগামী দিনের ধর্ম। ইসলামের এইরূপ অতীতে শত সহস্র মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। আজকে আবার মানুষের মনে দৃঢ় প্রতীতি জাগিয়েছে যে, এটাই মানবতার জন্য সত্য ও সঠিক পথ। মানবতার কাছে ইসলামের এই আবেদন ভবিষ্যতেও থাকবে।

---

১. আল-কুরআন, ২:২০৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে সংস্কৃতি ও মানবাধিকার

ইসলামী সাংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন দিক-

- ইসলামী সংস্কৃতির পরিচিতি
-আধ্যাত্মিক জীবনে
- নৈতিক জীবনে
-বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে
-সামাজিক জীবনে
-অর্থনৈতিক জীবনে
-রাজনৈতিক জীবনে

ইসলামে মানবাধিকার-

- মানবাধিকারের সংজ্ঞা
- ইসলামে মানবাধিকার
- জীবনের অধিকার ও নিরপত্তা
- দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা লাভের অধিকার
- বিধি বহির্ভূত নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের অধিকার
- মানহানিকর আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার
- আইনগত সমতা লাভের অধিকার
- ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার
- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লাভের অধিকার
- স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার
- রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার
- জাতীয়তার অধিকার
- বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার
- বাক-স্বাধীনতার অধিকার
- শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার
- সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার
- সরকারী কর্মে প্রবেশের সমঅধিকার
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার
- কাজ, ন্যায্য মজুরীসহ শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার
- বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার
- শিক্ষা লাভের অধিকার
- গণতান্ত্রিক অধিকার
- ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের অধিকর

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতি :

সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি হল সমাজ থেকে অর্জিত আচার-ব্যবহার। সমাজে একত্রে বসবাসের ফলে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। তাদের একে অপরের নির্ভরশীলতায় গড়ে উঠে একটি সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, বন্টন বিধি, ভোগবিলাস এবং জীবনধারার প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি। নৃ-বিজ্ঞানী টেইলার এর মতে, "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, আইন প্রথা ইত্যাদির জটিল সমাবেশকেই সংস্কৃতি বলা হয়।"[১] আল্লামা আবুল হাশিমের ভাষায়, Culture is the development of the faculties of man both extarnal and internal and is its manifestation in his behaviour and in his immediate material environment."[২]

ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৩] ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, যাতে মানুষের বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে যে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতি।

উল্লেখিত বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি। অত:পর (তার কর্মকান্ডের কারণে কখনও বা) নিম্নস্তরে স্থাপন করেছি।"[৪] সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি মানুষের সম্ভাবনাও অপরিসীম। তাদের জীবন বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়। ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি আল্লাহ্র একত্ববাদ। আল্লাহ স্রষ্টা, মানুষ তাঁর সৃষ্টি। তাই এই সংস্কৃতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ জীবন, খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা, যৌন জীবন, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ক এবং এক মানবোচিত পরিকল্পনা রয়েছে।[৫]

ইসলামী জীবন সর্বদেশ, কাল ও দর্শন এবং তমুদ্দন থেকে বিনয়ের সাথে যা কিছু সুন্দর, চিরন্তন, কল্যাণকর তাকে সাদরে বরণ করে নিতে উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। তবে সে সব ভাল জিনিস গ্রহণ করা হয় তাকে ইসলামের ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তৌহিদবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত করে তোলার নির্দেশনা রয়েছে।

তাই তা বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও দেশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতি, দেশ ও ভাষা হল সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এই সংস্কৃতির মূলনীতি ইসলামী জীবন দর্শন ও মানবতার উপর নির্ভর করে। জাতি, দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ সংস্কৃতির মূল ভিত্তি নয়। ইসলামী জীবন দর্শনের মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে তার বিরাট সৌধ ও শাখা-প্রশাখা।[৬] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।"[৭] এখানে দ্বীন অর্থ হল আল্লাহ্পাকের ফিতরাত, যার ছাঁচে মানুষের প্রকৃতি গঠন করা হয়েছে। যে সকল অমোঘ প্রকৃতিক নিয়ম মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সে সমষ্টির নাম দ্বীন বা জীবন দর্শন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই দ্বীনের বিরোধীতা অর্থ নিজ প্রকৃতির বিরোধিতা। এরূপ বিরোধীতা করে নয়, বরং এর সাথে সুসংগতি রক্ষা করে নিজের ইহকাল ও পরকাল সাফল্যময় করে তোলা যায়।

সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শ ভিত্তিক। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ, মানব জীবনে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন নীতির প্রবর্তক। সর্বজনীন বিচার প্রতিষ্ঠা তাওহীদবাদের লক্ষ্য। এছাড়া প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আইন-কানুন, নীতি, আচার-ব্যবহার যা ইসলাম অস্তিত্ববাচক হিসেবে নিজেই গড়ে তোলে। প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, আচার-ব্যবহার যেগুলো তাওহীদবাদ ও সর্বজনীন নীতির বিরোধী নয় তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। ইসলামের মূল্যবোধ এ সংস্কৃতির প্রাণ।[৮]

ইসলাম তাই মানব প্রকৃতির মূল তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থার বিধান দেয়। সুতরাং ইসলামের প্রভাব ও প্রতিফলন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়।

---

১. E.B. Taylor, Primitive Culture, vol-1, London, 1981, P.7
২. Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic foundation Bangldesh, Dhaka-1980, P. 133.
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, "ইসলামী সংস্কৃতি" এম.এম.পিকথল, (অনু. সানাউল্লাহ নূরী) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১০২
৪. আল-কুরআন, ৯৫:৪-৫
৫. ড. হাসান জামান, আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ৯৬
৬. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭. আল-কুরআন, ৩:১৯
৮. ড. হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

আধ্যাত্মিক জীবনে :

মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে এবং তার গন্তব্যস্থল কোথায়, মানব মনে স্বাভাবিকভাবে এ সব প্রশ্ন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী হতে সৃজন করেছি এবং তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার ও যত্ন করতে পার।"[১]

আয়াতটিতে আল্লাহর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁর উপর আর কেউ নেই। কোন শক্তি নেই। তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সকল সৃষ্টিই সমভাবে তাঁর দয়া ও করুণা প্রাপ্ত। বিশ্বে যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের মানুষই শ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি বলেই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছি। অত:পর আমি (তার কর্মকান্ডের দরুন কখনও বা) নিম্নতম স্তরে স্থাপন করেছি- শুধু তাদের ছাড়া যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায্য কর্মাচরণ করে। তাদের জন্য অব্যর্থ পুরস্কার। অতএব, কে এই বিধানকে সন্দেহ করতে পারে।"[২]

সুতরাং মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি অর্থই হল মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং তার সম্ভাবনাও অপরিসীম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন প্রতিভূ হিসেবে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বাস করার সুযোগসমেত মানুষকে কর্তব্য পালন করতে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বাস রাখ এবং কাজ কর, আল্লাহর গুণাবলীর সাথে একাত্ম হয়ে কাজ কর- এই হল প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী যখন অপরিসীম সম্ভাবনার মানুষ আল্লাহ্ পথকে সম্মান করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসে, ঈমান রাখে এবং আল্লাহর গুণাবলীর সাথে কাজ করে তখনই সে নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে এবং জড় পরিবেশের পটভূমিতে সগৌরবে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত।"[৩] কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মানুষ যখন তার জড় সম্পদ ভোগ লিপ্সার দাসে পরিণত হয় তখন সে নিজকে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে। এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম জীবনের বাস্তব দিকের প্রতি উপেক্ষা করে এবং দুনিয়ার সম্পদরাজিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মানুষ দুনিয়ার সম্পদরাজিকে স্বীয় প্রয়োজনে ভোগ করবে কিন্তু নিজেকে ভোগ সম্পদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করবে না। কেননা, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলে আল্লাহপাক ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সাধনাই হল ইসলামী আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব। সুতরাং মানুষের যে সকল বৃত্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশের সহায়ক সেগুলোর পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তাদের বহি:প্রকাশ ইসলামী জীবনে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।[৪]

নৈতিক জীবনে:

মানুষ জন্মগতভাবেই একটি নৈতিক সত্তা। মহানবী (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব সন্তানই নিজ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[৫] পৃথিবী থেকে পাপ-পঙ্কিলতা দূরীকরণ এবং মানুষের স্বাভাবিক শুভতায় বিশ্বাস-এ দু'টির সমবায়ে রচিত ইসলামের নৈতিক ভিত্তি। জন্মগতভাবে নৈতিকতার কারণে মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষকে নিজের প্রতি, সকল সৃষ্টির প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াই ইসলামী নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। এ জন্যেই ইসলামের নির্দেশিত সকল আচার-অনুষ্ঠানেই মানবাত্মার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মানুষের প্রকৃতিতে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব-এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মনুষ্যত্বের দিকটি মানুষকে নিয়ে যায় উপরের দিকে অর্থাৎ উৎকর্ষের চরম শিখরে। অন্যদিকে পশুত্বের দিকটি তাকে চালিত করে নিচের দিকে অর্থাৎ অধ:পতনের দিকে। জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মনের পশুত্ব ও রিপুকে মনুষ্যত্ব শক্তি দ্বারা জয় করা। এদিক থেকেই মানুষকে অভিহিত করা হয় নৈতিক দায়িত্ব সম্বলিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা বলে। সকল রকমের ভ্রান্তি ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তাকে বিকশিত করতে হয় তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ৪৯:৪-৮
২. আল-কুরআন, ৯৫: ৪-৮
৩. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
৪. Abul Hashim, Op.cit, P. 135
৫. আলী উদ্দিন মুহাম্মদ, মিশকাতুল মাসবিহ, কলিকাতা ১৩৫০ হিজরী, পৃ. ২১
৬. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ৫২

মানুষের শক্তিসমূহকে বিকশিত করার সাথে নৈতিকতার প্রশ্নটি জড়িত। এ বিষয়ে কখনও কখনও সে পশুত্ব শক্তি দ্বারা চালিত হতে পারে, যা মানুষ তথা সৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে। পশু শক্তিতে পরিচালিত হওয়া মানে নৈতিকতা বিরোধী হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি বা নৈতিকতা বিরোধী কাজ তা-ই, যা অপর কারও ক্ষতি সাধন করে। নৈতিকতা বিরোধী কাজই মানুষের প্রকৃতিতে পশুত্বের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, কর্ম বলতে কেবল হস্তদাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কর্ম বোঝায় না, চিন্তা ও অনুভূতিও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম বলেন, "যে কর্ম মানব সত্তায় ও তার পারিপার্শ্বিক বস্তু জগতে বিরাজমান সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিকর ফল প্রসব করে তা জুলুম ও নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক জ্ঞান কতগুলি অবাস্তব ও স্বেচ্ছা উদ্ভাসিত ভালমন্দের বিচার বুদ্ধি নয়, বরং যে কোন কর্ম স্বভাবত ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিময় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, তাই নৈতিকতা বিরোধী। ক্ষতি দৈহিক ও মানসিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হতে পারে। কোন কোন ক্ষতির প্রভাব সুদূরপ্রসারীও হতে পারে, আবার সীমিতও হতে পারে।"[১] সৃষ্টির যে কোন ক্ষতিকারক কর্মই মহান আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী জুলুম। শুধু তাই নয় বরং যে ব্যক্তি জুলুম করে কিংবা জুলুমের সহায়তা করে বা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবাদ করে না সেও জুলুমের জন্য সমভাবে দায়ী। যে সব ভোগলিপ্সা মানব মনকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে যেমন মাদকাসক্তি, জুয়া, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য এবং যৌন আবেদন সম্বলিত রূপ প্রদর্শনী ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতা বিরোধী। কেননা, তা মানব মনের ক্ষতিসাধন করে। অবশ্য মানব মনে রস সঞ্চালনকারী জীবনমুখী রুচি সম্পন্ন সংগীত ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী নয়। কেননা, এর মাধ্যমে মানুষের মানবতাবোধ তথা জীবন ও জীবনের পরিসমাপ্তির কথা থাকে।[২]

সুতরাং ইসলাম আপোষহীনভাবে যেমন নৈতিকতা বিরোধী যে কোন ক্ষতিকারক কর্ম ও জুলুমের বিরোধিতা করে, সেই প্রকারের মন গঠনের অনুশীলনী এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বহিঃপ্রকাশই হল নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামের এই নৈতিক পরিকল্পনাই আজকের পৃথিবীর কাঙ্খিত শান্তি দান করতে পারে, যে পরিকল্পনা ও নীতির অনুসরণ করে ইসলাম পাপাচারী মরু বেদুঈনদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করেছিল এবং তাদেরকে বিশ্বসভ্যতার ধারক ও বাহকে পরিণত করেছিল। ইসলামের নৈতিক ধারণা প্রকৃতিক নিয়মের এক অপরিবর্তনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩] ইসলামের নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতার বিষয় উল্লেখ করে রেভারেণ্ড টেইলর বলেন, "মদ্যপান, জুয়াখেলা ও ব্যভিচার যে তিনটি অভিশাপ খৃষ্ট জগতকে ধ্বংসের পথে চালিত করছে, তা একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই বিদূরিত করতে পারে।"[৪]

বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে :

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটির হল সেই বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সৃজনে এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনে এবং সমুদ্র চালিত পোতে যাতে মানুষ লাভবান হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা ভূমিকে যে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন তাতে তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করেছেন তাতেও বায়ুমণ্ডল এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।"[৫] কেবলমাত্র ঐ সব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তার গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান।

---

১. Abul Hashim, Op.cit, P.136
২. Abul Hashim, Op.cit, P. 136
৩. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, ঢাকা ও বগুড়া, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮
৪. উদ্বৃত: ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৫. আল-কুরআন, ২:১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য।" কেননা এ জ্ঞানই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং অজ্ঞানতা মানুষকে অন্যায় প্রবণ করে। তিনি আরও বলেছেন,"জ্ঞান অন্বেষণ কর কেননা, যে আল্লাহর পথে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে ধর্ম কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে; যে জ্ঞান দান করে সে দান-খয়রাত করে; আর যে যথোপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান দান করে সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বন্ধু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান জান্নাতের পথ আলোচিত করে; নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু, নির্জনে আমাদের সমাজ, পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী এ আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে; এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে; বন্ধুমহলে এ আমাদের অলংকার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়, ইহজগতে নৃ-পতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরজগতে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়।"[১]

প্রশ্ন হল জ্ঞান কখন থেকে শুরু করতে হবে? ইকবালের ভাষায়, "মূর্ত বস্তু থেকেই জ্ঞানকে যাত্রা শুরু করতে হবে। যেমন ধরা যাক, অগ্নি। এটাকে স্পর্শ করলে দগ্ধ হতে হয়। এ জ্ঞান আছে বলেই কেউ অগ্নি স্পর্শ করে না। অগ্নি স্পর্শ হতে বিরত রাখার জন্য পুলিশ, প্রহরী, হিতোপদেশ, সমাজ শাসনের প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যথেষ্ট। তারপর মাদক দ্রব্য সেবন মন ও মস্তিষ্কের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু তা সেবনে কি ক্ষতি হল সংগে সংগে তা উপলব্ধি করার জ্ঞান অর্জন না করা হলে পরিণামে মানুষ কুঅভ্যাসের দাস হয়। এমনি ধাপে ধাপে মানুষ জ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ে যাবে। ইকবালের ভাষায়,-"মূর্তবস্তুর বুদ্ধিগত উপলব্ধি এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের ফলেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে মূর্তবস্তুকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়।"[২] আল্লাহ বলেন, "হে জীন ও মানব জাতি! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তবে কর, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষমতার দ্বারাই তা পারবে।"[৩] অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামের বুত্তিবৃত্তিক জীবন বিজ্ঞানমুখী। কুরআন আল্লাহর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করার জন্য, গবেষণা করার জন্য বহুভাবে মানব জাতিকে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির ভিত্তি। বিদ্যা অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও যাও এবং তা অর্জন কর। "জ্ঞান সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্ত হতেও পবিত্র" এ কথার তাৎপর্য এটাই।

যে সকল বৃত্তি মানুষকে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানপিপাসু করে সেগুলোর পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে তার ফলিত রূপই ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি। এ জ্ঞান দু'প্রকার-বুদ্ধিলব্ধ এবং বোধিলব্ধ। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার অনুসরণে বোধিলব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনও ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে শিক্ষা বুদ্ধি ও বোধির উৎকর্ষ সাধন করে সেই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে-এর প্রয়োগ ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি।[৪]

ইসলামে জ্ঞান চর্চার স্থান সর্বোচ্চে এবং জ্ঞান চর্চাকে পবিত্র কর্ম বা দায়িত্ব মনে করা হয়, কৃষ্টি চর্চাকে সুউচ্চে মর্যাদা দেয়া হয়। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই তার প্রমাণ। জ্ঞানের সাধনায়, সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণায় ইসলামের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতি এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে সারা বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে ইসলামী সভ্যতার প্রেরণা বিদ্যমান। এ ধারণা পাশ্চাত্য জগতও অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছে। ব্রিফল্টের ভাষায় বলতে হয়, "বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু এর ফল পরিপক্ক হয়েছিল বিলম্বে। মূর সংস্কৃতির অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পর তার গর্ভজাত এই বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণ সঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং বহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।"[৫]

---

১. Sayed Amir Ali, The spirit of Islam, Delhi. 1922, P.P. 301-61.
২. Dr. Allama Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam, Lahore, 1960, P.131.
৩. আল-কুরআন, ৫৫:৩৩
৪. শাহেদ আলী, (সম্পা.) ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ১৩-১৪
৫. Brifault, Making of Humanity, London, P. 202

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইকবাল বলেন, "The fruits of modern European Humanism in the shape of modern science and philosophy are in many way only a further development of muslim culture."[১]

সুতরাং ইসলাম শুধু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে উৎসাহিত করে। চিন্তা, বিবেক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ, যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

সামাজিক জীবনে :

ইসলাম উদার মানবতা শিখায়। সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম দিয়েছে এক বৈপ্লবিক ধারণা। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল মানুষই সমাজভূক্ত এক আদমের সন্তান। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন হলেও সকল মানুষ একই মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে পরিণত করেছি- যেন একে অন্যকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তি সে-ই, যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহভীরু।"[২]

ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগের সাম্য। রক্তাভিজাত্য ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদের গৌরব অথবা বিশেষ কোন পেশা ইসলামী সমাজ জীবনে মানবিক মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততা ও কর্তব্যপরায়ণতাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। এখানে উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষও মানবিকতার প্রতি ইসলামের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামে সামাজিক সংস্কৃতির প্রথম সোপান।

ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি পরিবার। পারিবারিক সততা, শান্তি না থাকলে এবং পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকলে সমাজ জীবনে সুখ ও শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। সমাজের সত্যিকারের উন্নতি নিহিত রয়েছে বদান্যতা, ভালবাসা এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের তথা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও সদা বিলীয়মান বস্তুসামগ্রীর উপর মানুষের বুদ্ধিসত্তার স্বাক্ষর অংকনের যে ক্ষমতা তার উন্নতির মাঝেই।

মহানবী (স.) বলেছেন, "মানব সমাজ আল্লাহর পরিবার-----। পৃথিবীর সমগ্র মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মৃত্তিকায় গড়া।" এটাই হচ্ছে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, যা মানুষকে দিতে পারে সামাজিক চেতনা ও শান্তির আবেহায়াত। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অর্থ এখানে সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি। সততা, যোগ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার অনুপাতে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক সেরূপ মনোরম থাকবে যেমন আল্লাহ তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, "মানবতার জন্য গড়ে তোলা সকল সমাজের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ সমাজ। তোমরা সদাচরণের নির্দেশ দাও এবং অন্যায়কে নিষিদ্ধ কর এবং তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আন।"[৩]

ইসলাম সৎ ও ন্যায়কে যেমন সযত্নে আলিঙ্গন করে, তেমনি অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু অন্যায়কারীকে ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতির সাথে অন্যায় পথ হতে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, "আপনি আপনার প্রভূর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (লোকদেরকে) আহবান করুন।"[৪] ইসলামের মনোভঙ্গি আপসমূলক, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার উপরে জোর দেয়া হয়েছে, যাতে করে কোন কৃত দুষ্কর্মের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় এবং উন্নততর সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। "এবং ভাল ও মন্দ কাজ সদৃশ নয়। একটি ভাল কাজ দিয়ে একটি মন্দ কাজের উত্তর দাও। তখন দেখবে, যার সংগে তোমার শত্রুতা ছিল, তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হবে।"[৫] কিন্তু ইসলাম দূর্বল ক্রোধকে কখনও শুদ্ধির ছাড়পত্র প্রদান করে না। তাকে

---

১. Abdul Vahid (ed.), Thoughts and Reflection of Iqbal, Lahore, 1964. P.203.
২. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
৩. আল-কুরআন, ৩:১১০
৪. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৫
৫. আল-কুরআন, ৪১: ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

যতই সুভাষণে বিশেষিত করা হোক। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দ্বিতীয় গাল এড়িয়ে দিয়ে নতুন অপমান বা অন্যায়কে অভ্যর্থনা করার নীতিকে ইসলাম কখনও গুণ বলে অভিহিত করে না। কেননা, এতে করে মানবিক মর্যাদার অবমাননা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যায়কারীর কাছে দূর্বলের ক্ষমার কোন মূল্য নেই। সেই মুসলমানকে ক্ষমা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে যথার্থ পৌরুষকে অক্ষুন্ন রেখে ক্ষমা করার শক্তি ধারনা করে। কেননা এ সব ক্ষেত্রে ক্ষমাশীলতা আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর মনোরম বলে গৃহীত এবং সুফল ফলাতেও তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত।

সুতরাং বিশ্ব মানবের এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে এর বাস্তবায়নই সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি। আগেই বলা হয়েছে, ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি পরিবার। পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। পারিবারিক সততা ও শান্তি সমূলে ধ্বংস করে যৌন ব্যভিচার। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন ব্যভিচার নরহত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ ও অমার্জনীয় এবং ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির ঘোরতর পরিপন্থী। নরঘাতক একজন মানুষকে হত্যা করে কিন্তু ব্যভিচারী একটি পরিবার তথা সমাজকে হত্যা করে। তাই দৃঢ়তার সাথে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ এদের প্রত্যেককে একশতটি করে দোররা মার এবং তাদের প্রতি দয়াশীলতা আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।"[১]

মোটকথা, দৈহিক ও মানসিকভাবে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে, আর সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় তার নৈতিক জীবন। এজন্যেই তার পক্ষে কাম্য সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে তৎপর হওয়া। মানব জাতির মুক্তি, পরিবেশের উন্নতি বিধান এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ সুগম করার লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখাই ইসলামে সামাজিক সুনীতির প্রধান লক্ষ্য।

অর্থনৈতিক জীবনে :

সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতি এবং বিভিন্ন সমাজ সদস্যের মধ্যে সুখী সম্পর্ক রচনার প্রতি ইসলাম আদ্যোপান্ত সজাগ। ইসলাম মানুষের জন্য শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাই উপস্থাপন করেনি, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার জন্য এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থাও পেশ করেছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ্ তার 'রব'। যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তক তিনিই রব। আল্লাহ মানুষকে তার 'রব' গুণের খলীফা করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই সে-ই, যিনি তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে তিনি শ্রেণী মর্যাদায় আর সকলের উপর উন্নীত করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা-ই দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।"[২]

এখানে 'খলীফা' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করা যায়। খলীফা অর্থ প্রতিভূ। আল্লাহ্ যে নিয়মে জীবের সৃষ্টি, পালন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করেন সেই নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট অপরাপর জীবকে পালন করার দায়িত্ব অর্পণ করে মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করেছেন। জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা শোষণ বা শাসনের নয়-পালনের। এটাই খিলাফতের তাৎপর্য। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ, মর্ত্যে যা কিছু আছে সকলই তার অন্তর্ভূক্ত।"[৩]

সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ অধিকার আল্লাহ্‌র। এ সবের মালিক মানুষ বা ব্যক্তি সমষ্টিও নয়, রাষ্ট্রও নয়। এগুলোর ভোগের অধিকার রয়েছে কেবল মানুষের। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষ জড় সম্পদ অধিকার করবে মালিকরূপে নয়, আল্লাহ্‌র 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। এ সম্পদের ব্যবহার করতে হবে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী। ভোগের স্বত্বাধিকার তাদের অর্জন করতে হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "সেই আল্লাহ্ যিনি যমীনকে তোমাদের (জীবিকা উপার্জনের জন্য) অধীন, অনুকূল ও বিনয়ী, নম্র, মসৃণ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর ক্ষেত্রসমূহে শ্রম সাধনা করে (জীবিকা উপার্জন কর) এবং আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক ভোগ কর।"[৪] কোন

১. আল-কুরআন, ২৪:২
২. আল-কুরআন, ৬:১৬৬
৩. আল-কুরআন, ৩:৫
৪. আল-কুরআন, ৬৭:১৫

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক নিম্নমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মের সংস্থান এই মৌল জীবিকোপরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,"এবং আল্লাহর সেবা কর। কোন কিছুকে তাঁর শরীক বলে গণ্য করো না। দয়াশীলতা দেখাও পিতামাতার প্রতি, তোমার নিকটাত্মীয়ের প্রতি, অনাথদের প্রতি, অভাবীর প্রতি, তোমার প্রতিবেশীর প্রতি, যে তোমার জ্ঞাতী অথবা যে তোমার জ্ঞাতী নয় তার প্রতি, তোমার সহযাত্রীর প্রতি, মুসাফিরের প্রতি এবং তাদের প্রতি তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণা করে আছে।"[১]

এই দায়িত্ব পালনের নাম হল 'হক্কুল ইবাদ'। পবিত্র কুরআনে 'সালাত' শব্দটির সাথে 'যাকাত' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার মর্মার্থ হল 'হক্কুল ইবাদ' আদায় না করলে নামায হয় না- ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ব্যাপারে কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "যে ব্যক্তি ইয়াতিমের দুশমন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং প্রতিবেশীর কল্যাণের প্রতি উদাসীন সে দ্বীনকে অস্বীকার করে, তার সালাত অশুদ্ধ ও প্রদর্শনী সর্বস্ব এবং এ প্রকার মুসল্লিগণ অভিশপ্ত।"[২]

সুতরাং বলা যায় যে সমস্ত মূল্যবোধ ও গুণ অর্থের উপার্জন ও ব্যবহার সম্পর্কে এই মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করে তাদের পরিচর্যা এবং ব্যহারিক জীবন ও জড় পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপ অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।[৩]

রাজনৈতিক জীবনে :

ইসলামী রাজনীতি গোড়ার কথা হচ্ছে আল্লাহর প্রভুত্ব। যার নাম 'হুকুমতে ইলাহিয়া' বা ইসলামী রাষ্ট্র। আল্লাহ্ বলেন, "চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার, সার্বভৌমত্বের অধিকার কারোর নেই, আছে কেবল আল্লাহর জন্য। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।"[৪] ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দেশের অধিবাসীই দেশের প্রকৃত মালিক নয়, বরং আল্লাহই হচ্ছেন সমগ্র দেশ ও রাজ্যের মালিক। তিনি দেশ ও এর অধিবাসী তথা সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী নিজ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহর বিধান অনুসারেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী-রসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ-নিষেধই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। অন্যান্য নবীর মত হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আল্লাহ্ প্রেরিত নির্দেশাবলীর আলোকেই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা দিয়ে গেছেন। কোন আইনসভা, কোন শাসন কর্তৃপক্ষ বা কোন বিচার সভা এই নমুনার পরিপন্থী কোন নির্দেশ দিতে পারে না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। দ্বীন তাই পরিবর্তনহীন নিত্য। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে **Davide-de-Santillana** বলেন, "Islam is the direct government of Allah, the role of God, whose eyes upon his people, the principles of unity and order which in other societies is called civitas, polis state, In Islam is personified by Allah, Allah is the name of the supreme power acting in the common interest, thus the public treasury is the treasury of Allah, the army is the army of Allah, even the public functionaries are the employees of Allah."[৫]

ইসলাম মানবতার মঙ্গলের জন্য এমনি চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবার যারা সমাজের সদস্য অথবা একজন রাষ্ট্র পরিচালক অথবা একজন নেতা, যিনি শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী, এদের সকলের করণীয় হল নিজস্ব দায়িত্বের অন্তর্নিহিত সেই কর্তব্যসমূহ পালন করা। ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করবেন জনগণের কল্যাণে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি নর-নারী নিজের ব্যক্তিগত, ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে তার মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সাথে সাহায্য করবেন। কারণ শুধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি নন, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর রবুবিয়াতের খলীফা। এখানে কেউ কারও দাস-প্রভু নয়, সকলে ভাই-ভাই, আল্লাহর দাস এবং একমাত্র তাঁরই অধীন। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন বৈষম্য বিরাজ করে না। তবে এ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কিছু গুণ থাকা চাই। আল্লাহ্ বলেন, "ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য বান্দারাই ইসলামী হুকুমতের অধিকারী হয়ে থাকেন।"[৬] নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি -

---

১. আল-কুরআন, ৪:৩৬
২. আল-কুরআন, ১০৭:১-৪
৩. শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪. আল-কুরআন, ৬ : ৫৭
৫. David de Santillana, Law and Society, The legacy of Islam, London, 1931, P.286.
৬. আল-কুরআন, ২১:১০৫

Dhaka University Institutional Repository

১। অকলংক আদর্শ, ইসলামী চরিত্র;
২। জরুরী ইসলামী জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শ সচেতনতা;
৩। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা;
৪। আদর্শ রাষ্ট্র চালনার মত বুদ্ধিজ্ঞান, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা;
৫। ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও শত্রুকে প্রতিরোধ করার উপযোগী সাহস।[১]

ইসলামী রাষ্ট্রে দু'শ্রেণীর নাগরিক থাকে-মুসলমান ও জিম্মি। মুসলমান নাগরিকগণ আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ধন, মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের, ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাস করার, মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রয়েছে। এই মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব আরোপিত হয়। যেমন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার, শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য জান-মাল কুরবান। এজন্য আল্লাহ্পাক বলেন,"আল্লাহর অনুগত হও, তাঁর রসূল (স.)- কে অনুসরণ করে চল এবং তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) আমীরের অনুগত হয়ে থাক।"[২]

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের মত অমুসলিম নাগরিক বা জিম্মিরাও জীবন, ধন, সম্মান, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অধিকার লাভ করে থাকে।[৩] জিম্মিদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালনের অধিকার ও ধর্ম প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের অধিকার নেই।[৪] কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়া তারা রাষ্ট্রে যে কোন পদে নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম, অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিকের দায়িত্ব এক আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের নির্দেশানুযায়ী নিজেদের রাষ্ট্র ও সমষ্টি জীবন পরিচালনা করা। দায়িত্বার্পিত নাগরিকগণ স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা ভুল করলে অপরের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাকে সাহায্য করা বা সংশোধন করা। এজন্য এ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের কার্যক্রম জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি নাগরিক তার সমালোচনা করে তা সংশোধনের অধিকার রাখে। এ আদর্শের অনিবার্য ফল আইনের শাসন।[৫]

ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিচারালয়ে উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে সাধারণ অপরাধীর মত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য এবং সাধারণ আসামীর মতই তাঁর বিচার হবে।[৬]

শান্তির আকাঙ্খা ও ধৈর্যশীলতা মুসলমানদের জাতীয় জীবনে এক উজ্জ্বল দিক। ইসলাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়। কুরআনের ঘোষণা, "কাফির যদি সন্ধি করার জন্য নতি স্বীকার করে তবে তুমি তা গ্রহণ কর এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন।"[৭] সন্ধি ভঙ্গ করলে তার বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "সন্ধিতে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির বিশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা আছে মনে করলে উহার সন্ধি ফেরত দাও। ফলে উভয় দলই সমান হবে। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের মাত্রই ভালবাসেন না।"[৮]

স্বাধীনতা অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় মানুষের মৌলিক অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন আমলা, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানেরও বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।[৯] বাকস্বাধীনতা না থাকলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এভাবে যে সমস্ত মূল্যবোধ ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহায়ক সেগুলোর অনুশীলন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তাদের প্রয়োগ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি।[১০]

মানবতার ঐক্য বিধানের জন্য মহানবী (স.) তাঁর উম্মতের কাছে যে দ্বীনকে সমস্ত পৃথিবীর ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে দিলেন তা কোন নতুন ধর্মমত নয়। এটা সেই একই ধর্ম, যা প্রকৃতির গভীরে প্রোথিত, যা সকল জাতির নবীদের কাছেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং চিরন্তন তার কর্মপ্রবাহ। ইসলাম মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, মানুষের সামগ্রিক চেতনার পরিপূর্ণ পরিচয়। আমীর আলী বলেন, "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমান কালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎকর্ম, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশী প্রেম, সার্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১১]

---

১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৮
২. আল-কুরআন, ৪:৫৯
৩. Kazi Ayub Ali, An Introduction to Islamic Culture, P. 18
৪. Abul Ala Maududi, Islamic Law and Constitution (Tr. Khurshid Ahmed), Dhaka, 1969, P.145.
৫. শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৬. Kazi Ayub Ali, Op.cit, P. 18
৭. আল-কুরআন, ৮:৬১
৮. আল-কুরআন, ৮:৫৮
৯. শামছুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.৭৮
১০. শাহেদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১১. Sayed Amir Ali, Op.cit, P.178

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। মানুষের জ্ঞান, বিশেষত বস্তুনির্ভর জ্ঞান আপেক্ষিক হওয়া সত্ত্বেও সীমিত জ্ঞানকে অবলম্বন করে বিভিন্ন মানুষ নিজেদের জন্য জীবন বিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রয়াস পেয়েছে মানব জীবনের মূল সুর আবিষ্কারের। এ সব করতে গিয়ে তারা মানব জীবনের এক এক দিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অন্য দিকগুলোর প্রতি করেছে অমার্জনীয় অবহেলা। ফলে তা সমাজে ডেকে এনেছে সংকট, সংঘাত আর অভিশাপ। ইসলাম জীবনের কোন বৃত্তিকেই তুচ্ছ মনে করে না, আবার কোনটিকেই জীবনের একমাত্র নিয়ন্তাও মনে করে না। তাই ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ চায়। আর এটাই ইসলামী সংস্কৃতি[১] এটাই মানব সত্তার পূর্ণ বিকাশ তথা মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার পরম পরিণতি লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

পাশ্চাত্য মনীষীদের অনেকেই ইসলামের এই অপরিসীম প্রভাব ও প্রাণশক্তিতে উৎসাহিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যত মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা খোঁজে পেয়েছেন ইসলামেই। ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়, "দু'টি সুস্পষ্ট সংকট দেখা দিয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক অপরটি বস্তুগত। কসমোপলিটান প্রলিতারিয়েতের (তথা পাশ্চাত্য মানবতা) যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে গোষ্ঠী সচেতনতা ও অ্যালকোহল। এ দু'টি কুৎসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামী চেতনা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে, যা ভেবে দেখার বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজে যদি তা গৃহীত হয়, তবে উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার বিলোপ ইসলামের উল্লেখযোগ্য নৈতিক সাফল্য। সমকালীন দুনিয়ায় যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইসলামের এই নীতি প্রচার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ---- এটা সহজেই বোধগম্য যে, ইসলামী চেতনা সৃষ্টির কাজ হবে বিশ্বে শান্তি ও সহনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

অ্যালকোহলের কুপ্রভাব এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ তাকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।---- বস্তুতপক্ষে এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেও কোন একটা সম্প্রদায়কে সামাজিক অনাচার থেকে মুক্ত করা যায় না, যতক্ষণ না তাদের মুক্তির আকাংখা থাকে, সেই আকাংখাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত তৎপরতায় রূপায়িত করার ইচ্ছা সৃষ্টি না হয় এবং সেই জনগোষ্ঠীর অন্তর থেকেই তা জাগ্রত না হয়। আজ পাশ্চাত্য 'অ্যাংলো স্যাকসন' প্রশাসকরা তাদের অধীনস্থ নেটিভদের স্বাভাবিক বর্ণ পার্থক্যের কারণে নিজেদেরকে আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নেটিভদের ধর্মান্তর করণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি কমই আশা করা যায়। এক্ষেত্রেই ইসলাম যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সম্প্রতি দ্রুত গড়ে উঠা এসব গ্রীষ্মাঞ্চলীয় উন্মুক্ত সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এক ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। যা একই সাথে দিয়েছে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা। --- তাই ভবিষ্যতের পাতায় আমরা মন্তব্য রাখছি, তাহল পাশ্চাত্য সমাজের কসমোপলিটান প্রলিতারিয়েতদের সরিয়ে দিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় এর জাল বিস্তৃত হবে এবং সমগ্র মানবতা ইসলাম কবুল করবে। এরপর আমরা অনুমান করতে পারি সুদূর ভবিষ্যতে সমাজে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে ইসলাম কতিপয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।"[২]

এইচ.এ.আর গীব বলেন,"পাশ্চাত্য দুনিয়ার চরম বিরোধী মতবাদগুলোর মধ্যে ইসলাম এখনও ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। একদিকে যেমন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অরাজকতার বিরোধিতা করে তেমনিভাবে রাশিয়ানদের দমনমূলক সাম্যবাদেরও বিরোধিতা করে। অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইসলাম ততটুকু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়নি যেমন চলছে আজকের দিনের ইউরোপ ও রাশিয়ায়। ---- ইসলামে প্রত্যেক নাগরিক তার সম্পদের এক দশমাংশ সমাজের জন্য দান করার ব্যবস্থা থাকায় সাম্যবাদী মতবাদসমূহের যোগ্যতা এতে রয়েছে। ইসলাম অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়, ব্যাংকিং পুঁজি, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বিশেষ প্রয়োজনে পরোক্ষ কর আরোপ ইত্যাদির বিরোধিতা করে। কিন্তু পিতা ও স্বামীর অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এবং ব্যবসার মাধ্যমে পুঁজি সংগঠনের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। ফলে ইসলাম বুর্জোয়া

---

১. আবুল হাশিম, 'ইসলামী সংস্কৃতি' ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৬১

২. Arnold Toyenbee, Civilization on Trial, London, 1959, P.P. 205, 299

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদ ও বলশেভিক সাম্যবাদ এই মতবাদ দু'টির মধ্যবর্তী অবস্থান দখল করে আছে। অপরদিকে নিরবচ্ছিন্ন মানবতার সেবা করার প্রচেষ্টা ইসলামে রয়েছে। ইউরোপের চাইতে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক ও ঘনিষ্টভাবে ইসলাম প্রাচ্যের পাশে এসে দাঁড়ায়; ইসলামের রয়েছে আন্তঃবর্ণ সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের চমৎকার ঐতিহ্য। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সমমর্যাদা ও সুযোগ প্রদানের এত উদ্যোগ কোন সমাজ নেয়নি। এবং এতবেশী সফলতা আর কোন সমাজ অর্জন করতে পারেনি। --- বিভিন্ন বর্ণ এবং ঐতিহ্যের মধ্যে মীমাংসার অযোগ্য সমস্যা সমূহের পূর্ণ মীমাংসা করার ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত দুই বৃহৎ সমাজের মধ্যে বিরোধিতার পরিবর্তে যদি সহযোগিতা কায়েম করতে হয় তবে ইসলামের মধ্যস্থতা হবে অপরিহার্য শর্ত। প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপ যেসব সমস্যার মুকাবিলা করছে তার সমাধান বহুলাংশে ইসলামের হাতে রয়েছে। কিন্তু ইউরোপ যদি ইসলামের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেয় তবে উভয়ের পরিণতি হবে মারাত্মক।"[১]

জর্জ বার্ণার্ড শ বলেন, "আশ্চর্য প্রাণশক্তির জন্য মুহাম্মদের ধর্মকে আমি সশ্রদ্ধ মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মানবিক অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল সকল স্তরকে সমন্বিত করতে সক্ষম যার ফলে তা সকল যুগের কাছে আবেদনশীল। আমি তাঁকে সেই আশ্চর্য মানবকে অনুধাবন করেছি এবং আমার ধারনায় খ্রীস্টবিরোধী হওয়া দূরে থাক, তাকে মানবতার ত্রাণকর্তা বলে চিহ্নিত করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর মত একজন ব্যক্তি যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক হয়ে আসতেন, তাহলে এমন এক পদ্ধতিতে সকল সমস্যার সমাধান রচনায় তিনি সফল হতেন, যাতে করে বিশ্বে বহু আকাংখিত সুখ ও শান্তি নেমে আসত। মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী দিনের ইউরোপের কাছে তা সরাসরি গৃহীত হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা ইতিমধ্যেই গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে।"[২]

---

১. H.A. Gibb, Whither Islam, London, 1932, P.379.

২. George Barnard Shaw, The Genuine Islam, Singapore, Vol-1, 1936.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে মানবাধিকার:

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, সহজাত ক্ষমতার সৃজনশীল বিকাশ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। এগুলো এমন অধিকার যেগুলো ব্যতীত মানুষ সত্যিকার মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না। অধিকারগুলো মানুষের মূল্য ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষরূপে জন্মলাভ করার কারণে তার জন্মগত অধিকার। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।[১] তাই সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সমভাবে এ অধিকারগুলো প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বলেই সম্ভবত এসব অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। Encyclopedia Britannica-তে এ অধিকারগুলোকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রাপ্য মানুষের অধিকার হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে - "Rights thought to belong to the individual under natural law as a consequence of his being human"[২] প্রকৃতপক্ষে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সহজাত, সর্বজনীন ও অহস্তান্তরযোগ্য (Inalienable) কিছু অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।[৩]

মানবাধিকারের সংজ্ঞা :

UNO এর Universal Declaration of Human Rights, 1995-এর Preamble-এ মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে "............ recognition of the inherent dignity of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom justice and peace in the world."[৪] অন্যভাবে বলা যায়, "Human rights are mostly inherent and natural rights. The execution, Preservation or enjoyment of these rights are not aboigenetic. Without the effective environmental and structural foundation the enjoyment of human rights is simply impossible."[৫]

R.J.Vincent বলেন, "Human rights are the rights that every one equally has by virtue of their very humanity and also by virtue of their being grounded in our appeal to our human nature."[৬] অর্থাৎ মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে নির্দেশ করে যেগুলো শুধু মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের সমানভাবে রয়েছে এবং মানব প্রকৃতির জন্য মানুষ এ সব অধিকারের প্রত্যাশা করতে পারে।

অন্যদিকে Gealirth Alan বলেন, "Human rights are aspecies of moral rights in which all persons are equal simply because they are humans. Such rights can be arguable or justification though a universal set of valid moral principle."[৭]

The New Encyclopedia Britanica-তে মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Rights thought to belong to the individual under natural law as a conseuence of his being human. The charted of U.N. affairs a faith in foundamental human rights in the dignity and worth of the human person in the equal right of men and women and of nation large and small."[৮]

মুহাম্মদ জমির বলেন, "Human rights have gradually evolved over the years and are based on mankind's increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will recieve respect and protection."[৯]

এ প্রসঙ্গে মোস্তফা জামান ভূট্টো বলেন, "মানবাধিকার হচ্ছে সেই অধিকার যা মানুষকে সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিময় জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষকে বিশিষ্টতা প্রদানে সহায়তা করে। বলা যায় কারও মানবাধিকার হরণ করা হলে সে আর সুস্থ মানুষ থাকে না। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া চিন্তাশক্তি উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা মানুষের সহজাত, কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক না সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। তাই রাষ্ট্র, সরকার কিংবা অন্য কোন শক্তি মানুষের এ সব অধিকার যদি কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে ঐ মানুষের মানবাধিকারই কেড়ে নেয়া হয়। হরণ করা হয় সহজাত মানবিক বৈশিষ্ট্য।"[১০]

---

১. আল-কুরআন সুরা বানী ইসরাইল, আয়াত-৭০

২. The New Encyclopedia Britannica, Founded 1768, 15th edition, printed in U.S.A. Vol. 5, P. 200.

৩. U. N. O-এর Universal Declaration of Human Right, 1945-এর preamble.

৪. Moses Moscowity, Human Rights and World Order, Occana publications, inc. New Yark, Appendix-1, P. 199.

৫. Begum Rokeya, 'Human Rights–An overview in Historical Perspective' The Journal of Social Development, Vol. 12, No-1, Dec. 1997, P. 185

৬. As quated Dr. D. P. Khanna, IPS : Reforming Human Rights, P. 16.

৭. Geatirth Alan, Human Rights : Essays on Justifications Application, Chichago University Press, 1982, P. 1.

৮. The New Encyclopedia Britanica, Vol. V, 1978, P. 200.

৯. Muhammad Zamir, Human Rights : Issues and International Law, UPL Dhaka, 1990, P. 1

১০. মোস্তফা জামান ভুট্টো, 'মানবাধিকার নিয়ে ভাবনা' Amity-a-Voice of Humanity, Vol-1, No-1, May-2002, P. 1.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে মানবাধিকার প্রসঙ্গটি গভীরতর ও ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যাত হবার দাবী রাখে। বিচারপতি মুনিম ভারতের আইনমন্ত্রী আম্বেদকর এর বক্তব্যের আলোকে বলেছেন, "The Islamic veiws of the objects of religion, society and the state being completety differentn from the western concepts. Muslim jurists would not seadily admit the truth of these observations. In essence, the Islamic community or the state, according to such view, must strive for the fulfilment of the law as revealed in the Quran and supplimented by the sunnah (the Practices and sayings of the prophet.)"[১]

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মের বাণী ছিল আল্লাহর একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই সঙ্গে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরহঙ্কার মূল্যবোধের আলোকে মানবজীবনকে সর্বাঙ্গীন করা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সৃষ্টি করে আইনের মাধ্যমে মানব সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠা।[২] আল কুরআন ও রাসূল (স.) এর সুন্নাহতে মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলাম মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক ফলপ্রসূ দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। মহানবী (স.) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদীনা প্রজাতন্ত্রে ৬২২ সালে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান "মদীনা সনদ" এ সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম ও অন্যান্য মর্যাদাসহ সকলের জন্য অনেকগুলো অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইসলামী আইনে সংযোজিত মানবাধিকার মৌলিক অধিকারের নীতিসমূহই বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক ব্রিফল্ট তাই বলেছেন, "The ideals of freedom for all human beings, of human brotherhood, of the equality of all men before the law, of democratic Government by consultation and universal suffrage, the ideals that inspired the French Revolutin and the Declaration of Rights that guided the framing of the American Constitution and inflamed the struggle for independence in the Latin American countries were not inventions of the west. They find their ultimate inspiration and source in the Holy Quaran. They are the quintessence of what the intelligentsia of Mediaeval Europe acquired from Islam over a period of centuries throgh the various channels of Muslim Spain, Sicily, the Crusaders and of the ideals propagated by the various societies that developed in Europe in the wake of the Crusades inimitation of the brotherhood associations of Islam."[৩]

মানবজাতি সমকালীন মানবাধিকার মতবাদের উন্নয়ন ও এর এ সম্পর্কিত উৎস ইসলামী ধারণা থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য ধারার মানবাধিকারের সাথে ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মানবাধিকার পরিধি ও তাৎপর্যগত দিক দিয়ে পার্থক্য পূর্ণ হলেও বর্তমানে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন অধিকারসমূহ অধিকতর অর্থবহভাবে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে।[৪] তদুপরি এসব প্রচলিত ধরনের মানবাধিকার ছাড়াও মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব ও বিকাশ তথা কল্যাণের স্বার্থে ইসলামে সূক্ষ্মতরভাবে আরও অসংখ্য অধিকার ও কর্তব্য উল্লিখিত আছে। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মে ব্যক্ত উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার গুলো হল -

জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তা :

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনের অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি অধিকার। কেবলমাত্র এ অধিকারটি প্রাপ্তির পরই মানুষ অন্যান্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। মানুষের জীবনের অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন-

---

৯. F. K. M. Munim, "Rights of the Citizen under Constitution and law", Bangladesh Institute of Law and International Affairs Dhaka, 1975, P. 2.

১০. আবুল কাসেম, "মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে মানবাধিকার কর্মীর ভূমিকা", বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.

৩. Quoted by M. Ershadul Bari, Human Rights in Islam with special reference to women rights, paper presented at the International Seminar on Human Rights in Islam, 5th Oct. 1994. Sonargaon Panpacific Hotel, Dhaka, Bangladesh, P. 5.

৪.সৈয়দ শওকতুজ্জামান, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামজল্যাণ, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৬৮.

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ :

কুরআন ও সুন্নাহতে মানুষ হত্যাকে এক জঘন্য পাপ ও আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং হত্যাকারীকে হুদূদ[১] পর্যায়ের শাস্তি "কিসাস" বা মৃত্যুদন্ডে (অবস্থাভেদে অন্য দন্ডে) দন্ডিত করা হয়েছে।[২] যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছে।"[৩] তোমরা এখন কোন ব্যক্তিকে হত্যা কর না, যাকে আইনগত সিদ্ধান্ত ব্যতীত হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন।"[৪] কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "আমি বনী ইসরাইলের প্রতি (এ বিধান) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হ্যা করল। আর যে কোন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে।"[৫] কুরআনের এই আয়াতে "একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার মাধ্যমে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়" -এ উক্তি করে হত্যাকর্মের জঘন্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, একজন মানুষকে জীবিত রাখাকে সকল মানুষকেই জীবিত রাখার মত কর্ম হিসেবে উল্লেখ করে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটি নিরপরাধ মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা জীবন ও বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, জীবন বেঁচে থাকবে এবং এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিকাশ ও উন্নয়ন দ্বারা এ বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভরে উঠবে। সুতরাং ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করার মাধ্যমে মূলত সমগ্র মানবজাতির জন্য সম্ভাব্য কল্যাণ ও সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয়। রসূলুল্লাহ (স.)ও নর হত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, "সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষকে হত্যা করা"।[৬] তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ মানুষকে (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হত্যা করে, সে এমনকি বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না।"[৭]

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবনের এ প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন কোন পরিস্থিতিতেই অনুমোদনযোগ্য নয়, কেবলমাত্র দু'টি কারণ ব্যতীত- এক. কেউ কোন নির্ভরযোগ্য আদালতে দন্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠিত করেছে বলে প্রমাণিত হলে এবং দুই. কোন ব্যক্তি কোন নির্ভরযোগ্য আদালতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে দন্ডার্হ হলে। এ দু'টি পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য যেকোন পরিস্থিতিতে মানুষের বেঁচে থাকার সর্বজনীন অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। এ অধিকার লঙ্ঘনকারী শরীয়া আইনে দন্ডার্হ অপরাধ সংঘটনকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পেশাগত, মর্যাদাগত, রাজকীয় বা কূটনৈতিক বিশেষ মর্যাদা (Royal pregative and diplomatic immunity) নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য বিচার-বিবেচনার একই মূল্যবোধ ও মান অনুসৃত হয়েছে।

আত্মহত্যা নিষিদ্ধ :

আত্মহত্যা প্রাণসংহারের এক অমানবিক ও কাপুরুষোচিত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যাকারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে জীবনের মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে। আল-কুরআনে এ প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপ্রবণ।"[৮] সুতরাং আত্মহত্যা না করে বরং নিজের অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের প্রতাশী হতে কুরআনে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগানো হয়েছে। শরীয়া আইনের দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকারী সৃষ্টিকর্তার সকল পার্থিব ও অপার্থিব অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়। এ কাজে সহায়তাকারীও তা'যিরের দন্ডে দন্ডার্হ হয়ে থাকে।[৯]

নবজাতক হত্যা নিষিদ্ধ :

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকে আরব সমাজে নবজাতক বিশেষত মেয়ে শিশুদেরকে জন্ম লাভের পরপরই দারিদ্রের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। ইসলাম শিশু হত্যার এ জঘন্য প্রবণতাকে দন্ডার্হ অপরাধ ঘোষণা করে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে।[১০] কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনেরাপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক জঘন্য অপরাধ"।[১১]

---

১. হুদূদ শাস্তি হচ্ছে যা কুরআনে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। এর বিপরীতে রয়েছে তা'যির এর শাস্তি যা ইসলামী আদালত অবস্থাভেদে নির্ধারণ করে থাকে।
২. দন্ডার্হ নরহত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, গাজী শামছুর রহমান, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারি আইনের সংশোধন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃ. ৩০৫-৩১০.
৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৮
৪. আল-কুরআন, সূরা বানী-ইসরাইল, আয়াত-৩৩
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত-৩২
৬. আল-হাদীস; M. Ershadul Bari, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৭. আল-হাদীস; M. Ershadul Bari, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৮. কুরআন, সূরা-আন-নিসা, আয়াত-২৯
৯. দ্রষ্টব্য গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১
১০. দ্রষ্টব্য গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
১১. আল-কুরআন, সূরা বনী-ইসরাইল, আয়াত-৩১

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে প্রশ্ন করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"[১] এই আয়াতে নিরপরাধ নবজাতকের জীবনের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে প্রশ্নাকারে মানুষের চেতনার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে যাতে করে তারা (মানুষেরা) তাদের (শিশুকন্যাদের) জীবনের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তৎপর হয়।

নবজাতক বিশেষত মেয়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যদি কোন পরিবারে একের পর এক মেয়ে শিশু জন্মলাভ করে এবং তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেন, তাহলে সে শিশুরা তাদের পিতা-মাতাকে দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা করবে।"[২] রাসূলের এ ঘোষণায় মেয়ে শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গর্ভপাত নিষিদ্ধ :

জীবনের অধিকারকে হরণ করা হয় বলে ইসলাম গর্ভপাতকে অনুমোদন দেয় না বরং এতে ফৌজদারি আইনের আওতায় দন্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। 'ইসকাত-ই-হামল'[৩] ও 'ইসকাত-ই-জানীন'[৪] -এ উভয় পদ্ধতিতে গর্ভপাত সংঘটন ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (তা'যির-এর দন্ডে দন্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য) হয়েছে।

দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার অধিকার :

মানবেতিহাসের শুরুতে মানুষ ছিল স্বাধীন। পরবর্তীকালে দাস প্রথার অভিশাপ স্বাধীনতার এ মূল্যবান অধিকার থেকে মানব সমাজের একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত করে। কখন কিভাবে দাসপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল তা বলা কঠিন। সম্ভবত যুদ্ধের পর বন্দীদেরকে বাঁচিয়ে রেখে দাস-দাসীতে পরিণত করার রেওয়াজ থেকে উদ্ভব হয় এ অমানবিক প্রথাটি। Old Testament-এর আব্রাহামের (কুরআনে বর্ণিত নবী ইব্রাহীম) কাছে সারাহ্ কর্তৃক হাজেরাকে দাসী হিসেবে অর্পন এবং জোসেফ (কুরআনে বর্ণিত নবী ইউসুফ) মিশরের খোলা বাজারে দাস হিসেবে বিক্রিয় করার ঘটনা থেকে দাসপ্রথার অতি প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও পারসিয়ান সভ্যতায় দাসদের অবস্থা ছিল মানবেতর। তাদের নাগরিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না।তাদেরকে হত্যা, নির্যাতন ও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে দাসপতিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে দাসদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন পাশ করা হয় যাতে একজন শ্বেতাঙ্গকে অপমানিত করার অপরাধে একজন দাস বা দাসীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা বা যে কোন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি প্রদানের অধিকার স্বীকৃত হয়।

শুধু দাস-দাসীরাই নয়, বরং যে সকল স্বাধীন পুরুষ দাসীদের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হত তারাও সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। Abdullah Kannoun এ সম্পর্কে বলেছেন, "Any American marrying a slave woman was not allowed to hold any public office in South America, lest he should be sympathetic to the Negroes. That is to say, such person lost some of his civil rights as if he had commited a crime.[৫] ফ্রান্সের অধিবাসীদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন- "The attitude of the Franks, the early french, towards a free man who marrie a slave girl was so stem that he lost his own freedom."[৬]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আত-তাকভীর, আয়াত-৮-৯

২. আল-হাদীস, মুসনাদ, পৃ. ৮৮

৩. 'ইসকাত-ই-হামল' হচ্ছে এমন নারীর গর্ভপাত ঘটানো যার গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গসমূহ গঠিত হয়নি। অনুরূপ গর্ভপাত সৎ বিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্য বা তার প্রযোজনীয় চিকিৎসা করবার জন্য না করা হলে তা দন্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ঐরূপ নারীর সম্মতি নিয়ে তা ঘটানো হলে অপরাধ সংঘটনকারী যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে- যার মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে- দন্ডনীয় হবে। আর তা যদি ঐরূপ নারীর সম্মতি ব্যতীত ঘটানো হয় তা হলে সংঘটনকারী যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে - যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে, দন্ডনীয় হবে। গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৪. 'ইসকাত-ই-জানীন' হচ্ছে এমন নারীর গর্ভপাত ঘটানো যার গর্ভস্থ কিছু অঙ্গ বা অবয়ব গঠিত হয়েছে। অনুরূপ গর্ভপাত সদ্বিশ্বাসে উক্ত নারীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে না ঘটানো হলে তা দন্ডার্হ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি (ক) গর্ভস্থ শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে ইসকাত-ই-জানীন সংঘটনকারী দিয়াত এর কুড়ি ভাগের এক ভাগ দন্ডে (খ) যদি শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় এবং অপরাধীর কোন কাজের ফলে মারা যায়, তাহলে পূর্ণ দিয়াতের দন্ডে এবং (গ) তা'যির স্বরূপ যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, দন্ডার্হ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ নারীর গর্ভে যদি একাধিক শিশু থাকে তাহলে অপরাধী ঐরূপ প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক 'দিয়ত' বা তাযির - অবস্থাভেদে যা প্রযোজ্য হয়, দন্ডে দন্ডার্হ হবে। গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৫. Quoted in Abdullah Kannoun, Islam is the First anti-Slavery Religious System of the World. The Islamic Review Journal, Woking, Survey, England, July-August, 1966, P. 37

৬. Ibid, P. 37

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাস-দাসী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল স্বাধীন মানুষেরা নিগৃহীত হতে থাকে যে পর্যন্ত না ১৮৯০ সালে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করে ব্রাসেলস্ কনফারেন্সে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১] দাসপ্রথার অমানবিকতা ও এ সম্পর্কিত মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রাচীনকালে দার্শনিকগণ কার্যকর কোন চিন্তাধারা পেশ করেননি। "মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়' এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের অধিকাংশ দার্শনিক দাসপ্রতাকে সমর্থন করেছেন। দাসপ্রথা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতামত উল্লেখ করে Abdullah Kannoun বলেছেন, "In his opinion, mankind consisted of two catagories - the free and the slaves - and to him some people were slaves by their very nature."[২] গ্রিক, রোমান, পারসিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহে, ইহুদি, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মে এমনকি আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকায়ও প্রথম দিকে দাসপ্রথা স্বীকৃত প্রথার মর্যাদা পায়। এ থেকে অনুমিত হয় যে, এ প্রথাটির নৈতিকতা সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টির প্রাথমিক কৃতিত্ব ইসলামেরই প্রাপ্য। কেননা, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাসপ্রতার বিরোধিতা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। পক্ষান্তরে, ইসলাম এর অভ্যুদয়কাল অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতেই এ প্রথার বিরোধিতা ও এর বিলুপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এ কারণে ইসলামকে "The First Anti Slavery Religious System of the World" হিসেবে অভিহিতকরা হয়েছে।[৩]

মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার এক সর্বজনীন আবেদন নিয়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে যাতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন। মানুষ প্রভু বা দাস নয়। প্রাচীনকাল থেকে যে সকল পদ্ধতিতে দাসপ্রথা গড়ে ওঠে সেগুলো ছিল : (ক) শত্রুদের দখল করে সেখানকার সাধারণ মানুষ ও সৈন্যদেরকে আটক করার মাধ্যমে ব্যাপক দাসত্ব সৃষ্টি করা, (খ) স্বাধীন মানুষদের অপহরণ ও আটকের মাধ্যমে দাস বানানো, (গ) ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে স্বাধীনতা হরণ, (ঘ) দারিদ্রের কারণে সন্তান-সন্ততিকে বিক্রয় করার মাধ্যমে দাসত্বে নিয়োজিত করা ইত্যাদি। ইসলামে এ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে সাময়িক প্রয়োজনহেতু শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসীরূপে গ্রহণ করার অনুমোদন (কিছুতেই বাধ্যতামূলক নয়) দিলেও অন্য সকল পদ্ধতিকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়ে নতুনভাবে দাস-দাসী তৈরি হওয়ার উৎসপথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স,) বলেছেন, "শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে আমি ফরিয়াদি হব। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা একজন স্বাধীন মানুষকে আটক করে, তাকে বিক্রি করে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করে।"[৪] ইসলামের কোন দলিল বা গ্রন্থে যুদ্ধবন্দিত্ব ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে দাস-দাসী সৃষ্টি করার অনুমোদন নেই। ইসলামের আবির্ভাবকালে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসত্ব থেকে রক্ষা করার এমন কোন আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান ছিল না যা দ্বারা মুসলমানগণ তাদের প্রতিপক্ষকে যুদ্ধবন্দীদের দাস না বানানোর ব্যাপারে বাধ্য করতে পারতেন। সুতরাং, কৌশলগত কারণে ও নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলাম সাময়িকভাবে যুদ্ধবন্দিগণকে দাস-দাসীরূপে গ্রহণের বিষয়টিকে অনুমোদন করে। তবে, তাও এ শর্ত সাপেক্ষে ছিল যে, (এক) অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক মুক্তকরণ, (দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তকরণ, (তিন) বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তকরণ। যখন এ তিনটি ব্যবস্থার কোনটির মাধ্যমে বন্দিমুক্তি সম্ভব হবে না কেবলমাত্র তখনই যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমরা যখন তাদেরকে (শত্রুপক্ষকে) পরাভূত করবে তখন তাদের বন্দী করবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক কিংবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেবে।"[৫]

ইসলামে গৃহীত কয়েকটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থা সকল ধরনের দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছিল। ইসলামে গোটা দাস-ব্যবস্থার বিলুপ্তির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয় সেগুলো হল :

ক) তাকতিব (স্বাধীনতার লিখিত দলিল বা চুক্তিপত্র)-

'তাকতিব' ইসলামের এমন একটি দলিল যার মাধ্যমে দাস-দাসীগণ তাদের স্বাধীন বৃত্তির দ্বারা উপার্জিত সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য দাসপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার অধিকার লাভ করে। কুরআনে সম্পদশালী দাসপতিদের এ ব্যবস্থার অধীন দাস-দাসীদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের আবেদন জানানো হয়।[৬]

খ) তাদবির (দাসপতির মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভের অধিকারসম্পর্কিত চুক্তি)-

এ ব্যবস্থায় কোন দাসপতি যদি তার কোন দাস বা দাসীকে বলতো, "আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীনতা লাভ করবে", তাহলে উক্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় উক্ত দাস বা দাসীকে বিক্রি করা, উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করা বা পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হত এবং দাসপতির মৃত্যুর পর উক্ত দাস বা দাসী স্বাধীনতা লাভ করত।[৭]

---

১. Ibid, P. 37
২. Ibid, P. 37
৩. Ibid, P. 36
৪. আল-হাদীস, বুখারী ও ইবনু মাযাহ; Abdur Razzaq প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
৫.কুরআন,সূরা মুহাম্মদ, আয়অত-৪
৬. বিস্তারিত দেখুন, বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী, আল-হিদায়া, প্রকাশক কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, করাচী, ২য় খন্ড, দাসমুক্তি বা স্বাধীনতা অধ্যায়, পৃ. ৪৬৯-৪৭২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২-৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

গ) ইসতিলাদ (প্রভুর সন্তান জন্মদানহেতু স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কিত আইনগত ব্যবস্থা)-

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন দাসী তার প্রভুর সন্তানের জন্মদান করলে সে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করত। এমতাবস্থায় তার প্রভুর পক্ষে তাকে বিক্রি করা বা পরিত্যাগ করার অধিকার থাকত না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "দাসীকে তার প্রভুর পক্ষের সন্তান স্বাধীন করে দেয়।"[১]

ঘ) দাসীর প্রসবকৃত সন্তানের স্বাধীনতার ব্যবস্থা-

এ ব্যবস্থায় প্রভু কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে কোন দাসী কোন সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করতো। এ সম্পর্কে আইনগত ভিত্তি ছিল এই যে, যেহেতু সন্তানটি প্রভূর শুক্রজাত সেহেতু প্রভুর স্বাধীনতা তাকে স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করেছে।[২]

ঙ) আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা-

ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদি কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দানের আইনগত ব্যবস্থা প্রণীত হয়। অবশ্য এর পাশাপাশি ষাটজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আহার করানো, ষাটটি রোজা রাখার ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এর একটি কারণ এই যে, যখন পৃথিবী থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হবার ফলে দাসমুক্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তকরণ সম্বব হবে না তখন মানুষ বিকল্প হিসেবে এ সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। উল্লেখ্য যে, এভাবে ইসলাম কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে দাসপ্রথা উচ্ছেদের পরোক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

চ) যাকাত ব্যবস্থা-

কুরআনে দাস-দাসীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার আইনগত ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের যাকাতের অর্থে যে বিপুল পরিমাণ দাস-দাসীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার সম্ভব ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ব্যক্তি দাসত্বের অবলুপ্তি সম্ভব হলেও ভূখন্ডগত দাসত্বের অবলুপ্তি আজও সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে যে সকল দেশ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রামে রত তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

ছ) স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি-

হযরত মুহম্মদ (স.) কর্তৃক দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দান একটি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ এবং সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের উপায় হিসেবে ঘোষিত হয়। হাদীসে একে এক মহান প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, দাসপতির প্রতিটি অঙ্গ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে নরকের অগ্নি থেকে মুক্তি লাভকরবে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যে মুসলমান একজন বিশ্বাসী দাস-দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ মুক্ত দাস-দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে দাসপতির প্রতিটি অঙ্গকে নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা করবেন।"[৩] উপযুক্ত ঘোষণার ফলস্বরূপ বহু দাসপতি দাস-দাসীদেরকে স্বাধীনতা দান করতে উদ্বুদ্ধ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাতষট্টি, হযরত আবু বকর অসংখ্য, হযরত আব্বাস সত্তর, হযরত ওসমান বিশ, হাকীম ইবনু হিযাম একশত, ইবন ওমর এক হাজার, আবদুর রহমান ইবনু আউফ ত্রিশ হাজার দাস-দাসীকে স্বাধীনতা দান করেন।"[৪]

এভাবে ইসলাম দাসমুক্তি ও দাসপ্রথার বিলুপ্তির জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি খুলে দিয়েছিল যার মাধ্যমে খলিফাদের আমলে আরবের সকল দাস-দাসী স্বাধীনতা লাভ করে এবং আরবের দাস প্রথার সমাধান এভাবে চল্লিশ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।

বিধিবহির্ভূত আটক ও নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের অধিকার :

সরকার বা সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থা কর্তৃক এমন কোন কার্য সম্পাদিত হওয়া যার দ্বারা নাগরিকগণের উপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুরুত্বর মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ও শাস্তি আরোপ করা যায়, ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে - "আর যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণকে শাস্তি প্রদান করে তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"[৫] রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার কথা ও হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন।"[৬] অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "মনে রেখো! যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিযিয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।"[৭]

---

১. আল-হাদীস, ইবনে মাজা ও দারুকুতনী, বোরহান উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩
২. বুরহান উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
৩. আল-হাদীস, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দ্বিতীয় সংস্করণ, করাচী, ১৯৬১, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৯৪
৪. মুহাম্মদ আবুল হাসান, তানযীমুল আশতাত, ৩য় সংস্করণ, দেওবন্দ, ২য় খন্ড স্বাধীনতা অধ্যায়, পৃ. ২১৮
৫. কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৮
৬. আল-হাদীস, ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ, মিশকাত আল-মাসাবীহ, এম বশীর হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১ম খন্ড, ঈমান অধ্যায়, পৃ. ১২
৭. আল-হাদীস, আবু-দাউদ, মোঃ আতাউর রহমান, ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৬, জুন ৯৩, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়া আইন অনুসারে নির্যাতন, দমন, প্রতারণা অথবা গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের কাজ আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অসমর্থনযোগ্য। কোন ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষ্য দেয়া বা তথ্য সরবরাহের জন্য বল প্রয়োগ বা নির্যাতন করা, আদালতের পরওয়ানা (warrant) ব্যতীত পুলিশি তল্লাশি, মিথ্যা মামলা দ্বারা হয়রানি, গৃহবন্দিত্ব বা প্রতিরোধাত্মক আটক (preventive detention) যা নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার হরণ ও তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণ ঘটায় ইসলামে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ইসলামী আইন অনুসারে কোন ব্যক্তিকে অন্যের অপরাধের জন্য দায়ী করা বা দন্ড দেয়া যায় না। কুরআনে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অন্যের বোঝা বহন করেনা।"[১] ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে বা তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিচার করা বা আটক করাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মানহানিকর আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার :

সমাজের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থার মানহানিকর হস্তক্ষেপ ও কর্মকান্ড থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মূল্যবান নাগরিক অধিকার। ব্যক্তির মান-সম্মান, পদ-মর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতির হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে তার জীবনের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক বিকাশধারাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। তাই মানহানিকর আচরণের যত পন্থা হতে পারে, যেমন- অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, ভৎসনা, গালাগাল, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি কর্মকান্ড ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে- "পুরুষেরা অন্য পুরুষদের উপহাস করবেনা। হতে পারে তারা তাদের (বিদ্রুপকারীদের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অনুরূপভাবে নারীরাও অন্য নারীদের ঠাট্টা করবেনা। হতে পারো তারা তাদের (বিদ্রুপকারীদের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি (মানহানিকর উক্তি) করবে না, একে অপরকে আক্রমণাত্মক উপনামে আহ্বান করবে না বা কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিন্দা করবেনা, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করাকে পছন্দ করবে? তোমরা তো তাকে অপছন্দই করে থাক।"[২] নারী জাতির সম্ভ্রমের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে , "যারা পবিত্রমনা নারীগণের সম্ভ্রমে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে ও পরলোকে ধিকৃত হবে এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি অবধারিত।"[৩]

এভাবে ইসলামে মানহানিকর বিভিন্ন আচরণকে নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্ভ্রম ও মর্যাদার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইনগত সমতা লাভের অধিকার :

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে একটি কার্যকর আইনগত ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি মুকদ্দমার আইনগত প্রতিকার লাভের সর্বজনীন অধিকার প্রদান করে। ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণের মুকাদ্দমা ইসলামী শরী'আ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অমুসলিম নাগরিকগণ শরী'আ আইনের অধীনে তাদের মুকাদ্দমার নিষ্পত্তি চাইলে শরী'আ আইন অনুযায়ী তাও সম্পন্ন হবে। অন্যথায় প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর স্বীয় আইন অনুযায়ী তাদের মুকদ্দমা পরিচালনার নীতি ইসলামে অনুসৃত হয় যা ইসলামের সর্বজনীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অমুসলিম নাগরিকগণের মুকাদ্দমা তাদের নিজস্ব আইন অনুসারে পরিচালনা করার প্রেরণামূলক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কুরআনের নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়াতে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আর তাদের (ইহুদিদের) কাছে 'তাওরাত' রয়েছে যাতে আল্লাহর আইন আছে।"[৪] "আমি তাওরাত অবতারিত করেছি, এতে পথ-নির্দেশিকা ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ নবী, দরবেশ ও জ্ঞানীগণ-এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফয়সালা দিতেন।"[৫]

৬২২ সালে প্রণীত মদীনার আন্তর্জাতিক সনদে রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক ইহুদিদেরকে তাদের ধর্ম, আইন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদিসহ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম জাতিসত্তার অধিকার প্রদান করা হয়।[৬] পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (স.) ও অন্যান্য মুসলিম শাসক কর্তৃক খ্রীষ্ট, জরাথুষ্ট্র, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিও উপর্যুক্ত মূলনীতি অনুসৃত হয়।

---

১. আল-কুরআন, সূরা তুর, আয়াত-২১; সূরা আনআম, আয়াত-১৬৪
২.আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১১-১২
৩. আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত-২৩
৪. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত-৪৩
৫. কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত-৪৪
৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০-৫৭২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ যেভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে তার সৃষ্টি হিসেবে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর পার্থিব ও পারলৌকিক জগতের বিচারকার্যে সমতার অধিকার লাভ করে থাকে, অনুরূপভাবে তারা সমতার অধিকার পায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা "খিলাফত ব্যবস্থার" অধীনেও। আইনে সমতার অধিকার প্রদানের নীতি হচ্ছে ইসলামী সংবিধানের একটি ভিত্তিপ্রস্তর এবং যে সকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সভ্যতার বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ একটি মুল্যবোধ। আইনে সমতার মূলনীতি থেকে আইনের শাসন ও মানবিক স্বাধীনতার নীতি উৎসারিত হয়েছে।

ন্যায়বিচার লাভের অধিকার :

ইসলামে ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকর লাভ করে থাকে। ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ইসলামে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতা কিংবা আত্নীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও।"[১] অন্যত্র "তোমরা যখন কথা বলবে তখন ন্যায়ত কথা বলবে। যদি কোন আত্নীয় হয় তবুও আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে অর্থাৎ আল্লাহর আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করবে।"[২]

রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাব কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আবেগ যেমন আনুকুল্য, দয়া, ঘৃণা ক্ষোভ ইত্যাদির কারণে বিচারকের জন্য সুবিধামত আইনের ব্যাখ্যা দান ও রায় প্রদানের ন্যূনতম সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআনে বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "তোমরা বিচার করতে গিয়ে আবেগের বশবর্তী হবে না। তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।"[৩] "তোমরা যখন জনসাধারণের মধ্যে মুকাদ্দমা পরিচালনা করবে, তখন পূর্ণমাত্রায় ন্যায় পরায়ণতাসহ রায় দান করবে।"[৪]

অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার :

কোন ব্যক্তির অপরাধ আদালতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজে নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার এবং তদনুযায়ী আচরণ লাভ করার অধিকার ইসলাম প্রদান করে থাকে। কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়া তাকে দোষী সাব্যস্ত করা বা তার প্রতি অপরাধ আরোপ করা বা তাকে বাহ্যিকভাবে সৎকর্মপরায়ণ মনে হলেও নিতান্ত সন্দেহবশত তার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ এবং তদনুযায়ী আচরণ করা ইসলামী আইনে হারাম ও দন্ডার্হ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা বেশি সন্দেহ ও কুধারণা থেকে বেঁচে থাক কেননা কোন কোন সন্দেহ ও কুধারণা পাপ।"[৫] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা মিথ্যার নামান্তর।"[৬]

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ ইসলামের একটি নীতি। ইসলামী আইনে যা মুস্তাহাব বা পুণ্যার্হ কর্মরূপে বিবেচিত। কোন ব্যক্তির অপরাধ সমাজে ব্যাপকভাবে চর্চিত হতে থাকলেও যতক্ষণ না তা আদালতে প্রমাণিত হয় তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করার নীতিও কুরআনে উপস্থাপিত অন্যতম একটি নীতি। হিজরী সপ্তম বর্ষে 'গাযওয়া-ই-মুরাইসী' থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে হযরত আয়েশা (রা.)সম্পর্কিত ব্যভিচারের অলীক অপবাদ চর্চায় অনেক মুসলমানও অজ্ঞতাবশত অংশগ্রহণ করে। হযরত আয়েশার (রা.) বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধটি প্রমাণিত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাতে অংশগ্রহণের কারণে কুরআনে মুসলমানদেরকে তিরস্কৃত করা হয় এবং বলা হয়, "তোমরা যখন এ সম্পর্কে শুনেছিলে তখন বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করেনি এবং বলেনি যে, এটা নির্জলা অপবাদ।

যদি ইহকাল ও পরকালে তোমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করত। তোমরা একে তুচ্ছ ধারণা করেছিলে অথচ তা আল্লাহর কাছে গুরুতর বিষয় ছিল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও পুনরায় কখনও এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না।"[৭] সুতরাং ইসলামে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হবার অধিকারের স্থায়ী আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা, আয়াত-১৩৫
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, আয়াত-৫২
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা, আয়াত-১৩৫
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা, আয়াত-৫৮
৫. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২
৬. আল-হাদীস, মুহাম্মদ শাফী, মা'আরিফুল কোরআন, মহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা, ১৪২৩ হি., পৃ. ১২৮৩
৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত-১২-১৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার :

নাগরিকগণের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাসস্থান বা সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদিতে রাষ্ট্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থা, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির অবৈধ, অযাচিত ও নিবর্তনমূলক হস্তক্ষেপ তাদের (নাগরিকগণের) শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বিধায় এ থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার অন্যতম মূল্যবান মানবিক অধিকার। ইসলামে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। কুরআনে মানুষের এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে, "তোমরা গোয়েন্দা তৎপরতায় প্রবৃত্ত হবে না।"[১] তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে অনুমতি না নিয়ে বা গৃহবাসীকে অভিবাদন না করে প্রবেশ করবে না। কেননা, এটাই (অনুমতি গ্রহণ ও অভিবাদ) তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণপ্রদ পন্থা।[২] "গৃহের অভ্যন্তরে পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ নয়। বাসগৃহের সদর দরজার পথ দিয়ে প্রবেশ কর।"[৩]

কারও ব্যক্তিগত গুপ্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, ভিডিও ক্যাসেট টেপরেকর্ডার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়ে বা সেন্সর করা, টেলিফোনে আড়িপাতা বা টেলিফোনের কথাবার্তা গোপনে রেকর্ড করা, অর্থ-সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্যাদি জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করা। এ জাতীয় কর্মকান্ড নাগরিকগণের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, তাই ইসলামে এসব চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ সকল কাজে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "যারা মৌখিকভাবে ঈমান এনেছে বলে দাবি করে প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। তারা জেনে রাখ যে, তোমরা মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাবে না। কেননা, যে ব্যক্তি মানুষের গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় স্বয়ং আল্লাহ যার গুপ্ত তথ্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাকে চূড়ান্তভাবে অপমানিত করেন।"[৪]

বিনা অনুমতিতে কারও বাসগৃহে প্রবেশ করে তার ব্যক্তিগত বিষয় জানার প্রচেষ্টা চালানো ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম হিসেবে বিবেচিত। আবাসস্থলে মানুষ ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং অবসাদ দূর করে। অযাচিতভাবে বাসস্থানে প্রবেশ মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে। গৃহের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষ অসতর্কাবস্থায় থাকে বিধায় অনুমতি না নিয়ে প্রবেশের কারণে গৃহবাসীর বিরক্তি উৎপাদন ও অশ্লীলতার ব্যপ্তি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে বাসগৃহে প্রবেশ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত নীতিমালা কেবলমাত্র অপরের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং ব্যক্তির নিজস্ব এমন গৃহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য যেখানে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা বা মুহরিমা (বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ) নারীগণের বসবাসের ব্যবস্থা থাকে।

স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার :

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাইরে গমন ও পররাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এক বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা বিশ্বাসী। একারণে নির্দিষ্ট ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং সমভাবে বহির্বিশ্বের যে কোন স্থানে মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের ব্যাপারে ইসলাম কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না। ইসলামী রাষ্ট্র দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজ্যস্বরূপ যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্য অবারিত করে দিয়েছে। সুতরাং মানুষ তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার বলে বিশ্বের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা লাভ করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টজীবের জন্য এ পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন।[৫] তিনি তোমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে সুগম করে দিয়েছেন যাতে কের তোমরা যেখানে ইচ্ছামত বিচরণ করতে এবং তাঁর দেয়া আহার্য (জীবিকা) গ্রহণ করতে পার।"[৬] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "সমগ্র দেশ আল্লাহর আর মানুষ আল্লাহর বান্দা, তুমি যেখানে মঙ্গলজনক মনে কর বসবার কর।"[৭]

---

১. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২
২. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ২৭
৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৯
৪. আল-হাদীস, তিরমিযী ও আবু-দাউদ; মুহাম্মদ শাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৪
৫. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান, আয়াত ১০
৬. আল-কুরআন, সূরা মুল্ক, আয়াত ১৫
৭. আল-হাদীস, মাজমাউজ জাওয়ায়ীদ-লিল হায়সামী

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার :

ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না এ শর্ত সাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার দেয়। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে পররাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় আগত, নির্বাসিত বা বিতাড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজির জনগণকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। সে সময় মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি আশ্রয় প্রার্থীকে মদিনা প্রজাতন্ত্রে আশ্রয় প্রদানের নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, "অংশীবাদীদের কেউ যদি তোমার কাছে (মদীনায়) আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে। এরপর তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও।"[১] মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীগণের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও জনসাধারণের মনোভাব বর্ণনা করে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা (ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ) তাদের ভালবাসে যারা দেশ ত্যাগ করে তাদের কাছে আসে। আর তাদেরকে (দেশত্যাগীদেরকে) যা কিছু দেয়া হয় সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ লোভ বা ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না। তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে (আশ্রয় প্রার্থীগণকে) প্রাধান্য দেয়।"[২] আশ্রয়প্রার্থীদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দপূর্বক তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েচে মদিনা প্রজাতন্ত্রে।কুরআনে এরূপ সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এ ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ এবং আল্লাহ ও রাসূলকে সহযোগিতার কারণে ধনসম্পদ ও বাস্তুভিটা থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।[৩] কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভের পর আশ্রয়প্রার্থীগণকে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

জাতীয়তার অধিকার :

ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে কোন জাতির (কুরআনের পরিভাষায় কাওম বা উম্মাহ) অন্তর্ভূক্ত হওয়ার এবং তার দ্বারা পরিচিতি লাভের অধিকার প্রদান করে। তবে অধুনা জাতীয়তা বলতে বা বোঝায়, ইসলামে জাতীয়তার ধারণা তা থেকে পৃথক। আধুনিক জাতীয়তার ধারণা ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে মানবজাতির ভূখন্ডগত বিভক্তির ফলমাত্র। এরূপ জাতীয়তা কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধরণের মধ্যে চরম স্বাদেশিকতা এবং অন্য অঞ্চলের মানুষের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রত্যয় (superiority complex) সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের এ প্রত্যয় সর্বব্যাপী ঘৃণা ও অবজ্ঞার জন্ম দেয়।

কুরআনে আধুনিক জাতীয়তাবাদ-উপজাত উপর্যুক্ত মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। এ জন্য নয় যে, তোমরা একে (বিভক্তিকে) অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হিসেবে বিচেনা করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় সে ব্যক্তি যে সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ।[৪] কুরআনের এ আয়াতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তি মানুষের ন্যায়পরায়ণতা ও মহৎ অর্জনকে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলাম অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার চেয়ে বরং আদর্শগত জাতীয়তার ধারণাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ইসলামের এ জাতীয়তার ধারণা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভালবাসার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার :

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ করার অধিকার প্রদান করে। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে গড়ে তোলার জন্য পরিবার গঠনের অধিকারও দেয়। পরিবার এর বিস্তৃত পরিসরে সমাজের একক ও স্থাপক। সুতরাং সুস্থ ও স্তিতিশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অধিকার, একের প্রতি অন্যের কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৬
২. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত ৯
৩. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত ৮
৪. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাক্রম অব্যাহত রাখা এবং মনোগত প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ইসলাম যেমন বিবাহকে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করে তেমনি 'চিরকুমার ব্রত' গ্রহণকেও নিরুৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "বিবাহ আমার পন্থা, যে আমার পন্থার প্রতি অনাসক্ত হয় সে আমার আদর্শভূক্ত নয়।"[১] কৌমার্য ব্রতকে প্রত্যাখান করে তিনি বলেছেন, "ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্য প্রথার অনুমোদন নেই।"[২] কুরআনে কৌমার্যব্রত সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আর বৈরাগ্য, সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে।"[৩]

ইসলামে বিবাহ কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থা নয় বরং পারস্পরিক ভালবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে (এ ঐশী ব্যবস্থাপনায়) চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৪] ইসলামে বিবাহ এমন এটি সামাজিক চুক্তি যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। বৈবাহিক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। বৈবাহিক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর কোন পক্ষ যদি এ দাবি উত্থাপন করে যে, বিবাহে তার সম্মতি ছিল না, সে অবস্থায় ইসলামী আইনে সে বিবাহের বৈধতা থাকে না। তালাকের (বিবাহ বিচ্ছেদের) ব্যাপারেও ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে নিষ্পত্তির জন্য সালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা সমস্যা সমাধানের মনোভাব গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে সহায়তা দেবেন।"[৫]

সম্পত্তির মালিকানার অধিকার :

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা এ শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃত হয়েছে যে, সকল সম্পদে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশ ও অধিকার থাকবে এবং পুঁজিপতি শ্রমিক নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের কল্যাণ সমভাবে অর্জিত হবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৬]

ইসলামে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক শোষণ বা সংঘর্ষ-নির্ভর নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণমূলক ও ভ্রাতৃত্বসুলভ। এখানে একজন পুঁজিপতি যতক্ষণ না নিজের কল্যাণের অনুরূপ কল্যাণ শ্রমিকের জন্য কামনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অন্য ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।"[৭]

ইসলামে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (trustee) হিসেবে এর অর্জন, ভোগ ও বন্টনের অধিকার লাভ করে। এখানে যেমন কাউকে আল্লাহর দান (সম্পদ অর্জনের অধিকার) থেকে বঞ্চিত করা যায় না তেমনি কারও অধিকার থেকে সম্পদকে দখলচ্যুত করাও যায় না। প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হস্তগত করণ, বাজারে একচেটিয়া অধিকার লাভ, সংকট সৃষ্টি কিংবা কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্য মজুদ করণ, সুদের ভিত্তিতে ঋণ দান বা লোকসানের চুক্তি ব্যতীত লভ্যাংশ গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর"[৮] "আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাঁর দান পৌঁছে দেন। তাঁর দান প্রাপ্তিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নেই।"[৯] "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (পণ্যদ্রব্য) মজুদ করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ পৌঁছে দাও।[১০]

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুন নিকাহ, অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২. আল-হাদীস; Muhammed Ayenuddin, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ২৭
৪. আল-কুরআন, সূরা আর রুম, আয়াত ২১
৫. আল-কুরআন, সূরা আননিসা, আয়াত ৩৫
৬. আল-কুরআন, সূরা মাআরিজ, আয়াত ২৪-২৫
৭. আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম; মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৮. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ১০৩
৯. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩০
১০. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ, আয়াত ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের এ সকল আয়াতসহ আরও অসংখ্য আয়াতে এভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রদত্ত এ অপ্রকৃত ব্যক্তি মালিকানায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের নেই। ইসলাম প্রতিটি নাগরিককে উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ লাভ কিংবা স্থানান্তরিত করার অধিকার প্রদান করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "(উত্তরাধিকারের সম্পদ বন্টন হবে) ইষ্টিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে প্রদত্ত দান এবং ঋণ পরিশোধের পর।"[১]

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার :

ইসলাম মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্ব স্ব ধর্ম পালন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের নিমিত্ত উপাসনালয় নির্মাণ এবং ধর্মীয় আদর্শ প্রচারার্থে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বাধীনতা প্রদান করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাক্দাস অধিকারের পর সেখানকার খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বিগণকে এসব অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঘোষণায় বলেছিলেন, "ইসলামী সরকার তাদেরকে জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। তাদের গীর্জায় কেউ বসবাস করতে পারবে না, তাদের ক্রস ভাঙ্গতে পারবে না বা তাদেরকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে পারবে না।"[২]

কুরআনের দাবি অনুসারে ইসলামী মূল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মূল্যবোধ নেই।[৩] সুতরাং এ শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকাশ ও উপস্থাপনের এক বিশ্বজনীন ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর একক, যৌথ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত হয়েছিল।[৪] কুরআনে এ দায়িত্ব পালনের একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সুকৌশলপূর্ণ পন্থা অবলম্বন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "হে মুহাম্মদ! আপনার পালনকর্তার প্রতি তাদেরকে আহ্বান করুন কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।"[৫]

403663

কোন ব্যক্তির কোন মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার বা কোন মতবাদ বর্জনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যক্তির আগ্রহ ও ইচছাকে গুরুত্ব প্রদান করে। কিছুতেই প্রলোভন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ, নির্যাতন, শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত বা ধর্মচ্যুত করার নীতিকে সমর্থন করে না। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন যাতে তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়?"[৬] "আপনি বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা অবিশ্বাসী থেকে যাক।"[৭] কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে প্রতিটি ব্যক্তির যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার বা ধর্মহীন নাস্তিক থেকে যাওয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "ধর্ম সম্পর্কে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবিধানের ব্যবস্থার অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে সত্যপথ বিপথ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"[৮] একবার জনৈক সাহাবি স্নেহের বশীভূত হয়ে তার পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটি অবতারিত হয়। ইসলাম সম্পর্কে এ অভিযোগ রয়েছে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামের যে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা কাউকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার পাশাপাশি অন্যায়-অবিচার ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা খ্রীষ্টান মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা.)তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করে বরং উপর্যুক্ত আয়াতটি পাঠ করে ধর্মের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করার নীতিকে সমর্থন করেন।

ইসলাম যেমন ব্যক্তিকে ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হওয়ার স্বাধীনতা দেয় অনুরূপভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। কারও ধর্মানুভূতিকে আহত করে এমন কোন কাজ, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাহিত্য বা নেতিবাচক সমালোচনা-যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে, "এ সকল মানুষ (অমুসলিমগণ) আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যে সকল উপাস্যকে আহ্বান করে, তোমরা তাদের গালাগাল দিও না।"[৯]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা, আয়াত ১১
২.সাইয়্যেদ কুতুব, বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, গোলাম সোবহান সিদ্দিক অনূদিত, শতদল প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১৮-২১৯
৩. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮১, সূরা হাজ্জ, আয়াত-৬
৪. আল-কুরআন, সূরা ইমরান, আয়াত-১০৪
৫.আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত ১২৫
৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ৯৯
৭. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯
৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬
৯. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১০৮

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাক্-স্বাধীনতার অধিকার :

রাষ্ট্র, সমাজ ও মানব সভ্যতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইসলাম মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। তবে মতামত প্রকাশের এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ও অবাধ হবে না। কেননা, যে মতামত ও প্রকাশনা সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক তা অবশ্যই আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কুরআনে সমাজ ও সভ্যতার জন্য চিন্তা করার এবং এর অগ্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখার অধিকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে, "তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত মনোনীত করা হয়েছে যাতে তোমরা কল্যাণমূলক কাজে নির্দেশ দাও এবং গর্হিত কাজ নিষেধ কর।"[১]

কুরআনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক মদিনার জনসাধারণকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভিন্নমত পোষণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে এমন নির্ভিক মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিলেন যে, তারা নির্দ্বিধায় তাদের মতামত প্রকাশ করতেন। তিনি তার সাহাবীগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার আদেশ দিতেন। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অন্যায় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে সম্মানীয় জিহাদ হচ্ছে এমন ব্যক্তির জিহাদ যে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত মতামত প্রকাশ করে।"[২] স্বৈরাচারী শাসকদেরকে সমর্থনকারী ও সহযোগিতা দানকারী লোকদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন, "আমার পরে যারা শাসকদের অন্যায় কর্মকান্ডকে সমর্থন করবে তারা আমর অনুসারী নয়।"[৩]

সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাক-স্বাধীনতার চর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রথমত হস্ত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। তাতে সমর্থ না হলে মুখের ভাষা দ্বারা অর্থাৎ স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। তাতেও সমর্থ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে অন্তরে ঘৃণা করা উচিত। তবে শেষোক্ত পদ্ধতিটি দূর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে।"[৪] উপর্যুক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহর (স.) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদিনা প্রজাতন্ত্রে বাক-স্বাধীনতার এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। খলিফাগণের শাসনামলেও জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তাঁরা প্রায়শই বলতেন, "তোমাদের (জনসাধারণ) কল্যাণ নেই, যদি তোমরা আমদের সমালোচনা না কর এবং আমাদের কল্যাণ নেই, যদি আমরা তা না শুনি।"[৫] সুতরাং খিলাফতের শাসনামলেও যে বাক-স্বাধীনতার একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান ছিল এ ঘোষণা তেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বাধীনভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার :

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের কোন উম্মাহ্ বা সমাজভূক্ত হওয়া প্রাকৃতিক সত্য ও ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ফলমাত্র। যেহেতু কোন মানুষই সমাজ থেকে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না সেহেতু কোন দল বা উম্মাহর সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী স্বাধীন। এ স্বাধীনতা অনুসারে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, পরস্পরের মিলন, কোন দল বা সংস্থার অধীনে দলবদ্ধ হওয়া, সভা-সমাবেশ করা নিজেদের মধ্যে মক্তভাবে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করা, নিজেদের কল্যাণে কর্মসূচি প্রণয়ন করা ইত্যাদি কার্যক্রমের অধিকার লাভ করে। ইসলামে বাক-স্বাধীনতার অধিকার ইতিবাচক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা চর্চাসহ সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে একযোগে অংশগ্রহণের জন্যে এ স্বাধীনতা স্বীকৃত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক অথবা আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বা কোন ষড়যন্ত্রমূলক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণতায় একে অন্যকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরের সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[৬] কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি উম্মাহ্ বা দল থাকা উচিত যারা সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বারণ করবে।"[৭]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১১০
২. আল-হাদীস, M. Ershadul Bari, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩. আল-হাদীস, Abdur Razzaq, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৪. আল-হাদীস, ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, বাব-ই-আল-আমর বিন মা'রূফ, পৃ. ৪৩৬
৫. আহমদ মুল্লাজিয়ূন, নূরুল আনওয়ার, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, পৃ. ৩১৬
৬. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত-৩
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "যখন তোমরা গুপ্ত মন্ত্রণাসভা প্রতিষ্ঠিত কর, দুর্বৃত্তি, অপরাধ, শত্রুতা বা রাসূলের (স.) অবাধ্যতার জন্য নয়, বরং ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তা কর। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।"[১]

সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার :

ইসলাম দেশের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইসলামে এটি একটি অধিকারই নয়, ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে মানুষ এ বিশ্বে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্বের অধিকার কোন ব্যক্তি পরিবার কিংবা নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে অবারিত।

সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে কোন ব্যক্তির সরাসরি কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণ, সরকারের প্রতি আনুগত্য বা বিরোধিতা প্রদর্শন, সরকারকে পরামর্শ দান, ব্যর্থতায় সরকারকে সতর্ক, সমালোচনা বা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাচ্যুত করা এবং পূর্বতন সরকারের স্থলে একটি নতুন সরকার নির্বাচিত করা ও তাকে কার্যে নিযুক্ত করা ইত্যাদির অধিকার। ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে এসব অধিকার প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সরকারে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন- "আমার পর আর কোন নবী হবে না, খলীফা হবে। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, "তখন আমাদের করণীয় কি হবে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "একজন খলীফার পর আরেকজন খলীফাকে নির্বাচন করবে এবং আনুগত্য দেখাবে।"[২]

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নির্বাচন ও অভিষেক অনুষ্ঠানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি সরকারের সমালোচনা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা সরকার থেকে আনুগত্য প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি যদি সরকারকে যথাযথভাবে পরিচালনা করি তাহলে আপনাদের উচিত আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আর যদি ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিচালনা করি তাহলে আপনাদের উচিত আমাকে সংশোধন করে দেয়া। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আনুগত্য দেখানো যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত থাকি। যখন আমি তাদের অবাধ্য হই আপনারা আর আমাকে আনুগত্য দেখাবেন না।"[৩]

ইসলাম সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সকল নাগরিকের সর্বজনীন অংশগ্রহণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে শূরা বা পরামর্শভিত্তিক শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার অধিকারকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কুরআনে এ পদ্ধতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের (সরকারের) সামষ্টিক কর্মকান্ড সম্পন্ন হবে তাদের (সরকার ও নাগরিকগণের) পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।"[৪] সপ্তম শতাব্দীতে মদিনা প্রজাতন্ত্রে এ পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছিল। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আপনি তাদের (নাগরিকগণের) সঙ্গে যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে পরামর্শ করুন। অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এর (সফলতার জন্য) আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ভরসাকারিগণকে ভালবাসেন।"[৫]

সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যারা একজন খলীফা বা রাজনৈতিক কর্মকর্তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে মৃত্যু বরণ করে তারা অমুসলিমের মত মৃত্যুবরণ করে।"[৬] রাসূলের (স.) এ ঘোষণায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধকারই শুধু ঘোষিত হয়নি, বরং একে একটি অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারি কর্মে প্রবেশের সম-অধিকার :

ভাষা, বর্ণ বা জাতিগত ও সামাজিক উৎপত্তি নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারী কর্মে প্রবেশের সমান অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে সমতার নীতি উৎসারিত হয়েছে রাসূলুল্লাহর (স.) বিদায় হজ্বের অভিভাষণ থেকে, যাতে তিনি বলেছেন, "তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য (আনুকূল্য) লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না, কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত।"[৭]

---

১. আল-কুরআন, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-৯
২. আল-হাদীস, বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত
৩. Ibn Ishaq, Sirat-al-Nbiyy (SAAS), edited by M.M.D. Abdul Hamid, Cairo: M. Sunayh, 1983/1963, Vol. IV, P. 1075
৪. আল-কুরআন, সূরা শূরা, আয়াত-৩৮
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-এমরান, আয়াত-১৫৯
৬. আল-হাদীস ঃ *Ismail R. Ali Faruqi, Islam and Human Rights, Islamic Quarterly*, The Islamic Cultural Centre, London, 1983, Vol. 27, P. 26
৭. আল-হাদীস; Muhammed Ayenuddin, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস দ্বারা সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সমতার নীতি অবলম্বিত হবার ঘোষণার পাশাপাশি এ নীতিও ঘোষিত হয়েছে যে, ইসলামের সমতা চরম মানের সমতা নয়, বরং ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দক্ষতার স্বীকৃত সাপেক্ষ একটি নীতি। গোটা জাতির উন্নয়নের স্বার্থে ইসলাম ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও প্রতিটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ইসলামে যেহেতু সরকারী দায়িত্বকে একটি পবিত্র আমানত (trust) হিসেবে গণ্য করা হয় সেহেতু এ দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করার নীতি অনুসৃত হয় যে তা সর্বোচ্চ দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহকে তাদের যোগ্য প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।"[১] সুতরাং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পরিচালনার জন্য আবেগ-প্রবণ, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চাইতে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের দ্বারা মনোনীত দক্ষ ও জ্ঞানী প্রতিনিধিগণই উত্তম হবেন।

ইসলাম যোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন (potential) লোকদের উপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার পাশাপাশি এ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহিতার নীতিও অনুসরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে ন্যস্ত সকল কিছুর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"[২] রাসূলের এ ঘোষণা অনুসারে প্রতিটি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার উপর অর্পিত আমানতের (দায়িত্ব) জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কাছে দায়ী থাকেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার তথা সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার :

ইসলামের বিধান অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তির মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। চাকুরী এবং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যে কোন পেশা বা চাকুরীতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। তার উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকার থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রচেষ্টা করেও তার মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করতে অসামর্থ হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে সাহায্য প্রদানের বিধান রয়েছে। অধিকন্তু বেকার, অসামর্থ এবং অভিভাবকহীন পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য দেয়ার বিধান ইসলামী আইনে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলাম সামাজিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। হাদীসে আছে, সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় অথচ প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। তদুপরি রয়েছে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খলিফা ওমর (রা.) ও খলিফা দ্বিতীয় ওমর এর আমলে দেখা যায়।[৩]

কাজ, ন্যায্য মজুরিসহ শ্রমিকের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার :

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেই শ্রমজীবি মানুষ ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি শ্রম বিভাগের মাধ্যমে অংশীদার হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়ে খেঁটেছেন। খুলাফা-এ-রাশেদার অন্যতম দুই খলিফা হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলীও (রা.) তেমন রূপে জীবন যাপন করেছেন। ইসলাম শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামের প্রচারক নিজে বিত্তবান মানুষ ছিলেন না, ফলে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিকূল পরিস্থিতি তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। ফলে ইসলামে শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "তোমরা মানুষকে অত্যাচার ও শোষণ করো না। নিশ্চয়ই যারা দুনিয়ার মানুষের উপর শোষণ চালাবে, তাকে কিয়ামতের দিন মারাত্মক শাস্তি প্রদান করা হবে। শ্রমিকদের প্রতি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটা মহানবীর (স.) সাবধান বাণী। শ্রমিকের সমস্যা নিরসন এবং তাদের অধিকার পূরণে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বাস্তব ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টি রাখতে তাগিদ দিয়ে মহানবী (স.) বলেন, "এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের খেদমত করেছে।" শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "তাদের জন্য যা অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিও না।" নবী করিম (স.) এর এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এছাড়া বর্তমান শ্রমিকদের কাজের সময় ও প্রকৃতির জটিলতা অনায়াসে দূরীভূত করা যায়। মহানবী (স.) বলেন, "তিন ধরনের ব্যক্তি আছে কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হব। আর আমি যার দুশমন হব তাকে আমি লজ্জিত ও পর্যদুস্ত করে ছাড়ব। উক্ত তিনজনের মধ্যে একজন সে যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু মজুরি দেয় না।" শ্রমিকদের অধিকার আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট তাগিদ রয়েছে। শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাবার আগেই মজুরি প্রদানের তাগিদ রয়েছে ইসলামে।"[৪]

---

১. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৫৮
২. আল-হাদীস; Ismail R. ali. Faruqi, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৩. ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, ইসলামে মানবাধিকার, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ সেপ্টেম্বর-২০০৩, পৃ. ৯
৪. আল-কুরআন, সূরা-বাকারা, আয়াত-২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার :

শুধু কর্ম দিয়েই যে মানুষের জীবন ঠাঁসা, সে মানুষ জীবনের কাছে বন্দী। সে বিশ্ব কারাগারে কয়েদি। মানুষের দাবি আছে যেমনি কর্মের, তেমনি অবসরের। জীবনের বিকাশের জন্য চাই অবসর। একটানা কাজ দেহকে অবসন্ন করে, মনকে ভরে দেয় অবসাদে। ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরকে পুনরায় কর্মক্ষম করে তুলতে প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাস। আবার প্রতিদিনের কর্মক্লান্তি এক ঘেয়েমী দূর করার জন্য প্রয়োজন অবসর বিনোদনের। তাই যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন শ্রমিকের অন্যতম দাবী। এই দাবিকে মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইসলামে বলা হয়, "শ্রমিকদের জন্য যা অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিওনা। অগত্যা যদি তা করতেই হয় তা হলে তাকে নিজে সাহায্য কর।"[১২২] এখানে পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের অবসরের অধিকারের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষালাভের অধিকার :

শিক্ষার অধিকার সকল মানুষের জন্য মৌলিক। মানুষকে মানুষ হতে হলে শিক্ষা তার জন্য অপরিহার্য। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুকিত যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে নানাভাবে তখন শিক্ষাহীনতা একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ। মানবাধিকারে সর্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা তারাই পাবে যাদের এদিকে প্রবণতা আছে। আর উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার তাদেরই থাকবে যারা মেধাবী। ইসলামে এই প্রসঙ্গে বলা হয়, "শিক্ষালাভের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে" এবং বলা হয়, "বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।"[১২৩]

গণতান্ত্রিক অধিকার :

ইসলামে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের সমালোচনা করা যায় এবং বিরোধীদলের উপস্থিতিও স্বীকৃত রয়েছে। জনগণ রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশের আয়োজন করতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই।"[১২৪] ইসলামে বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত বক্তব্য সমর্থিত নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ কটুক্তি প্রকাশকারীকে ভালবাসেন না।" এইভাবে ইসলাম যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বক্তব্য প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার :

সংখ্যালঘু অমুসলিমরা তাদের সমস্ত সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। ইসলামী আইনে অমুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে। একইভাবে তাদের শিক্ষার ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার ধর্ম আমার কাছে।"[১২৫]

ইসলাম শুধু মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য কিছু মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ সমস্ত অধিকারসমূহ যদি কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে তা বলবৎকরণের বিধান রয়েছে। এই অধিকারসমূহ বলবৎকরণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে, একটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদালতের মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে পরকালে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। যদি কোন ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অধিকার বলবৎকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং অন্যের অধিকার হরণ করে তাহলে পরকালে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলামে যে সমস্ত মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, সেগুলো সর্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন। মৌলিক অধিকারগুলো বাস্ত বায়নের জন্য যে দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্রময় এবং যা আধুনিক আন্ত র্জাতিক মানবাধিকার আইনে পরিলক্ষিত হয় না। মানবাধিকার ও মেওলিক অধিকারের উন্নয়নে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্বীকার করে Rev. Bosworth Smith তাঁর "Mohammad and Mohammadanism" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "It recognized individual and public liberty, secured the person and property of the subjects and fostered the growth of all civic virtues. It communicated all the privileges of the conquering class to those of the conquered who conformed to its religion and all the protection of citizenship to those who did not. It put an end to old customs that were of immoral and criminal character. It abolished the in-human custom of burying the infant daughters alive, and look effective measures for the suppression of the slave traffic, it prohibited adultery and incestious relationship and on the other hand inculcated party of heart, cleanliness of body, and sobriety of Life."[১২৬] উপরোক্ত উক্তি থেকে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের উন্নয়নে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।

---

১. গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫
২. গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭
৩. Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, Madras-1968, P. 361
৪. আল-কুরআন, সূরা-বাকারা, আয়াত-২৫৬
৫. আল-কুরআন, সূরা-ক্যাফিরুন, আয়াত-২৫৬
৬. Rev. Bosworth Smith, Mohammad and Mohammadanism, London-1875.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তন

* ইসলামে সমাজকল্যাণ চিন্তারধারা
* সমাজকল্যাণের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে মহানবী (স.)
* খুলাফা-ই-রাশিদার যুগে সমাজকল্যাণ
* উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সমাজকল্যাণ
* মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে সমাজকল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সমাজকল্যাণ চিন্তারধারা :

সমাজকল্যাণের আধুনিক ও সুসংগঠিত যে রূপ দেখা যায়, তার পেছনে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, অনুশাসন ও মানবীয় দর্শন এবং মানব কল্যাণের সার্বজনীন নীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলী সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মানব কল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে এবং সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবাকে উত্তম কাজ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগ যুগ ধরে মানুষ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং ন্যায়বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে। বস্তুত ইসলামের জীবন দর্শন সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম আমাদের সামনে মানবকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণের যে মূলনীতি ও আদর্শ তুলে ধরেছে তা খুবই ব্যাপক। মহানবী (স.) বলেছেন, মানব জাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করেন। মুসলিমদের সেবার আদর্শ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎকর্ষই চায়না, এর দৃষ্টি-দিগন্ত আরও দূরপ্রসারী, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য উন্মুখ ও সর্বজনীন মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকারের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[১] "এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোোমদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে।"[২]

কাজেই দেখা যায় যে, অপরের সেবার জন্য মানুষের জন্ম - এই হল কুরআনের বাণী এবং মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মানবজাতির জন্য তাদেরকে মানবতার চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করার জন্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি করে প্রেরণ করা হয়েছে। একদিকে যেমন মানুষের সমাজে যা সৎ ও ন্যায়সংগত তা প্রতিষ্ঠার নজ্য মুসলিমদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অবৈধ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া আইনের পরিপন্থী যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩]

এভাবেই ইসলাম আদর্শ সমাজ গঠনের মূলনীতিসমূহ সরবরাহ করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মানুষ সমান। ইসলামের শিক্ষা হল, আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই অভিন্ন নয়। অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব মানুষের এক জাতীয়তার ভিত্তি। আল্লাহ্ মানুষকে এক জাতিরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে শত সহস্র পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষই এক, তারা এক আদমেরই বংশধর। যোগ্যতা, সম্ভাবনা, উচ্চাকাঙ্খা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এর কোন পার্থক্যের উপরই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসন স্থাপন করতে পারে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তার বংশ-গোত্র, তারা দৈহিক বর্ণ (সাদা, কালো, বাদামী), তার সম্পদের পরিমাণ এবং তা সম্ভ্রমের মাত্রার কোন গুরুত্ব নেই।[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৩:১১০

২. আল-কুরআন, ২:১৪৩

৩. অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও একথা সত্য যে, বদান্যতার সূত্রপাত হয় স্বগৃহে এবং মুসলিম সমাজের বাহিরে যে বিরাট মানব সমাজ রয়েছে সেদিকে মনযোগ দেয়ার পূর্বে মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানগণ যেখানেই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন না কেন, সেখানে মুসলিম-অমুসলিম কোন প্রকার প্রশ্ন জাগবে না; সেখানে মুসলমানদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের সেবা কার্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের একটি নির্দেশরূপে ধর্মীয় কর্তব্যেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর আদেশ এই যে, মুসলমানদের কার্যাবলীর মাধ্যমে শুধু মুসলমানগণই নয়, বরং সমস্ত মানব জাতিই যেন স্বর্গীয় দীপ্তির সন্ধান পায় এবং আল্লাহর দেয়া আইন মেনে চলে। (এ.কে. ব্রহী,'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৫৪-৫৫)।

৪. Hammudah Abdalati, Focus in Islam, Al-Ittehad-al-Islami-al-Alami, Jeddah, 1973, P.57.

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শ্বেতকায়, কৃষ্ণতায়, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, ধনী ও নির্ধন সকলেই মানুষ, সকলেই আল্লাহর বান্দা। শ্বেতকায় ও শ্বেতচর্মের বলে কৃষ্ণকায়ের উপর প্রভত্ব করতে পারে না; আবার ধনী ধনের বলে নির্ধনের উপর প্রভূত্ব করতে পারবে না। আরব-অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; সাদা ও কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বংশ গৌরব, ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও পদমর্যাদার অহমিকার উপর মানুষের পার্থক্য বা আভিজাত্য নির্ভর করেনা, নির্ভর করে শুধু তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতায় আর তার একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হল পুণ্যশীলতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১]

সুতরাং ইসলামী সমাজে গোত্র, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য একেবারেই কৃত্রিম ও অর্থহীন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এসব পার্থক্য মানুষের প্রকৃত মর্যাদাকে এতটুকু প্রভাবিত করে না। বস্তুত সমতার ইসলামী মূল্যমানের ভিত্তি ইসলামী সমাজ কাঠামোর অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এটি নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো থেকে উৎপন্ন হয় : ১. সমস্ত মানুষ বিশ্বলোকের প্রভূ এক অভিন্ন ও শাশ্বত আল্লাহর সৃষ্টি; ২. সমস্ত মানুষ একই মানবকূলের অন্তর্ভূক্ত এবং আদম হাওয়ার বংশধারার সমান অংশীদার; ৩. আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ন্যায়পরায়ন ও দয়াশীল কোন বিশেষ গোত্র, যুগ বা ধর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব নেই। সমগ্র বিশ্বলোক তার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র জনপ্রাণীই তার সৃষ্টি, সমস্ত মানুষ সমানভাবে জন্মগ্রহণ করে বলে কেউই কোন বিশেষ অধিকার সঙ্গে নিয়ে আসে না এবং সমস্ত মানুষ সমানভাবে মৃত্যুবরণ করে বলে কেউই পার্থিব কোন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায় না। ৪. আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব গুণাবলীর ভিত্তিতে এবং তার নিজস্ব কর্মকান্ডের আলোকে বিচার করবেন; ৫. আল্লাহ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দিয়েছেন সম্মান ও মর্যাদার অধিকার।[২]

মুসলমানদের সামাজিক জীবন ঐশী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তিকে নিশ্চিত করা। শ্রেণী সংগ্রাম, বর্ণাশ্রম এবং সমাজের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থী। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও শ্রেণী, বংশ বা সম্পদের দরুন শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ নেই, বরং এর বিপরীত কুরআনের বহু আয়াত ও মহানবীর (স.) বহু হাদীস মানব জাতিকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে বিষয়গুলো একই সঙ্গে ইসলামের সামাজিক কাঠামোর মূলনীতিরূপেও কাজ করছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয় হল, মানব জাতি এক ও অভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভূত এবং একই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্বুদ্ধ একটি পরিবার সদৃশ। অতএব, অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে তার তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন তার উপর অভিন্ন দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। মানুষ যখন উপলব্ধি করবে যে, তারা সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্ট আদম ও হাওয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তখন আর বর্ণ বিদ্বেষ, সামাজিক অবিচার কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের কোন অবকাশ থাকবে না। অভিন্ন পিতৃ-মাতৃত্বের দরুন লোকেরা যেমন প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ, তেমনি সামাজিক আচরণেও তারা হবে ঐক্যবদ্ধ। কুরআন ও সুন্নাহতে প্রকৃতি, উৎস ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিক থেকে মানবীয় ঐক্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হল বর্ণগত অহমিকা ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নির্মূল করা এবং যথার্থ ভ্রাতৃত্বের পথকে সুগম করে তোলা। আল-কুরআনে তাই বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়।"[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৪৯:১৩

২. Hammudah Abdalati, op.cit, P-58. এই মূলনীতিগুলোর সমর্থনে আল-কুরআন হতে কিছু আয়াত তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন-
"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্ম বিধায়ক রূপে।" (৭৩:৯)
"হে মানব তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর; যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাঁহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন; যিনি তাহাদের দুই জন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন।" (৪:১)
"আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তিতে তো তোমার প্রতিপালকের নিকট, ... তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই মারেন, তিনিই বাচান, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারীর শুক্র বিন্দু হইতে যখন উহা স্খলিত হয়..... পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাহারই, ... তিনিই অভাব মুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন, ... তিনিই গ্রহ-নক্ষত্রের মালিক, ... আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং সামুদ সম্প্রদায়কেও, কাহাকেও তিনি বাকি রাখেন নাই। আর ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, উহারা ছিল অতিশয় জালিম, অবাধ্য, উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উহাকে আচ্ছন্ন করিল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি। তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে। (৫৩:৪২-৫৫)
"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য উহাদের বাহন দিয়াছি, উহাদের জীবনের জন্য উত্তম উপকরণ দিয়াছি। আর আমি যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপরে উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।" (১৭:৭০)

৩. আল-কুরআন, ৭:১৮৯, ৪৯:১০-১৩, ৪:১

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্যই হল আল্লাহর বন্দেগী করা এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে তোলা। দুনিয়ায় সত্য ও সুবিচার, ভালবাসা ও অনুকম্পা, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠাও এ উদ্দেশ্যের অন্ত র্ভূক্ত।[১]

ইসলাম বলে মানুষ একজন অপরজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে না। পিতার প্রতি পুত্রের, পুত্রের প্রতি পিতার, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর; ভৃত্যের প্রতি মনিবের আর মনিবের প্রতি ভৃত্যের; একজন মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এ সকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। আবুল হাশিম তাঁর 'দ্য ক্রিড অব ইসলাম' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।"[২]

ইসলামে সামাজিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত নিখুঁত, মহৎ ও ব্যাপক। এই কাঠামোর উল্লেখযোগ্য মৌল উপাদানগুলো হল সহযোগী লোকের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, আর্তের প্রতি সান্ত্বনা ও সমবেদনা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা, ব্যথিতের ব্যথা উপশম, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সংহতির অনুভূতি, জীবন, সম্পত্তি-সম্পদের প্রশ্নে অন্যান্য লোকের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলোর কয়েকটি হল, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পনকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিওনা এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।"[৩]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে ...... সৎকর্ম ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবেনা। আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[৪]

এভাবেই ইসলাম মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশ্বজনীন-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সকল মানুষই সমান এবং জন্ম ও মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। ইসলাম এমন ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যেখানে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণেই একজন অন্যজনের অধিকারকে পদদলিত করতে পারে না। মানবতার আদর্শ হিসেবে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে প্রভেদ মানে না। অমুসলিমগণকে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো হতে বিচ্ছিন্ন করেনি। এক আল্লাহর অধীনে ইসলাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চায়। মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে ভৌগলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের উর্ধ্বে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনয়নই ইসলামের লক্ষ্য।

---

১. আল-কুরআন, ৫১:৫৭-৫৮
২. Abul Hashim, The Creed of Islam, Islamic Foundation Banlgadesh, Dhaka-1987, P.21
৩. আল-কুরআন, ৩:১০২-১০৪
৪. আল-কুরআন, ৫:১-২

Dhaka University Institutional Repository

মানব সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে ঐক্যবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলাম নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছে। ইসলামের ঐক্যবন্ধন কোন দেশ বা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা সমগ্র মানবজাতিকে একইসূত্রে গ্রথিত করতে আগ্রহী। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সর্বোপরি ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম মানব জাতির ঐক্যবন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ জন্যই ইসলাম তার নীতি ঘোষণা করেছে, মুষ মাত্রই সমান; জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। একমাত্র কর্মই মানুষের মর্যাদাকে চিহ্নিত করে; এ কর্ম ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য মানবতার জন্য। এ সকল কর্মে যে সফল সেই ইসলামে সত্যিকার মর্যাদাশীল মানুষ। ইসলামে জাতিগত প্রাধান্য নেই; গোত্র, বর্ণ, সামাজিক পদমর্যাদা ও পেশার ক্ষেত্রেও ইসলাম কোন প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই তাদের সম্পর্কও ভ্রাতৃত্বের। ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে ভাষাগত পার্থক্য, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়। ইসলাম বর্তমান বিশ্বের বর্ণবাদী, স্বদেশ হিতৈষী ও জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত নৈতিক আদর্শবাদী ও আন্তর্জাতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে তৎপর। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক জন্মসূত্রে নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই। এ সমাজে অংশগ্রহণকারী সকলেই একই অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। কোন রকম বর্ণগত বা জাতিগত ভেদাভেদের শিকার কেউই হবে না। উচ্চ-নীচ বলে কেউই গণ্য হবে না এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন কারও অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না।[১]

এই হল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌল মূল্যবোধ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মর্মকথা। ইসলামের অপরাপর যত মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার সবই এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মুল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজে কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজ্যাতের স্বীকৃতি নেই বলে এখানে মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সামজের কল্যাণে অবদান রাখার উপর। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ন চর্মকার অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।[২] ইসলাম শুধুমাত্র মানবমর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন গোষণাই প্রদান করেনি, বরং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সম্পূর্ণ সফলভাবে এসব আদর্শ বাস্তবায়িত করে, যখন সমগ্র বিশ্বের কাছে মানবমর্যাদা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা ছিল একেবারেই অজানা। গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সভ্যদেশের মধ্যেও হেলট (Helots), প্লেবিয়ান (Plebian) ও শূদ্রের সকল মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত অনেক স্থলে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। তথাকথিত অভিজাত ও বর্ণবাদী লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম ও সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে কোটি কোটি নর-নারীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। মানুষের অধিকার হতে শত সহস্র বছর ধরে বঞ্চিত করে রেখেছে। ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য সব মুছে ফেলে সমগ্র মানবজাতিকে এক সমাজভুক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেয়নি; বাস্তব জগতে কোটি কোটি মানুষকে এই সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।[৩] বলা হয়েছে, সমগ্র মানবজাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। অতএব, জাতি গোত্রের এই প্রাকরভেদের উদ্দেশ্য শুধু একটাই হওয়া উচিত যে, তা পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যম হবে।[৪]

এরপর কতক লোক জীবনে সামনে এগিয়ে যায় এবং কতক লোক পেছনে পড়ে থাকে। কেউ বিত্তশালী হয়, কেউবা হয় বিত্তহীন। কেউ হয় শাসক, কেউ হয় শাসিত। কতক জাতির চামড়ায় হয় সাদা, কতক জাতির চামড়া হয় কালো। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এই উঁচু-নিচু ও ছোট-বড় মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ ঘটাবে ইসলাম তা হতে দেয় না। আল্লাহ বলেছেন, "তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদিগের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন; তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।"[৫]

---

১. অধ্যাপক কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেসন্স ঢাকা-১৯৭৯, পৃ.৭
২. শাহেদ আলী সম্পাদিত, ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট-১৯৬৭, পৃ. ১৪-১৫
৩. দ্রষ্টব্য, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স.): তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৪৯-৫৩
৪. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
৫. আল-কুরআন, ৬:১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এখানে যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব। এ মানব সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। এখানে দরিদ্রের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের, কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। এই উদ্দেশ্যেই মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সকলেই সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না, কেবল ন্যায়পরাণতার ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত।"[১]

এভাবেই ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের আভিজাত্য, ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার, পদমর্যাদা ও জ্ঞান-গরিমার আস্ফালনকে চুরমার করে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মানবতার কল্যাণের জন্য এমনই চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই সমাজকল্যাণ তথা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বস্তরে মহানবী (স.) এ চরিত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। নামায, রোযা ও যাকাত অর্থাৎ ইসলামের অনুশাসন অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে এ আদর্শকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাৎসরিক হজ্জের মধ্য দিয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

এবার আমরা মানবতাবোধ ও মানবিক বিষয়াবলী সম্পর্কে ইসলাম কি বরে সেদিকেই নজর দেব। এ পর্যন্ত আমরা ইসলামে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য নিয়ে যা আলোচনা করেছি তার মূল উৎস হল মানব প্রেম। এই মানব প্রেম তখনই সমাজে বিরাজ করে যখন মানুষের মাঝে মানবতাবোধের জন্ম নেয়। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সমাজে তখনই প্রতিষ্ঠা করা যাবে যখন মানুষের মাঝে মানবতাবোধ জাগ্রত হবে এবং তা সক্রিয় হবে। মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হল মানবতাবোধ। মানবতাবোধ হল মানুষের জন্য অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখে-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ-মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়। মানব কল্যাণে ব্রতী হয়। মানুষের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ বোধ থেকেই মানুষ-মানুষের প্রতি সুবিচার করে। মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয় ও সংরক্ষণ করে। এ বোধশক্তির তীব্রতা থেকেই মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হলে, মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন হলে অপর মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা প্রতিবাদ করে এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।[২]

মানুষের মধ্যে যখন মানবতাবোধের অভাব দেখা দেয়, তখনই যে অন্যের অধিকার হরণ করে; মানুষকে কষ্ট দেয়; মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। মানুষের দুঃখ-কষ্টে সে ব্যথিত হয় না। মানব কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রতী হয় না। নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা, অমানবিকতা এবং পাশবিকতা তার উপর জেঁকে বসে। হিতাহিত জ্ঞান তাদের থাকে না। এদেরই অবস্থা সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদিগের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে, তদ্বারা শ্রবণ করে না, ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তাহারা গাফিল।"[৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে মানুষের মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্ক হল মানবিক সম্পর্ক, রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক, ঈমানী বা বিশ্বাসগত সম্পর্ক। এ সম্পর্কগুলো মানব সমাজে দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া-মায়া এবং দরদ-ভালবাসার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যদি সেগুলো দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কবলে পতিত হয় তবে মানব সমাজে সুখ-শান্তি ও উন্নতি আসবে না।

---

১. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৪০
২. আব্দুস সহিদ নাসিম 'মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ মানবতাবোধ' মাসিক পৃথিবী, মে-১৯৯৭, পৃ.১৯
৩. আল-কুরআন, ৭:১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মানুষে মানুষে এই জন্মগত ও প্রাকৃতিক মানবিক সম্পর্কের কারণেই মানুষের মধ্যে মানবতাবোধের সৃষ্টি হয়। এ বোধ জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে। অতঃপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তা হয়ত বিকশিত হয়, নয়ত চাপা পড়ে যায়। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যেমন বিবেকবোধ দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন সীমালংঘনের প্রবণতা। সাথে সাথে আল্লাহ্ উপদেশ দিয়েছেন সে যেন তার বিবেকবোধকে জাগ্রত করে এবং পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত করে তোলে। আবার সে যেন তার সীমালংঘনের প্রবণতাকে সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। মানবতাবোধ একটি নৈতিকবোধ হলেও ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের কতিপয় অধিকার এবং কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সেগুলোর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছে। সেগুলোর লঙ্ঘনকে আইনগত ও শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।[১]

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। যেমন- জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার; কর্ম, উপার্জন ও জীবিকার অধিকার। ইজ্জত, আব্রু ও সমান-মর্যাদার অধিকার। এসব অধিকার প্রদান করা ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও নৈতিক বোধ থেকেই উৎসাহিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলাম এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগতভাবে বিধিববদ্ধ করে দিয়েছে। নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই যদি মানুষের প্রতি মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়, তবেই সমাজে নেমে আসতে পারে মানবপ্রেমের অনাবিল শান্তির এক নির্মল পরিবেশ। কেননা, ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে।

সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেই কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটা হয় প্রকৃত মানবতাবোধ। এর সাথে কোন বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকে না। ইসলাম এ নিঃস্বার্থ চেতনা ও মানবতাবোধই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। এ মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সেটাই ইসলাম।

অতএব ইসলামই বিশ্বে একমাত্র ধর্মব্যবস্থা বা জীবন বিধান যা সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা।[২] ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, অসহায়কে সাহায্য দান, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান; বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শনকে অতি মাত্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণের প্রতি তাগিত দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ,"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্যের নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।"[৩]

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহিনা, কৃতজ্ঞতাও নহে।"[৪]

মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাসবে, তবেই মুসলিম হবে।"

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।"

"সেই লোকদের মধ্যে ভাল, যে লোকের উপকার করে।"

"পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে আসমানে যিনি আছেন (আল্লাহ্) তোমাদের উপর দয়া করবেন।"

"সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহর প্রিয়তম, যে তার এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারক।"[৫]

---

১. আল-কুরআন, ১৭:৭০, ৩১:২০, ৪৫:১২-১৩, ১৬:১২-১৪
২. আল-কুরআন, ২:২১৩
৩. আল-কুরআন, ৩:১১০
৪. আল-কুরআন, ৭৬:৮-৯
৫. হাদীসগুলো উদ্ধৃত: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাস প্রিন্টার্স ঢাকা-১৯৬২, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্পৃহা হৃদয়ে না থাকলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে যালিমের যুলম থেকে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলতে। এসব ইসলামে 'হুকুকুল ইবাদ' নামে পরিচিত।

ইসলাম মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ বা রক্তের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয়না, বরং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার উপরই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[১] এ খলিফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কিত ধারণাই ইসলামী সমাজের মূল্যবোধের উৎস এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের চারিত্রিক রূপের মাপকাঠি। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর রবুবিয়াতের কাজ (লালন ও পালন নীতি) মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে করে যাবে।[২] যেহেতু মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব তাই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, আদমকে কুর্নিশের মাধ্যমে মানুষের প্রাধান্য স্বীকার করতে।[৩] আল্লাহ স্বয়ং মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে। যাতে করে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। কেননা, এ বস্তু জগতে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে মানুষ এর নির্যাস। মানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বলোকের সৃষ্টি। তাই এ বিশ্বলোককে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য। মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে এর ব্যবহার করবে। এ সবই স্বতঃই মানুষের কল্যাণে নিরত। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনিই পৃথিবীতে সবকিছু তোমাদের (মানবজাতি) জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৪]

ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্যই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি এবং তারই জন্য এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে এবং ধর্ম-বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এই সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সে সবাইকে সমান অধিকার দেয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতানুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"[৫]

মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ইসলামে সমাজসেবাকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে। ইসলাম সৃষ্টির প্রতি যে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায় তা মূলত সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমিনের যা কিছু বিদ্যমান, তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ, মানুষ নয় তা সে ব্যক্তিই হোক, আর রাষ্ট্রই হোক। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিকরূপে নয়, আল্লাহর 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু ব্যবহারিক স্বত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ প্রদত্ত শ্রম শক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মের সংস্থান এই জীবনোপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। এজন্যই আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর, এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় করা।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ২:৩০
২. আরবী 'রব' শব্দটি থেকেই এসেছে 'রবুবিয়াত'। 'রব' এর অন্তর্নিহিত অর্থে রয়েছে বিশ্বজগতের সৃজন, প্রতিপালন এবং বিবর্তনের কর্তৃত্ব। অতএব 'রব' হচ্ছেন মহাবিশ্বের একক স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তক। মানুষ এক অর্থে স্রষ্টা বটে, কিন্তু যেখানে 'কিছুনা' থেকে 'কিছু' সৃষ্টির প্রশ্নে সেখানে তার কোন হাত নেই। সে নিজের জীবন যাপন আত্মরক্ষা এবং আত্ম উন্নয়নের রীতি নির্ধারণ ও উপায় অবলম্বন করতে পারে মাত্র। প্রত্যেকটি জীবন দর্শনই মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্ম উন্নয়নের সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে নিজ বিশিষ্ট সমাধান দিয়ে থাকে। অবশ্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা, পৃথিবীর সব মানুষের সাধারণ সমস্যা। বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের দর্শনে মতবাদে এবং বিভিন্ন জীবন যাপন পদ্ধতিতে যে বিরোধ বা সংঘাত দেখা দেয়, তা এসব মৌলিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি নিয়ে নয়, বরং এসব মৌলিক সমস্যার সমাধানের পন্থা নেই। অন্যান্য বিশিষ্ট মতবাদের মত ইসলামেরও এসব জীবন সমস্যা সমাধানের নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। 'রব' এর পথ পদ্ধতি তথা ইসলাম নীতি বিধান বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ ধারা বিধৃত হয়েছে এবং আল-কুরআন মারফত অবতীর্ণ হয়েছে। (আবুল হাশেম, সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ,' ইসলামীক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ.৪০।)
৩. আল-কুরআন, ২:৪০
৪. আল-কুরআন, ২:২৯
৫. আল-কুরআন, ১৩:১১
৬. আল-কুরআন, ২:২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে, যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে দু:খ-ক্লেশে ও সংগ্রামে সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা, যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।"[১]

এভাবেই ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কল্যাণকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। সর্বোপরি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সুষম বন্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে, যা সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে।

আল্লাহর বাণী, "তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদিগের জন্য।"[২]

এ আয়াতে সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ শ্রেণীর অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। কোন প্রাণীর মধ্যে বৈষম্যও করা হয়নি। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের এতে সমান অধিকার রয়েছে। ইসলামী আইন অনুসারে কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করলে তাকে সেই শাস্তি দেয়া হত, যে শাস্তি একজন মুসলমানকে হত্যা করলে দেয়া হত। মহানবী (স.) বলেছেন, "তাদের (জিম্মি) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না। এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'উশর' (দশমাংশ) জিম্মিদের নিকট হতে নেয়া হবেনা। তাদের অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হবে।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, "মনে রেখো! যে ব্যক্তি কোন 'মুয়াহিদ' (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করব।"[৪]

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তাহারা ব্যয় করিবে, বল, যাহা উদ্বৃত্ত" "তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৫] এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগ ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, বরং কোন অঞ্চলের সম্পদে শুধু সে অঞ্চলের লোকদের কায়েমী স্বার্থকেও ইসলাম স্বীকৃতি দেয়নি। দারিদ্র বা সম্পদের স্বল্পতার অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ ইসলাম কাউকে দেয় না। প্রত্যেককেই কম-বেশী সমাজের জন্য ব্যয় করতেই হবে। তাই আল্লাহ বলেছেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ যাহাকে যে সামর্থ দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ২:১৭৭
২. আল-কুরআন, ৪১:১০
৩. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮২
৫. আল-কুরআন, ২:২৯
৬. আল-কুরআন, ৬৫:৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য। সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যতীত সম্পদের সুষম বন্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক সাম্য ও নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের বিকাশ সাধন হয় না; সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয় না। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনন্য। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দূর্বল, ধনী-দরিদ্র এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলামে যে বিচার নীতি উপস্থাপন করেছে তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব, আকীদা, বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানে কোন ভেদাভেদ নীতির অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেছেন,"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও ইহা তোমাদিগের নিজের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্য অভিভাবক।"[১]

মহানবী (স.) নিজেকে কখনও আইনের উর্ধ্বে বিবেচনা করেন নি। কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তিনি আর সকলের মতই মানুষ। ব্যতিক্রম হল আল্লাহর ওহী আসে তাঁর কাছে। তিনি সামাজিক আচরণেও কখনোই বৈশিষ্ট্যের দাবী করেন নি। তিনি ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক। বানু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্মী একজন মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে মহানবী (স.) তাঁর হাত কেঁটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অভিজাত কুরাইশ গোত্রের জন্য বিষয়টি খুবই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। মহিলাটি এই সম্মানিত কুরাইশ বংশের ছিল বলে ওসামা ইবন যায়িদ নবী (স.) এর নিকট তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। মহানবী (স.) তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দূর্বল শ্রেণীভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত হবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।"[২]

ইসলাম যেহেতু সমগ্র জাতিকে একটি পরিবার হিসেবে গণ্য করে, তাই মানব পরিবারের সকল সদস্য আল্লাহর কাছে এবং তাঁর নাযিলকৃত আইনের চোখে একই মর্যাদার অধিকারী। তাই এখানে ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু সাদা-কালোর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। জাতি, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদার জন্য কোন প্রভেদ নেই। মানুষের মর্যাদা নির্ণয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল চরিত্র, যোগ্যতা এবং মানবতার জন্য সেবা। মহানবী (স.) এ সম্পর্কে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমার চেহারা বা তোমার সম্পদ দেখবেন না, বরং তিনি দেখবেন তোমার অন্তর এবং তোমার কর্ম।"[৩] কোন মুসলিম নর অথবা নারীকে দরিদ্রতা বা সম্পদের স্বল্পতার জন্য যদি কেউ অপমান বা হেয় করে, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তাকে লজ্জিত করবেন।"[৪]

এজন্যই ইসলাম তার অনুসারী মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছে যেন তারা প্রথমত তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, নারী, শিশু বিশেষ করে ইয়াতিম, দরিদ্র ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মুসাফির যাদের খোঁজ-খবর নেয়া ও সমবেদনা জানানো। প্রয়োজনে তাদের সকলের সাথে গঠনমূলক আচরণ করা। ঠিক এ কারণেই ইসলামের সামাজিক সুবিচারের আদর্শ একটি মানবিক সুবিচার এবং মানব জীবনের জন্য একটি মৌলিক উপাদান। এটা সীমিত অর্থে নিছক অর্থনৈতিক সুবিচারের কথা বলে না। জীবনের সমুদয় তৎপরতা ও দিক নিয়ে এর পরিসীমা। এমন কি মানুষের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তঃকরণ ও বিবেক এর আওতাভুক্ত। এই সুবিচার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে তৎপর নয় বা নিছক জড়বাদী মূল্যবোধই তার কর্মক্ষেত্র নয়, বরং এ হচ্ছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকসহ অন্যান্য সকল মূল্যবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ।[৫] ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ধারণার দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি হল নিরঙ্কুশ ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত ঐক্য এবং দ্বিতীয়টি হল সাধারণভাবে ব্যক্তি ও সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, যা একদিকে মানব প্রকৃতির মৌলিক উপাদানসমূহকে বিবেচনা করে, তেমনি মানুষের যোগ্যতার সীমাকেও সামনে রাখে। পবিত্র কুরআনে মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এবং সে অবশ্যই ধন-সম্পদের সালসায় উন্মুক্ত।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ৪:১৩৫
২. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, বুখারী শরীফ, ৮ম খন্ড, দিল্লী, ১৩৬৫ হিজরী, পৃ. ১৯৯
৩. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খন্ড-১৯৮৭, পৃ. ৩৪
৪. ইমাম আলী আল রিদা, মুসনাদ, বৈরুত-১৯৬৬, পৃ. ৪৭৪
৫. সৈয়দ কুতুব, 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার', ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৩৪
৬. আল-কুরআন, ১০০:৮

Dhaka University Institutional Repository

ধন-সম্পদের প্রতি এই ভালবাসা তা নিজের জন্য এবং সন্তান-সন্ততির জন্য। কুরআন এও বলে যে, "মানুষ স্বভাবগতভাবেই কৃপণ।"[১] তাই মানুষের মধ্যে সব সময় এ স্বভাব বিদ্যমান থাকে, আবার অন্যদিকে করআন মানুষকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, আল্লাহর রহমত এত ব্যাপক যে, তা দুনিয়ার সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রয়েছে।[২]

সুতরাং একদিকে আল্লাহর এই অসীম রহমত এবং অন্যদিকে মানুষের ব্যয়কুণ্ঠার দিকে আলোকপাত করে আল-কুরআন দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রয়োজনীয় হিদায়াত ও শৃংখলা বিধান ছাড়া এমনিতে ছেড়ে দিলে মানুষ কতটুকু লালসায় উন্মত্ত হতে পারে। তাই ইসলাম তার আইন ও বিধান এবং উপদেশ ও হিদায়াহ ইত্যাদির বেলায় মানুষের স্বভাবগত আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত হয় না বা তার মনের গহীন কোণের লোভকে উপেক্ষা করে না, বরং তার লোভী স্বার্থপরতা এবং কৃপণতার রোগকে আইন ও বিধানের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে চায়। ইসলাম মানুষকে তার সাধ্যাতীত বিষয়ের ব্যাপারে দায়ী করে না। একই সাথে ইসলাম সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণকে যেমনি উপেক্ষা করে না, তেমনি যুগে যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উন্নত আদর্শ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকেও অগ্রাহ্য করে না।[৩]

এটা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজে যদি অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ সমাজকে ব্যক্তি যা দিল বা সামাজিক উৎপাদনে স্বীয় ভূমিকা রাখল, সে অনুযায়ী প্রাপ্য প্রতিদান পাওয়ার ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং তাদের উপর অন্যের শোষণ বন্ধ না হয় তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সবার প্রতি সমান ব্যবহার ইত্যাদি সবই অর্থহীন হয়ে পড়বে। আল-কুরআন এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছে, "লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না।"[৪] অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রকৃত পাওনা অবশ্যই পাবে এবং অন্যের অংশ থেকে বঞ্চিত করবে না। মহানবী (স.) বরেছেন, "অবিচার সম্পর্কে সাবধান হও। কারণ শেষ বিচারের দিনে অবিচার অন্ধকারের সমতুল্য হবে।[৫]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল- ইসলাম নিয়োগকারী ও নিয়োগ প্রাপ্ত এই উভয়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার পন্থা ঠিক করে দিয়েছে। শ্রমিককে তার কাজ অনুযায়ী ন্যায্য মজুরী দিতে হবে এবং একজন নিয়োগকারী মুসলিম মালিক তার শ্রমিককে শোষণ করতে পারবে না।[৬] সুতরাং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সকল প্রকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইসলাম মালিকের প্রতি যেমনিভাবে অনেকগুলো কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, তেমনি শ্রমিকের প্রতি নির্দেশ রয়েছে কর্তব্যপরায়ণ, যত্নশীল, সৎ ও বিশ্বস্ত হতে। এটা সম্ভব হবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে পরস্পরের সহযোগিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা, পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের জন্য সামঞ্জস্যশীল নিয়মনীতি, ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ, সুবিচার ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রাধান্য ইত্যাদির মাধ্যমে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন দৃঢ় নিষ্ঠার সাথে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে, তেমনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, আয়ের সুষম বন্টন এবং সমাজ কল্যাণের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথাও বলে। এই নিষ্ঠা অবশ্যই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। এখানে সমাজের সম্পর্ক পারস্পরিক অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সাথে সুন্দরভাবে মিশ্রিত। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার সম্পর্ক ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকার পর সমাজে মানুষের আয় ও সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য থাকতে পারে না এবং এ ধরনের বৈষম্য ইসলামের কাঙ্খিত ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করবে। সুতরাং ইসলাম বন্টনমূলক সুবিচারের পক্ষপাতি, সেখানে সম্পদ ও আয়ের পুনঃবন্টন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী এ ব্যবস্থায় মানুষের জন্মগত মর্যাদার সাথে সংগতিশীল জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা রয়েছে। যা সমাজের প্রতিটি লোকের জন্য কাম্য ও সম্মানজনক। যে সমাজ এ মান অনুযায়ী জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, সে সমাজের কোন মূল্য নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে লোক তার নিকট প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে পেট পুরে খায়, সে প্রকৃত মুসলমান নয়।"[৭]

---

১. আল-কুরআন, ৪:১২৮
২. আল-কুরআন, ৭:১৫৬
৩. সৈয়দ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৪. আল-কুরআন, ২৬:১৮৩
৫. মুসনাদ আহমদ এবং বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান, প্রথম খন্ড, পৃ.৮
৬. বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২২ ও ১৮৬
৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে হযরত আলী (রা) বলেছেন, বিত্তশালীদের নিকট যা পর্যাপ্ত রয়েছে, তা থেকে দরিদ্রদেরকে প্রদান করা বিত্তবানদের জন্য অপরিহার্য। কোন দরিদ্র যদি ক্ষুধার্ত, নগ্ন বা দূর্দশাগ্রস্ত হয় তার কারণ ধনী কর্তৃক বঞ্চনা (তাদের অধিকার থেকে) এবং এটাই সঙ্গত যে, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।[১] হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেছিলেন, "জাতির সম্পদে সবার সমান অধিকার রয়েছে। কারও নয়, এমনকি তার নিজেরও অন্যদের চেয়ে বেশী অধিকার নেই। তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে দেখে যেতে চান যে, সুদূর সানা পর্বতের রাখালও তাঁর সম্পদ থেকে ভাগ পেয়েছে।"[২]

অতএব, ইসলামী সমাজ তার উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে বণ্টনমূলক সুবিচার কর্মসূচীর অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে সমাজের সকল সদস্যের মানবিক মর্যাদা অনুযায়ী জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজে তাদের প্রকৃত অবদানের বা সেবার ভিত্তিতে বিভিন্ন মানের উপার্জনের স্বীকৃতি দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজকে প্রদত্ত অবদানের জন্য সমাজ নির্ধারিত মূল্যমানের রোজগার করার সুযোগ পায়।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে যদিও কাজের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তার কর্মদ্যোগের স্বাধীনতা রয়েছে, সে অর্থোপার্জন ও তা দখলে রাখার অধিকার পেয়েছে; তবু প্রকৃত সত্য হল এই যে, সে অর্জিত সম্পদের নিছক একজন আমানতদার মাত্র; সে কেবল তার সম্পদ, তার আমানতের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তার উপার্জন করার, বিনিয়োগ করার ও ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধন-সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে নারাজ। ইসলামের মতে, গ্রাস ভর্তি খাবার, মুঠো মুঠো ধন-সম্পদ বা দেহজ কামনা-বাসনার নাম জীবন নয়। যদিও ইসলাম ব্যক্তিকে সঙ্গতি সম্পন্ন থাকতে, কোন কোন সময় তারও বেশী থাকতে বলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের মাধ্যমে বা ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী অর্থ ব্যবস্থার সহায়ক কোন উদ্যোগের মাধ্যমে সে এই সঙ্গতি লাভ করতে পারে, যাতে একদিকে দারিদ্রের ভয় দূরীভূত হয় এবং সাথে সাথে উপার্জনের ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহারও বন্ধ হয়। জীবন ধারনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে। গরীবের প্রয়োজনের স্বীকৃতি, সমাজের জন্য কল্যাণকর সীমা পর্যন্ত সম্পত্তি অর্জন এবং ধনীদের ধন-সম্পদের উপর গরীবের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এভাবেই ইসলাম সমমান, ভারসাম্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়াদিসহ জীবনের বহুবিধ উপাদানের কোনটিকেই উপেক্ষা করেনি। বরঞ্চ এর সবগুলোর এমনিভাবে সংগঠিত করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এবং গড়ে উঠতে পারে সর্বাত্মক ঐক্য।[৩]

তাই ইসলাম সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যাকাত, ওয়াক্ফ, বায়তুলমাল, করজে হাসানা, সদকায়ে জারিয়াহ ইত্যাদি। ইসলামের এসব অনুশাসন এবং প্রেরণাই ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের অধিকার বা অংশ রয়েছে তার সম্পত্তির উপর। সেজন্য ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বন্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাতকে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দয়া করে দেয়া হয় বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে গরীবদের মধ্যে[৪] যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার (দৈহিক, মানসিক বা বাইরের কোন অসুবিধা যেমন বেকারত্ব) ফলে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দেয়া যাতে "যারা বিত্তমান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তন না করে।"[৫]

---

১. আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, ২য় খণ্ড, কায়রো-১৯৬৪, পৃ. ২৩৩
২. হায়কল, আল-ফারুক উমর, ২য় খন্ড-১৯৬৪, পৃ. ২৩৩
৩. সৈয়দ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৪. মহানবী (স.) যখন হযরত মুয়ায (রা.) কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন, তখন তাকে কিছু কর্তব্য কাজের তালিকা প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল লোকদের শিক্ষা দেয়া যে, আল্লাহ যাকাতকে ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। (বুখারী ২য় খন্ড, পৃ.১২৪)
৫. আল-কুরআন, ৫৯:৭

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বলতে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ টাকা হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকে বোঝায়। হাদীস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরয হয় না। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য পছন্দ করে না। এটাকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার চেষ্টাও করে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ধনী মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দূর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হয়, যার নাম যাকাত। এর ফলে যেমন অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি সামজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য অনেকটা কমে যায়।

দারিদ্র মানবতার শত্রু। যে কোন সমাজ ও দেশের জন্যে এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্রের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্রের জন্যে।[১] এ সমস্যার প্রতিবিধানে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা অনন্য। দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র দূর করে, সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন বজায় রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের লোভ এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্খাকে বিধৌত করে এবং দারিদ্র সমস্যা দূরীকরণে তাদের সজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ ও সামাজিক সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, যাতে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে আবর্তিত না হয় এবং গরীবরা যেন আরও গরীব না হয়। যাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। এসব গুণাবলী সমাজ জীবনের সংহতি ও শৃঙখলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ আনয়নের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। যাকাত একাধারে ইবাদাত এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। যাকাত ব্যবস্থায়ই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার দর্শন ও আদর্শের অনুসরণে গড়ে উঠেছে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল বায়তুল মাল। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভান্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভান্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বায়তুল মাল বলা হয়।[২] ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের নিকট থেকে রাজস্ব হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এখানে জমা হত এবং এখানে থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মিটানো হয়। সারা বছরের ব্যয় বহনের পর যে অর্থ রাজকোষে উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়েই জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। বায়তুলমালে সঞ্চিত সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। কেউ যাতে মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। যাকাতের নির্ধারিত আট শ্রেণীর জনগণের[৩] চাহিদা পূরণ না হলে বায়তুল মাল থেকেই তাদের সাহায্য প্রদান করা হত। খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে বায়তুল মাল একদিকে দু:স্থ, অসহায়, অক্ষম, দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বায়তুল মাল।

---

১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেসন্স, রাজশাহী-১৯৯৬, পৃ. ৪৩-৪৪
২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মহানবীর (স.) অর্থ প্রশাসন, অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা-১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬, পৃ. ২৩০
৩. আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে; ঋণগ্রস্তদের জন্যে; আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।" (৯:৬০)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে মানবকল্যাণের স্বার্থে জাগতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের আর একটি দিক হল ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। সাধারণত কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় অথবা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্‌ফ বলে।[১] ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণ সংস্থা। এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। ওয়াক্‌ফ ইসলামের একটি ঐচ্ছিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। তাই এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যাকাত যেখানে একটি বাধ্যতামূলক সার্বিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সেখানে ওয়াক্‌ফ হল সে কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানে একটি সহায়ক সংগঠন।

ইসলামের অপর একট সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল করজে হাসানা বা সুন্দর ঋণ অর্থাৎ সুদমুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনাসুদে ও শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করজে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সাহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে এই 'সুন্দর করজকে আল্লাহকে কর্য দেয়া বলা হয়েছে, "সে কে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) প্রদান করিবে। তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন, আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাণিত হইবে।"[২]

ইসলামের অন্যতম সমাজ সেবা কার্যক্রম হল সাদাকাহ বা দান প্রথা। যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হলেও শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পরও সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শষ্য বীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শষ্যকণা। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। যাহারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহা বলিয়া বেড়ায়না ও ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।"[৩]

এভাবেই ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে যেমন মানবতার সেবা করার জন্য তাগিদ দিয়েছে, তেমনি পরোক্ষভাবে সমাজ ও জাতির কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এছাড়াও মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর কল্যাণের জন্যে ইসলামে আরও কিছু দান-সাদাকাহ প্রদানের নিয়ম রয়েছে যা সাধ্যানুসারে সকল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানই করে থাকেন। এসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরা আদায় এবং ঈদুল আযহার সময় কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। ইসলামের এই অর্থ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়া এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন। এর ফলে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়।

উল্লেখ্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কেবল মুসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, মত নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা এতে দেয়া হয়েছে এবং বায়তুল মাল ব্যবস্থার মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজকল্যাণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য একটি মহোত্তম আদর্শ। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং মানবীয় সমতা হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। ইসলাম একটি দর্শনমাত্র নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি জীবন বিধান। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেদন আন্তর্জাতিক। বর্ণ, গোত্র, রক্তের সম্পর্ক ও ভৌগোলিক সীমারেখার চৌহদ্দী পেরিয়ে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও স্তরে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। মোটের উপর ইসলাম একটি গতিশীল শক্তি ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা। তাই মানুষের জীবনের সত্যিকারের যা প্রয়োজন তার সবই মেটাবার প্রয়াস এতে রয়েছে।

---

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২৫০
২. আল-কুরআন, ২:২৪৫
৩. আল-কুরআন, ২:২৬২, ৬৫, ৭১, ৬১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে মহানবী (স.) :

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায় সৃষ্ট জীবের সেবা। মানবের প্রতি অত্যাচার, অবিচার, দরিদ্রের প্রতি নির্মম ব্যবহার, প্রজার রক্ত শোষণ এবং স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-পোষণ হতে বঞ্চিত রেখে কেবল 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বললে মুক্তি হবে না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানি দান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতকে সেবা শুশ্রূষা, এর ভিতর দিয়েই বিশ্ব প্রভূকে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। কেননা, মানুষকে দু'টি চোখ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি দেয়া হয়েছে, কথা বলার শক্তি দেয়া হয়েছে, শুভ -অশুভ দু'টি পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে করে সে দায়িত্বের কঠিন পথপতিক্রমায় উত্তীর্ণ হয়। দায়িত্বের সে কঠিন পথ-পরিক্রমা হচেছ দাস মুক্ত করণ, অভাব অনটনে জর্জরিত নিরন্ন ও নিঃসহায়দের খাদ্য দান তথা অভাব দূরীকরণ এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং পরোপকারে ব্রতী হওয়া।[১] "যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।"[২]

মূলত এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে দূর্গত জরাজীর্ণ মানবতার সেবা করার, আর্তের প্রতি দয়া করার, দরিদ্র-প্রপীড়িত, বন্যা কবলিত, প্রাকৃতিক দূর্যোগে পতিত দূর্দশাগ্রস্ত ইয়াতিম, মিসকিন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার তাগিদ করা হয়েছে।

মহানবী (স.) মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার সূত্রাবদ্ধ এমন এক নীতিদর্শন ভিত্তিক জীবনাচরণের পরিমন্ডল গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে স্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর দিয়ে মানুষ ব্যক্তিগত দলগত ও সমাজবদ্ধ জীবনে পূর্ণতর ও সমৃদ্ধ জীবন লাভে সক্ষম হওয়ার সুযোগ পায়। জীবনের প্রথম লগ্নে একজন ইয়াতিম, নিরক্ষর ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হয়েও তিনি নিজ চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হন এবং 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংস্থা গঠন করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যৌবনের প্রথম পর্যায়ে মক্কায় হারবুল ফুজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ নামক পাঁচ বছরব্যাপী যুদ্ধজনিত বিভীষিকা ও সমকালীন সামাজিক অশান্তিদায়ক অবস্থা দেখে কতিপয় উৎসাহী যুবককে নিয়ে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন। এ সংস্থাই বস্তুত তার জীবনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবার উদ্যোগ। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হিসেবে সদস্যগণ নিম্নরূপ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ও দায়িত্ব গ্রহণ করে-

* আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করব;
* বিদেশী লোকদের ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান রক্ষার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব;
* দরিদ্র ও অসহায় লোকদেরকে সহায়তা করব;
* অত্যাচারী ও তার অত্যাচারকে দমিত ও ব্যাহত করতে এবং দূর্বল দেশবাসীকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।[৩]

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি বলেছেন, "আব্দুল্লাহ ইবন জাদআনের গৃহে শপথের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার বিনিময়ে আমাকে রক্তবর্ণ উষ্ট্র দান করলেও আমি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে রাজী নই। আজও যদি কোন মজলুম ব্যক্তি 'হে ফুজুল প্রতিজ্ঞার সদস্যগণ' বলে আহ্বান করে, তাহলে আমি তার সেই ডাকে সাড়া দেব। কারণ ইসলাম ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মজলুমের সাহায্যের জন্যই এসেছে।"[৪] আর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রতিকূল সামাজিক, রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে একটি বিশৃঙ্খল ও মানবিকতাবোধ বিবর্জিত জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং সামগ্রিক আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজ কল্যাণকর জীবন লাভে সক্ষম করার প্রয়াস চালান আর তাঁর একাজে তিনি বিস্ময়করভাবে সফলতা অর্জন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'মানবজাতির মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ট, যিনি সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করেন।"[৫] বক্তব্যটির গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হল শুধু অপরের অধিকার সংরক্ষণই নয়; অধিকন্তু মঙ্গল সাধন করতে হবে। ইসলামের আদর্শের আলোকেই ৬২২ সালে স্বাধীনতা, সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে মদীনায় প্রতষ্ঠিত হয় সত্যিকার অর্থে প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র, সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ছিল। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ সর্বযুগের মৌলিক অধিকারের প্রকৃষ্ট দলিল ও সর্বোত্তম দিক-নির্দেশনা। যার প্রথমে তিনি বলেছেন, "তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে, আজিকার দিনটি যেমন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ, তোমাদের একের প্রাণ, ধন-সম্পদ অপরের নিকট তদ্রুপ মর্যাদাপূর্ণ।"[৬]

---

১. আল-কুরআন,
২. আল-কুরআন,
৩. সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনুবাদ আবদুল মান্নান তালিব), 'শাশ্বত নবী' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ৩৩
৪. রওশন আলী খোন্দকার (সম্পা.) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ.১২৮
৫. উদ্ধৃতঃ এ কে ব্রোহী,'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬,পৃ. ৫৬
৬. সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তদুপরি তিনি এ অধিকারগুলো শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা নয়, বরং তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন, কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর অনুসারীরা তাদের জীবনে সেই মহামূল্য নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বায়তুল মালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী অনুশাসন অনুসরণ করে খুলাফা-এ-রাশেদার যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

দারিদ্রের সেবায় মহানবী (স.) :

নবী করীম (সা.) দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সর্বদা দরিদ্রের কল্যাণ কামনা করতেন, তিনি তাদেরকে উপার্জন করে দিতেন। কারও দুঃখ-কষ্ট দেখলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন।[১] কোন লোক দরিদ্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখালে তিনি বলতেন, "তোমরা যা কিছুর অধিকারী হয়েছ তা মেহনতিদের বদৌলতে।"[২] তিনি বলতেন, "যদি গোটা ভূ-পৃষ্ঠ কলুষ আত্মা ধনাঢ্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তথাপি তারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন দরিদ্রের সমতুল্য হতে পারে না।"[৩] দরিদ্রেকে কেউ গালি দিলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন এবং এ-আচরণকে জাহিলিয়াত যুগের আচরণ বলে অভিহিত করতেন।[৪]

গণীমত হিসেবে ক্রীত দাস-দাসী এলে তাদের উপর তিনি নিজ আত্মীয় স্বজন এমনকি কন্যা ফাতেমা (রা.)-র তুলনায়ও দরিদ্রদের অধিকার অধিক বলে মনে করতেন। কোন দরিদ্রের ইন্তেকাল হলে এবং তাঁর অবগতির পূর্বেই তাকে দাফন করা হলে, অবগতি লাভের পর তিনি অসন্তুষ্ট হতেন এবং কবর স্থানে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়া করতেন।[৫]

দরিদ্রদের তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা.) কে বলতেন, "তোমার দরজা হতে কোন মিসকীনকে খালী হাতে ফিরিয়ে দিওনা, তাকে এক টুকরা খুর্জর থাকলেও দান কর।" "তোমরা বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর না, কেননা অনেক সময় কোন দু:স্থ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে যে, কোন শপথ করলে তা তিনি পূর্ণ করেন।" "জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র হবে।""হে আয়িশা! দরিদ্রদের ভালবাস, তাদেরকে নিকটে আন, তবে আল্লাহও নিকটে হবে।" "ধনীকদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এ কথা শুনে তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তোমাদের সঙ্গে বসতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৬]

তিনি দরিদ্রদিগকে নিষ্কর্ম ও ধনীদের অর্থ সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকার পরিবর্তে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জনের উপদেশ দিতেন, "দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম।" "ঐ জীবিকাই সর্বোৎকৃষ্ট যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে।" আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করতেন। নিরূপায় না হলে দরিদ্রদিগকে যাঞ্ছা করতে নিষেধ করেছেন। একদিন রাসুল (স.) তাঁর মজলিসে সাহাবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে,, তাঁরা কারও নিকট হাত পাতবেন না। তিনি ভিক্ষার পরিবর্তে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহের উৎসাহ দিতেন।[৭]

ইসলামে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই। মানুষের মর্যাদা মূল্যায়নের মাপকাঠি হল তার গুণাবলী ও সত্যনিষ্ঠা। দরিদ্রদের অন্তরে সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত করার প্রতি তিনি এত যত্নবান থাকতেন যে, তাদের নগণ্য দান খয়রাতকে ধনীদের বৃহৎ দানের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং বলতেন, "এর বদৌলতে এ সব বড় বড় দানও কবুল করা হবে।" দান খয়রাত হযরত (স.) এর জীবনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দু:স্থ-নিপীড়িত মানুষের সাহায্যকল্পে সতত তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। জীবনে কোনদিন কোন লোক হযরতের নিকট কিছু চেয়ে বিমুখ হয়নি। এজন্য মহানবীর (স.) দানশীলতাকে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) প্রবাহমান বায়ূ অপেক্ষাও অধিকতর প্রবহমান বলে বর্ণনা করেন। বিশেষত রামাযানুল মুবারকে।[৮] একবার শিষ্যবৃন্দের সাথে নামায পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি উঠে এসে গৃহে গমন করেন, কিছুক্ষণ পর আবার নামাযে যোগ দেন। শিষ্যবৃন্দ অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "কতিপয় দিনার দুই তিন দিন হতে এখনও আমার বিছানায় পড়ে আছে, তা আজও বিতরণ করা হয়নি। নামায পড়তে পড়তে সে কথা মনে পড়ায় আমি উঠে যাই, দিনারগুলি বিতরণ করার ব্যবস্থা করে আসলাম।"[৯]

---

১. মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, হাদীস নং-১০১৭
২. আবু দাউদ (৩য় খন্ড), পৃ ৭৩, হাদীস-২৫৯৪
৩. মিশকাত (২য় খন্ড), পৃ ৬৬৪
৪. মুসলিম শরীফ (৪র্থ খন্ড), হাদীস-২৫০৪
৫. হযরত রাসূলে করীম (স.) ঃ জীবন ও শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৪
৬. ঐ, পৃ ২৭৪-৭৫
৭. বুখারী (১ম খন্ড) আয-যাকাত, বাব-৫০
৮. সহীহ মুসলিম (৪র্থ খন্ড), হাদীস-২৩১১
৯. উদ্ধৃত ঃ গোলাম মোস্তাফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুশয্যায় থেকেও মহানবী (স.) দান করার কথা বিস্মৃত হননি। ইন্তিকালের পূর্বদিন তিনি হযরত *আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কাছে যে দিনারগুলি রেখেছিলাম তা কোথায়?"* হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, "আমার কাছেই আছে।" হযরত বললেন, *"তা শীঘ্রই দান করে দাও।"* বলতে বলতে *তিনি* হতচেতন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান হলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "দিনারগুলি দান করেছ কি?" হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, "না এখনও করিনি।" তখন তিনি সেগুলো আনতে বললেন। হযরত আয়িশা (রা.) তা এনে হযরতের হাতে দিলেন। দেখা গেল ছয়টি দিনার। হযরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তা বিতরণ করে দিয়ে বললেন, "এখন আমার শান্তি হল। দিনারগুলো রেখে আমার প্রভূর সান্নিধ্যে গেলে কি লজ্জার কথাই না হত।"[১]

একজন দরিদ্র হযরতের নিকট গমন করে দেখল যে, হযরতের অগণিত ছাগ ও শেষ প্রান্তরে পরিব্যাপ্তভাবে চিরণ করছে। লোকটি হযরতের নিকট তা দান চেয়ে বল। হযরত তার ইচ্ছা অনুযায়ী সব দান করে দিলে সে তা গ্রহণ করল এবং আনন্দে ও বিস্ময়ে স্বগোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলল, মুহাম্মদ এতাদৃশ দানবীর যে, সে ভবিষ্যত দরিদ্রতার বিন্দুমাত্রও পরোয়া করে না।[২]

একবার আনসার সম্প্রদায়ের কিছু লোক হযরতের নিকট দান প্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে দান করলেন। দানের ফলে তাঁর সমগ্র সম্পদই নিঃশেষ হয়।[৩] হুনায়নের যুদ্ধে যে ধন-সম্পদ পাওয়া যায় হযরত (স.) সমস্তই সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কোন হতদরিদ্র লোক মৃত্যুবরণ করলে তিনি ঋণ পরিশোধের ভার নিতেন। একবার বাহরাইনের ধনরত্ন হযরতের নিকট আসলে তা সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত আব্বাস (রা.) এত পরিমান অর্থ পান যে তা বহনের ক্ষমতা তার ছিল না। হযরতের নিকট তিনটি ভূ-সম্পত্তি ছিল। একটি ফেদাকে, অন্যটি মদীনায় এবং তৃতীয়টি খায়বারে। দরিদ্রদের জন্য তিনি 'ফেদাক' সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দিলেন এবং মদীনার উদ্যানগুলি দান করে দেন। খায়বারের সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তাঁর পরিবার-পরিজনকে দান করলেন এবং বাকী দু-ভাগ সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে উৎসর্গ করলেন।[৪]

হযরত (স.)-এর সাহাবাগণও তাঁর আদর্শকে একনিষ্ঠভাবে তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করে গেছেন। নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত অত্যন্ত ব্যয়বহুল তাবুকের যুদ্ধে হযরত উমর (রা.) তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের অর্ধেক দান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) দান করেন তার সম্পদের পুরোটাই।[৫]

আর্ত ও পীড়িতদের সেবা :

অসুস্থদের সেবা-যত্নের প্রতি মহানবী (সঃ) বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু বা প্রিয়জনদের অসুস্থতার সংবাদ পেলে তিনি তার শুশ্রূষার জন্য হাজির হতেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিকট আপন পরের পার্থক্য ছিল না। এমনকি কোন ইহুদি অসুস্থ হলে তাকেও দেখতে যেতেন।[৬] নবী (স.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যায় বা সেবা করতে যায়, আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, "তুমি আল্লাহ্ পাকের জন্য অত্যন্ত খুশির কাজ করেছ। তোমার এ পদক্ষেপ প্রভূত কল্যাণদায়ক হয়েছে এবং এ কাজের মাধ্যমে তুমি জান্নাতে বাসস্থান সংগ্রহ করেছ।"[৭] "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, পীড়িতের সেবা কর এবং কয়েদিগণকে মুক্তির চেষ্টা কর।" "যে ব্যক্তি অজু করে নেকী লাভের উদ্দেশ্যে তার কেন পীড়িত মুসলমান ভাইকে দেখতে বা সেবা করতে যায়, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে ৬০ বছরের দূরত্বে অবস্থান করে।"[৮]

নবী করীম (স.) বলেছেন, "তোমাদের ভাইয়ের দিকে হাসি মুখে তাকানো তোমার জন্য একটি সদকা বা পুণ্যের কাজ; কাউকেও কোন ভাল কাজের আদেশ করা একটি সদকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা সদকা। পথে-প্রান্তরে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেয়া সদকা; অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করা সদকা; মানুষের চলার পথ থেকে কাটা-পাথর ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তুগুলি সরিয়ে ফেলা সদকা। তোমার বালতি হতে অন্যের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়া সদকা।"[৯]

---

১. গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৩-৫১৪
২. ফজলুল করিম, আদর্শ মানব, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৪৭, পৃ. ২৪৭
৩. ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮
৪. ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৯
৫. মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, বিশ্বসভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদানই, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা -১৯৮৮, পৃ. ৩৭
৬. বুখারী (৪র্থ খন্ড), বাব ৪৪, ইরাদাতুল মুশরিক।
৭. মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছিদ্দিকী, মানুষের নবী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৭২, পৃ. ২৫৪
৮. মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪
৯. মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ২৫৫-২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) রোগীদের ঘৃণা করা ও তাদের অস্পৃশ্য করে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি পীড়িতের সাথে একত্রে পানাহার করতেন। তবে তিনি সাহাবীদের জেনে-শুনে মহামারী কবলিত এলাকায় যেতে এবং স্বেচ্ছায় কোন ছোঁয়াচে রোগের শিকার হতে নিষেধ করেছেন।[১] রোগী দেখতে গেলে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে মনে সাহস যোগাতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিজেদের রোগের চিকিৎসা কর। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সব রোগের ঔষধ রেখেছেন।" তিনি নিজেও জনগণকে বিভিন্ন সহজলভ্য ঔষধ সম্পর্কে অবহিত করতেন।[২] তিনি বলতেন, "কোন মুসলিম যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা কোন কষ্ট-ক্লেশে পড়ে, তখন তার পাপরাশী এভাবে ঝরে যায় যেমন শীত ঋতুতে বৃক্ষপত্র ঝড়ে যায়।"[৩]

হাদীসে কুদসীতে উল্লেখিত হয়েছেঃ "শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি; আমি পীড়িত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। এ কথা শুনে বান্দা অবাক হয়ে আরজ করবে, হে প্রভু, তুমি অভাবমুক্ত। কেমন করে তুমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত এবং পীড়িত হতে পার? উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে তোমার দুয়ারে উপস্থিত হয়েছিল, তুমি তাকে খাদ্য ও পানীয় দাওনি। যদি দিতে সেখানে তুমি আমাকে পেতে। তোমার জানা উচিত ছিল, আমার বান্দার সেবা করলে আমারই সেবা করা হয় এবং আমি তাতেই সন্তুষ্ট হই।"[৪]

অতিথি সৎকার ও দাওয়াত গ্রহণ :

অতিথির সেবা ও সম্মান করার অনুশাসন কম বেশি সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু মহানবীর (স.) নির্দেশে ইসলামে তা মূল ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গরূপে স্থির হয়েছে। অতিথির অসম্মান করলে বা স্বেচ্ছায় খাদ্য-পানীয় না দিলে ঈমান পূর্ণ হয় না। গৃহস্বামীর খাদ্যবস্তুতে অতিথির হক বা দাবি রয়েছে। গৃহী নিজের ইচ্ছায় এ হক না দিলে পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে বাধ্য করে অতিথির হক আদায় করে দেবে। অন্যথায় সকলেই গোনাহগার হবে। নবী (স.) বলেন, "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মুসলিম সমাজের কারও বাড়িতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়। তারপর সেই অতিথি যদি অনাহারে থেকে রাত্রি যাপন করে তবে সেখানকার সকল মুসলমানের উপরেই সেই অতিথিকে সাহায্য করার দায়িত্ব পড়বে। এমনকি প্রয়োজন হলে যে গৃহস্বামীর বাড়িতে সে অতিথি হয়েছিল, তার ধন-সম্পদ ও ফল-শস্য হতে সেই অতিথির আহার্য পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করে তারা অতিথিকে দিতে পারবে।" "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন অতিথির সম্মান করে।" গৃহীর প্রতি অতিথি সৎকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য একদিন ও একরাত্রি পর্যন্ত থাকে। অতিথির পক্ষে কারও আতিথ্য গ্রহণ করা তিন দিন পর্যন্ত চলতে পারে। তিনদিনের বেশি কাউকে যদি খাদ্য দান করা হয়, তবে তা সদকারূপে গণ্য করা হবে।" "নবীগণের আদর্শ অনুযায়ী সুন্নাত কাজ হচ্ছে অতিথির বিদায়কালে গৃহস্বামী যেন তাকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।"[৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, "আমি একদিন ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় অচলভাবে পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। সে সময় আমার ক্ষুধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একজন পথিককে কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু লোকটি তার গন্তব্য পথে চলে গেল। অতঃপর উমর (রা.) সে পথে গমন করলেন। তাঁর দৃষ্টিও আমার ক্ষুধার প্রতি আকৃষ্ট হল না। অতঃপর সেই স্থান দিয়ে হযরত (স.) যাওয়ার সময় বললেন, "আমার সঙ্গে চল। হযরত গৃহে পৌছে প্রথমেই আমার ক্ষুধা নিবারণ করলেন।" একদা এক বিধর্মী হযরতের আতথ্য গ্রহণ করল। হযরত তাকে একটি ছাগলের দুগ্ধ দোহন করে পান করতে দিলেন। এভাবেই লোকটি সাতটি ছাগীর দুগ্ধ নিঃশেষ করে ফেলল, হযরতের জন্য আর কিছুই রইল না। একদা মেকদাদ নামক এক সাহাবী এবং তাঁর দু বন্ধু অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের উপযোগী কিছুই সংগ্রহ করতে পারলেন না। শেষে তারা হযরতের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা করলেন। তিনি তাদেরকে তিনটি ছাগীর সমস্ত দুগ্ধ পান করতে দিলেন এবং বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দান ক্ষুধার্ত উদরকে পরিতৃপ্ত করা।[৬]

---

১. আবু দাউদ (৩য় খন্ড), হাদীস-১৩০৩
২. আত তিরমিযি (৪র্থ খন্ড), পৃ ৩৮৩-৪১২, হাদীস-২০৩৮
৩. বুখারী (৪র্থ খন্ড), পৃ. ৪৪
৪. উদ্বৃত্ত ঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৫. মোঃ আব্দুল জব্বার ছিদ্দিকী, উদ্বৃতঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫
৬. বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

একবার কয়েকজন সাহাবী হযরত (স.)- কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমরা খাদ্য গ্রহণ করলেও আমাদের তৃপ্তি হয় না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক আহার গ্রহণ কর। তদুত্তরে তারা তা স্বীকার করলে হযরত (স.) বললেন, "সকলেই একত্রিত হয়ে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্‌র নাম গ্রহণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বরকত দেবেন।"[১]

জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর মেহমান নয়। নবী (স.) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন: "আজ রাতে আমার এ মেহমানকে কে গ্রহণ করতে পারে?" উত্তরে আবু তালহা আনসারী (রা.) বললেন, হে রাসূল আমি। মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজ ঘরে গেলেন। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, "নবী (স.)-র মেহমানকে সম্মান কর।" স্ত্রী বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! বাচ্চার খাদ্য ছাড়া ঘরে বাড়তি কিছুই নেই।" আবু তালহা বললেন, বাচ্চা রাতে খানা চাইলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও। মেহমান মেজবান ছাড়া খেতে চাইবে না। তাই তুমি বাতিটা নিভিয়ে দিও। তাহলে রাসূল (স.)-এর মেহমানকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ানো যাবে।" স্ত্রী তা-ই করলেন। এভাবে অন্ধকারে নিজে না খেয়ে মুখে খাওয়ার শব্দ করে খাওয়ার ভান করেন। সকালে নবী (স.) সাহাবীকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ এ-কাজেই খুব খুশি হয়েছেন।[২]

হযরত আলী (রা.)-এক ইহুদির কিছু কাজ করেন এবং প্রতিদানে কিছু যব সম্মানী লাভ করেন। তারপর এক-তৃতীয়াংশ পিষে খাদ্য তৈরি করে খেতে বসেন। এ-অবস্থায় একজন মিসকিন এসে খাদ্য চায়। তখন তিনি মিসকিনকে খাদ্য দান করেন। পরদিন দুই-তৃতীয়াংশ খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। তখন একজন ইয়াতিম এসে খাদ্য চায়। তিনি তাকে খাদ্য প্রদান করেন। অত:পর তৃতীয় দিন বাকি অংশ রান্না করা হলে একজন মুশরিক বন্দি এসে খাদ্য চায় তিনি তাকে তা দিয়ে দেন এবং রাত ও দিন ক্ষুধার্ত থাকেন। আল্লাহ্ বলেছেন: "আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দিকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।"[৩]

জীবে দয়া :

শুধু মানব জাতির জন্য নয়, জীবের জন্যও নবী করীম (স.)-এর হৃদয় দয়া ও অনুকম্পায় পরিপূর্ণ ছিল। জীবজন্তুর এমনকি তরুলতার প্রতিও হযরতের দয়ার অন্ত ছিল না। জগতে মানুষ ছাড়াও অগনিত সৃষ্টি রয়েছে, যাদের কেউ কেউ কখন মানুষের অজ্ঞাতে তার ফসল খেয়ে ফেলে। এর বিনিময়েও সে বক্তি সৃষ্টিসেবার সওয়াবে পুরস্কৃত হন। যেমন- মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি একটি বৃক্ষ রোপন করে অথবা শস্য বপন করে, অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখি বা কোন জীবজন্তু তার অজান্তে খেয়ে ফেলে, তাহলে তা তার সদকাহ করার সওয়াব হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি সেখান থেকে চোরও চুরি করে নিয়ে যায় তা তার জন্য একটি সদকাহ্ বলে আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হবে।"[৪]

মহানবী (স.) জীব-জানোয়ারের উত্তম যত্ন নেয়ার জন্য সর্বদাই উপদেশ দিতেন। কোন পশুকে দূরবস্থায় দেখলে তিনি বলতেন, "এই প্রাণীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, সুস্থ অবস্থায় তাদের উপরে চড়ে বেড়াও, উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা কর।"[৫] কোন পশুর মুখে দাগ লাগান দেখলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেন, "তোমরা কি শুননি যে, আমি এ সব ভাষাহীন প্রাণীর মুখে দাগ দিতে এবং উহাদের আকৃতি বিকৃত করতে নিষেধ করেছি?"[৬] উষাকালে মোরগের ডাকে কেউ বিরক্ত হলে বলতেন, "মোরগের গাল-মন্দ বলো না, কেননা সে সালাতের জন্য জাগ্রত করে। যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা সে কোন রহমতের ফেরেস্তা দেখেই ডাকে।"[৭]

---

১. ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
২. আ. র. ম আলী হায়দার, 'ইসলামের সেবা ও আধ্যাত্মিকতা', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭৬
৩. আল-কুরআন, সূরা-৭৬, আয়াত-৮-৯
৪. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুস সাদাকাত দ্রষ্টব্য
৫. আবু দাউদ (৩য় খন্ড), পৃ. ৪৯, হাদীস-২৫৪৮
৬. আবু দাউদ (৩য় খন্ড), পৃ. ৫৭, হাদীস-২৫৬৪
৭. আবু দাউদ (৫ম খন্ড), পৃ. ৩৩১, হাদীস-৫১০১-৫১০২

Dhaka University Institutional Repository

এক স্ত্রী লোকের একটি বিড়াল ছিল। সে তাকে বেঁধে রাখত। সে বিড়ালটিকে কখন ছেড়ে দিত না যে, সে পোকা-মাকড় ধরে খায় কিংবা নিজেও কিছু খেতে দিত না। অবশেষে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। ফলে ঐ মহিলা নরকবাসিনী হল। (বুখারী) ইসরাইল বংশীয় একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচারের জন্য গ্রাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে স্থানান্তরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেখল একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে একটি কূপের চারিদিকে ঘুরছে। স্ত্রী লোকটি তার জুতা খুলে তা দ্বারা পানি তুলে কুকুরটিকে খাওয়াল। এজন্য আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী) ইতরজন্তু পর্যন্ত হযরতের করুণা হতে বঞ্চিত হত না। তারাও যেন তাকে তাদের দয়ালু বন্ধু বলে চিনত। একদা হযরত (স.) শিষ্যদের সঙ্গে কোন স্থানে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক উট হযরতকে মাটিতে মুখ দিয়ে অব্যক্ত শব্দ করতে লাগল। তিনি থামলেন, পরে উটের মালিককে ডেকে বললেন, "এই উট আমার কাছে নালিশ করছে যে, সে পেট ভরে খেতে পায় না। অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে। দেখ, তুমি এর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[১]

কোন কোন সাহাবী পাখির ছানা ধরে নিয়ে আসতেন, ছানাদের মা তাদের মাথার উপর বিব্রত অবস্থায় উড়তে থাকত। হযরত ঐ সমস্ত পাখির ছানাকে মুক্ত করে দিতেন এবং বলতেন, "তোমরা কেন তাদের স্বাধীনতা হরণ কর? কেন তাদের মাদেরকে কষ্ট দাও?"[২]

এক সময় হযরত একটি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি হরিণীর ডাকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। তিনি দেখলেন হরিণীটি বাঁধা রয়েছে এবং নিকটেই শিকারী শুয়ে আছে। হরিণীটি তার শাবকের জন্য কাতর ধ্বনি করছিল। তিনি হরিণীকে খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হরিণী বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করিয়ে ফিরে আসল। শিকারী জাগ্রত হলে হযরত তাকে হরিণীকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করলেন। সেও তাকে ছেড়ে দিল। হরিণী তার অব্যক্ত রবে হযরতকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল।[৩] বৃক্ষ-লতার প্রতিও হযরতের স্বস্নেহ ব্যবহার ছিল। তিনি অকারণে জীবিত বৃক্ষছেদন করতে নিষেধ করতেন। মক্কা শরীফের হেরেমের মধ্যে গাছের পাতা ছেঁড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছে।

সর্বজীবে দয়া, পীড়িতের সেবার জন্য পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সাহিত্যেই অনেক মহৎবাণী রয়েছে। মুসলমানদের এটা ইবাদত। আল্লাহ্ রহমান, সর্বজীবের প্রতিই তাঁর দয়া বিস্তৃত। বিপন্ন মানুষ বা প্রাণীর সেবা করলে তার দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহনরূপে ক্ষমা ও নৈকট্য লাভ করা যায়। মহানবী (স.) তাই এ কাজকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছেন। এ ইবাদত মানব জীবনের সর্বস্তরের কর্তব্য। যে ব্যক্তি শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি করেন, কিন্তু কোন জীবের করুণ আর্তনাদে তার হৃদয় বিগলিত হয় না, তিনি যেমন আংশিক মুসলমান অপর ব্যক্তি শুধু জীবের সেবা করেন, বিপন্নের মমতায় ভরপুর কিন্তু আল্লাহর হুকুমে নামায, রোযা ইত্যাদি করেন না, তিনিও তেমন আংশিক মুসলমান। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ের প্রতি কর্তব্যই যিনি পালন করেন, তিনিই প্রকৃত ইবাদত করেন।

খুলাফা-এ-রাশেদার যুগে সমাজকল্যাণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তিকালের পর সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের একটি সমৃদ্ধ ধারা রচিত হয় খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে। ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই হযরত আবু বকর (রা.) এক নীতি নির্ধারণী ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দূর্বল, আমি তার নিকট থেকে জনগণের অধিকার আদায় করে নেব এবং তোমাদের মধ্যকার দূর্বলতর ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী। তার অধিকার আমি অবশ্যই আদায় করে দেব।"[৪] খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সমগ্র আরবে ভয়াবহ অভ্যুত্থান ঘটে এবং বেশ কিছু গোত্র ইসলামের আবশ্যকীয় বিধান যাকাত দিতে অস্বীকার করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করেছিল তা অচল ও ব্যর্থ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ফলে তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে ওরা যে যাকাত প্রদান করত, তার একটা উটও যদি আমার সময়ে দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।"[৫]

---

১. মুহম্মদ তাইয়্যেব (অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ), মানবতার বৈশিষ্ট্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ.৪
২. আবু দাউদ (৩য় খন্ড), পৃ. ৪৬৯, হাদীস-৩০৮৯
৩. তিবরানী ও বায়হাক্বীর উদ্ধৃত ঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪. কিতাবুল আমওয়ালের বরাতে মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ৮৭
৫. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, (অনু.) ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা হযরত আবু বকর (রা.) এর সমগ্র খিলাফত আমলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবিত থাকাকালীন সময়ের মতই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তাঁর আমলেই প্রথমে সরকারীভাবে বায়তুলমালের মত একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়, যার মাধ্যমে অসহায়, বিপদগ্রস্ত ও দরিদ্ররা সাহায্য পেত। এমনকি তাঁর সময়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন ইরাক এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন, হীরাবাসী খৃষ্টানদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বার্ধক্য, রোগাক্রান্ত ও দারিদ্রক্লিষ্ট লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[১]

হযরত আবু বকর (রা.) এর পর হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। এ সময়ই কায়েস ও রোমানদের সাথে যুদ্ধ চলছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ হয়। তখন হযরত উমর (রা.) এর নেতৃত্বে ইসলামী সাম্রাজ্য যেমন বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দিক দিয়েও অধিকতর সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা অর্জিত হয়।[২] খলিফা ওমর (রা.) সর্বপ্রথম বায়তুলমাল ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণের দায়িত্ব সরকারীভাবে গ্রহণ করেন। যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হলে বায়তুল মাল হতে জনকল্যাণে ব্যয় করা হত, যাতে কারও মৌলিক চাহিদা অপুরণ না থাকে। জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কল্যাণমুখী ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভূমি জরিপ করা হয়। খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক খাল খনন করা হয়। এসব খাল খনন করে বহু অনাবাদী ভূমি চাষাবাদ যোগ্য করা হয়। বিখ্যাত সুয়েজ কাল হযরত উমর (রা.)-এর সময় খনন করা হয়। এসব ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও সুসংহত করে।[৩]

হযরত উমর (রা.) ২০ হিজরীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আদম শুমারীর উদ্দেশ্যে 'দিওয়ান' নামক একটা বিশেষ সরকারী বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এই আদমশুমারীর ভিত্তিতে কয়েক প্রকারের লোকের জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় পেনশন নির্ধারিত হত। এরা হচ্ছেন -(ক) বিধবা এবং ইয়াতিমরা (খ) রাসূল (স.) জীবৎকালে ইসলামের সংগ্রামে যারা পুরোভাগে ছিলেন, তাঁরা সকলে, রাসূল (স.) এর বিধবা পত্নীগণ, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বেঁচেছিলেন তারা, গোড়ার দিকের মুহাজিরগণ ইত্যাদি এবং (গ) সকল অক্ষম, পঙ্গু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোকেরা। এই পরিকল্পনা মুতাবিক ন্যূনতম বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ছিল দু'শত দিরহাম। এমনকি শিশুরা নিজেদের ভরণ পোষণ করতে অসমর্থ থাকাকালে নীতির ভিত্তিতে জন্ম মুহূর্তে থেকে শুরু করে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য শিশুদের নিয়মিত ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এই ভাতা দেয়া হত তাদের বাপ মা অথবা অভিভাবকদেরকে।[৪] হযরত উমর (রা.) এর এ পেনশন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে উইলিয়াম বলেন, "The person system of Umar is spectacle probably without parallel in the world."[৫]

হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে এ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অমুসলিম নাগরিকদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। তিনি একদিন এক বৃদ্ধকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে তার ভিক্ষা করার কারণ জানতে চান। লোকটি জানাল যে, জিযিরার অর্থ যোগাড় ও ঘরের প্রয়োজন পূরণের জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই বলে। একথা শুনে খলিফা বলে উঠলেন, "আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। তোমার যৌবনকালীন কাজ-কর্মের ফসলতো আমরা সবাই ভোগ করেছি। অতঃপর তোমার বার্ধক্যকালীন জরাজীর্ণ ও অসহায় অবস্থায় তোমাকে ত্যাগ করেছি, যেন তুমি তিলে তিলে ধ্বংস হও।"[৬] অত:পর তিনি লোকটির জন্য মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন এবং তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিত করেন।

---

১. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৪৪
২. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৩. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
৪. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, 'ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও সরকার', ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৮৭
৫. As quoted by Md. Atiqur Rahman, op. cit, P. 167
৬. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বিলাল (রা.) একবার খলিফার নিকট স্থানীয় প্রশাসক ও সেনা নায়কদের উপেক্ষার দরুন সৃষ্ট দরিদ্র জনগণের অভাব অনটন সম্পর্কে অভিযোগ করলে খলিফা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর নামে শপথ, এ আসন থেকে আমার উঠে যাওয়ার আগেই তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি অভাবগ্রস্ত নাগরিকের জন্য দুই মুষ্ঠ পরিমান আটা ও সেই অনুপাতে প্রয়োজন পরিমাণ সিরকা ও খাবার তেলের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জওয়াবে সকলেই বলে উঠলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, আমরা আপনার পক্ষ হতে এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আল্লাহ আমাদের বিপুল ও সুপ্রশস্ত সম্পদ দান করেছেন।"[১]

বায়তুল মাল সম্পর্কে খলিফা উমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, "রাষ্ট্রীয় সম্পদে কোন লোকই অপর কারও তুলনায় অধিক পাওয়ার অধিকারী নয়। আমি কারও অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন নই। আল্লাহর নামে শপথ, এ সম্পদে প্রত্যেকটি মুসলিমেরই প্রাপ্য অংশ রয়েছে।"[২]

খলিফা উমর (রা.) হযরত খালিদকে (রা.) লিখে পাঠিয়েছিলেন, "এই ধনমাল সরকারী ব্যবস্থাধীন। তা একান্তভাবে গরীব জনগণের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।"[৩] তিনি বলতেন, "সুদূর ফুরাত নদীর তীরেও যদি একটি উট অসহায় অবস্থায় মনে, তবু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আল্লাহ তার সম্পর্কেও আমার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন।"[৪]

হযরত উমর (রা.) তাঁর জীবনের শেষ বছরে একাধিকবার বলেছেন, "আল্লাহ যদি আমাকে পরমায়ু দেন আমি দেখব যাতে করে সানা পর্বতমালার নিঃসঙ্গ মেষ পালকও জাতির সম্পদে তার অংশ পায়।" বাস্তব প্রশ্ন বা সমস্যাদির উপলব্ধির যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাঁর ছিল তারই বদৌলতে হযরত উমর (রা.) গড়পরতা একজন মানুষের পুর্ণ স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ন্যুনতম কি পরিমাণ খাদ্য দরকার তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একবার ত্রিশ জন লোকের একটি দলকে নিয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পর্যন্ত করেছিলেন এবং এ সব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের পর তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, দেশের প্রত্যেকটি নর এবং নারী (আর্থিক ভাতা ছাড়াও যে ভাতা হয়ত তারা ভোগ করছে) প্রত্যকদিন দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার মত প্রচুর গম মাসিক ভাতা হিসেবে পাবে।" অবশ্যি হযরত উমর (রা.) তাঁর সামাজিক নিরাপত্তার মহৎ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করার আগেই ঘাতকের ছুরিকাঘাতে শাহাদাৎ বরণ করেন।[৫]

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর সময় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের এ ইসলামী ব্যবস্থা সর্বোতভাবে অব্যাহত ছিল। তাঁর খিলাফত কালে ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং উতাল-পাতাল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বায়তুল মালে যাকাত সাদাকাত জমা হওয়া অব্যাহত থাকে এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি।[৬] তাঁর সময়ে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় যাকাত নেয়ার মত লোক না পাওয়া গেলেও তিনি এ বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার ফরমান জারি করেছিলেন।[৭]

একই অবস্থা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)। তাঁর শাসনামলে ইসলামী জগতে রাজনৈতিক দূর্যোগের ঘনঘটা ঘণীভূত হয়ে উঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণকে প্রদত্ত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পূর্ববতই অব্যাহত থাকে। তিনি মালিক বিন আল হারিস (রা.) কে (আল আশতার) মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করার সময় লিখিত ফরমানে তাঁকে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন, গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহর আনুগত্য করে চলার, সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয় রেখে কাজ করার, মুসলিমের প্রতি বিনম্র ও ফাসিক ফাজির ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ ন্যায়বিচার, জালিমের উপর তীব্র কঠিন শাসন চালানোর, সাধারণভাবে মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলতা ও যথাসাধ্য কল্যাণমূলক আচরণের বিস্তারিত উপদেশ এবং নসিহত লিখেছিলেন।[৮]

ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু সচেতন ছিলেন একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আলী (রা.) কে লক্ষ্য করে উসমান ইবন হানিফ (রা.) বলেছিলেন, "আপনি বিত্ত সম্পদের সমবন্টন নীতি অনুসরণ করেছেন। এ নীতির মাধ্যমে আপনি সমাজের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়েছেন, নিগ্রো এবং

---

১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৫. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৭. তারিখে তাবারীর বরাতে, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৮. হযরত আলী (রা.) "প্রশাসনের মুলনীতি" (অনু. খালেদ চৌধুরী), ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১৭-৩৫ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

পারসিয়ানদেরকে আরবদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। আপনি দাস ও মালিককে বায়তুল মাল হতে সমপরিমাণ অংশ দিচ্ছেন, ধনীদেরকে তাদের জায়গীর হতে বঞ্চিত করেছেন, তাদের বিশেষ মর্যাদা লোপ করেছেন। এ নীতি দ্বারা আপনি খিলাফতের ও নিজের কল্যাণের চেয়ে সর্বনাশকেই ডেকে আনছেন। আর এ কারণেই প্রভাবশালী ও সম্পদশালী আরবগণ আপনাকে পরিত্যাগ করে আমীর মুয়াবিয়ার দলে যোগ দিচ্ছেন। দরিদ্র, অক্ষম লোকজন আপনার কোন উপকারই করতে পারবে না। অসহায়, বিধবা ও দাসগণ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। খলিফা উত্তরে বললেন, "অসম ধন বন্টনের মাধ্যমে আমি এক বিত্তশালী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা শোষণের পথ প্রশস্ত করতে পারি না। সমাজের এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণের কোন পন্থাই আমি মুহূর্তের জন্য অনুমোদন বা বরদাশত করতে পারি না।"[১]

খুলাফা-এ-রাশেদার আমলে উপর্যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অক্ষম ও বিপদগ্রস্তদের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের স্বীকৃতি রয়েছে, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের পথ নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে সমাজকল্যাণ

খুলাফা-এ-রাশেদার পর উমাইয়া যুগে সমাজকল্যাণের সম্ভাবনাময় দিকসমূহ স্তিমিত হয়ে পড়লে এ সময়ে আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় উমর রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের মঙ্গলবিধায়ক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ানের সমসাময়িক আবদুল মালিক এ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। অধ্যাপক হিট্টির মতে "তাঁর শাসনামলে প্রশাসনের জাতীয়করণ হয়, প্রথম টাকশাল স্থাপন করে আরবীমুদ্রা প্রস্তুত হয়, ডাক বিভাগের উন্নতি হয়।"[২] আরব সাম্রাজ্যের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী খলিফা ওয়ালিদ মসজিদ-মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠায় খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপক হিট্টির কথায়, "He was perhaps the first ruler in mediaeval times to build hospitals for persons was diseases and the many bazars house which later in the west followed the Moslem precedent."[৩]

উমাইয়া রাজত্বের সময় সমাজ সেবায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী হলেন খলিফা দ্বিতীয় উমর। খুলাফা-এ- রাশেদার খলিফাদের মত পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি অনাসক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, সরল এবং কর্তব্যপর এ খলিফাকে বলা যায় সর্বোতভাবে জনকল্যাণে উৎসর্গীত। মাত্র আড়াই বৎসরের শাসনকালে তিনি জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ নিয়োজিত করতে দেখা যায় এবং জনগণের মঙ্গলচিন্তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত পাওয়া যায়।

উমাইয়া যুগের পর আব্বাসীয় আমলের খলিফাগণের মধ্যে আল-মানসুর (৭৪৫-৭৭৫ খ্রী.) ন্যায় বিচারক ও সুশাসক হিসাবে জনগণের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হন। তিনি বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে "খাদ্য সুষ্ঠ সরবরাহ, জ্ঞানচর্চার ভিত্তি ও ন্যায় বিচারের বাগিচা" হিসেবে তা গড়ে তোলেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে তিনি মৃত্যুশয্যায় উত্তরাধিকারী পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "দান ছাড়া কোন খলিফা গুণী, আনুগত্য ছাড়া কোন নরপতি শক্তিশালী অথবা ন্যায়বিচার ছাড়া কোন জাতির সংস্কার সাধন হতে পারে না।"[৪] আব্বাসীয় যুগের খলিফা হারুন-আল-রশীদ ন্যায় বিচারক, সদাশয়, মহানুভব, দানবীর, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নরপতি হিসাবে ইতিহাস খ্যাত। অধ্যাপক হিট্টির মতে "বিশ্বের কার্যকলাপ নিয়ামক দু'টি বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতির নাম নিয়ে নবম শতাব্দীর সূচনা হয়-পাশ্চাত্যে শার্লিমেন এবং প্রাচ্যে হারুন-আর-রশীদ। এ দু'জনের মধ্যে হারুন সন্দেহাতীতভাবে অধিকতর শক্তিশালী এবং উন্নততর সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী।"[৫] তাঁর গোটা সাম্রাজ্যব্যাপী জনহিতকর কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্কুল, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, রাস্ত াঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও কৃষির অগ্রগতির জন্য খাল খনন ইত্যাদি নির্মাণ। তিনি পাগল চিকিৎসার জন্যও একটি আলাদা হাসপাতাল নির্মাণ করেন। খলিফা হারুনের পর ইতিহাসখ্যাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক আল-মামুনের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি মনে করতেন যে, জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য "তিনি রাষ্ট্রের কোন খলিফা বা আমির-ওমরাহদের ব্যক্তিগত সাময়িক বদান্যতায় শিক্ষা নির্ভর করুক এর পক্ষপাতী ছিলেন না। -------- তিনি এটিকে (শিক্ষাকে) চিরস্থায়ী দান স্বত্বের উপর সাময়িক

---

১. মোহাম্মদ আজরফ, ইসলাম ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১১৭

২. P. K. Hitti, History of the Arabs, London, P. 206

৩. Ibid, P. 208

৪. Ibid, P. 209

৫. Ibid, P. 213

Dhaka University Institutional Repository

দান হতে স্বয়ং সম্পন্ন করেছিলেন।" এ অবস্থার কারণে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রচুর পরিমাণ লাখেরাজ সম্পত্তি পাওয়া যায় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও বহুমুখীন ব্যাপকতায় বিকাশ হয়। ফলে মানবকল্যাণ, সমাজ উন্নয়ন ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবন লাভের পথ নির্দেশনা লাভ সহজতর হয়। উইলিয়াম মুর খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন জ্ঞানী-গুণীর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "মধ্যযুগের ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জমান, তখন এ মনীষীবৃন্দের পরিশ্রমের ফলেই লুপ্ত প্রায় গ্রীসীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে তাদের পরিচিত ঘটে।"[১]

মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সমাজকল্যাণ :

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। প্রকট বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও এর আক্রমনাত্মক প্রভাব প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় আরবদের অভিযানকে স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সহজ সরল রীতিনীতি, সহিষ্ণুতা ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরব বণিক, ধর্ম প্রচারক, পীর দরবেশ, শাসকবর্গ প্রমুখ উপমাহদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সুদীর্ঘ ৮শ বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে।[২] মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সুলতানী ও মুঘল এ দু'ধারায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এতে ইসলামী মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা, নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুহম্মদ বিন কাসিম (৭১২) ও সুলতান মাহমুদের (১০০০-'২৭) পর মুহম্মদ ঘুরী ১১২৯ সালে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঘুরী দক্ষ সংগঠক এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরে ২টি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কর্মচারী ও ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন।

কুতুবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০) সমাজকল্যাণে সবচেয়ে স্মরণীয় ও বরণীয়দের মধ্যে অন্যতম। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিঃস্বার্থভাবে প্রজা কল্যাণে নিয়োজিত হন। তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রজাদের বিচারকার্য সমাধা করতেন এবং রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর বদান্যতা ছিল কিংবদন্তীর পর্যায়ভূক্ত। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাকে 'লাখবক্স' (লক্ষদাতা) উপাধিতে বিভূষিত করেন।

সামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬) জনকল্যাণে খ্যাতিসম্পন্ন শাসকদের অন্যতম। তাঁর প্রবর্তিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ ছিল-

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাজপ্রাসাদে ঘন্টা স্থাপন।
২. শিক্ষা ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষকতা, দিল্লীতে কলেজ নির্মাণ ও নাসিরিয়া মাদ্রাসা স্থাপন।
৩. বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ।
৪. শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা।
৫. রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বন-জঙ্গল অপসারণ।
৬. "আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক" ও "আল্লাহর বান্দাদের সমাহায্যকারী" হিসেবে খ্যাতি লাভ।[৩]

নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬) সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে- রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

গিয়াস উদ্দীন বলবনের (১২৬৬-১২৮৭) অবদানসমূহ হচ্ছে-

১. সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন।
২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
৩. দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং ইসলামী শরীয়াত প্রবর্তন।
৪. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি।[৪]

---

১. William Muir, Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, Edinburgh, 1934, P. 509
২. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৪. ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২৪

পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে সমাজসেবার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খিলজী, মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজশাহ তুঘলক উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দিন খিলজী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রজাসাধারণের ভোগান্তির সমস্যা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক দয়ালু ও প্রজাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। তাঁর দানশীলতার এতই খ্যাতি ছিল যে, তাঁর দু'হাতে দান করার ফলে রাজকোষের অর্থ কমে যেত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কৃষিখাতে উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, ইয়াতিম, অসহায়দের দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামন্য অবদান রাখেন। জনহিতকর কার্যে ফিরোজশাহ তুঘলক উদার ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁর কৃষি নীতির ফলে দিল্লী প্রদেশ স্বয়ংসম্পন্ন হয়। তিনি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' নামক একটি দাতব্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ দপ্তর থেকে অসহায়, বিপদগ্রস্ত, দরিদ্র ও ফকিরদের সাহায্য প্রদানসহ খানকাহ্গুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হত।[১]

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে। তিনি বেশ কিছু খানকাহ প্রতিষ্ঠা ও মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে সমাজসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁর পরে স্বাধীন সুলতান হিসেবে কিংবা দিল্লীর আনুগত্য পোষণকারী শাসক হিসাবে ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রমুখের সমাজসেবা মূলক নীতি ও কর্মকান্ড উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে হোসেন শাহের শাসন কালকে "স্বর্ণযুগ" হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন এবং দু:স্থ দরিদ্রদের উপকারের জন্য অনেক লঙ্গরখানা স্থাপন করেন।[২]

মুঘল আমলে বাবর, শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব প্রমুখের শাসনকালের মধ্যে শেরশাহ, আকবর ও আওরঙ্গজেব সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এঁদের মধ্যে শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর স্থাপন করে শাসন কার্য নির্বাহ করেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের জন্য দাতব্য বিভাগ গড়েন। অন্ধ, অশক্ত বৃদ্ধ, বিধবাদের জন্য তিনি সরকারী খয়রাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়। তিনি প্রতি বছর ১৮,১৫,০০০ টাকা খয়রাতী খাতে খরচ করতেন।[৩] আকবর সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন এবং নিজ সন্তানের মর্যাদায় প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। আর 'জিন্দাপীর' হিসাবে খ্যাত আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মভিত্তিক জীবনাদর্শের পূর্ণ অনুসারী হয়ে নিজে ও অন্যান্য মানুষের সুখ-সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহের ভিত্তি গড়ে তোলার প্রয়াস চালান।

মুঘল আমলে বাংলাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ স্থাপিত হয়। আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি হিসাবে মীরজুমলা ও শায়েস্তা খানের আমলে প্রজাসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি ঘটে। নবাব শায়েস্তা খান সুষ্ঠুভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে করেন এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এ সময় দান খয়রাত ও বদান্যতার ফলে বাংলা থেকে দরিদ্রতা ও দূরাবস্থা এত কমে যায় যে, তখন কাজের জন্য মজুর পাওয়া যেত না।[৪]

ভারত-বাংলাদেশের সমাজকল্যাণের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার চেয়ে ধর্ম-প্রচারক বা পীর-ফকিরদের ভূমিকাই ছিল অধিক সমুজ্জ্বল। বস্তুত মধ্যযুগের সমাজসেবার ইতিহাসের ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ই রচিত হয় এসব মানব প্রেমিক পীর ফকিরদের নিবেদিত জীবনাদর্শ ও অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতে। তাঁরা মানবসেবাকে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হিসাবে বিবেচনা করে সমগ্র ভারতের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন ও নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন এমন এক আদর্শের প্রতীক যাঁদের সংস্পর্শে অবহেলিত ও সমস্যা কবলিত মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমৃদ্ধ জীবন লাভের পথনির্দেশনা পেত। শুধু বুদ্ধিবৃত্তীয় জাগরণেই নয়, সমাজসেবামূলক কর্মেও তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের আস্তানাগুলো ছিল দু:স্থ, বৃদ্ধ, উন্মাদ এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্র ও আশ্রয় স্থল। প্রত্যেক আস্তানার সাথে একটি করে লঙ্গরখানা থাকত যেখানে গরীব ও অভুক্ত লোকেরা বিনা খরচে খেল।[৫] আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরাইখানা, মসজিদ, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং কুপ খনন ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁরা মানবসেবার নিদর্শন রেখে গেছেন।

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
২. প্রফেসর আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
৩. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, কলিকাতা-১৯৯৮, পৃ. ৩০
৪. ডঃ এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৪৫-৪৬
৫. ডঃ এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মূলত মুসলিম বিজয়ের পূর্ব থেকেই এদেশে সূফী-দরবেশগণ আগমন করে জনসেবায় কালজয়ী ভূমিকা পালন করেন। এ সকল পীর-ফকিরগণের মধ্যে বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ, বদরপুরের শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী, মহাস্থানের শাহ্ সুলতান সাহী সওয়ার, শাহজাদপুরের মখদুম শাহদৌলাহ্ শহীদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরে আগত সূফী-দরবেশগণের মধ্যে আজমীরের খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী, পান্ডুয়ার শায়খ জালালউদ্দিন তাবরিজি, সিলেটের শেষ শাহজালাল, দিল্লীর নিজামউদ্দিন আউলিয়া, সাদুল্লাপুরের শায়খ আখী সিরাজ, সোনারগাঁওয়ের শেখ শরফউদ্দিন তাওয়ামা, বিহারের মখদুম উল মূলক শায়খ শরফউদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরী, পান্ডুয়ার শেখ আলাউল হক, পান্ডুয়ার নূর কুতুব আলম, জৈনপুরের মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, চট্টগ্রামের বদরুদ্দিন বদর-ই আলম, খুলনার খান জাহান আলী, মোয়াজ্জমপুরের শাহ লঙ্গর, চাঁদপুরের শাহ্রাস্তি প্রমুখ অন্যতম।[১]

ত্রয়োদশ শতকের দরবেশ শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ও কয়েকটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। 'তাঁর খানকাহ্ (আস্তানা) এবং লঙ্গরখানাগুলো আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মানবসেবামূলক কার্যের কেন্দ্র হিসাবে বাঙালী সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করে তোলে এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে।[২] সিলেটের শাহ্জালাল সিলেটবাসীকে অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে মুক্ত করেন এবং সেখানে সর্বস্তরের মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় তাকে সংযমী, নিষ্ঠাবান ও সেবাধর্মী সাধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ইবনে বতুতার বর্ণনায়, 'এই শায়খের শ্রমের ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং এজন্য তিনি তাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানকাহ্ ছিল সাধু-দরবেশ, পরিব্রাজক ও দুঃস্থ মানুষের আশ্রয়স্থল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁরা তাঁর জন্য নানা প্রকার সামগ্রী উপহার আনত এবং এগুলো দিয়ে তাঁর আস্তানায় বহু লোককে খাওয়ানো হত।[৩]

শায়খ আঁখী সিরাজ লক্ষণাবতীতে একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ খানকাহ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক কার্যাবলীর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এর প্রভাব সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর খানকায় অসহায়, দীন-দুঃখী, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ মানুষ আশ্রয় লাভ করত এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও আবাস আশ্রম হিসেবে এ খানকাহগুলোতে তারা সেবা যত্ন পেত। তিনি একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে গরীব, ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও সাধু-ফকিরগণ সব সময় খাবার পেত।[৪] শায়খ আলাউল হক পান্ডুয়ায় একটি খানকাহ্ ও একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ খানকাহ ও লঙ্গরখানা ছিল ভক্ত, জ্ঞানী, স্রষ্টা অন্বেষণকারী ও আশ্রয়হীন অনাথদের আশ্রম। তিনি সোনারগাঁওয়ে এক সময় খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা স্থাপন করে ধর্ম ও জ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত হন। শায়খ আলাউলের পুত্র নুর কুতুব আলম কঠোর জীবন সাধনা ও জনসেবার আদর্শ অনুসরণ করে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি চিকিৎসালয় ও একটি লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহ করেন।[৫]

খুলনার খান জাহান আলী খুলনা জেলার দূর্গম অঞ্চলগুলো জয় ও ঐ এলাকাসমূহ আবাদী করে তোলার কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁর সমাধি স্তম্ভেও যে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে তাঁকে 'মহৎ খান জাহান' 'ইহকাল ও পরকালের শিক্ষাদাতা', 'সৈয়দদের প্রেমিক', 'ধার্মিকদের অনুরাগী', 'বিদ্বান', 'ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী' এবং 'অবিশ্বাসী ও বিধর্মীদের শত্রু'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ করেন, দীঘি খনন করেন এবং খুলাফা-এ-রাশেদার অনুসরণে খুলনায় একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।[৬]

উপরোক্ত দরবেশগণ ছাড়াও আরও বহু সুফী-দরবেশ এ দেশের আনাচে-কানাচে খানকাহ গড়ে তোলেন, বহু মসজিদ নির্মাণ করেন, অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এসব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আজও অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে এদেশে বিরাজ করছে ও পীর-ফকিরদের মানবসেবামূলক কর্মকান্ডের কীর্তি বহন করছে। যেমন: তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Sufi or Pirs played an important role in consolidating Muslim power and infusing culture among the masses. The biographical sketch of the Sufis reveal that their activities were confined not only within the four walls of their Khanqahs, rather they exerted a great influence in the peoples mind and in the society. They come from established Khanquahs, imperted instructions, while some of them settled and died in this country------ their dargahs and toms are visited and venereted by hundreds of people even today."[৭]

১. বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, Abdul Karim, Social History of Muslims in Bengal, Chittagong-1985, Dr. Mohammad Enamul Hoq, A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh-1989, Dr. M. A, Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Karachi, 1963, etc.
২. মাওলানা জামালী, সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হি., পৃ. ১৭১
৩. Journal of Asiatic Soceity of Bengal, 1922, P. 413
৪. Ibid, P. 413
৫. ডঃ এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০
৬. ডঃ এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৭. Amiya Kumar Banarjee, West Bengal District Gazetteers (Howrah), Calcutta, 1922, P. 128.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ পর্যালোচনা

* মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি
* ইসলাম ও মূল্যবোধ
* মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি
* আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
* সামগ্রিক জীবনবোধ
* সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্র
* সকলের জন্য সমান সুযোগ
* সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন
* সামাজিক দায়িত্ব
* সামাজিক ন্যায়বিচার

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধের সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

'মূলবোধ' একটি ব্যাপক ও বহুল ব্যবহৃত আপেক্ষিক প্রত্যয়। এটা দর্শন সম্পর্কিত একটি ধারণা। কোন মানুষই সমাজ মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। এটা সমাজ ও সমাজকল্যাণের এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এটা এমন এক আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাংখার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে। এটা সমাজকে শৃঙ্খলিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সমাজকর্ম সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। এর সেবাকার্যক্রম মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও সমস্যা এবং সমাজের গতিশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।[১] এসব বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং সমাজ জীবন ও সমাজকল্যাণকে বিকশিত করার লক্ষ্যে মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন।

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভাল মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। কোন সমাজেই মূল্যবোধ লিপিবদ্ধ থাকে না। সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে উঠে। ফলে সমাজ ভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। এজন্য এ.আর.উইলিয়াম বলেছেন, "মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার ব্যবহার; রীতিনীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকান্ডের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়।"[২] সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দলীয় লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ এবং সমাজ অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। আর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হল প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।"[৩]

সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক মুল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত ধারণা। মূল্যবোধের মধ্যে ব্যক্তি নিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বর্তমান থাকে। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক শৃংখলার অন্যতম উপায়। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social Process) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতম মানদন্ড (higher order norms) হিসেবে সমাজের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদন্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।[৪]

ইসলাম ও মূল্যবোধ :

এবার পর্যালোচনা করে দেখা হবে আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের মূল্যবোধের সাথে ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ কতটুকু সম্পর্কিত এবং আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাব ও প্রাণশক্তি কিভাবে কাজ করেছে।

---

১. সম্পাদাস, সমাজকর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস ঢাকা-২০০৫, পৃ.১৩৭
২. মোঃআতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৫৮ হতে উদ্ধৃত।
৩. সম্পাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
৪. সম্পাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে মানব জীবনের পরমার্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ, মানব জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্য, পরিণতি প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুরাগই দর্শন। আর এক্ষেত্রে ধর্মই অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা পালন করে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, Religion has existed in all times and places. It is organized set of values, beliefs and norms desihned to lesson or explain the problem of human life. Human societies always face problems, people always attempt to solve them. Beliefs always play a part in this attempts. To this degree religion will always be with us."[১]

সমাজ জীবনে বিধি-বিধান পালন, অনুশাসন, জীবন ব্যবস্থা, আর্থ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদির পথ নির্দেশ দেয়াই ধর্মের একটি সামাজিক কর্তব্য। জীবনকে সুন্দর করার জন্য নীতি, নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবীয় সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা করা প্রয়োজন। ধর্মীয় জীবন দর্শন বিশেষত ইসলামী ধর্ম ব্যবস্থা এ লক্ষ্য অর্জনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। ইসলাম অর্থ আনুগত্য। আনুগত্য অর্থ মেনে নেয়া, গ্রহণ করা এবং সেই মত জীবন-যাপন করা। ইসলাম চায়, আমাদের প্রভূ ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে শান্তি আনয়ন। ইসলাম নতুন কোন ধর্ম ব্যবস্থা নয়। মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যেদিন আগমন করেছেন সেদিন থেকেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের জীবন-বিধান আল্লাহ্ মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন। ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। এর অর্থ ইসলাম এমন এক চিরন্তন এবং মৌলিক বিধান যা মানুষকে জীবনের চলার পথে প্রতিনিয়ত দিক নির্দেশ দিয়ে থাকে।[২] তাই সামগ্রিক জীবনদর্শন এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামের পরিধিভুক্ত। এজন্যই মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আজ তোমাদের ধর্মব্যবস্থা সর্বাঙ্গ সুন্দর ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলাম তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।"[৩]

তাই ধর্ম শব্দের প্রচলিত অর্থে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না। ব্যক্তি এবং স্রষ্টার মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক সীমিত সম্পর্ক স্থাপনই সাধারণতঃ ধর্মের সংজ্ঞার আওতায় আসে। কিন্তু ইসলাম এই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। ইসলাম একদিকে যেমন স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অপরদিকে তেমনি মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্ট জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্কও সংজ্ঞায়িত করে। সমগ্র জীবনকেই বেষ্টন করে আছে ইসলাম। জীবনের এমন কোন দিক নেই; যা ইসলামে বর্ণিত হয়নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। তাই ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "That is combines all the grandest and the most prominent features in all ethnic catholic religions, compatible with reason and the moral intution of man........ . It is not merely a syestem of positive moral rules based upon a true conception of certain principles, the enforcement of certain dispositions, the cultivation of a certain temper of mind which the conscience is to apply to the ever varying exigenies of time and place."[৪]

ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়, যেখানে থাকবে শুধু সুখ, শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা-যা সমাজকর্মেরও লক্ষ্য। ইসলাম মানবকল্যাণে বিশ্বাসী বিধায় অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মানব সেবাকে এতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবাকে শ্রেষ্ঠতর কাজ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজের বুক থেকে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়বিচার ও শোধনের ফল্গুধারা প্রবাহিত করে। ইসলামের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে পেশাদার সামজকর্মের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। বস্তুতঃ ইসলামের জীবন দর্শন সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। যেমন-

---

১. G.R.Leslic and other, Introductory Sociology, 3rd, ed.1994, P-460.
২. মুহাম্মদ ফজলে ইলাহী (অনু.), সহজ ভাষায় ইসলামের মূল কথা, আঞ্জুমানে হিদায়াতুল উম্মত, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ.২
৩. আল-কুরআন, ৫:৩
৪. Sayed Amir Ali, Op.cit, P.178.

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি (Recognition of the dignity of man) :

সমাজকল্যাণের বিশ্বাস মতে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ অমূল্য সত্তা ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সমাজকল্যাণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তি সত্তার মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। কারণ, ব্যক্তির মর্যাদা ও সত্তার স্বীকৃতি দান ব্যতীত যেমন তার কল্যাণ আনায়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধনও অসম্ভব। তাই এতে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে সমাজের সুষম কল্যাণ সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

ইসলামের মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই-এটাই হল মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। এই সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত কেউ মানুষের উপরে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ সার্বভৌম। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কার সামনে মানুষের সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে,"আমরা অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জল পথে। আর তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।"[১] সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরষ্কার।"[২] মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় লাভ করে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দেখা যাবে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত। পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের সেবায় নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত নিয়োজিত রয়েছে। আল-কুরআনের বহু স্থানে বা আয়াতে মানব জাতিকে তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সেরা সৃষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।"[৩]

বিশ্বলোকের বিশালতার তুলনায় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। বিশ্বলোকের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষই তার প্রাণ ও আত্মা এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক দিয়ে এক বিরাট বিশাল অসীম ও মহান সত্তা। মানুষ বলতে মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত সত্তাই বোঝায়। কেবল দেহটা কখনও মানুষ নয়। মানুষ এক মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই-এটাই হল মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মান যেমন আল্লাহর নিকট, তেমনি তা বিশ্বালোকের সবকিছুর উপর। আল্লাহ তায়ালা এক বিশেষ উন্নতমানে তাকে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে রূপ, আকার-আকৃতি, গঠন প্রকৃতিও দিয়েছেন সবকিছু থেকে ভিন্নতর; সব কিছুর তুলনায় উন্নত ও উত্তম। আল্লাহ নিজেই তাঁর "রূহ" তার দেহ সত্তায় ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ কর্মচারী ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজদাও করিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে যেমন দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তেমনি দিয়েছেন জ্ঞান-বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার শক্তি। এই মানুষ হল সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকুলের গৌরবের অমূল্য অতুলনীয় একমাত্র ধন। এ-দুনিয়ার সবকিছু যা আছে উর্ধ্বলোকে, যা আছে ভূতলে, সবকিছুই মানুষের অধীন, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ সবকিছুকে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুকূল ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন। আর দৃশ্য-অদৃশ্য যত নিয়ামত, মানুষের জন্য কল্যাণকর যা কিছু, সবই বিপুলভাবে তাকে দান করেছেন। সবকিছু তার জন্য অনুগত ও অনুকূল।[৪] আর সে নিজে কার জন্য? ...... তার সমগ্র সত্তা ও জীবন একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেনঃ "হে আদম সন্তান, আমি তো তোমাকে কেবলমাত্র আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। তোমার উপর আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত তা তুমি যেন কখনও ভুলে না যাও। যেসব জিনিস আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি, তাতে যেন কখনও এতটা মনোনিবেশ না করে বস, যাতে

---

১. আল-কুরআন, ১৭:৭০
২. আল-কুরআন, ৯৫:৪-৬
৩. আল-কুরআন, ৩১:২০
৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে যার জন্য সৃষ্টি করেছি তার কথা ভুলে যেতে পার। আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি। এটাকে তুমি খেলা মনে করোনা। আমিতো তোমার রিযক, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব, তুমি হতাশায় ভারাক্রান্ত হবে না। হে মানুষ! তুমি আমাকে পেতে চাইবে, তবে তুমি আমাকে পাবে। আর যদি তুমি আমাকে পেয়েই যাও, তবে তোমার সবকিছু পেয়েই গেলে, কিছুরই অভাব বা অপূর্ণতা থাকবে না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে হারিয়ে ফেল, তাহলে তুমি হবে সর্বহারা। ----আমি যেন হই তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"[১]

একজন মুসলিম জানে যে, মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পর আর একটি জগৎ আছে। মৃত্যু মানুষের অনন্ত যাত্রার একটি স্তরমাত্র। এ মহাযাত্রা হবে অনন্তকালের অসীমতার পানে। সেখানে তাকে সংবর্ধনা জানানো হবে এই বলে "যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।"[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার তুলনা দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আল-কুরআনের বহু আয়াতে মানুষের এই উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) নবী করীম (স.)-এর নিকট প্রথম যে প্রত্যাদেশ বাণী নিয়ে আসেন সেখানে শুধু মানুষের মর্যাদারই কথা নয়, মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের কথাও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।"[৩]

বহু আয়াতে আল্লাহর কাছে মানুষের নৈকট্য ও মানুষের কাছে আল্লাহর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তাহার আহবানে সাড়া দেই।"[৪] "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।"[৫] .... তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি (আল্লাহ্) উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক; উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ উহাদিগের সঙ্গে আছেন।"[৬] "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; এবং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী; সর্বজ্ঞ।"[৭]

উচ্চতর জগতে অর্থাৎ মহান আত্মার জগতে মানুষের যে স্থান তা এতই উচ্চ ও মহান যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের মস্তকও তাদের সম্মুখে অবনমিত। মহান আল্লাহ্ তাঁরই জমিনে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই খিলাফতের এ মহান উচ্চ মর্যাদা অভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি; তাহারা বলিল, আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে; আমরা তো আপনার সপ্রশংসায় স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বলিলেন, আমি জানি যাহা তোমরা জান না। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, এই সমুদয় নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাহারা বলিল, আপনি মহান, আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো জ্ঞানই নাই! বস্তু আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বলিলেন, হে আদম! তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দাও। যখন সে তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি।"[৮] মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর এ নির্দেশ ইবলিশ মেনে নিতে পারেনি।

---

১. ঐ, পৃ. ৮২
২. আল-কুরআন, ৩৯:৭৩
৩. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫
৪. আল-কুরআন, ২:১৮৬
৫. আল-কুরআন, ৫০:১৬
৬. আল-কুরআন, ৫৮:৭
৭. আল-কুরআন, ২:১১৫
৮. আল-কুরআন, ২:৩০-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ এ বস্তুজগতের সারনির্যাস। মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। এটাই হল মানুষের মর্যাদা। ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্যই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং তার জন্যই এত আয়োজন। আল্লাহ মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদেরকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফলকল্পে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন, "তুমি কি লক্ষ্য করা না যে, আল্লাহ তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে।"[১]

"তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আকাশ হইতে পানির বর্ষণ করিয়া তদ্বারা তোমাদিগের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে। এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ।"[২] এ বিশ্বজগতে এই হচ্ছে মানুষের স্থান ও মর্যাদা এবং তার সঙ্গে এই হল সম্পর্কের আসল রূপ। এ সৃষ্টলোকে মানুষের চেয়েও বহু বড় ও সূক্ষ্মতম সৃষ্টি রয়েছে, তৎসত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার কারণ এই যে, মানব সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহর জ্যোতির একটা অংশ এবং মানুষের দেহে রয়েছে সেই রূহ, যা আল্লাহ নিজে তাঁর রুহ থেকে তার দেহে ফুঁকে দিয়েছেন।

ইসলামের মতে, মানুষ অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী। তাই সে জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে। এজন্য তাকে অন্য কোন সৃষ্টির সামনে মাথা নোয়াতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। কেননা, আল-কুরআনে শিরককে জঘন্যতম অপরাধ বলা হয়েছে। যেমন; "ইন্নাশ্ শিরকা লাজুলমুন আযীম।"[৩] শিরককে ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ইসলামের মতে, আল্লাহ পরম আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্তা এবং সবকিছুর উৎস। নিছক প্রশংসা বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ মানুষের পক্ষে কাম্য নয়। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে এমনভাবে ঐশী গুণাবলী অর্জন করতে হয় যেন সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কেননা মানুষই মহান আল্লাহর একমাত্র সৃষ্ট জীব যে তার আপন শক্তির বিকাশ সাধন করে সচেতনভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। এই সক্ষমতার মধ্য দিয়েই দেশ ও কালে অবস্থিত অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। মানুষ প্রকৃতি থেকে অবস্থিত অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়, বরং প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃষ্টি, আল্লাহর সৃজনী শক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাকৃতির প্রতিটি পরমাণু মানুষের দেহে স্থান পেয়েছে। মানুষ জগতের ক্ষুদ্ররূপ, যেন একটি অণুজগৎ। সে যেসব শক্তি ও বৃত্তির অধিকারী, সেগুলির মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে চারদিকের পরিবেশ তার বিকাশ ও অগ্রগতির পক্ষে বেশ প্রতিকূল। কিন্তু এই প্রতিবেশকে পরিবর্তিত করতে এবং কল্যাণকর করে ঢেলে সাজাতে সে সক্ষম। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরোধিতা মানুষকে এমন এক সুযোগ এনে দেয় যার সাহায্যে সে সৃষ্টি করতে পারে এক কল্পজগৎ এবং সেই সূত্রে পেতে পারে অপরিমেয় আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। সুতরাং একমাত্র এ জগতের ও নিজের পরিবেশের জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ পারে তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে বিকশিত করতে।[৪] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সব রকম অধিকার ও কার্যক্রম কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যাস্ত করা হয়নি; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের উপর তা আরোপ করা হয়েছে। ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেন। এ ব্যক্তি মানস গঠনের লক্ষ্যেই ইসলামে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সর্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে জ্ঞানার্জনের তাগিদই ছিল প্রথম ঐশীবাণী।

সুতরাং ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্য সমগ্র বিশ্ব ব্রাহ্মান্ডের সৃষ্টি এবং তারই জন্য এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্মানের আসনে বসায়। এই সম্মান ও মর্যাদা সব মানুষের জন্মগত অধিকার। আকীদা-বিশ্বাস পোষণ, জ্ঞানার্জন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দেয়।

---

১. আল-কুরআন, ২২:৬৫
২. আল-কুরআন, ১৪:৩২-৩৪
৩. আল-কুরআন, ৩১:১৩
৪. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯১, পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of self-determination) :

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম ও সমাজকর্মের অভিন্ন মূল্যবোধ দৃষ্ট হয়। সমাজকর্ম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার চাহিদা, পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলার অধিকার দানে বিশ্বাসী। তাই সমাজকর্ম কখনোই কারও উপরে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়না; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নিজের উপরই ছেড়ে দেয়া হয় যাতে সে তার সম্পদ ও সামর্থের সদ্ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

ইসলামের অন্যতম একটি স্বীকৃত মূল্যবোধ হল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী বিধান মতে, প্রত্যেক মানুষ স্বীয় চেষ্টায় ভাল মন্দ করে থাকে। এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-"যারা সৎ কাজ করে তারা তা নিজের জন্যই করে থাকে এবং যারা অসৎ কাজ করে তারা তা নিজেদের জন্যই করে থাকে।"[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।"[২] "যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে নিযুক্ত হয়, সে সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজ দায়িত্বেই তা করে থাকে।"[৩] "যে সৎ পথে চলে; সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে এবং যে বিপথে গমন করে সে বিপথে গমনের দায়িত্ব নিজেই বহন করে।"[৪]

সুতরাং বুঝা যায় যে, ইসলামে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম একটা মধ্যমপন্থার নীতি অবলম্বন করে। ইসলাম আল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে যেমন এক বাক্যে স্বীকার করে, তেমনই মানুষের মুক্তচিন্তা ও দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না। আল্লাহ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমায়িত। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তাকে ভাল মন্দ বিচার করে চলতে হয়। তার মুক্ত চিন্তার অধিকার রয়েছে বটে, কিন্তু সেই অধিকার আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আইন ও কানুনের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহ তায়ালা দু'টি পথ সৃষ্টি করেছেন। একটি দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, কিন্তু অপরটি দ্বারা ধ্বংসের পথে যাওয়া যায়। মানুষকে তাঁর পছন্দ মত পথ বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি পথ দু'টি একটিতে দু:খ-কষ্ট অপরটিতে শান্তি রয়েছে, একটি ন্যায়ের অপরটি অন্যায়ের; প্রথমটির ফল প্রতিদান, অপরটির ফল শাস্তি। মানুষ তার স্বাধীন চিন্তার দ্বারা উপযুক্ত পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু মানুষের ভালকে মন্দতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই আছে। প্রকৃত ইসলামী আদর্শ হল আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন। আত্মসমর্পনের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধ পরিহার করা। আর সেটাই ইবাদাত।[৫] মানুষের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। মানুষের জন্মকাল হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলে ভিতর বাইরের সংগ্রাম। একদিকে প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার সাথে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এদিকে থেকেও মানুষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। মানুষের গোটা পরিবেশ এক বিরোধ-সংহতির ইতিহাস, এক বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস। কাজেই মানুষ যা চায় সব সময় তা পায় না, এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়। মানুষ তাই এক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ স্বাধীন। এক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠন।[৬]

ইসলাম যেমন সাধনার ধর্ম তেমন কর্মেরও ধর্ম। কর্মহীন ঈমান আর ঈমানহীন কর্ম আল্লাহ গ্রহণ করেন না। ইসলাম বলে 'আল্লাহর দেয়া এই যে অফুরন্ত সম্পদ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ তা থেকে জীবিকা সংগ্রহ করুক। এও তার ইবাদত বা উপাসনা। সুতরাং ইসলামে আত্মনির্ভরশীল পরিশ্রমকে কল্যাণ লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সকলকেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য পরিশ্রম করতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইসলামের এরূপ আত্মনির্ভরশীলতামুখী পরিশ্রম সমাজকল্যাণের সফলতা ও কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণের, মানব ধর্মের মূলকথা হল মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ইসলামে সমাজসেবাকে সর্বোকৃষ্ট কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করে।"[৭]

সমাজকর্মেও আত্মনির্ভরশীলতাকে সবচাইতে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে এই ধর্ম দর্শন সমাজকল্যাণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

---

১. আল-কুরআন, ৪১:৪৬
২. আল-কুরআন, ১৩:১১
৩. আল-কুরআন, ৪:১১১
৪. আল-কুরআন, ১০:১০৮
৫. মুহাম্মদ লুৎফর, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ.৩০৮
৬. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুঠির, বগুড়া ও ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ২৮৮
৭. এ.কে. ব্রোহি, 'ইসলামী জীবনের আদর্শ', ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-পৃ.৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক জীবনবোধ (Complete lookout) :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে মানব জীবনের সামগ্রিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলাম ও সমাজকল্যাণ উভয়েই সমাজের অখন্ড সত্তায় বিশ্বাসী এবং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সমাজকে পৃথকভাবে বিচার না করে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করা হয়।

ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম নয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, পার্থিব, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইন, সংস্কৃতি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পথ নির্দেশ রয়েছে। কুরআন মানুষকে ইসলামে পূর্ণভাবে অর্থাৎ কোন অংশ পৃথক না রেখে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বলে।[১]

ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা। কুরআন বলে, আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি। যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্যে বিস্ময়কর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ্ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখে তাঁর ও তাঁর রসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে।[২] তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যে সবের বন্দেগী কর তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদারা রেখে নিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোনই সনদ নাযিল করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যেই নয়। তাঁর নির্দেশ এই যে, স্বয়ং তাঁর ছাড়া আর কারুরই দাসত্ব ও বন্দিগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবনপন্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই জানে না।

এরাই সেই লোক যে তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, নেকীর হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষক বা রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞেস করা হবে তার রাষ্ট্রের জনগণ সম্পর্কে। প্রত্যেক মানুষ তার পরিবারের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, প্রত্যেক নারী তার স্বামীর সংসারের রাখাল স্বরূপ, তাকে তার পরিবারের সকল সদস্য সম্পর্কে হিসেব দিতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মচারী তার মালিকের রাখাল, তাকে আর মালিকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"[৩]

শান্তিই হল ইসলামের মূলমন্ত্র। কারণ এই শান্তির পথেই ইসলামের উদ্ভব এবং এই শান্তিই এর শেষ ফলশ্রুতি। অতএব, ইসলাম মূলত শান্তির ধর্ম। মানুষকে অধিকতর সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। প্রকৃতির সবকিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এসকল পূর্ণতা সাধনে মানুষকে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছে এবং এর মাধ্যমে সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে মানবিক বৃত্তির পূর্ণতা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে এবং এই পূর্ণাঙ্গতা তাকে মুক্তি লাভে সাহায্য করে।

ইসলামের উদ্দেশ্যে হল সর্বশক্তিমান পরমসত্তা আল্লাহর স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সাথে শান্তি স্থাপন করা। সৃষ্টির সেরা (আশরাফুল মাখলুকাত) জীব ও আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে মানুষকে সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন করবে এবং একমাত্র তাঁরই আদেশ মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। সে প্রাকৃতিক কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। এর অন্যথা হলে মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অবনতি ডেকে আনবে। এভাবেই মানুষ আল্লাহর সাথে শান্তি বজায় রেখে স্বীয় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। আবার ইসলাম যেমন আল্লাহর সাথে শান্তির কথা বলে, তেমনি তা সমগ্র বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও আগ্রহী। এর অর্থ মানুষ একজন অন্যজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়। পিতার প্রতি পুত্রের ও পুত্রের প্রতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর ও প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, একজন মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এসকল

১. আল-কুরআন, ২:২০৮
২. আল-কুরআন, ৫৭:২৫
৩. উদ্ধৃত: মুহাম্মদ আসাদ, 'ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও সরকার' ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। তাই আল্লামা আবুল হাশিম তাঁর ক্রিড অব ইসলাম গ্রন্থের বলেছেন, "ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখে না বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।"[১]

সমাজকর্মও মানুষের জীবনকে অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করে থাকে। বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও বিশ্ব সৌন্দর্য বিধানের মৌলিক শিক্ষা ইসলামে রয়েছে। এক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় স্রষ্টার একক কর্তৃক ও অসীম ক্ষমতাকে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস করা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানবীয় জীবনকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় করে তুলতে সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা দেয় ইসলাম। ইসলামের এ শিক্ষা জীবন-দর্শনের দিক নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমবেতভাবে জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তুলতে সহায়তা করছে, সমস্যাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত করছে। ফলে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন সমাজকর্মে এক সমৃদ্ধ ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

সাম্য, গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্ব (Equality, Democracy and Brotherhood) :

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি। মানবকল্যাণ তথা মানবতার সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কিয় মানবীয় চেতনাবোধ। এর মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক, আত্মিক এবং বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন তথা সর্বপ্রকার উন্নতির বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে সাম্যের প্রশংসা সর্বত্র বিদ্যমান। বলাবাহুল্য, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র প্রভৃতি কল্যাণকর নিয়ম-নীতি ইসলামের অমূল্য অবদান। ইসলামই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। এতে বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্য নেই। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একজন মানুষ থেকেই সৃজিত হয়েছে। তাই মানব সমাজে কোনরকম ভেদাভেদ থাকতে পারে না। পারে না বলেই ইসলাম সমাজের সর্বত্র সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের বাস্তবায়নের আদেশ দেয়। মানব সমাজে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনে ইসলামের এই অনুপম নীতি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ ও শিক্ষা অতুলনীয়।

সাম্যের কথাই বলা হউক আর ভ্রাতৃত্বের কথাই হউক এর কোনটাই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হবে। মানবতাবোধ ছাড়া সমাজের শান্তির আশা করা যায় না। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হল মানুষের জন্যে অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়; মানবকল্যাণে ব্রতী হয়; মানুষের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে; এ বোধ থেকেই মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হলে, মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন হলে অপর মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়; তারা এর যথার্থ প্রতিবিধানে এগিয়ে আসে। সৃষ্টির সেরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মগত ও বংশগত অধিকার শুধু নয়, বরং মূলত তার বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের কারণে। মানুষের জন্য মানুষের সহমর্মিতা সহানুভূতি ও মমত্ববোধ তথা একজন অপর জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়া ও তার দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করে; বস্তুত সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। আর এই ইবাদাতের জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[২] আর এ মানবতাবোধ যখন মানুষের মাঝে থাকে না তখন মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে, মানুষ মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়। মানুষের দুঃখ-কষ্টে সে ব্যথিত হয় না। মানুষ মানব কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রত হয় না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা, অমানবিকতা এবং পাশবিকতা। আর কুরআনের দৃষ্টিতে এদের অবস্থা হল, "তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তাতে বোধ নেই। তাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তাদের অর্ন্তদৃষ্টি নেই। তাদের কান আছে বটে কিন্তু তাতে শ্রবণশক্তি নেই। এদের অবস্থা হল পশুর মত, বরং পশুর চাইতেও বিভ্রান্ত। ওরা চরম চেতনাবোধহীন।"[৩]

---

১. আবুল হাশিম, ইসলামের মর্ম কথা (অনু. মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৮২
২.আল-কুরআন, ৫১ ঃ ৫৬-৫৭
৩.আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে মানুষের মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্কগুলো হল-মানবিক সম্পর্ক, রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক, ঈমানী বা বিশ্বাসগত সম্পর্ক। এ সম্পর্কগুলি যদি মানব সমাজে দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া-মায়া, এবং দরদ, ভালবাসার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই মানব সমাজে নেমে আসবে অনাবিল সুখ, শান্তি আর উন্নতি। কিন্তু এ সম্পর্কগুলো যদি ওসব মহৎ গুণাবলীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, এগুলো যদি দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, যুলুম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কবলে আপতিত হয়, তবে মানব সমাজে সুখ, শান্তি ও উন্নতি আসতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, কোন বৈষম্য নেই; বংশ, বর্ণ ও শ্রেণীগত কোন ভেদাভেদ নেই। কেউ উঁচু নয়, কেউ নিচু নয়, কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ দাস নয়, কেউ মনিব নয়; কেউ পবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মানব হিসেবে সব মানুষ সমান। মানুষ হিসেবে সব মানুষের সৃষ্টিসূত্র এক ও অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষ সমান। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে জন্মসূত্রগত এক চিরন্তন শ্বাশত সম্পর্ক।[১] এ সম্পর্ক বৈষম্যহীন, এ সম্পর্ক মানবিক সম্পর্ক, মনুষত্বের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক।

মানুষে মানুষে এই জন্মগত ও প্রাকৃতিক মানবিক সম্পর্কের কারণেই মানুষের মধ্যে মানবতবোধের সৃষ্টি হয়। এ বোধ জন্মগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে। অতঃপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তা হয়ত বিকশিত হয়, নয়ত চাপা পড়ে যায়। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে মানুষের একটা বোধ অন্তর্গত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যেমন বিবেকবোধ দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন সীমালংঘনের প্রবণতা। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন সে যেন তার বিবেকবোধকে জাগ্রত করে এবং পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত করে তোলে। আবার সে যেন তার সীমালংঘনের প্রবণতাকে সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। মানবতাবোধ একটি নৈতিকবোধ হলেও ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের কতিপয় অধিকার এবং কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছে। সেগুলোর লংঘন আইনগত ও শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।[২]

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে। যেমন, জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার, কর্ম, উপার্জন ও জীবিকার অধিকার। ইজ্জত, আব্রু ও সম্মান, মর্যাদা রক্ষার অধিকার। শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার। ভ্রমণ, বিয়ে-শাদি, সন্তান লালন-পালন ও সামাজিক সম্পর্কের অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার প্রদান করা ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও নৈতিক বোধ থেকেই উৎসারিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলাম এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে।

নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই যদি মানুষের প্রতি মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়, তবেই সমাজে নেমে আসতে পারে মানবপ্রেমের অনাবিল শান্তির এক নির্মল পরিবেশ। কেননা, ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "এটা আমি এ জন্য পাঠিয়েছি যেন মানুষ তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে ও মানব সমাজ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা কল্যাণকর কাজের আদেশ করবে আর অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে।"[৪]

সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেই মানবকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটা হয় প্রকৃত মানবতাবোধ। এর সাথে কোন বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকে না। এ নিঃস্বার্থ চেতনা ও মানবতাবোধই ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। এ মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সেটাই ইসলাম। এরপর ইসলাম যে জিনিসটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
২. আল-কুরআন, ৭৬ ঃ ২৫
৩.আল-কুরআন, ৩ ঃ ১১০
৪. অধ্যাপক কে, আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই এটাই ইসলামের বিঘোষিত নীতি। ইসলাম এমন এক ব্যাপক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেখানে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণেই একজন অন্যজনের অধিকারকে পদদলিত করতে পারে না। মানবতার দর্শন হিসেবে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে প্রভেদ মানে না। অমুসলিমগণকেও ইসলাম তার সমাজ কাঠামো হতে বিচ্ছিন্ন করেনি। এক আল্লাহ্‌র অধীনে ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চায়। মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের উর্দ্ধে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনয়নই ইসলামের লক্ষ্য এবং মানুষের প্রগতির ধারণায় নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি এবং আধুনিক মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে তা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। শুরু থেকেই ইসলাম এ লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সমকালীন অবস্থার উপযোগী প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানব সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে ঐক্যবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলাম নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছে। ইসলামের ঐক্যবন্ধন কেবল দেশ ও জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা সমগ্র মানব জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে আগ্রহী। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সর্বোপরি, ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতিকে ঐক্য বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ জন্যই ইসলাম তার নীতি ঘোষণা করেছে, মানুষ মাত্রই সমান, জন্ম বা মর্যাদার কারনে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। একমাত্র কর্মই মানুষের মর্যাদাকে চিহ্নিত করে। এ কর্ম ও ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, মানবতার জন্য। এ সকল কর্মে যে সফল, সেই ইসলামে সত্যকার মর্যাদাশীল মানুষ, ইসলামে জাতিগত প্রাধান্য নেই, গোত্র বর্ণ, সামাজিক পদমর্যাদা ও পেশার ক্ষেত্রেও ইসলাম কোন প্রাধান্য স্বীকার করে না। ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই তাদের সম্পর্কও ভ্রাতত্বের। ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে ভাষাগত পার্থক্য, ভৌগোলিক অসংলগ্নতা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়, ইসলাম বর্তমান বিশ্বের বর্ণবাদী, স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত, নৈতিক আদর্শবাদী, আন্তর্জাতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে তৎপর। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক জন্মসূত্রে নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতেই; জন্মসূত্রে মার্কিন বা আফ্রিকান, যোগসূত্রে ইহুদী বা আর্য, বর্ণসূত্রে কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় বিশিষ্ট এবং ভাষাসূত্রে ভারতীয় বা আরবীয় যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ তাআলাকে যিনি প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নির্দেশসমূহকে জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছেন তিনিই এই সমাজ ব্যবস্থার শরীক হতে পারেন। এ সমাজে অংশগ্রহণকারী সকলেই একই অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। কোন রকম বর্ণগত বা জাতিগত ভেদাভেদের শিকার কেউই হবে না। উচ্চ নীচ বলে কেউই গণ্য হবে না এবং ধরা ছোয়ার বাইরে এমন কারও অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না।"[১]

ইসলাম জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কিয় যে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় মানব জাতির অতীত কিংবা বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোথাও তা দেখা যায় না। অথচ এমন এক অবস্থা ও পরিবেশ ইসলামের এই অনুপম নীতি ঘোষিত হয় যখন পথিবীর অন্য সব স্থানের মত আরব দেশের মানুষ ও অসংখ্য পরিবার ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। আর এসব পরিবার ও গোত্র একে অন্যের সাথে বিরামহীন পারিবারিক ও গোষ্ঠীয় সংঘাতে লিপ্ত থাকত। একই পরিবার ও সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য ছিল। ভাগ্যবান সম্পদশালী লোকেরা উচুঁ সামাজিক মর্যাদা ও সম্ভ্রম ভোগ করত এবং যারা ছিল রক্ত সম্পর্কে গোত্র প্রধানের ঘনিষ্ঠ তাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল সকলের উপরে।

পেশাগত বৈষম্যও তাদের মধ্যে ছিল। মূর্তিদের তত্ত্বাবধায়কগণ (পুরোহিত) ছিল আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান। তাই তাঁরা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত; মজুর শ্রেণীর মানুষকে তারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে ঘৃণার চোখে দেখত। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা আরবদের কাছে এত অপরিচিত ছিল যে, যৎ সামান্য উত্তেজনার বশে ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাত। তাদের নারীরা ছিল তাদের অস্থাবর সম্পত্তি। পুরুষ ও নারীর সমান মর্যাদা আরব সমাজে ছিল না। ক্রীতদাসদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করা হত যেন তারা

---

১. Abul Hashim. The Cread of Islam. Islamic foundation Bangladesh, 1987, p.80

Dhaka University Institutional Repository

ভারবাহী পশু। পশুর উপর অত্যাচার বর্তমানে মানুষের মনে যে পরিমাণ অনুকম্পা জাগিয়ে তোলে, তখন ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার স্বাধীন মানুষের মনে সে পরিমাণ অনুকম্পাও জাগাত না; এ সব অসাম্যকে ভাগ্যের ফল ও দেবতাদের বিধান বলে মনে করা হত; এ সব সামাজিক অবিচার ধর্ম ও দর্শনের সমর্থন অনুমোদন লাভ করত; বহু বিবাহ, ব্যভিচার প্রভৃতি ছিল সেদিনের নিত্য নৈমিত্তিক আচরণ এবং যৌন নৈতিকতার মান এতই স্থুল ও নিম্ন ছিল যে, আরবরা সৎ মা ও সৎ ছেলের, এমনকি ভাই ও বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অনুমোদন করত। মোটকথা মদ্যপান, জুয়া, লুণ্ঠন, নির্যাতন অন্যায় ও সামাজিক অসমতা ছিল সেদিনের আরবদের প্রচলিত আচার আচরণের অংশ। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের আগে আরবদের নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থা ছিল যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় অবস্থার চেয়েও খারাপ। অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের আশেপাশে আবদ্ধ আরবদের সাধারণ জনতা তখন আর্তনাদ করছিল এবং একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিল। আর সেই ত্রাণকর্তাকেই তারা খুঁজে পেল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুমহান ব্যক্তিত্বে।[১]

এ সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা আরবদেশের অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শোচণীয় হলেও তখন সমগ্র ইউরোপ ছিল মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; সতীদাহ, কালীদেবীর সামনে নরবলী, আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হয়ে উঠে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে আর্তনাদ করছিল। বর্ণপ্রথা তখন এতই কঠোর ছিল যে, কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেঁটে যেত, তাহলে তাকে ফাঁসি দেয়া হত।[২] আদিম অধিবাসীদের সাথে ব্রাহ্মণদের উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা তো দূরের কথা, এমনকি তারা তাদের ছায়াও মাড়াবে না। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়েও বেশী সম্মান পায়।[৩] মানুষে মানুষে এত প্রভেদ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়নি। বহু ইশ্বরবাদ, কুসংস্কার ও বহু বিবাহের ব্যাপারে ভারত ও আরবের অবস্থা ছিল একই। বস্তুত, সারা পৃথিবী যখন বিরাজমান অশুভ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য উৎসুক ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, তখনই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে।

এই বিষণ্নময় অবস্থার মধ্যে শোনা গেল আল্লাহ্‌র কঠোর অথচ করুণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" এ কণ্ঠস্বর কঠোর কারণ, মানুষে মানুষে মানব সৃষ্ট ভেদাভেদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্য এটা অমননীয় ও স্পষ্ট আদেশ। আর এটা করুণাপূর্ণ কারণ, এটা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের কথা, আল্লাহ্‌র পিতৃত্ব, মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা শিক্ষা দেয়। যে সব বাধা ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলাম সে সব বাধাকে কার্যকরভাবে অপসারণ করে এবং এমন এক সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে যাতে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব জীবন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়।[৪] মহানবী (স.) সে ধর্মের জয়গান ও প্রচার করেন তা ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এটি এমন এক ধর্ম যেখানে জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় প্রভৃতি সব ভেদাভেদকে মানুষের চিন্তা ও চেতনা থেকে মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাজিক অসমতা দূর করেন, নারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেন, ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং মদ্যপান, জুয়া, রক্তপাত প্রভৃতি যেসব অসামাজিক প্রথা তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে প্রচলিত ছিল সেগুলো সবই কঠোর হাতে দমন ও দূর করেন। একজন ব্যক্তির একলার পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় সমাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে এগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা কি করে সম্ভব হল, তা ভাবতে গেলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। তার ধারণাবলী ছিল প্রগতিশীল এবং তার কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছিল মানবতার কল্যাণে। মানব জাতির মুক্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও সততা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।[৫]

---

১. Prof. Syedur Rahman. An Introduction to islamic Culture and Philosophy, Dhaka, 1963.
২. Ibid, P.20.
৩. Abul Hashim. op,cit. P. 80
৪. Ibid, P.82
৫. Prof. Syedur Rahman, op.cit. P.23

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শুধুমাত্র মানব মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন ঘোষণাই প্রদান করেনি, বরং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সম্পূর্ণ সফলভাবে এ সব আদেশ বাস্তবায়িত করে, যখন সমগ্র বিশ্বের কাছে মানব মর্যাদা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা ছিল একেবারেই অজানা। গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি সভ্য দেশের মধ্যেও হেলট (Helots), প্লেবিয়ানস্ (Plebians) ও শুদ্রেরা সকল মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত অনেক স্থলে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শুদ্র, ইতর, ভদ্র, উচ্চ-নিচ এ ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরন্তন অভিশাপ। উচ্চ শ্রেণীর ও বর্ণের মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম ও সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে কোটি কোটি নর-নারীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে, মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্ম ও সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে কোটি কোটি নর-নারীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে, মানুষের অধিকার হতে সহস্র সহস্র বছর ধরে বঞ্চিত করে রেখেছে।

ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানব জাতিকে এক সমাজভূক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেয়নি, বাস্তবজগতে কোটি কোটি মানুষকে এই সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইসলাম আল্লাহ্কে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে দিয়ে বাদশাহ ও ফকির, আমীর ও গরীব, ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক, প্রভু ও ভৃত্যকে একসূত্রে গ্রথিত ও এক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, এই সাম্যে মানুষের অন্তর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছোট-বড়, উচ্চ-নিচ, ইতর-ভদ্র ও শ্বেত-কৃষ্ণের নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে।[১] কুরআন ঘোষণা করেছে, "হে মানব জাতি ! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকেই সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।"[২]

সুতরাং সমগ্র মানবজাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। অতএব জাতি ও গোত্রের এই প্রকারভেদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হওয়া উচিত যে, তা পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যম হবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজনমাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[৩]

এরপর জীবনে কতক লোক সামনে এগিয়ে যায় এবং কতক লোক পেছনে পড়ে থাকে। কেউ বিত্তশালী হয়, কেউ বা বিত্তহীন হয়। কেউ শাসক হয়, কেউ হয় শাসিত। কতক জাতির চামড়া হয় সাদা, কতক জাতি চামড়া হয় কালো। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তাই বলে এই উচু-নিচু ও ছোট-বড় মানবতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কারণ ঘটাবে ইসলাম তা হতে দেয় না। দরিদ্রের উপর ধনীর, প্রজার উপর শাসকের, কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা কেবল সততার ভিত্তিতে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে তাকওয়াবান।"[৪] কুরআনের এই মহৎ উদ্দেশ্যের সমর্থন করে মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন "তোমরা সকলে ভাই ভাই এবং সকলেই সমান। তোমাদের কেউ অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পার না। একজন আরব একজন অনারবের উপর এবং একজন অনারব একজন আরবের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। অনুরূপভাবে একজন শ্বেতাঙ্গকে একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। কেবল ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্তি ব্যতীত।"[৫] এভাবেই ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের আভিজাত্য, ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার, পদমর্যাদা ও জ্ঞান গরিমার চুরমার করে সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আইনের চোখে সবাই একই রকম। সবার উপর আইনের কর্তৃত্ব সমভাবে কার্যকর। তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু ন্যায়ের ভিত্তিতে; সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। যে শক্তিশালী, সে দূর্বলকে সাহায্য করে, এভাবে গোটা সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির সেবকে পরিণত হয়। মহানবীর (স.) উক্তি মতে, পারস্পরিক স্নেহ মমতায় মুসলমানদের উদাহরণ একটা একক দেহের মত। দেহের একটা অঙ্গ যখন রুগ্ন হয়, তখন সবকটা অঙ্গ তার সাথে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়।

---

১. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স.) ঃ তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ৪৯-৫০.
২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১
৩. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
৪. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১৩
৫. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৪৩, পৃ. ৩৪০.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানবতার কল্যাণের জন্য এমনই চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের নীতি যে বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক করে তাহল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ হলেন মানুষের একমাত্র উপাস্য। সমগ্র মানব জাতির একত্বের ভিত্তিতে একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সব মানুষের স্বার্থকে এ উদ্দেশ্য ও আদর্শে একীভূত করতে হবে। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে মানুষ অনুশীলন করবে এবং তা করার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পার্থিব প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বস্তরে মহানবী (স.) এ সাম্যের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। নামায, রোযা ও যাকাত প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ সাম্যকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাৎসরিক হজ্জের মধ্য দিয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

মুসলমানদের নামায বা উপাসনা সাম্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ইসলামে, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রীতির বিমূর্ত নীতিসমূহ নামাযের মাধ্যমে জীবন্ত ও প্রমূর্ত হয়ে দেখা দেয়। জুমুআর দিনে শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে মসজিদে এসে সকল মুসলমান ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, প্রভু ও দাস অঙ্গে অঙ্গে এক হয়ে পরমসত্তা আল্লাহ্‌র নিকট লুটিয়ে পড়ে। প্রতি বছর দু'বারে ঈদের সময় সহস্র সহস্র মুসলিম প্রান্তরে প্রান্তরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র আরাধনা করে। আল্লাহ্‌র দরবারে মুসলিমগণ যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, তখন একজন দ্বীনহীন কুলির পায়ের কাছেও প্রতাপ প্রতিপত্তিশালী বাদশাহ্ বা সম্রাটের মাথা স্থাপিত হতে দেখা যায়। এ নামাযের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ যখন ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়মিত নামাযে মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সমতাবোধ সৃষ্টি হয়। এই একতাবোধ রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণ একতাবোধে সীমিত থাকে না। এখানে পরিবার ও বংশ, সম্পদ ও ক্ষমতার অহমিকা, গরীব ও দূর্বলের প্রতি ঘৃণা-এ সবই বিলিন হয়ে যায় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পারস্পরিক আলিঙ্গনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমতা ভিত্তিক আনুগত্য গড়ে উঠে। এভাবেই প্রার্থনার মাধ্যমে সংকীর্ণ পারিবারিক বা গোষ্ঠীয় ঐক্যের স্থলে গড়ে উঠে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর চেতনা ও ঐক্যবোধ।[১]

রোযায় সবাই সমভাবে অনাহারে থাকে। এতেও ধনী-দরিদ্রের মাঝে কোন ভেদাভেদ থাকেনা। নামাযের কাতারে ধনী, নিধন, আমীর-ফকীর সকলেই সমান হলেও বাস্তব সামাজিক পরিবেশে, তাদের স্ব-স্ব গৃহে তারা বিভিন্ন ধরনের বিলাসী জীবন নির্বাহ করে। অপর পক্ষে দীন-দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষ সমূহ অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। রমযান মাসে ধনী-দরিদ্রের এই সামাজিক ভেদ রেখা মুছে যায়। ধনী উপলব্ধি করতে পারে ক্ষুধার যন্ত্রণা কত প্রবল। ফলে দরিদ্রের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমান সুযোগ সুবিধাসহ এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়ে তোলা, সে জন্যই নিজের স্বার্থকে সমাজের তথা মানবতার স্বার্থে অধীনস্থ করার জন্য তা মানুষকে পরামর্শ দেয়। মানুষে মানুষে সে প্রভেদ বিদ্যমান তা হ্রাস করা ইসলামের লক্ষ্য জীবনে সবাইকে সমান সুযাগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহার্য্যার্থে রাজভান্ডারে (বায়তুলমাল) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বাধ্যতামূলক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির পক্ষে তার বছরান্তে সঞ্চিত সম্পদের ১/৪০ অংশ দদ্রির জন্য পৃথক করে রাখা বাধ্যতামূলক। একে সংগ্রহ করে জমা দিতে হয় কেন্দ্রীয় রাজকোষে এবং একে বণ্টন করতে হয় রাজভাণ্ডার থেকে। খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে এ নিয়ম কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমে দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি প্রায় উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সমাজের সব মানুযের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলাম সুদ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রত্যেক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান, যাকাত প্রবর্তন ও সুদ প্রথা বিলোপের মাধ্যমে ইসলাম তা দূর করার চেষ্টা করেছে। এভাবেই ইসলাম মানুষকে সামাজিক সমতা প্রদানের চেষ্টা করে, সামাজিক ও বিবর্তনের পথে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য ও হ্রাস করতে চায় এবং দরিদ্রদের শোষণের উপর বিত্তবান সমাজ গড়ে উঠাকে বন্ধ করে। এভাবেই ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিত্তশালীর সম্পদে বিত্তহীনদের অধিকার দিয়েছেন এবং বিত্তশালীর সম্পদকে সমাজে বিতরণের ব্যবস্থা করে এক অর্থনৈতিক সাম্যের সৃষ্টি করেছে। ধনীর সঞ্চয়ের স্পৃহা ও দরিদ্রের দুঃখ-দৈন্যের নিদারুণ যন্ত্রণা এবং ধন ও শ্রমের চিরন্তন দ্বন্দ্ব মিটিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুছিয়ে দিয়েছে। নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও' এ দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবর্ধমান বিকাশই যাকাত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

---

১. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ৪১.

Dhaka University Institutional Repository

মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। প্রতিটি সুস্থ ও ন্যূনতম আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার মক্কা শরীফ গিয়ে হজ্জ পালন করা কর্তব্য। একজন মহৎ লোকের ব্যক্তিত্ব যে সাধারণ মানুষের মনকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে তা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মের সঙ্গে জড়িত স্থান তার পর্যটকের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্যই মুসলমানগণ মক্কাতে হজ্জ পালন করে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে থাকেন। এ প্রেরণার প্রথম কারণ মহানবীর (স.) জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে এ স্থানটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দ্বিতীয়ত এর পুরনো ঐতিহ্য ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় থেকে প্রবহমান। হজ্জের উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঐক্যবিধান ও সংহতি অর্জন। সারা পৃথিবীর মানুষের নিজের দেশ, সমগ্র মানব জাতি তার ভাই এবং অপরের মঙ্গল সাধন তার ধর্ম এসব ধারণা সৃষ্টিও হজ্জের লক্ষ্য। তাই হজ্জের সময় মুসলমাগণ একই ইহরামের পোশাক পড়ে, একইভাবে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ায় এবং একই নিয়মে হজ্জের কাজগুলো সমাধা করে। এতে সবল-দুর্বল, আপন-পর এবং ছোট-বড়র কোন পার্থক্য থাকে না। এভাবেই ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতির একত্ব ঘোষণা করে। হজ্জ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ মক্কাভূমিতে সমবেত হয়ে এক আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যয়শীল ও এক আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে পারস্পরিক প্রীতি, সৌহার্দ, ভালবাসা জ্ঞাপন করেন এবং সাম্যের জয়গান ঘোষণা করেন। মুসলমানদের বিশ্বাস ও ধর্মের ঐক্য নয়, তাদের বেশ-ভূষা, আহার-বিহার এবং চিরন্তন ইচ্ছা ও অনুভূতির ঐক্য ফুটে উঠে হজ্জের মধ্য দিয়ে।[১]

হজ্জের সময় যখন সমগ্র বিশ্বের মুসলমানে মুসলমানে মিলন হয়, যখন ইরানী, তুরানী, মিসরী, ভারতী, তুর্কি, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, আরবীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমান, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে মক্কা নগরে এসে একত্রিত হয়ে একই আল্লাহ্র আরাধনা করে, তখন যে সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অনবদ্য ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই মনোমুগ্ধকর অপার্থিব দৃশ্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে ডঃ লেনার তার "Religious system of the world, গ্রন্থে বলেছেন, "The demonstration of equality turrinished on the occation of Hajj is complete that it is well right impossible to distinguish a servant than master. The whole of the humanity assumpes one aspect and one attitude and thus the noblest sight of equality and brotherhood is witnessed to Hajj. There is in this city a force which than would the holiness and diversion of mankind"[২]

এ সম্পর্কে অধ্যাপক পি কে হিট্টির বক্তব্য, উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন, "যুগ যুগ ধরে এ বিধান ইসলামের প্রধান ঐক্য সংস্থাপক শক্তি ও বিভিন্ন জাতীয় বিশ্বাসীর মধ্যে অত্যন্ত কার্যকরী সূত্র হিসেবে কাজ করে আসছে। পৃথিবীর চারটি মহাদেশ হতে সমবেত বিশ্বাসী ভ্রাতৃসঙ্গের এ ধরনের সম্মেলনের সামাজিক প্রভাব অতিরঞ্জনের উর্ধ্বে। নিগ্রো, যাযাবর, চীনা, পার্সী, তুর্কী, আরব, ধনী-নির্ধণ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে এ বিধান সকল মানুষকে এক ভ্রাতৃসংঘ স্থাপনের এবং এক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান করে। দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম অন্তত তার নিজস্ব সমাজের সীমারেখার মধ্যে বংশ, বর্ণ ও জাতীয়তার বিভেদের প্রাচীর নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।"[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, হজ্জ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূলনীতিটিই হচ্ছে একটি উদার ও মহান নীতি এবং মুসলিম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধানই এর প্রধান লক্ষ্য।

ইসলামের দেওয়ানী আইনেও সব মানুষের সাথে ন্যায়নীতি ও হকের ভিত্তিতে আচরণ করা হয়। আইন রচনার আসল উদ্দেশ্য সুবিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নয়। আইন যুলুম প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ঝান্ডা উড়ায়, যাতে সকল উৎপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষ তার নিচে আশ্রয় নিতে পারে। ফৌজদারী আইনেও সকলের জন্য একই রকম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। যে হত্যা করে তাকে হত্যা করা হয়। যে চুরি করে, সে শাস্তি পায়। যে অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে, তাকে শায়েস্তা করা হয়। হত্যাকারী জ্ঞানী হোক বা মূর্খ হোক, নিহত ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব হোক, মযলুম আরব হোক বা অনারব হোক, প্রাচ্যবাসী হোক বা পাশ্চাত্যবাসী সবাই আইনের চোখে সমান। স্বাধীন মানুষের বদলা স্বাধীন মানুষের কাছ থেকে, গোলামের বদল গোলামের কাছ থেকে এবং নারীর বদলা নারীর কাছ থেকে নিতে হবে।[৪]

---

১. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৭৬, পৃ. ১০৭.
২. উদ্ধৃতঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩. P.K. Hitti, History of the Arabs, P. 136
৪. আল-কুরআন, ২ : ৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান। মানুষ হিসেবে সব মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলাম যে সমাজ ব্যবস্থা র্নিধারণ করে তাতে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণ অর্থাৎ তার গুণ ও কর্মের দ্বারা, তার বংশ গৌরব, ধনদৌলত, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পেশা দ্বারা নয়। নারীরা শুধু সামাজিক মর্যাদাই লাভ করে না, তারা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস সব মিথ্যা ও কৃত্রিম সম্ভ্রমবোধ সরাসরি বাতিল করে দেয়। ইসলামের খলিফারা তদানীন্তন বিশ্ববাসীর মনে ভীতি ও প্রশংসার ভাব উদ্রেক করেছিলেন তাদের চরিত্র মাহাত্মে, রাজ দরবারের মনোমুগ্ধকর শোভা ও আড়ম্বর দ্বারা নয়। কালিমার এই মানবীয় দিক অর্থাৎ মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এমন যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে লালন করা হত যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তার অনুসারীদের মধ্যে, তাঁর নিজের ও তার পরিবারের প্রতি কোন বিশেষ সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শন করার কোন প্রবণতা সহ্য করতেন না।[১] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন, "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। (অতএব সকলেই সমান)" "হে আদম সন্তান, মনে রেখো, আজকের এই দিন, এই মাস, এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পত্তিও মর্যাদা সম্পন্ন" "মনে রেখো, আধার যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি পদতলে দলিত করছি। অজ্ঞতার যুগের রক্তপাত এবং তার প্রতিশোধের সকল ঘটনা আজ থেকে বিস্মৃত হয়ে যাও। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা ইবন রাবিয়া বিন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি।"[২]

এভাবে মহানবী (স.) সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছিলেন। স্বয়ং তাঁর মহান জীবনেও সাম্যের এ আদর্শ পেশ করেছেন। জগত বরেণ্য শেষ্ঠতম আদর্শ মহাপুরুষ হয়েও সামান্য দীন হীন কুলি ও মজদুরে সংগে উঠেছেন, বসেছেন, পানাহার করেছেন। তিনি প্রায়ই নিজের জুতা মেরামত করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং নিজের জামা তৈরী করতেন। একবার তার একটি দেনা শোধ করার জন্য সামান্য মজুরী উপার্জন করার প্রয়োজনে তাঁকে এক ইহুদীর জন্য গভীর কূপ থেকে পানি উঠাতে দেখা গিয়েছিল।[৩] ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে তাঁর নিকট কখনও স্বধর্মী-বিধর্মী বিচার ছিল না। তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন নি। কিন্তু হযরত সব সময় তাঁর সাথে পরম সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেছেন। একদিনের জন্যও উভয়ের মধ্যে অপ্রীতির সঞ্চার হয়নি। হযরত বিধর্মী অতিথির মলমূত্র স্বহস্তে ধৌত করেছেন। ইসলামের অতি বড় শত্রুর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন। ইহুদী ও খ্রিষ্টানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিধর্মী ইসলামও গ্রহণ করেছে।[৪] তিনি মজলিসে এমনভাবে সকলের মাঝে উপবেশন করতেন যে, সাধারণ সাহাবা থেকে তাকে পার্থক্য করা যেত না।

একটি নতুন জাতির প্রতিষ্ঠাতা, একটি সাম্রাজ্যের অধিপতি ও একটি মহান ধর্মের প্রবর্তক হয়েও তিনি নিজেকে কখনও আইনের উর্ধ্বে বিবেচনা করেন নি। কুরআনের ভাষায় তিনি আর সকলের মতই মানুষ, ব্যতিক্রমটা হল আল্লাহ্র ওহী আসে তাঁর কাছে। তিনি সামাজিক আচরণেও একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় কোন বৈশিষ্ট্য দাবি করেন নি।[৫] তিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যদিয়ে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই সকলের সাথে সমভাবে মিলেমিশে সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় সাহাবীদের সাথে তিনিও মাটি কেটেছেন এবং মাটির বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছেন। একদা এক সফরে যাবার প্রস্তুত করার সময় অন্য সবার মত তিনিও বন থেকে লাকড়ি কুঁড়িয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জনৈক সাহাবী তার ভৃত্যকে প্রহার করতে দেখে মহানবী (স.) তাকে বললেন, "সে তোমার ভাই, তুমি যা খাও, তাই তাকে খেতে দিও। তুমি যা পরিধান করবে, তা-ই তাকে পরিধান করাও।" এর চেয়ে বড় সাম্য আর কি হতে পারে ?

মহানবী (স.) তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তিনি নিজে উপস্থিত হতেন। তিনি সাংবিধানিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবেও সকল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বৈধভাবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় তিনি সুবিচার ও সাম্যের প্রতি তার ভালবাসা ও অনুরক্তির প্রমাণ হিসেবে উচ্চ কণ্ঠে সরাসরি জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কার অভিযোগ থাকে, তাহলে সে অবলীলায় তা করতে পারেন। সুতরাং 'রাজা কোন ভুলই করতে পারে না' ইসলাম এ ধারণা আদৌ সমর্থন করে না।

---

১. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫.
২. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ৪৫.
৩. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪.
৪. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ; রেঁনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, পৃ. ৩.
৫. আল-কুরআন, ১৮ ঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় হিযরত করার পর মহানবী (স.) মদীনার অধিবাসী আউস ও খাজরাস গোত্রের শতাব্দীর বিবাদ ভুলিয়ে দেন এবং তাদের একটি সাধারণ নাম দিলেন আনসার। মক্কা হতে যারা মদীনায় হিযরত করেছিলেন তাদের নাম হল মোহাজের। মোহাজেরগণ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং আনসারগণ ছিলেন প্রধানত কৃষিজীবি। আনসারগণ মোহাজের ভাইদেরকে নিজেদের সম্পত্তি তুল্যাংশে ভাগ করে দিলেন। পক্ষান্তরে মোহাজেরগণও স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী ব্যবসায় লিপ্ত হলেন। আনসার ও মোহাজেরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ আরও নিবিড় করার জন্য মহানবী (স.) তাঁদের মধ্যে "ভাই" সম্বন্ধ পাতিয়ে দিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে একজন মোহাজেরকে একজন আনসারের ভাই বানিয়ে দেয়া হল। ইতিহাসে এটাই "আকদুল মুখাওয়াত" নামে পরিচিত। এর প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) শত্রু ছিলে, (আল্লাহ্) তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা দিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে (পরস্পর পরস্পরের) ভাই হয়ে গেলে।[১] এই ভ্রাতৃত্বের ভাবাদর্শে তারা নিজেদের যাবতীয় সম্পত্তি এমনভাবে ভাগ করে নিলেন, যেভাবে ভাইয়েরা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়।

মহানবী (স.) সর্বপ্রথম হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি জানিয়ে দাসপ্রথা নিবারণের ব্যবস্থা করেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে মহানবী (স.) দাস ও দাসীকেও মানুষ বলে স্বীকার করেছেন। দাসের মুক্তিপথকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দাস ব্যবস্থাকে তিনি পাপ এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। দাসদিগকে শুধু মুক্ত করার জন্যই নয়, মর্যাদাসহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃত্ব করার অধিকার নবী নিজে দিয়েছেন। মক্কায় অবস্থানকালে এ কর্মসূচীর সকল ব্যয়ভার বহন করেন হযরত খাদিজা (রা.)। যায়েদকে মুক্ত করে নবী (স.) তাকে নিজেদের পরিবারভূক্ত করে নেন। মহানবী (স.) নিজের ঘনিষ্ঠ আত্নীয় এক গর্বিত কোরাইশের মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছিল জায়েদ নামক এই ক্রীতদাসের সাথে। এর ফলে বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বংশগৌরব ও বংশের অহমিকা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (স.) তাকে মোহাজের ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীদের জেনারেলের দায়িত্ব প্রদান করেন। তার মৃত্যুতে তার পুত্র ওসামাকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয় এবং হযরত আবূ বকর (রা.), উমার (রা.) সহ অন্যান্যের মত মর্যাদাশীল সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নেতৃত্ব মেনে এগিয়ে চলেন।[২] প্রসিদ্ধ নিগ্রো ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা.) নিজের ব্যক্তিগত গুণবলে এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন যা পৃথিবীর যে কোন মানুষের কাম্য। তিনি মুয়াজ্জিনের উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। তিনি তিন তিনটি বিয়ে করেছিলেন এবং তারা সবাই ছিলেন আরবের বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের কন্যা। তাদের একজন ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর কন্যা।[৩] ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রসঙ্গে Prof. Hurgronje বলেছেন, "Mohammad was a claiment to no new religion--- The league of Nations, founded by the prophet of Islam, put the principle of internatinal unity and human brotherhood on such universal foundations as to show candle to the other nations, Today the black Christians cannot enter the church meant for the white chiristians. A Christian missionary is boy-cotted for marrying a Negro woman. Human beings are buried alive. There are numerous other things of the kind attributed to the Christains by the Muslims. thereby showing the lowlevel of Christian Society. The fact is that no other nations of the world can show a parallel to what Islam has done towards the realisation of the idea of a league of Nations."[8]

ইসলাম আল্লাহ্‌র একত্ব তথা তাওহীদ দর্শনের ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের ধারণার ভিত্তিতে মানুষের জন্য সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম শুধু সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উচ্চতম আদর্শ ও রীতিনীতিই শেখায়নি, বরং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকারের রীতিনীতিরও নিশ্চয়তা বিধান করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দিয়েছে অবাধ বাকস্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান ন্যায়বিচার পাবার অধিকার। রাষ্ট্র, সমাজ ও মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করেছে। "তোমরা হলে

---

১. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১০৩
২. সৈয়দ আমির আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম (অনু. মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ১৪৩-৪৯.
৩. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, 'ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন' ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা-১৯৯৯, পৃ. ৮
৪. উদ্ধৃত ঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯.

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে মনোনীত করা হয়েছে। যাতে তোমরা কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশে দাও এবং গৃহিত কাজের নিষেধ কর।"[১] কুরআনের এই নির্দেশের যথাযথ বাস্ত বায়নের জন্য মহানবী (স.) তাঁর সাহাবাদেরকে এমন নির্ভিক মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিলেন যে, তারা নির্দ্ধিধায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন। কেননা মহানবী (স.) বলেছেন, "সবচেয়ে সম্মানীয় জিহাদ হচ্ছে এমন ব্যক্তির জিহাদ, যে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত মতামত প্রকাশ করে।" "আমার পরে যারা শাসকদের অন্যায় কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করবে তারা আমার অনুসারী নয়।"[২]

খলিফাগণের শাসনামলেও বাকস্বাধীনতার এ পরিবেশে অক্ষুন্ন থাকে। যরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) সর্বদা জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাতেন। তাঁরা প্রায়শই বলতেন, "তোমাদের (জনসাধারণ) কল্যাণ নেই, যদি তোমরা আমাদের সমালোচনা না কর এবং আমাদের কল্যাণ নেই, যদি আমরা তা না শুনি।"[৩] নির্বাচিত হবার পর প্রচলিত ধারায় খলিফাগণকে তাদের ভাষণে জনগণকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হত যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মুতাবিক খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সেই নির্দেশ মেনে চলবেন এবং সে মর্মে তিনি আইনের শাসনের নিশ্চয়তা দিবেন। খলিফার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার সকল স্বাধীনতা জনগণের আছে।[৪]

একজন লোক হযরত উমরকে (রা.) সাবধান করে দিয়ে বললেন, "আপনি যদি কোন ভুল করেন তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, এ তরবারী নিয়ে আপনাকে সমুচিত শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করব না।" এরূপ স্পষ্ট কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যে, মুসলিমদের মধ্যে তাহলে এমন ব্যক্তিও আছে যে তরবারী দিয়ে উমরের ক্রুটি সংশোধন করতে চায়।" একদা উমর (রা.) যখন খোৎবার মাঝে মগ্ন, তখন জুময়ার নামাযের জামায়াতের লোকজনদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল "আপনি এত বেশী কাপড় কোথা থেকে পেলেন যে, আপনার পোশাক এত দীর্ঘ দেখাচ্ছে ?" তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ পুরাতন ছোট পোশাকে দাঁড়িয়ে প্রতুত্তরে বললেন যে, তাঁর প্রাপ্য কাপড়টুকু তিনি তাঁর বাবাকে দিয়েছেন।[৫] এরূপ বাকস্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের ভিত্তি সাম্যের চেতনা, সকল মুসলিমকে সামাজিকভাবে ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একই উম্মাহ বা জাতি হিসেবে গড়ে তোলে; আমর বিন আসের নেতৃত্বে আরবগণ যখন মিসরে অভিযান চালান সে দেশের শাসক তখন শত্রুর (মুসলিমদের) সম্পর্কে খবরাদি নেয়ার জন্য গোপন দূত নিয়োগ করেন। দূতটি আমরকে তার সৈন্যদের মাঝে বসে খেতে দেখে শাসকের নিকট সে দৃশ্যটির বর্ণনা দেন। বর্ণনা শুনে শাসক বিস্ময়ে বলে উঠেন, "যে সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সৈন্যরা নির্ভেজাল সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে জয় করা অসম্ভব।"[৬]

ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, ছোট-বড় ব্যবধানের উর্ধ্বে আইনের চোখে সাম্য, ন্যায়বিচারে সাম্য, সরকারী কাজ বন্টনে এবং রাজস্বে তথা সবক্ষেত্রেই ইসলাম সাম্যের নিশ্চয়তা বিধান করে। জন্মগত দিকে সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক লোক উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। অধিকার ও দায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রেই সাম্যের নীতি পালিত হত। এ প্রসঙ্গে সরোজিনী নাইডু লণ্ডনে তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "It (Islam) has brought to the modern world the true gift of Democracy but the trend of civilization today the sum total of the world's aspiration today is to reconstruct the new world towards the brotherhood that was preached in the desert by a camel-driver more than thirteen hundred years ago.--- Centuries ago when my forefathers were evolving great philosophies and sending to the younger nations a message of enlightenment. Arabia was still uncultured. Arabia was nothing but a desert of wild holders when the great Buddhist message of "Nirvan" was being enunelated from the Bo-tree by Bhddha Gaya and Sarnath, there was no conception of what the world 'Democracy' meant when christ was crucified upon the cross by the unbelievers, even then the idial of brotherhood was not accepted. It was challenged and trampled in the dust. It was necessary that a Camel-driver from Arabia should gave to the world in the ultimate from the most perfect defination of brotherhood of the republic of equality of all men of all classes of all rank." [৭]

---

১. আল কুরআন, ৩ ঃ ১১০
২. হাদীসদ্বয় উদ্ধৃত ঃ মুহাম্মদ শফিক আহম্মেদ প্রমুখ, 'ইসলামে মানবাধিকার ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা, ৪৭, ৪৮, ৪৯, অক্টোবর-৯৩, জুন-৯৪, পৃ. ১৭৭
৩. আহমদ মুল্লাজিয়ুন, নুরুল আনওয়ার, ঢাকা, পৃ. ৩১৬.
৪. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, আত্ তারীখুল ইসলামী, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ১৭৬-১৭৭.
৫. এডভোকেট মুজিবুর রহমান, 'ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম', শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন-৯১, বাংলাদেশ-সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা-১৯৯১; পৃ. ১২২
৬. এডভোকেট মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৭. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম আরবদের সংস্কৃতির মধ্যে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায় মানব জাতির অতীত কিংবা বর্তমান ইতিহাসে আর কোথাও তা দেখা যায় না। তাদের কাছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব তত্ত্ব ও দূরবর্তী আদর্শ মাত্র ছিল না, এটা ছিল তাদের প্রত্যক্ষ সমাজ জীবনের ভিত্তি। তারা শুধু একে অপরের সহচর ছিলেন না, ছিলেন একে অন্যের ভাই। এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গুণেই বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন করা, বিশ্বশান্তি কায়েম করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্ববন্ধুত্ব স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ইসলাম মানবতার উৎকর্ষ সাধনের যে মহান আদর্শ পেশ করেছে, বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের যে নিখুঁত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছে তা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অধীনে একই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিধানের কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি অনুপম প্রতিষ্ঠান। আধুনিক যুগেও যদি ইসলামের এই মহান আদর্শের বাস্তবায়ন হয়, তবে শুধু যে মুসলিম জাতির হারানো গৌরব ফিরে আসবে তাই নয়, বরং এই অশান্ত পৃথিবী পারে শান্তি, কল্যাণকামী মানুষ পাবে কল্যাণ ও মুক্তি।

অপরদিকে সমাজকল্যাণও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে বিশ্বাসী বলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে; কারণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধিত হলেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমাজের সবল-দূর্বল সকলের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ বিধানে সহায়তা করে সাম্য ও গণতন্ত্র ইসলাম ও সমাজকর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সকলের জন্য সমান সুযোগ (Equality opportunity for all) :

ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র।

ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্নবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃংখলা স্থাপন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠ পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। এতে জাতিভেদের কোন বালাই নেই। আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তিনি চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর অনুসন্ধান করে।"[১] এ আয়াতে সম্পদ ভোগে কোন বিশেষ শ্রেণীর অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। কোন প্রাণীর মধ্যে বৈষম্যও করা হয়নি। ইসলামী আইন অনুসারে কোন মুসলমান কোন অমুসলমানকে হত্যা করলে তাকে সেই শাস্তি দেয়া হত যে শাস্তি একজন মুসলমানকে হত্যা করলে দেয়া হত। যাতে কোন অবিচার বা যথেচ্ছাভাব না হয়, সেজন্য কোন মুসলমান নাগরিককে অমুসলিম (জিম্মি) নাগরিকের সম্পত্তি ক্রয় করারও অধিকার দেয়া হয়নি। এমনকি ইমাম এবং সম্রাট পর্যন্ত কেউই কোন অমুসলিমকে তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারতেন না। মহানবী (স.) বলেছেন, "তাদের (জিম্মি) শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধন-প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রী, পূজারী, বিশপ ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের ক্রুশ ও দেব-দেবীর মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না। মুসলমান চাষীদের অবশ্য দেয় 'ওশর' জিম্মিদের নিকট হতে নেয়া হবে না। তাদের অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা হবে।"[২] তিনি শত্রুদের প্রতি প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গৃহাভ্যন্তরে ক্ষতিহীন বাসিন্দাদের গায়ে হাত দিও না, নারীদের অক্ষমতার সম্মান রক্ষা কর; দুগ্ধপোষ্য শিশু আর রোগশয্যার মানুয়কে আঘাত কর না; বাধা প্রদান কর না এমন অধিবাসীদের বাসগৃহ ভেঙ্গে দিওনা; তাদের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ ও ফলের গাছ নষ্ট কর না। খেজুর গাছের ক্ষতি কর না।"[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৪১ ঃ ১০
২. যাদুল মায়াদের উদ্ধৃতি দিয়ে সৈয়দ বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪.
৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি যিম্মীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে এবং তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে আমি পরলোকে তার জন্য অভিযোগকারী হব।"[১]

এজন্যই Encyclopedia of Religion and Ethics- এ বলা হয়েছে- "The recognition of rival religious systems as possessing a Divine revelution gave to Islam from the outset a theological basis for the toleration of non Muslim." [২]

এভাবেই মহানবী (স.) তার জীবনে সাম্য ও মৈত্রীর নীতি ঘোষণা করেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করেন। স্বরাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বরূপ আরবে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করেন, জনসাধারণের জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর হিফাযতের দায়িত্ব ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; সুবিচার কায়েম করেন। জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মানুষের আর্থিক দুর্গতি দূরীভূত করার সকল বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ইসলাম আরবদের সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল; আরবেরা শুধু মানুযে মানুযে কৃত্রিম বিভেদই অপসারণ করল না, তারা তাদের মধ্যকার সব বিবাদ মীমাংসা করল, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সমূলে উৎপাটিত করল, একে অপরের সহচরের মত নয়, নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতে শিখল। এ সমাজ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্‌র পিতৃত্ব সুলভ প্রভূত্ব ও মানুযের ভ্রাতৃত্বের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাসের ফলে।"[৩]

"সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি" (২:২১৩)- এই সক্রিয় বিশ্বাসের ফলে যাঁরা ছিলেন সমাজে সর্বপ্রধান সেই খলিফারাও কোন বিশেষ সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করতেন না। একজন সাধারণ বেদুঈনও তাদেরকে নাম ধরে সম্বোধন করত, যেভাবে সে তার ভাইকে সম্বোধন করত; বর্তমানে রাজা, মহারাজা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরকে যেভাবে আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিযোগে সম্বোধন করা হয়, খলিফাদেরকে সেভাবে সম্বোধন করা হত না। খলিফা ও একজন সাধারণ লোকের মধ্যে এটুকু পার্থক্য ছিল যে, খলিফা পদাধিকার বলে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতেন কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সামাজিক সম্মান ভোগ করতেন। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এত বাস্তব, এত অনুপম ও সতেজ ছিল যে, সামাজিক প্রাধান্য সম্বন্ধে খলিফাদের নিজেদেরও কোন ধারণা ছিল না এবং তাঁদের পদের সম্ভ্রম ও মহিমা সম্বন্ধেও তাদের কোন কৃত্রিমবোধ ছিল না। যখন পারস্যের গর্বিত শাসনকর্তা হরমুজানকে বন্দী অবস্থায় খলিফা উমরের (রা.) সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন বিজেতা খলিফা নিরীহ সাধারণ মানুযের মত হাতের উপর মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর মসজিদে খোলা সিড়িতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।"[৪]

সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করতেন। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব উঁচু ছিল। কোন পরিশ্রমের কাজকে, তা যতই নগণ্য হোক না, তারা তাকে নীচ বলে মনে করতেন না। নিজেদের পেশার ভিত্তিতে ভাই থেকে ভাই পৃথক হতেন না। হযরত আবূ বকরকে (রা.) প্রায় দেখা যেত কাপড়ের ভারী বোঝা পিঠে করে কাপড় বিক্রি করার জন্য মদীনার রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। খলিফা হয়েও তিনি মহল্লার সেই দরিদ্র মেয়েদের ছাগল দুয়ে দিতেন, যাদের পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। ঐ সময় তিনি বলতেন, "আশা করি খিলাফতের দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও আমি এই জনসেবার কাজটা চালিয়ে যেতে পারব, যা এ যাবত করে এসেছি।"[৫] এ কাজকে তিনি লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করেন নি। তাদের সমাজে ঈর্ষা ও ঘৃণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে শোষণের সম্পর্ক ছিল না, ছিল প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক এবং তারা একে অন্যকে ভাইয়ের মত সাহায্য করতেন। তারা পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। যদি কখনও তারা কাউকে আঘাত করতেন প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে নয়, শুধু বিদ্বেষযুক্ত কর্তব্য পালনের জন্য।

---

১. ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
২. ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, পৃ.৩
Encyclopedia of Religion and Ethics এর 'Tolaration' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৩. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
৪. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৫. ডঃ মোস্তফা আসসিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেছেন, "আমাদের আমীর বা নেতা আমাদের মধ্য থেকেই একজন, যদি তিনি আমাদের দ্বীনের কিতাব তথা পবিত্র কুরআন ও প্রিয় নবী (স.)-এর আদর্শের অনুসরণ করেন, তবে আমরা তাকে আমাদের খলিফার পদে বহাল রাখি, এর ব্যতিক্রম হলে আমরা তাকে পদচ্যুত করি। যদি তিনি চুরি করেন, তবে তাঁর হাত কাটা হয়। আর যদি তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হন তবে তাকে প্রস্তরাঘাত করা হয়। যদি তিনি আমাদের কাউকেও গালি দেন তবে সেও তাকে সেই পরিমাণ গালি দেয়। যদি তিনি কোন লোককে আহত করেন তবে তাকে তার বদলা দিতে হয়। তিনি আমাদের অগোচরে পৃথক কক্ষে অবস্থান করেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে যে অহমিকা প্রকাশ করেন না, তিনি গনিমতের সম্পদ বন্টনে আমাদের তুলনায় নিজকে প্রাধান্য দেন না। তিনি আমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ।"[১]

মানুষের অধিকার রক্ষার এবং সাম্যের আদর্শের এর চেয়ে নিখুঁত ও উৎকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তারা মানুষের সেবা করতে কখনও কোন দ্বিধা করেন নি। এখানে কোন রাজপ্রাসাদ, রাজ্যের বৈভব ও ঐশর্য্য বিলাসের কোন সামগ্রী ছিল না। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝে রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (স.) দিনের পর দিন অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কাটিয়েছেন। তার ঘরে মাসের পর মাস স্ত্রী-কন্যার অন্নের কোন সংস্থান থাকত না। বিশাল ভূখণ্ডের অর্ধাশ্বর হযরত উমরের (রা.) পরিধানে শত-গ্রন্থি বিশিষ্ট কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানি ছিল তার খাদ্য। প্রাথমিক যুগের খলিফাদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে মনীষী ইমারসনের (Emerson) একটা মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Every great and commanding movement in the annuals of the world is the triumph of some enthusiasm. The victories of the Arabs after Mohammed, who in a few years from a small and means beginning established a larger empire than that of Rome is an example, they did they knew not what. The nacked Derar, horsed or an idea was found on overmatch for a troop of Roman caverly. The women fought like men and conquared the Roman man. They were miserably equipped, meserably red. They were Temperance troops. There was neither brandly nor flesh needed to feed them. They conquered Asia, Africa and Spain on barly. The Caliph Omar's walking stick Struck more terror into those who saw it, than another man's sword. His diet was barley bread, his sauce as salt, and often times by was of abstinened. He ate his bread without salt. His drink was water. His palace was built of mud; when he left Medina to go to the conquest of Jerusalem, He rode on a red camel with a woden platter hanging at its saddle; with a bottle and two sacks; one holding barely and the other dried fruits."[২]

খলিফা ও একজন ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্যের বোধ তাদের ছিল না। তাদের মন আর্ত-মানবতার সহানুভূতিতে বিগলিত থাকত। এজন্যেই হযত আবূ বকর (রা.) মহানবীর (স.) অনুসরণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে য়্যাজিদ, নিশ্চিত হয়ো, যেন তোমার নিজের লোকদের উপর উৎপীড়ন না কর, তাদের প্রতি অস্বস্তিও ঘটাবেনা, বরং তোমরা সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, আর যা ন্যায়সঙ্গত ও বিচার সম্মত তা করতে যত্নবান হবে, কারণ যারা অন্যথা করে তাদের উন্নতি হবে না। যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা মানুষের মত নিজেদের পরিচয় দেবে, আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, আর যদি তোমরা বিজয়ী হও, তাহলে ছোট শিশুদেরকে হত্যা করবে না, বৃদ্ধদেরকে না, নারীদেরকেও না। খেজুর গাছ নষ্ট করবে না, শস্যের ক্ষেত পোড়াবে না, ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে খরিদ পশুর কোন অনিষ্ট করবে না। যখন তোমরা কোন সন্ধি বা চুক্তি কর তা পালন করবে এরং তোমাদের কথা রক্ষা করে চলবে। তোমরা চলার পথে দেখবে কিছু ধর্মপরায়ন লোক মাঠের মধ্যে সংসারত্যাগী অবস্থায় বাস করছে, যারা এই প্রকারে আল্লাহ্র সেবায় নিযুক্ত, তাদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদেরকে হত্যা করবে না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করবে না।[৩] হযরত আবূ বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হবার পর মহানবী (স.) কর্তৃক মনোনীত সেনাপতি ওসামা বিন যায়িদকে নিয়ে জিহাদে যাত্রা করেন। সতের বছর বয়স্ক যুবক ওসামা অশ্বে আরোহণ করেন এবং তিনি অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলতে থাকেন। এভাবেই তিনি সাম্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

---

১. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২. Emarson, Man-The Reformer, P. 370.

৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০.

Dhaka University Institutional Repository

জেরুজালেম বিজয়ী খলিফা উমর (রা.) যখন বিজয় গৌরবে বিজিত নগরে প্রবেশ করেন তখন তার পরিশ্রান্ত ক্রীতদাস উটের পিঠে আরামে বসেছিল এবং তিনি উটের রশি ধরে উটকে টেনে নিয়ে চলছিলেন। একদা গভীর রাতে খলিফা উমর (রা.) ও মহানবীর (স.) চাচা হযরত আব্বাসকে (রা.) দেখা গিয়েছিল একজন ক্ষুধার্ত ভগ্নী ও তার সন্তানদের জন্য খাবারের ভারী বোঝা বহন করে পাহাড়ের উপর উঠতে। রাতের এ সময় তারা এ কাজ করার জন্য খিলাফতের ক্লান্ত ভৃত্যদের কষ্ট দিতে চাননি।[১] খলিফা উমর (রা.) নিজে জেগে মদীনায় আগত বাণিজ্যিক কাফেলাকে যাতে নারী পুরুষ ও শিশুরা ছিল, পাহারা দিয়েছিলেন আর কাফিলা আরামে ঘুমিয়ে ছিল। অথচ তিনি এমন কাজ করলেন, যা আজকাল একজন নগণ্য সৈনিকও কোন কাফিলার প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে করবে না। এ সময় তিনি তিনবার এক শিশুর মাকে সতর্ক করলেন যেন শিশুকে তিনি আরামে রাখেন। বিদেশী পথিকের শিশুর প্রতি উমরের (রা.) এমন মানবিক আচরণ ও চেতনার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তিনি রাতের ঘুম ও আরামকে হারাম করে প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। পথিমধ্যে দেখলেন একজন গর্ভবতী মহিলার প্রসব বেদনা উঠেছে, অথচ তার কোন সাহায্যকারী নেই। একথা জেনে তিনি নিজের স্ত্রীকে তার সাহায্যের জন্য নিয়ে যান। নিজে বাবুর্চি এবং স্ত্রী ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেন। অথচ প্রচলিত পরিভাষায় তারা মুসলিম জগতের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। এমন উচু স্তরের মানব প্রীতি, উদারতা ও মহানুভবতা এক কথায় ইতিহাসে নজীর বিহীন।

বায়তুল মাল সম্পর্কে হযরত ওমরের (রা.) ঘোষণা, "আল্লাহ্র নামে শপথ ! এ রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ অপর কারও অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবি করতে পারে না ! আমি নিজেও কারও অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবীদার নই।"

ইসলাম শুধু হযরত উমরকেই (রা.) একজন মহানুভব মানুষ হিসেবে পেশ করেনি, বরং হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রা.) একই ধরণের মহানুভব মানবহিতৈষী ছিলেন। এছাড়া উমর বিন আব্দুল আযীয, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখের ন্যায় বড় বড় ব্যক্তিত্ব, বড় বড় ফকীহ, দার্শনিক ও নেতার জীবনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ধনী ও দরিদ্র, সাদা ও কালো মানুষের জন্য পৃথক পৃথক মসজিদ ছিল না। সব মানুষ সমান ও ভাইভাই হিসেবে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন, এক আল্লাহ্কে সিজদাহ্ করতেন, শুধু এক আল্লাহ্র তাঁরা উপাসনা করতেন এবং একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই তাঁরা সাহায্য চাইতেন। সুতরাং সাম্য, মৈত্রী, জনসেবা ও সুবিচারের এমন অতুলনীয় এবং অভাবনীয় বিস্ময়কর আদর্শ কেবল ইসলামই পেশ করেছে। পৃথিবীর আর কোন মতবাদ ইসলামের সমকক্ষ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এইচ, এ, আর গীবের মন্তব্যটি উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। তিনি বলেছেন "নিরবচ্ছিন্ন মানবতার সেবা করার প্রচেষ্টা ইসলামে রয়েছে। ইউরোপের চাইতে অধিক বাস্তবভিত্তিক ও ঘনিষ্টভাবে ইসলাম প্রাচ্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। ইসলামে রয়েছে আন্তঃবর্ণ সহযোগিতা ও সহ অবস্থানের চমৎকার ঐতিহ্য। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সম মর্যাদা ও সুযোগ প্রদানের এত উদ্যোগ কোন সমাজ নেয় নি এবং এতবেশী সফলতা আর কোন সমাজ অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন বর্ণ এবং ঐতিহ্যের মধ্যে মীমাংসার অযোগ্য সমস্যাসমূহের পূর্ণ মীমাংসা করার ক্ষমতা ইসলামের আছে।"[২]

এভাবে ইসলামের ন্যায় সমাজকল্যাণও বিশ্বাস করে যে, সামাজিক সম্পদের প্রতি সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। সমাজকল্যাণ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়, যাতে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়।

সম্পদের ব্যবহার ও সুষম বন্টন (Proper utilization of resources equal distribution) :

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পরও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কী খরচ করবে, বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।"[৩]

---

১. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫.
২. H.A.R. Gibb, Whither Islam, London, 1973, P. 379.
৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২১৯.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ বলেছেন, "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১] এখানে 'তোমাদের' শব্দটি কোন ব্যক্তি, সমষ্টি বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি, বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে এবং কারও বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়, কোন অঞ্চলের সম্পদ যে শুধু সে অঞ্চলের ইসলাম এ স্বীকৃতিও দেয় নি।

ইসলামের মতে, সম্পদ শুধুমাত্র দু'টি কাজে ব্যবহৃত হবে। এর একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরটি শিল্প কিংবা ব্যবসায় ব্যয় করা। আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ হতে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর।"[২]

দারিদ্র বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কম বেশী ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন "যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য আছে তারা তা হতে সমাজ কল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অনটনের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করুক। আল্লাহ্ কাউকেও তিনি যা দিয়েছেন তার বাইরে, তার বহনের অতিরিক্ত ভার তার উপর অর্পণ করেন না। অস্বাচ্ছন্দ্যের পর আল্লাহ্ পুনঃ তাদেরকে সম্পদ দান করবেন।"[৩]

আল-কুরআনে মওজুদদারদের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, "তারা অভিশপ্ত যারা ধন সম্পদ মওজুদ করে আর গুণে গুণে রাখে, ভাবে তাদের ধন তাদের নিরাপত্তা দিবে, নিশ্চয় নয়। এই সম্পদ তাদের এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে যা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে।"[৪] সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ধন সম্পদের অপচয় কর না, যারা এভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[৫] ইসলাম মানুষকে সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। এভাবেই ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণও একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনকে আবশ্যকীয় মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই এটি সাধারণ মূল্যবোধ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব (Social responsibility) :

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। আসমান ও যমিনে যা কিছু বিদ্যমান, তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ্, মানুষ নয়-তা সে ব্যক্তিই হোক, আর ব্যক্তির সমষ্টি রাষ্ট্রই হোক। মালিকানা স্বত্বের অর্থ ইচ্ছামত বস্তুর ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার। ইসলাম মানুষের এ ধরনের অধিকার স্বীকার করে না। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিক রূপে নয়-আল্লাহ্র 'রব্ব' (লালন ও পালন নীতি) গুণের প্রতিভূরূপে (খলিফা)। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এর ব্যবহারিক স্বত্ত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সংগত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবনমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মের সংস্থান এই মৌল জীবিকার উপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনেরই নাম 'হককুল ইবাদ' আদায় করা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের সকল কাজই আল্লাহ্র জন্য, সকল কাজই আল্লাহ্র ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। ব্যাকুল মন চায় শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এখানেই ইবাদতের মূল নিহিত রয়েছে। আল-কুরআনের প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াতে ইসলামের ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে; "ইহা সেই কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ, যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৯
২. আল-কুরআন, ৬৩ ঃ ১০
৩.আল-কুরআন, ৬৫ ঃ ৭
৪. আল-কুরআন, ১০৪ ঃ ২-৪
৫. আল-কুরআন, ১৭ ঃ ২৬-২৭
৬. আল-কুরআন, ২ ঃ ২-৫

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতগুলি বিশ্লেষণ করলে ইসলামে ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় ঈমান ও আমলের বিশ্বাস ও কর্মের মৌলিক নীতিসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঈমান ইসলামের তত্ত্বমূলক দিক এবং আমলের ব্যবহারিক দিক। বিশ্বাস বিবর্জিত কর্ম যেমন ইসলামের লক্ষ্য নয়, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও ইসলামের আদর্শ নয়; ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ও সংযোগ ঘটেছে।

সমগ্র বিশ্বজগতের উপর মহান আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজমান। সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র বিধান ও নিয়ম-নীতি ও নির্দেশ মেনে চলছে। তাই কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নেই। আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বিশ্বজগৎ এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না। মানব সমাজে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। আল-কুরআন মানুষের দু'টি পরিচয় দিয়েছে। "আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অত:পর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাহাদিগকে নহে, যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, ইহাদিগের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"[১]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলিতে দেখা যায়, মানুষের দু'টি পরিচয় রয়েছে। প্রথমত, মানুষ পৃথিবীর সুন্দরতম সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত। দ্বিতীয়ত মানুষ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক জীবন পরিচালনা করে অর্থাৎ মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ হয়। সে পরিণত হয় আশরাফুল মাখলুকাতে। আর আল্লাহ্‌র বিধান পরিত্যাগ করে সে যখন আপন প্রবৃত্তির (নফস) অনুসরণ করে তখন সে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। মানুষ যাতে নিজের সৃষ্টির সেরা জীব' এবং মর্যাদা রক্ষা করতে পারে সেজন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ঐশী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর যথার্থ অনুসরণ করার অর্থই আনুগত্য, অন্য কথায় ইবাদত। এই ইবাদতের মাধ্যমেই জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও ইপ্সিত সাফল্য লাভ সম্ভব। অন্যথায় অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় অনিবার্য।

প্রকৃতি জগতের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান, তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড, যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।"[২] কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ তার ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌র অনুসরণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা লঙ্ঘনও করতে পারে। এজন্যই মানুষের রয়েছে জবাবদিহিতা এবং কর্মানুযায়ী জান্নাত-জাহান্নামের ব্যবস্থা।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ইনসান' শব্দের অর্থ মনুষ্যত্ববোধ বা অনুভূতি। মানুষের এ মনুষ্যত্ববোধ এবং তার তীক্ষ্ণ অনুভূতি রয়েছে বলেই তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। তার এ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়েই সে বিচার করবে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করবে। তারপর সে বুদ্ধি ও বোধকে, মনুষ্যত্ব ও অনুভূতিকে মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে কাজে লাগাবে ঐকান্তিকতাও আন্তরিকতার সঙ্গে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন।" "আমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।"[৩] আল্লাহ্ তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের রয়েছে পাঁচটি ফরয ইবাদত অর্থাৎ কালিমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। কালিমা জীবনে শুধু একবার উচ্চারণ করা ফরয, অন্য সময় তা উচ্চারণ করা ফরয নয়। তবে সব সময় তা স্মরণে রাখা ও তার মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি। নামায দিনে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা ফরয। রোযা শুধু বছরের একমাস ফরয। রোযা অবস্থায় অন্য সকল বৈধ কাজ করাও জায়েজ রাখা হয়েছে। হজ্ব শুধু বিত্তবানদের জন্য জীবনে একবার পালন করা ফরয। যাকাত শুধু বিত্তবানদের জন্য নির্দিষ্ট। বাকি সময় মানুষ কী করবে ? আবার অন্যভাবে মানুষ যদি বাকি সময় নফল ইবাদতে কাটিয়ে দেয় তা হয় বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ, জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করার নামান্তর। মূলত ইসলাম এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করতে বলে। "হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।"[৪] ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র তথা বিশ্ব, জীবনের সকল পর্যায়ে, দিক্ ও বিভাগে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করার জন্য জীবনের সকল শ্রম, সাধনা, প্রয়াস ও সময়কে ব্যয় করাই প্রকৃত মুমিন জীবনের লক্ষ্য এবং ইসলামে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য।

---

১. আল-কুরআন, ৯৫ ঃ ৪-৬
২. আল-কুরআন, ৫৫ ঃ ৫-৮
৩. আল-কুরআন, ৫১ ঃ ৫৬
৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২০১

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত ইবাদত সরাসরি আল্লাহ্ সাথে সম্পৃক্ত বা হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ইবাদত আর যে সমস্ত ইবাদত বান্দা বা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত তা হুকুকুল ইবাদ। দু'টি ইবাদতের মধ্যে এমন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে যে, দু'টিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই। বান্দার হককে উপেক্ষা করে শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করলে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা যাবে না। দু'ধরনের ইবাদতই আমাদের উপর ফরয এবং যদি কেহ উভয় ইবাদতের কোন একটিতে আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং অন্য ধরনের ইবাদতকে উপেক্ষা করে তবে তার পক্ষে ইবাদতের পূর্ণ কামালিয়াত অর্জন কর সম্ভব নয়। যেমন ব্যক্তিগত মনবিক প্রয়োজন, পরিবার, সংসার ও জাগতিক সকল কিছু উপেক্ষা করে যদি কেউ শুধু আল্লাহ্র ধ্যানে ও চিন্তায় জীবন পরিচালনা করে সিদ্ধি লাভ করতে চায়, তাহলে সে বাস্তবতাকে চরমভাবে উপেক্ষা করল। অথচ আল্লাহ্ই মানুষকে নানা জৈবিক প্রয়োজন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রতি আল্লাহ্ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধাঁর মহিমান্বিত স্রষ্টার সকল গুণ ও শক্তির সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণ ও স্রষ্টার নির্দেশ মত হালাল-হারামের বিধান মান্য করে জীবন-যাপন, সর্বোপরি সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সব কাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই আল্লাহ্র হক। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক আচরণ করাই হুকুকুল ইবাদ। অতএব আল্লাহ্রই হুকুম পালন আর আল্লাহ্র হুকুম পালনের নামই ইবাদত।

মূলত হুকুকুল্লাহ্র দাবি শুধু একটিই আর হুকুকুল ইবাদত হল সুবিস্তৃত, সীমা-সংখ্যাহীন। হুকুকুল ইবাদ ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতা আসে না। একমাত্র আল্লাহ্কে স্মরণ করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনার্থে যদি আমরা সর্বপ্রকার মিথ্যা বলা, অশ্রাব্য-অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, পরনিন্দা-পরচর্চা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে সর্বদা সত্য কথা বলি, সুশ্রাব্য বাক্য ব্যবহার করি, অন্যের সাথে অসদাচরণ করি তবে তা অবশ্যই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে আমাদের চোখ, কান, হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যদি সর্বদা ইসলাম নির্দেশিত হালাল পন্থায় ব্যবহার করি তবে তার ইবাদতরূপে গণ্য হবে। শরীরের যেকোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ অন্যায় অবৈধভাবে ব্যবহার করলে যেমন পাপ হয়, বৈধ ও ইসলাম সম্মত হালাল পন্থায় ব্যবহার করলে তেমনি নেকী ও সওয়াবের প্রত্যাশা করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মিথ্যা বললে, অন্যের সাথে অসদাচরণ ও অন্যায় করলে যেমন গোনাহ হয়,সত্য বললে, সদাচরণ, সদালাপ ও পরোপকার করলে তেমনি সওয়াব হয়।

পার্থিব জীবনে আমাদের কায়-কারবার, লেন-দেন, বেচা-কেনা, আর্থিক আদান-প্রদান, সামাজিক আচরণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সঠিক ও সঙ্গতভাবে জীবন পরিচালনার নাম ইবাদত। বেচার সময় কম দেওয়া, কেনার সময় বেশি আনা, মালে ভেজাল মিশ্রিত করা, অতিরিক্ত মুনাফাখোরি, মওজুদদারি, ফটকা বাজারি, কালো বাজারি, ক্রয়-বিক্রয়ের মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে এ সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে সততা, ঈমানদারী ও আমাতদারীর সাথে ব্যবসা পরিচালনা করলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, অধীনস্থ লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়ানুগ আচরণের যে শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে তা যথাযথরূপে মেনে চললে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে যেমন শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, হুকুল ইবাদ হিসেবে তা যথার্থ ইবাদত হিসেবেও আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে এর বরখেলাফ হলে তার দ্বারা ইসলামের শিক্ষা বা আল্লাহ্র আদেশকে অমান্য করা হয়। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবেনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।"[১] বস্তুত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিচারপ্রার্থীকে ন্যায্য বিচার দিতে, রোগাগ্রস্তকে দেখা-শোনা করতে ও চিকিৎসা সেবা দিতে, মজলুমকে জালিমের অতাচার হতে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। এসব কিছু হুকুল ইবাদ বা বান্দার হক বা মানবতার সেবা।

---

১. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই' কিন্তু পূণ্য আছে কেহ যদি পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "এবং আল্লাহ্‌র-ইবাদত কর। কোন কিছুকে তাঁর শরীক বলে গণ্য করোনা। দয়াশীলতা দেখাও পিতা-মাতার প্রতি, তোমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি, অনাথদের প্রতি, অভাবীদের প্রতি, তোমার প্রতিবেশীর প্রতি, যে তোমার জ্ঞাতি অথবা যে তোমার জ্ঞাতি নয়, তোমার সহযাত্রীর প্রতি, মুসাফিরের প্রতি এবং তাদের প্রতি তোমার দক্ষিণ হাত যাদের ধারণ করেছে।"[২] "যারা এতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন, সে সকল উপাসনাকারী অভিসপ্ত।"[৩]

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমার যে উত্তম দ্রব্য উপার্জন কর তা হতে অপরের জন্য ব্যয় কর এবং আমরা জমি হতে যা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি তা হতে ব্যয় কর।"[৪]

ইবাদতের অর্থ তাই ব্যাপক ও গভীর। আমাদের চিন্তা, কর্ম, আচরণ, দায়িত্ব ইত্যাদি সবকিছু যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে ও তাঁর রাসূলের (স.) সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত হয় তখনই তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয়। এর বিপরীতটাকে বলা হয় 'নাফসানিয়াত' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইবাদাত আমাদের দেহ-মনে আনে শান্তি ও পারলৌকিক জীবনে-আনে সাফল্য।

ইসলামের মত-সমাজকল্যাণও বিশ্বাস করে যে, সমাজের প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সমাজবদ্ধ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমবেত দায়িত্ব পালন বা প্রচেষ্টাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। তাই সামাজিক দায়িত্ব ইসলাম ও সমাজকল্যাণে সমভাবে স্বীকৃত মূল্যবোধ।

সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) :

সমাজকল্যাণের মতে, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য। সমাজকল্যাণ সম্পদের সুষমবণ্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এটি সাম্য ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল-দূর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ইসলাম যে সুবিচারনীতি উপস্থাপন করেছে তা সকল মানুষের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয় তা বংশের দিক দিয়েই হোক আর বর্ণ, ভাষা ও সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই হোক। এমনকি আকীদা, বিশ্বাস, আত্মীয়তা, নৈকট্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদির কারণেও আইন প্রয়োগে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-"তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচারকার্য করবে, তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে।"[৫] "হে ঈমানদারগণ! ন্যায়বিচারে তোমরা অটল থাকবে, আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীরূপে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের প্রতিকূলে যায় অথবা পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের (প্রতিকূলে যায়)। সে ধনী অথবা গরীব হোক, আল্লাহই উভয়ের জন্য উত্তম অভিভাবক।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৭৭
২. আল-কুরআন, ৬ ঃ ৩৬
৩. আল-কুরআন, ১০৭ ঃ ২-৪
৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬৭
৫. আল-কুরআন, ৪:৫৮
৬. আল-কুরআন, ৪:১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের বাণীতে বলেন, "অনারবের উপর একজন আরবের কোন কর্তৃত্বই নেই, যেমনি নেই একজন আরবের উপর আরেকজন আরবের। মাটির তৈরি আদমের পরবর্তী বংশধর হল মানুষ।" তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বিশেষ সুযোগের প্রতিটি দাবি-তা রক্তের হোক আর সম্পত্তির হোক সেদিন থেকে তাঁর পদতলে। রসূল (স.) কখনও নিজেকে আইনের উর্দ্ধে বিবেচনা করেন নি। কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তিনি আর সকলের মতই মানুষ। ব্যতিক্রমটা হল, তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসে। তিনি সামাজিক আচরণেও কখনই কোন বৈশিষ্ট্যের দাবি করেন নি।[১]

মহানবী (স.) ও তাঁর খলিফাগণ ছিলেন আল্লাহর এ নির্দেশ বাস্তবায়নের আদর্শ মূর্তপ্রতীক। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে। তাইমা ইবন উবাইরাক নামেমাত্র একজন মুসলমান (প্রকৃত পক্ষে সে ছিল কপট) বর্ম চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলে, সে বর্মটি একজন ইহুদীর বাড়ীতে পুতে রাখে। ইহুদীর বাড়ী থেকে তা উদ্ধার করা হলে ইহুদী অভিযোগ অস্বীকার করে এবং তাইমার উপর দোষ চাপায়। একজন মুসলমান হিসেবে সকল মুসলমানের সহানুভূতি ছিল তাইমার পক্ষে। মহানবী (স.) মামলাটি নিজের হাতে নিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক বিচার করে ইহুদিকে মুক্তি দান করলেন।[২] বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে মহানবী (স.) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের জন্য ব্যাপারটা বড়ই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। তাই তারা নবীর প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদকে তাঁর নিকট পাঠালেন সুপারিশের জন্য। মহানবী (স.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সবাইকে জমায়েত করে তিনি একটা জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রদান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দূর্বল শ্রেণীভুক্ত কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ, চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।"[৩]

একবার উবাই বিন কাব যাইদ বিন সাবিতের আদালতে খলিফা উমরের (রা.) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। উমর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত। যায়িদ তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিচারকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং খলিফাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এতে খলিফা তাকে বললেন, "আদালতে আসামীর প্রতি এ সম্মান দেখানোই আপনার প্রথম অবিচার। কথাটি বলে তিনি উবায়ের পাশে উপবেশন করলেন। উমর অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কিন্তু উবায়ের হাতে কোন প্রমাণ না থাকায় তিনি উমরকে শপথ করার আহবান জানান। উমরের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিচারক যায়িদ উবায়কে শপথের দাবী প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। উমর এই পক্ষপাতিত্বে রুষ্ট হয়ে যায়িদকে বললেন, "আপনার চোখে যদি উমর আর অন্যলোক সমান না হয়, তাহলে আপনি বিচারকের পদের জন্য উপযুক্ত নন।" কাযীর বিচারে যথোপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় উমর (রা.) তাঁর নিজের ছেলেকে দ্বিতীয়বারের মত বেত্রাঘাত করলেন। ছেলেটি মারা গেল। মিসরের গর্ভনর আমর বিন আসের পুত্র একজন আদি মিশরীয়কে কোন বিচার ছাড়াই প্রহার করলে উমর পিতা-পুত্র উভয়কে ডেকে পাঠালেন এবং মিসরীয়কে তার উপস্থিতিতে অনুরূপভাবে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। আমরের পুত্রকে অনরূপভাবে প্রহার করা হল এবং আমর মিসরীয়টির ক্ষমার ফলে উমরের বেত্রাঘাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন।

আরবের ঘাসওয়ানের রাজা যুবালা বিন আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করার পর সদল বলে খলিফা উমরের সাথে সাক্ষাত করেন। একদিন তিনি যখন কাবায় হজ্জ করতে গেলেন তখন একজন বেদুঈন তার পোশাকে অসতর্ক অবস্থায় ময়লা লাগালে তিনি বেদুঈনকে আঘাত করলেন। বেদুঈন উমরের (রা.) নিকট অভিযোগ করলে তিনি যুবালাকে বললেন "যদি আপনি বেদুঈনের নিকট থেকে প্রত্যাঘাত আশা না করেন তাহলে আপনি তার ক্ষতিপূরণ দিন।" "আপনি কি রাজন্য ব্যক্তি আর সাধারণ লোককে পার্থক্যের চোখে দেখেন না?" যুবালা জিজ্ঞাসা করল। উমর উত্তর দিলেন, "না, ইসলামের সামনে সবাই সমান।" উমরের নিকট হতে ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে রাতে তিনি পালিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন।"[৪]

---

১. তায়সিরুল উসুল, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪
২. এ্যাড. মুজিবুর রহমান, 'ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব', শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন-৯১, বাংলাদেশ- সৌদীআরব ভ্রাতৃ সমিতি ঢাকা, পৃ. ১৪১
৩. ড. মুসতাফা আসসিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪. Dr. Ahmed Gamil Mazzara, Islam Democracty and Socialism, Islamic Revew, April-1962, P.8.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী (রা.) এক সময় তাঁর একটি বর্ম হারিয়ে ফেললেন। আর তা উদ্ধার হল এক ইহুদীর নিকট থেকে। আলী নিজের হাতে আইন তুলে না নিয়ে মামলাটি কাযীর নিকট অর্পন করলেন। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশয়ের কারণে নিস্কৃতি দিলেন, যেহেতু আলী তাঁর একপুত্র হাসান ও ভৃত্যকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করলেন। হযরত আলী (রা.) মিসরের গভর্নর মালিক ইবনে হারিসকে লেখা একটি চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্দ্ধে থেকে নির্ভয়ে ও কারোর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।"[১]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রা.) একজন গভর্ণর আবু মুসা আল-আশআরী (রা.)। তাঁর নিকট প্রেরিত বিচার প্রশাসন সম্পর্কিত তাঁর (হযরত ওমর (রা.) চিঠিখানি ইসলামে আইনের শাসন ও আইনের চোখে সকলের সমতার আরেকটি প্রমাণ। চিঠির বক্তব্য: "সবার সাথে এমনভাবে বিচার কর যাতে বড়লোক ও শক্তিশালীরা তোমার বিচার হতে নির্ভিক না হয় এবং দরিদ্র ও দুর্বলেরাও তোমার কাছে বিচার প্রার্থী হতে ভীত না হয়।"[২] এজন্য হযরত ওমর (রা.) হজ্বের সময় সমবেত জনতার সামনে তার শাসনকর্তাদের (গভর্ণর) উপস্থিত করতেন এবং লোকদের সামনে ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করতেন: "হে জনতা! এরা সরকারী ভান্ডার থেকে জাতীয় সম্পদ প্রয়োজন মত তোমাদের মাঝে বন্টন করবে। এদের কেউ যদি এর বিপরীত কিছু করতে থাকে তাহলে এই জনসমাবেশে তার বিরুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ কর।"[৩] ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও পূর্ণমাত্রায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করেছে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনজ্ঞদের সূত্র হল, "আমাদের জন্যেও যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব, তাদের উপরও তাই।"[৪] হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "অমুসলিম নাগরিকগণ জিজিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতই সংরক্ষিত হবে।"[৫]

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে এক খ্রীস্টান উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে খলিফা হিশামের বিরুদ্ধে "সমন" জারি করে। আদালতে হাজির হলে তাকে খ্রীষ্টানের সাথে একই পর্যায়ের দাঁড় করানো হয়।"[৬] ইসলামী আইনের চোখে খলিফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্যের প্রশ্রয় দেয়া হত না। হেরা অঞ্চলের এক মুসলমান একজন অমুসলিমকে খুন করে বসল। তিনি মুসলিম খুনিকে বন্দী করে বিচারের জন্য অমুলিমদের নিকট হস্তান্তর করলেন। ইসলামী আইন কিসাসের রীতি অনুযায়ী খুনিকে সমতার আইনে খুন করা হল।"[৭] কয়েক জন উট মালিকের ঘটনায় মদীনার কাযীর আহবানে আব্বাসীয় খলিফা মনসুর স্বশরীরে উপস্থিত হলেন এবং কাযীর সামনে একজন সাধারণ বিবাদীর বেশে দাঁড়ালেন। কাযী খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাতে এমনকি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না। বাদীর পক্ষে মামলার রায় হল। সঠিক ও উপযুক্ত বিচারের জন্য মনসুর পরবর্তীতে কাযীকে উপটৌকন দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বীকৃতি দিলেন।[৮]

মুসলিম শাসকগণ সকলকে সাম্যের ভিত্তিতে একই কাতারে রেখে বিচার ফয়সালা করতেন। এমনকি মহানবী (স.) খুলাফা-এ-রাশেদীনের এক হাজার বছর পরেও আইনের চোখে সমতার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ অনেক ঘটনাই রয়েছে। শেরশাহের পুত্র আদিল খাঁ নদীতে স্নানরতা এক মহিলার দিকে পান পাতার বিড়া ছুঁড়ে মেরেছিল। মহিলা ক্ষিপ্ত হল তার স্বামী শেরশাহের নিকট অভিযোগ করলে তিনি আদেশ দিলেন যে, অভিযোগকারী ও রাজপুত্র আদিল খানের স্ত্রীর দিকে অনুরূপ পানের বিড়া ছুঁড়ে মারবেন; যেহেতু এটাই হচ্ছে ইসলামী বিধানের প্রতিশোধমূলক নীতি।[৯]

---

১. হযরত আলী (রা.), প্রশাসনিক চিঠি (অনু. খুরশিদ আহম্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ.৭
২. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল-ফারুক (অনু. জাফর আলী খান), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬
৩. মুহাম্মদ ইবন সায়াদ, আততাবাকাত, দারুল ইয়াহইয়া, বৈরুত, লেবানন-১৯৯৬, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮৩
৪. ড. আব্দুল করিম জায়দান, (অনু. মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম), ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ. ৮২
৫. হযরত আলী (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৬. মাও. একে আজাদ, (অনু. প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম), আদর্শ খেলাফতের নমূনা, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ঢাকা. পৃ. ৩০২
৭. মাও. একে আজাদ, (অনু. প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম), আদর্শ খেলাফতের নমূনা, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ঢাকা. পৃ. ৩০২
৮. এ্যাড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৯. এ্যাড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বতুতা তুঘলকের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একদিন একজন হিন্দু প্রজা আদালতে স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, সুলতান তাঁর পুত্রকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছেন। বিচারক আসামী হিসেবে দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ তুঘলককে আদালতে হাজির হতে তলব করেন। বিচারে স্বয়ং সম্রাটের অপরাধ প্রমাণিত হয়। অতপর অভিযোগকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এ বিচার অবনত মস্তকে মেনে নেন।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একই সাথে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তথা সামগ্রিক সমাজকল্যাণের স্বার্থে কাজ করে থাকে। ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সমাজকল্যাণের মূল্যবোধসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এথেকে ধারণা করা যায় যে, সমাজকল্যাণের মূল্যবোধসমূহ ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

ইসলাম ধর্মে দরিদ্র ও আর্তদের সেবাছায়া দান, সমভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলের সমঅধিকার দান ও ভোগ করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পালনের জোরালো নির্দেশনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইসলাম সেবার ধর্ম হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদা পায়। ইসলামী অনুপ্রেরণায় নিবেদিত পীর, ফকির, সমাজ সংস্কারক ও সমাজসেবকগণ এ দেশের ইতিহাসে ও সমাজকর্মের এক যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে লঙ্গরখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতালসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানিক সেবা, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম লগ্নে এগুলো জনকল্যাণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল। এখনও ইসলামের ভাবাদর্শ ও অনুপ্রেরণায় ওফাকফ, যাকাত, দানশীলতা ও মানবপ্রেম সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের এক উল্লেখযোগ্য অংশের পরিচয় বাহক।[২]

তাই পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামের মূল্যবোধসমূহ আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশ ও উন্নয়নের বহুপূর্ব হতে সমাজে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এসকল মূল্যবোধের বাস্তবতা ও কার্যকারিতা লক্ষ্য করেই আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই রেজাউল করিম যথার্থই বলেছেন, "ইসলাম ধর্ম এমন এক আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও সমাজ উপযোগী, মানবকল্যাণমুখী, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী ধর্ম, যা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী জীবন বিধান ভিত্তিক। ইসলাম সৃষ্টিকর্তাকেন্দ্রিক ধর্ম হলেও শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং কুরআন ও হাদিসভিত্তিক উপায়ে সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ মহান আল্লাহর নির্দেশিত অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিধি-বিধান অনুসরণও বাধ্যতামূলক। ইসলামী রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং মূল্যবোধের পরিপূর্ণ অনুসরণ যে কোনো সমাজকে কল্যাণময়, সুশৃঙ্খল, শান্তিময় ও উন্নয়নমুখী করতে পারে। সুতরাং একটি পূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে (as a complete code of life) ইসলাম ধর্ম সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের দর্শনকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে।"[৩]

---

১. মাও. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২. M.J. Gazder, Charities their past, Present and future in socialwelfare in India, Planning comission of India, ঘর্ষ উনমঘর. ১৯৫৫, চ.১৮৯

৩. রেজাউল করিম, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা-২০০১, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠান

ক) বায়তুলমাল-

* বায়তুলমাল পরিচিতি
* বায়তুলমালের সূচনা
* বায়তুলমালের উৎস ও প্রকার
* সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমালের বৈশিষ্ট্য ও অবদান

খ) ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা-

* যাকাত পরিচিতি
* যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ
* বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের নিসাব
* যে সকল সম্পদে যাকাত নেই
* কাদের উপর যাকাত ফরজ?
* বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত
* যাকাতের ব্যয় খাতসমূহ
* যেসব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে?
* যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য
* সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব
* বাংলাদেশে যাকাতের ব্যবহার ও কার্যকারিতা
* বাংলাদেশে যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা
* বাংলাদেশে যাকাত ভিত্তিক সমাজকল্যাণ

গ) ইসলামে ওশর ব্যবস্থা-

* ওশর পরিচিতি
* ওশরী ও খারাজী জমি
* ওশর ফরজ হওয়ার শর্তাবলী
* ওশর ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত
* ওশরী ফসল
* ওশরের নিসাব বা পরিমাণ
* সরকারী খাজনা ও ওশর
* সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে ওশরের গুরুত্ব
* বাংলাদেশের জমি ওশরী কিনা
* বাংলাদেশের জমি, ফসল ও ওশর

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) ইসলামে খারাজ ব্যবস্থা-
* খারাজ কি?
* খারাজের সূচনা ও তাৎপর্য

ঙ) ইসলামে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা-
* ওয়াক্ফ পরিচিতি
* ইসলামে ওয়াক্ফ নীতিমালা
* ওয়াকফের শর্তসমূহ
* ওয়াকফের বিষয়বস্তু
* ওয়াকফ করার নিয়ম
* কিভাবে ওয়াকফ সম্পূর্ণ হয়?
* ওয়াক্ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্ত সাপেক্ষ ওয়াক্ফ
* ওয়াকফের উদ্দেশ্যাবলী
* অবৈধ উদ্দেশ্য
* ওয়াকফের প্রকারভেদ
* মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি
* সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াকফের বিবর্তন ও তাৎপর্য
* বাংলাদেশে ওয়াকফ ও সমাজকল্যাণে এর অবদান
* ওয়াকফের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
* বাংলাদেশে ওয়াকফের সম্ভাবনা

চ) সাদাকা বা দানশীলতা-
* সাদাকা বা দান প্রথা পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
* সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে সাদাকার তাৎপর্য

ছ) সাদাকাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়া-
* সাদাকাতুল ফিতর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
* কুরবানীর চামড়ার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন
* সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে এর মূল্যায়ন

জ) করযে হাসানা

ঝ) মালে গানীমাহ

ঞ) খুমুস

ট) আলফাই

ঠ) জিযিয়া

ড) ইসলামে সর্বগ্রাসী সুদপ্রথার উচ্ছেদ-
* সুদ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত
* সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী
* সুদ সম্পর্কে হাদীস
* অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি :

ইসলাম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে। ইসলামের সামাজিক-অর্থনৈতিক দর্শন সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা ও নির্ভরযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তবমুখী সামাজিক-অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবসময় গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলামের এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকলকে সুখ ও সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপনে সহায়তা করা, গঠনমূলক ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং সামাজিক অগ্রগতিতে বাস্তবমুখী অবদান রাখা। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে সাথে ইসলাম কতিপয় কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ইসলামের বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণের ক্ষেত্র তৈরী ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম মানব সমাজের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করেই খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: বায়তুলমাল, যাকাত, ওশর, খারাজ, ওয়াক্‌ফ, সাদাকা বা দান, সাদাকাতুল ফিত্‌র ও কুরবাণীর চামড়া, করযে হাসানা, গণিমত, খুমুস, ফাই ও জিযিয়া। ইসলামের এ সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে কতটা অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা পর্যালোচনা করা হবে।

বায়তুলমাল (Baitul Mal)

সংজ্ঞা ও পরিচিতি :

ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল বায়তুলমাল ব্যবস্থা। 'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত রাষ্ট্রীয় কোষাগার (Public Treasury) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়তুলমালের বুৎপত্তিগত অর্থ-ধনাগার, কোষাগার, মাল বা সম্পদের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। বায়তুলমালকে সমগ্র মুসলমানের সাধারণ সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বায়তুলমালের সম্পত্তি মুসলিম জনসাধারণেরই সম্পত্তি।"[১] মদীনা রাষ্ট্রের যে অর্থ প্রশাসন ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু হল বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নবী করীম (স.) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভান্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভান্ডারের নিরাপদ স্থানটিকে বায়তুলমাল বলা হয়। অবশ্য কোন কোন সময় ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা অর্থব্যবস্থাকেও বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। তবে পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থভান্ডারের নিরাপদ স্থানটিকে বায়তুলমাল বলা হয়।[২] বায়তুলমাল ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। মদীনা রাষ্ট্রের বায়তুলমাল জনকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য গঠিত হয়েছিল।[৩]

বায়তুলমালের সূচনা :

যে সকল রূপক অর্থে বায়তুলমালকে ব্যবহার করা হয় সে সব অর্থ অনুযায়ী নবী করীম (স.)-এর যুগেই বায়তুলমালের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (স.) এর যুগে বাহরাইন, ইয়েমেন এবং আম্মান থেকে জিযিয়া, খিরাজ প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ আদায় করা হত সেগুলো কোন কোষাগারে না রেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। প্রাথমিকভাবে মসজিদকে কেন্দ্র করে বায়তুলমাল পরিচালিত হত। পরবর্তীকালে আলাদা জায়গায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সম্পদ (গাণীমাত) মুসলিম সৈন্যবাহিনীর হস্তগত হত সেগুলোকে একত্রিত করে এক-পঞ্চমাংশ নবী করীম (স.) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী বন্টন করে দিতেন। এক-পঞ্চমাংশ যা বায়তুলমালে জমা হত তা তিন প্রকারে ব্যবহৃত হত। এক অংশ নবী করীম (স.)-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকত, অপর এক অংশ তাঁর আত্মীয় ও পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট থাকত এবং অবশিষ্ট এক অংশ বায়তুলমালে জমা থাকত। নবী করীম (স.)-এর অংশ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হত এবং বায়তুলমালের অংশ দীন-দুঃখী, অনাথদের জন্য ব্যয় করা হত।[৪]

---

১. আল-হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১
২. মাও. মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. সাইয়েদ হাসান মুসান্না (অনূ. মাও. শফিউদ্দীন), ইসলামী সমাজব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০, পৃ.৪৩
৪. মুহাম্মদ মুদ্দাসির হোসেন (সম্পা.), মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, ১ম খন্ড, রাজশাহী, ১৯৭৯, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সর্বপ্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং হযরত আবু ওবাদা (রা.)কে তার ব্যবস্থাপক (মুহ্তামিম) নিযুক্ত করেন। কিন্তু যে ধন-সম্পদই তাঁর কাছে আসত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুসলমানদের কল্যাণার্থে ব্যয় করে ফেলতেন। এ কারণেই তখনকার বায়তুলমালের দরজা সব সময় তালাবদ্ধ থাকত। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর যখন হযরত উমর (রা.) কয়েকজন সাহাবীর সাহায্যে বায়তুলমালের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করেন তখন তিনি তা একেবারেই শূন্য দেখতে পান।[১]

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন মিসর এবং ইরাক থেকে খিরাজ প্রভৃতি আসতে থাকে তখন তিনি আল ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শক্রমে সর্বপ্রথম মদীনার বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রদেশগুলোতেও যথারীতি বায়তুলমাল এবং তার শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করে আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে কোষাধ্যক্ষ (আমীর খাযানা) নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন সাহাবীকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। বায়তুলমালগুলোর জন্য যথারীতি 'রেজিষ্ট্রার' এবং 'দিওয়ান' প্রণয়ন করা হয়। অবশ্য কোন কোন বায়তুলমালে কি পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত থাকত তা বলা কষ্টসাধ্য। ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর মতে, রাজধানীর ' বায়তুলমাল' থেকে শুধুমাত্র রাজধানীর বাসিন্দাদের বেতন, অযিফা প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হত, তার সর্বমোট পরিমাণ ছিল বছরে তিন কোটি দিরহাম।[২]

উমাইয়া খলিফাগণ ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। খলিফা হযরত উসমান (রা.) দান, উপহার ও বিশেষ সুবিধা দানের মাধ্যমে বিত্ত ও মর্যাদার দিক দিয়ে উমাইয়া গোষ্ঠীকে সমাজের উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি উমাইয়া বংশের খলিফাগণ বায়তুলমালের অর্থ ও যথেচ্ছা খরচ বা দান করতেন।[৩]

বায়তুলমালের উৎস :

যে সব খাত হতে সম্পদ বায়তুলমালে জমা হত সেগুলো হচ্ছে[৪] (ক) মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব ও খনিজ সম্পদের রয়ালটি (খ) বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, গণিমাতের মাল, অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা (গ) দেশের সমষ্টিগত প্রয়োজন পুরণের জন্য আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ (ঘ) মালিক বা উত্তরাধিকারবিহীন ধন-সম্পত্তি (ঙ) অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর ইত্যাদি। সে যুগে তিন ধরনের বায়তুলমাল প্রচলিত ছিল। যেমন-

বায়তুলমাল আল খাসঃ

বস্তুত বায়তুলমাল আল খাসই ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা খলিফার খাস তহবিল। এ তহবিলে আয়-ব্যয়ের স্বতন্ত্র উৎস ও খাত নির্ধারিত থাকত। খলিফার ব্যক্তিগত ব্যয়, রাজপরিবারের সদস্য ও প্রাসাদরক্ষীদের পেনশন ও ভাতা এবং খলিফার পক্ষ থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রদত্ত উপহার উপঢৌকনের ব্যয় এ তহবিল থেকে নির্বাহ করা হত।[৫]

বায়তুলমাল :

বায়তুলমালই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্বরূপ। সেকালে রাষ্ট্রব্যবস্থা যেহেতু কেন্দ্রভিত্তিক ছিল, সেহেতু প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের দায়িত্ব যথাক্রমে স্ব-স্ব সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যক্তির হাতেই ন্যাস্ত থাকত। এভাবে প্রাদেশিক বায়তুলমালের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রাদেশিক গভর্ণরের উপর ন্যাস্ত করা হত। তিনি রাজস্ব আদায় ও তা ব্যয় করতেন। এই বায়তুলমাল প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থাপন করা হত। কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল দেশের কেন্দ্রীয় রাজধানীতে থাকত এবং খলিফা স্বয়ং এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন।[৬]

বায়তুলমাল আল মুসলিমীন :

জনগণের দ্বিতীয় কোষাগারকে বলা হত বায়তুলমাল আল-মুসলিমীন বা মুসলমানদের কোষাগার। বস্তুতঃ নামের সাথে মুসলিম শব্দ থাকলেও কেবল মুসলিমদের জন্যই এ তহবিল নির্ধারিত ছিল না, বরং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কল্যাণার্থে এ তহবিল ব্যয় করা হত। এ তহবিলের অর্থ দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, মসজিদ ও গীর্জা নির্মাণ এবং দরিদ্র জনগণের কল্যাণসাধন ও তাদেরকে ভাতা প্রদান করা হত।[৭]

---

১. সাইয়ুতী, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২০
২. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৫
৩. আল-জাহশীয়ারী, কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব, কায়রো, ১৯৩৮, ৩য় খন্ড, পৃ. ১১০
৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৬৬-২৮৬
৫. ড. এম.এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ১৫৭
৬. ড. এম.এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৭. ড. এম.এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমালের বৈশিষ্ট্য ও অবদান :

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় সম্পদে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সমান অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ, বায়তুলমালের উপর কারোরই একচেটিয়া অধিকার ছিল না। এদিকে ইঙ্গিত করেই নবী করীম (স.) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে দানও করি না, নিষেধও করি না, আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে থাকি।"[১]

রাষ্ট্রের বায়তুলমালের সহায় সম্পদ সবই জনগণের আমানত। ইসলামের বিধি মুতাবিক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে। কোন প্রকার অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বেইনসাফী করা চলবে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, "আল্লাহর নামে শপথ! এ রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ অপর কারও অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবী করতে পারে না। আমি নিজেও অধিক অধিকারের দাবিদার নই। আল্লাহর শপথ! প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এ সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।" "গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে একজোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্য। এছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।"[২]

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন,"এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করি না। ন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হবে, ন্যায় মুতাবিক প্রদান করা হবে এবং বাতিল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। ইয়াতিমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। অভাবী হলে মা'রুফ বা ন্যায়পন্থায় গ্রহণ করব।"[৩]

বস্তুত ইসলাম বায়তুলমালের ধারণা অতি ব্যাপক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের মৌলিক বিশ্বাসের উপরই বায়তুলমালের ধারণা ভিত্তিশীল। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বরূপ। তদানীন্তন সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুলমালই পূরণ করত। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন একজন লোকও যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে বঞ্চিত না হয়, তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। রাষ্ট্রের মধ্যে দু:স্থ, গরীব, বৃদ্ধ পঙ্গু, আশ্রয়হীন ও অসহায় প্রমুখদের আর্থিক ও বৈষয়িক সহায়তা দান বা সুদবিহীন ঋণ দানে বায়তুলমাল কাজ করে। যাকাত গ্রহীতা নির্ধারিত আট ধরণের মানুষের চাহিদা যখন যাকাতের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা, তখনই বায়তুলমালের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বায়তুলমাল গঠিত হত প্রধানত যাকাত ও রাষ্ট্রীয় উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে। তাছাড়া জনগণের দান, সাদকা, গণিমাত (শত্রু সম্পত্তি) ইত্যাদির অর্থও বায়তুলমালে জমা রাখা হত।[৪] খলিফা মজলিস-এ-শূরার পরামর্শক্রমে বায়তুলমালের অর্থ বা সম্পদ জনগণের বিতরণের ব্যবস্থা করতেন।

শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিমদেরও বায়তুলমাল হতে দান করা হত। যে সকল অমুসলিম নাগরিক জীবিকা উপার্জনে অক্ষম, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় ধনভান্ডার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি দানের ব্যবস্থার নীতি খলিফা চতুষ্টয় বাস্তবায়ন করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) জনৈক বৃদ্ধ ইহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং সাময়িকভাবে তাকে কিছু দান করেন। তারপর রাষ্ট্রীয় ধনভান্ডার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন, "এ ব্যক্তির মত অপর ব্যক্তিদের জন্য বায়তুলমাল হতে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দাও। এদের যৌবনে এদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়েছে। তাদের বার্ধক্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেয়া অবিচার ছাড়া কিছু নয়।"[৫]

কুফার শাসনকর্তা মাদরুযবান নামক জনৈক অমুসলিম কারিগর দ্বারা কুফার বায়তুলমাল পূণনির্মাণ করান। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে খলিফা উমর (রা.) এর নিকট পাঠান। খলিফা বায়তুলমাল হতে তার জন্য আজীবন বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন। আরেকবার হযরত উমর (রা.) জাবিয়া গমনকালে পথিমধ্যে কিছু সংখ্যক খ্রীস্টান কুষ্ঠরোগীকে দেখতে পেয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে এদের জন্য বায়তুলমাল হতে বৃত্তি প্রদান করার আদেশ দান করেন।[৬]

---

১. উদ্বৃত. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০
২. ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৩৪
৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৭
৪. রুবেন লেভী, সোস্যাল ষ্টাকচার অব ইসলাম (অনু. ড. গোলাম রসুল), মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৯-২৯০
৫. উদ্বৃত. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৬. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

বায়তুলমাল ইসলামের একটি বিশিষ্ট্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মেটানোর পর যে অর্থ বায়তুলমালে উদ্বৃত থাকত, তা থেকে সমাজের দু:স্থ গরীব, অসহায় ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করা হত। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে সর্বপ্রথম জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তাতে জনকল্যাণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। সে কারণে বায়তুলমালকে সরকারী সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১]

সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের চাকুরির জামানতে বায়তুলমাল হতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারত। বস্তুত: ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। জনগণের নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য যেমন বিনা সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হত, তেমনি উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যও খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে বায়তুলমাল হতে উৎপাদন ঋণ দেয়া হত।[২] সে আমলে বায়তুলমাল একদিকে যেমন দু:স্থ, অসহায়, অক্ষম দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী বায়তুলমালের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগেও বায়তুলমাল গড়ে উঠতে দেখা যায়। সরকারী বায়তুলমাল যে ধরণের কাজ করত, বেসরকারী বায়তুলমালও সে ধরণের কাজ করত। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের কল্যাণ সাধনের অনবদ্য উদাহরণ হল বায়তুলমাল। সমাজকল্যাণের ইতিহাসে বায়তুল এক অভাবিত স্থান দখল করে আছে। এর মাধ্যমেই মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। তাই একে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩] বিশ্বের সকল দরিদ্র আইন এবং নিরাপত্তা কর্মসূচীর পথ প্রদর্শক এবং ভিত্তি হল বায়তুলমাল। বায়তুলমালের আদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতেই বিশ্বের সবদেশে জনকল্যাণ বিভাগগুলো পুরোটাই বায়তুলমাল ব্যবস্থার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৪]

খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে বায়তুলমালের প্রবর্তন সরকারীভাবে হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে বেসরকারী পর্যায়েও বায়তুলমাল সংগঠন ও পরিচালনা করা হয়। বর্তমানেও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। মুসলিম অধূষিত দেশে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে বায়তুলমালের সাহায্য গ্রহণ দরকার। ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে না উঠলেও এসব দেশে বেসরকারী বায়তুলমাল সংগঠনে মনোযোগী হওয়া যায়। কেননা, এসব দেশের ছিন্নমূল, দু:স্থ ও অসহায় মানুষের আর্থিক অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগময় অবস্থায় বায়তুলমাল গঠন করে কার্যকর নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। আধুনিক সুসংগঠিত সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হওয়ার প্রথম লগ্ন থেকে প্রাক শিল্পযুগের সনাতন সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা হিসেবে বায়তুলমালের সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আসছে। সনাতন সমাজসেবামূলক তৎপরতার মধ্যে বায়তুলমালই অধিকতর সংগঠিত ও ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। পেশাদার সমাজকর্মের সহায়তায় একে আরও কার্যকরভাবে বৃহত্তর সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালনা করা যায়। তাতে জনকল্যাণের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা আরও অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।[৫]

আমাদের দেশে বর্তমানে বায়তুলমাল ব্যবস্থা চালু নেই। অথচ বাংলাদেশের সমাজ জীবনেও বায়তুলমাল তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে চাহিদা পূরণ এবং ঋণ সমস্যা-সমাধানে বায়তুলমাল ব্যবস্থা হবে অতুলনীয়। দেশের ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী ব্যক্তিরা প্রতি বছর সাদকাহ, যাকাত, ফিতরা, দান-খয়রাত, কুরবাণীর চামড়া ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে দান করে থাকেন। অপরিকল্পিত এ দান-খয়রাত সমাজের মানুষের স্থায়ী কল্যাণের চেয়ে তাদেরকে পরনির্ভর ও ভিক্ষুকে পরিণত করছে। এসব অর্থ সংগ্রহ করে বায়তুলমালের ন্যায় তহবিল সৃষ্টি করা গেলে ভিক্ষুক, দু:স্থ, ইয়াতিম ও অসহায় মানুষের সাহায্য দান করা যায়। বায়তুলমালের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব। এজন্য সরকারী কিংবা বেসরকারী পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উদ্যোগ আবশ্যক।

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেন্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ.৮৭
২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, তারিখে তাবারী, পৃ. ২৭৬৬, ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৬৪, C.L.Swaterch, What is Mutuelism, P.64.
৩. আব্দুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
৪. মো: আতিকুর রহমান, স্নাতক সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল ঢাকা-১৯৯৯, পৃ.১৩১
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা

যাকাত পরিচিত :

যাকাত হল মহানবী (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এর অনুকরণেই পরবর্তীকালে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধায়ক কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়।[১] তাই সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। যাকাত যাকাতদাতাকে পাপ ও কৃপণতা হতে পবিত্র করে। ধনের কিয়দংশ দ্বারা অবশিষ্ট ধন পবিত্র হয়। তাই মহানবীকে (স.) সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেন, "তাদের ধন হতে সাদাকাহ (যাকাত) আদায় কর; এব দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দেবে।"[২] যাকাতের ফলস্বরূপ ধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে উল্লেখ আছে, "তোমদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দান করে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।"[৩] এতে বুঝা যায় যে, যাকাতই ধনের প্রাচুর্য ও বৃদ্ধির কারণ এবং তদুপরি যাকাত প্রদানে মানুষ আত্মশুদ্ধি লাভ করে। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ধনের যে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানবের উপর অবশ্য কর্তব্য (ফরয) করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে।[৪]

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়- "ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ কারও নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করার প্রথাকেই যাকাত বলা হয়।"[৫] অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকে যাকাত বলে। এটা ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। হাদীস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ একবছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরয হয় না।

যাকাত ইলামের পাঁচটি বুনিয়াদের অন্যতম। ইসলামে সালাত বা নামাযের পরেই যাকাতের স্থান। কেননা, আল-কুরআনে বহু আয়াতে নামায ও যাকাতের কথা একই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে, "আর নিয়মিত নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় কর এবং প্রণতিকারীদের সাথে প্রণতি জানাও।" "নামায রীতিমত পালন করতে থাক এবং যাকাত প্রদান করতে থাক এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে উত্তমরূপে করজ প্রদান কর।"[৬]

যাকাত দরিদ্রের প্রতি ধনীদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত অনুগ্রহ নয়। এটা আবশ্যিক দরিদ্র কর। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য ও একটি ইবাদত, মানুষকে পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর দ্বারা দ্বিবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। প্রথমতঃ যাকাত প্রদান করে যাকাত আদায়কারী পাপ, ধনলিপ্সা এবং ধনের প্রতি আসক্তি হতে উদ্ভুত চারিত্রিক রোগসমূহের দোষ হতে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ দীন-দরিদ্র, অনাথ, শিশু, বিধবা নারী, বিকলাঙ্গ; উপার্জনে অক্ষম নারী-পুরুষ, ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি যারা জীবন ধারণোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে অসমর্থ, জাতির এমন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা তদ্দারা লালিত-পালিত হয়ে থাকে। যাকাতদাতার কল্যাণ সাধনই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল আনুষাঙ্গিকভাবেই সাধিত হয়ে থাকে। এ জন্যই কোন স্থানে, কোন সময়ে অনাথ, বিধবা, ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি না থাকলেও ধনীদের প্রতি যাকাত প্রদানের আদেশ সমভাবে বলবৎ থাকবে।[৭]

যাকাতের নিসাব (পরিমাণ) :

নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ অথবা অর্থের অধিকারী হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয় এবং যা অপেক্ষা কম হলে যাকাত ফযর হয় না, ঐ পরিমাণ সম্পদকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।[৮] যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয় সে ব্যক্তিকে ফিকহ এর পরিভাষায় 'সাহেব-এ-নিসাব' বা যাকাতদাতা বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ বা নগদ টাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব।[৯] এ পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট পূর্ণ এক বছর থাকলে সে সব সম্পদের $\frac{১}{৪০}$ অংশ যাকাত প্রদান করা ফরয। নিসাবের কম হলে এবং এক বছর পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হয় না।

---

১. আব্দুস সামাদ, আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুঁথিঘর, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ১১৩
২. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩
৩. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯
৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪৫
৫. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ২৫২
৬. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০
৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪৫
৮. মুয়াত্তা হতে উদ্ধৃত : মাও. মুনতাছির আহমাদ রহমানী, যাকাত দর্পন, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৯
৯. ড. এম, এ, মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ২১০

বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের নিসাব

স্বর্ণ ও রৌপ্য :

খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের হোক বা না-হোক প্রকৃতিগত কারণেই উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং এগুলোর মূল্য নিসাবের সমপরিমাণ বা তার বেশী হলেই যাকাত আদায় করতে হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে পিন্ড আকারে রক্ষিত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন, অলংকার-এসব তৈরীর মূল্যসহ হিসেব করে শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে।[১]

নগদ অর্থ :

নিজের কাছে বা ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদিও নগদ অর্থ বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া পূর্বের বকেয়া পাওনা ঋণ, চলতি বছরে দেয়া ঋণ এ সবকেও নগদ অর্থের মধ্যে ধরে যাকাত হিসেব করতে হবে। তবে যে সব ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই সেগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। তবে এসব ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে এর যাকাত দিতে হবে। প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় যেহেতু সুদ আছে সে জন্য ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়, জীবন বীমা, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থের মধ্য থেকে সুদ পৃথক করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে এবং বাকী অংশের ওপর যাকাত দিতে হবে।[২] প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে সুদ ও মূল অর্থের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম পালন করতে হবে। পেনশন বাবদ প্রাপ্য অর্থও হিসেবে ধরতে হবে।

ব্যবসায়ের মালামাল :

ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামালের যাকাত নিরূপণকালে বছর শেষে হিসেব সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার ওপর যাকাত দিতে হবে। সমাপ্তি দিবসে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর যে স্থিতিপত্র (Balance Sheet) তৈরী করা হয়, এতে সাকুল্য দেনা-পাওনা যথাঃ মূলধন, সম্পদ, চলতি মুলধন, অর্জিত মুনাফা, ক্যাশে এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়াধীন মাল, প্রস্তুতকৃত মাল, ঋণ, দেনা ও পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসেবে আনতে হবে। এ সবের মধ্য থেকে স্থায়ী মূলধন সামগ্রী যেমনঃ মেশিন, দালান, জমিসহ ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিটকৃত মাল এবং অন্যান্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের ওপর যাকাত হিসেব করতে হবে। যে সব পাওনা ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই সেগুলো পাওয়ার পর যাকাত দেয়ার শর্তে বাদ রাখা যেতে পারে বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রীত জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদও হিসেবে নিতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে।[৩] কেন না, এসব দ্রব্য উৎপাদনশীল; যন্ত্রপাতির মালিক তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম। তা ছাড়া কোন ব্যক্তির একাধিক ব্যবসা থাকলে এবং তার পরেও সোনা-রূপা, মূল্যবান পাথর, নগদ অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি থাকলে এ সম্পদের হিসেবের যোগফলের ভিত্তিতে যাকাত নিরূপণ করতে হবে। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে হিসেব করা যাবে না।

কৃষি ফসল :

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণীর ফসলের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে হিসেব করে যাকাতযোগ্য পরিমাণ ফসল হলে যাকাত বা ওশর দিতে হবে। যেমন- ধান, পাট যদি সাড়ে ২৬ মন বা তার বেশী হয়, তাহলে ফসল তোলার সময়েই তার যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে কলাই, সরিষা, মধু ইত্যাদি প্রত্যেকটির নিসাব পৃথকভাবে ধরতে হবে।

খনিজ সম্পদ :

খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই। খনি যদি ব্যক্তি মালিকানায় থাকে সম্পদ উত্তোলনের পরই হিসেব করে এর যাকাত দিতে হবে। তবে খনি সরকারী মালিকানায় থাকলে এর যাকাত দিতে হবে না। খনিজ সম্পদের যাকাতের হার শতকরা ২০ ভাগ।

পশু সম্পদ :

গরু -মহিষ: নিজের কাজে খাটে এবং বিচরণশীল (সায়েমা) নয় এমন গরু/মহিষ বাদ দিয়ে ৩০টি গরু-মহিষ হলেই তার ওপর যাকাত দিতে হবে। প্রতি ৩০টি গরুর জন্য এক বছর বয়সের একটি গরু এবং প্রতি ৪০টি বা তার অংশের জন্য দুই বছর বয়সের একটি গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

১. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, যাকাত কি ও কেন? ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১২-১৩
২. ডঃ এম, এ, মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৩. বুখারী ও মুসলিম এর কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ছাগল-ভেড়া :

ছাগল/ভেড়ার সংখ্যা ৪০টি হলে ১টি, ১২০ পর্যন্ত ২টি, ৩০০ পর্যন্ত ৩টি এবং এর অধিক ১০০ ও তার অংশের জন্য আরও ১টি করে ছাগল যাকাত প্রদান করতে হবে।

উট :

উটের নিসাব ৫টি। প্রতি ৫টি উটে ১টি করে ছাগল/ভেড়া যাকাত দিতে হবে। কিন্তু উটের সংখ্যা ৪৪ হলে ১টি ১ বছরের উট-শাবক যাকাত দিতে হবে।[১] সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এ হারে যাকাত দিতে হবে।

ঘোড়া :

হযরত উমর (রা.) ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর পূর্বে ঘোড়ার ওপর কোন যাকাত ছিল না। ঘোড়া যদি যানবাহন, বোঝা-বহন বা জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু তা না হলে ঘোড়ার মূল্য ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার বেশী হলে তার ওপর শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে।[২]

যে সকল সম্পদে যাকাত নেই :

যাকাতমুক্ত সম্পদ সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন, "বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহণের পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফলসমূহ যা বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্প দিনে বিনষ্ট হয়ে যায়, যথাঃ আম, পেঁপে, শসা, তরমুজ, খরবুজা, বাঙ্গী, লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই।"[৩] (হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথাঃ বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশ ব্যতীত অন্য সমস্ত শস্যাদি তরি-তরকারী ও ফলসমূহের যাকাত প্রদান করতে হয়)। যাহোক, হাদীসের আলোকে যে সকল সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেগুলো হল :

১. জমি;
২. মিল, ফ্যাক্টরী, ওয়্যার হাউজ, গুদাম ইত্যাদি;
৩. দোকান;
৪. বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি;
৫. এক বছরের কম বয়সের গবাদি পশু;
৬. ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক;
৭. বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী;
৮. গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্ট্যাম্প;
৯. অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জাম;
১০. গৃহপালিত সকল প্রকার মুরগী ও পাখি;
১১. কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী;
১২. চলাচলের জন্তু ও গাড়ী;
১৩. যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম;
১৪. ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য;
১৫. বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ;
১৬. যাকাত বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরে মধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ;
১৭. দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত;
১৮. সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য সম্পদ।[৪]

উপরন্তু মূল্যবান সুগন্ধি, মণি মুক্তা, লোহিত-বর্ণ প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে আহৃত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর যাকাত নেই। যে সমস্ত পশু ও বাহন ভাড়ায় খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হয় না।

কাদের ওপর যাকাত ফরয :

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেবলমাত্র স্বাধীন পূর্ণ বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। যেমন-

---

১. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।
২. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩. বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য।
৪. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের ওপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা :

সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। মালিকানা বলতে সম্পদ মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের ওপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করাকেই বোঝায়। যে সব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয় তার ওপর কোন যাকাত নেই। যেমন: সরকারী মালিকানাধীন ধন-সম্পদ। অনুরূপভাবে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদের ওপরেও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াক্ফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয় তবে তার ওপর যাকাত দিতে হবে। যে ঋণ ফেরত পাবার আশা নেই তার ওপর যাকাত ধার্য হবে না।

সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া :

যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্য উৎপাদনক্ষম, বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক নয়, বরং সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। যেমন- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কৃষিজাত ফসল, খনিজ সম্পদ, মধু, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল।[১] তাই এ সবের ওপর যাকাত ধার্য হবে। যে সকল মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয় সে সবের ওপরে যাকাত অপরিহার্য নয়। যেমন ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালামাল, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, বাড়ি, গাড়ি, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, চলাচলের বাহন, মাটির নীচে প্রোথিত সম্পদ যার হদিস জানা নেই।

যাকাতযোগ্য পরিমাণ সম্পদ থাকা :

যাকাত ফরয হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। শরীয়াত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। সাধারণত সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারও নিকট সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ বা উভয়টি মিলে সাড়ে ৫২ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি এবং উট ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা :

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হয়। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "লোকজন আপনার নিকট জানতে চায়, তারা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন।"[২] হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, "অতিরিক্ত বলতে পরিবারের ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বোঝায়।"[৩] ইউসুফ আল কারযাভীর মতে, "স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের ভরণ-পোষণও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত।"[৪]

ঋণমুক্ত হওয়া :

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিমজ্জিত হয়ে যায় বা নিসাব তার চেয়ে কম হয় তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধ করার পর বা ঋণের পরিমাণ সম্পদ বাদ দেয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল তার ওপর যাকাত ধার্য হবে। কেউ কেউ বলেন যে, যে ঋণ কিস্তিতে শোধ করতে হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে যে বছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হবে সে বছর সেই পরিমাণ ঋণ বাদ দেয়া উচিত। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর ঋণ পরিশোধ অবশ্যই করতে হয়। অন্যথায় সে সম্পদের ওপর যাকাত দেয়া উচিত।

সম্পদ এক বছর থাকা :

কারও নিকট কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর হাতে থাকলেই কেবল সে সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (ওশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসেব সমাপ্তির দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে (Balance Sheet) বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনার হিসেব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

---

১. ডঃ এম, এ, মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

২. আল-কুরআন, ২:২১৯

৩. উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী (অনু. আব্দুল কাদির), ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত

অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাত :

ধন-সম্পদের মালিক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার আইনানুগ অভিভাবককেই তার সম্পদের যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

যৌথ মালিকানাধীন যাকাত :

যৌথভাবে যদি একাধিক লোক কোন সম্পদের মালিক হয় তবে তাদের প্রত্যেককেই সম্পদে নিজ নিজ অংশের জন্য যাকাত পরিশোধ করতে হবে, অবশ্য যদি তার অংশ নিসাবের সমান বা তার চেয়ে বেশী হয়। সম্পদের এই অংশ তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে যোগ করে যদি নিসাবের শর্ত পূরণ হয় তবে তাকে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তির যাকাত :

নির্ধারিত যাকাত পরিশোধের পূর্বেই সম্পদের মালিক মারা গেলে তার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীগণ অথবা তার অছি কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা এবং কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করে অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করবেন।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত :

মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে যদি সম্পদ ন্যস্ত করা হয় তাহলে মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ককে সে সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

বিদেশে অবস্থিত সম্পদের যাকাত :

কারও সম্পদ যদি বিদেশে থাকে আর সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে তার উপরও তাকে যাকাত দিতে হবে। তবে সে দেশের সরকারী ইসলামী হলে এবং উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করে থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। সম্পদ দেশে আর সম্পদের মালিক দেশের বাইরে থাকলে মালিকের প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ থেকে যাকাত দেবেন।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ :

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদারগণ হল (১) দরিদ্র, (২) নিঃস্ব, (৩) যাকাত সংগ্রহকারী ও বিতরণকারী (৪) নওমুসলিম, (৫) দাস মুক্তির জন্য, (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (৭) আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী (৮) বিপদগ্রস্ত পথিক।[১]

যে সব কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে :

আল-কুরআনে উল্লিখিত যাকাতের হকদার ৮ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ৬ শ্রেণীর লোকই দারিদ্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাই দরিদ্র, অভাবী ও ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা, পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে কাজ করা যেতে পারে তা হল :

- যাকাত ফান্ড বা তহবিল থেকে দরিদ্র-অভাবী, দুঃস্থ নর-নারী, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, ইয়াতিম এবং অনুরূপ অসহায় লোকের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর সক্ষম অংশকে এমনভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।
- মুসাফিরদের যাতে যাতায়াতের পথে কোন প্রকার কষ্ট করতে না হয় সে জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।
- সঙ্গত কারণে যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য এমন সব ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তারা ঋণমুক্ত হয় বা ঋণগ্রস্ত হতে না হয়।
- ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হয়। এ জন্য গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

---

১. আল-কুরআন, ৯:৬০

Dhaka University Institutional Repository

- দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা-সুবিধা দানের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী প্রভৃতি নির্মাণ করা।
- বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য নিয়মিত স্টাইপেন্ড, স্কলারশীপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে। মোটকথা পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয়-বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে যে কোন দেশে দারিদ্র দূরীকরণের ও দু:স্থ মানবতার কল্যাণে যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য :

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যাকাত যে ফরয তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনে আল্লাহ যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকদের কাজ বলেছেন। "ধ্বংস অনিবার্য ঐ সকল মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত আদায় করে না।"[১]

ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করার পরও যদি কেউ শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করে বা যাকাত আদায় না করে তাহলে সে মূলত: ইসলামকেই অস্বীকার করে। অনেকে বলে থাকেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে কর বা খাজনা দেয়ার পরও যাকাত দিতে হবে কেন? কর বা খাজনা আদায় করলেও যাকাত দিতে হবে। কারণ, যাকাত কর নয়, মূলত: এটা একটা অর্থনৈতিক ইবাদত। কর বা ট্যাক্স প্রদান কোন ইবাদত নয়। কর ও ইবাদতের মধ্যে মৌলিক ধারণা ও নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন -

(ক) যাকাত শুধুমাত্র মুসলমানদের ওপর ফযর ইবাদত এবং ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই ব্যক্তিকে তার নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসেব নিজে কষেই তার যথার্থ যাকাত আদায় করতে হয়, সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে এর ব্যবস্থা করুক বা না করুক। করের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে এবং এটা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ও নয়। মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিককেই কর প্রদান করতে হয়।

(খ) কর হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-যার জন্য করদাতা প্রত্যক্ষ উপকার আশা করতে পারে। সরকারও করের অর্থ দরিদ্র-অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্য বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত লোকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করতে হয়।

(গ) যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যে কোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে। কর বা ট্যক্সের অর্থ দ্বারা দেশের সকল নাগরিকই সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যাকাতের অর্থ দ্বারা শুধুমাত্র যাকাত গ্রহীতাই সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

(ঘ) যাকাত শুধুমাত্র বিত্তশালী মুসলিমদের জন্যই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর বিশেষত: পরোক্ষ কর সর্বসাধারণের ওপর আরেপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণকে দিতে হয়।

(ঙ) যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের ওপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না, বরং সম্পদ ঘরে জমা থাকলেও যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের ওপর। আয় বাড়লে করের পরিমাণ বাড়ে।

(চ) যাকাতের মধ্যে করের সকল উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকার পরও যাকাতের হার স্থির ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু করের হার স্থির নয়। যে কোন সময় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হতে পারে।

(ছ) উৎপাদনশীল জমির (স্থাবর সম্পত্তি) কর বাধ্যতামূলক, দিতেই হবে (ফসল হোক বা না হোক)। পক্ষান্তরে ফসল উৎপাদিত হলেই শুধু যাকাত দিতে হবে, অন্যথায় নয়। কর জমির উপর ধার্য হয়। আর ফসলের যাকাত ওশর ফসলের উপর ধার্য হয়।

---

১. আল-কুরআন, সূরা হামিম সিজদাহ, আয়াত ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং কোন দিক দিয়েই যাকাতকে প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর হিসেবে যেমন গণ্য করা যায় না, তেমনি তার সাথে তুলনীয়ও হতে পারে না। যাকাত ধনীদের নিসাব পরিমাণের অতিরিক্ত সম্পদে আল্লাহ নির্ধারিত আবশ্যিক আদায়যোগ্য অংশ। কেউ এর পরিমাণ কম বা বেশী করতে পারে না। যাকাত যে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তির ওপর যেমন ফরয নয়, তেমনি নিসাব পরিমাণের অধিক সম্পদ নির্দিষ্ট সময়ের বেশী অধিকারে থাকলে কেউ এ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না।

সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব :

দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাতের শাব্দিক অর্থ শোধন। যাকাত তিনটি উপায়ে শোধন কার্য সম্পাদন করে। সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর কর্মধারা ব্যাপ্ত। যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূর করে, সামাজিক সংহতি ও প্রগতি বজায় রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের লোভ এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্খাকে বিধৌত করে এবং দারিদ্র্য সমস্যা দূরীকরণে তাদের স্বজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ ও সামাজিক সম্পদের মধ্রে সামঞ্জস্য বিধান করে, যাতে সম্পদ কতিপয় হাতে কুক্ষিগত না হয় এবং গরীবরা যেন আরও গরীব না হয়। ফলে যাকাত মানুষের মধ্য থেকে শয়তানী প্রেরণা দূর করে তাদেরকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে এবং অভুক্ত, বিবস্ত্র, অসুস্থ ও অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ও সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করে। ফলে যাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। এ সব গুণাবলী সমাজ জীবনের সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, "যাকাত দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য যেমন একটি কর্তব্য, তেমনি যাকাত প্রাপ্তদের পক্ষে এটি একটি অধিকার। যাকাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমন্বয় সাধিত হয়।"[১]

সমাজ জীবনে যাকাত প্রথার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। খুলাফা-এ-রাশিদীনের আমলে যাকাত একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সমাজ জীবনে যাকাত প্রথা আর্ত-দূর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর হওয়া ছাড়াও সুষম বন্টন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অবদান রাখে।

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ-আল-কারযাভী বলেন, "যাকাত একটি আর্থিক কর ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। তা ধনী-গরীবের দূরত্ব হ্রাস করে ও সম্প্রীতি গড়ে তোলে। এটি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্র তা সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য দায়িত্বশীল। তা নৈতিক ব্যবস্থাও। কেননা তা ভালবাসা ও বন্ধুতের বন্ধন সুদৃঢ় করে।"[২] লিউড্রোশের মতে, "যে দু'টি সামাজিক সমস্যা গোটা বিশ্বকে জর্জরিত করে তুলেছে তার সমাধান আমি ইসলামে পেয়েছি। প্রথম আল্লাহর ঘোষনা, 'সব মুসলিম ভাই ভাই।' সামাজিকতার মৌল বিধানের সংক্ষিপ্ত ঘোষণা এটা। আর দ্বিতীয় প্রত্যেক মালদারের উপরই যাকাত ফরজ করা এমন কি গরীবদেরকে তাদের প্রাপ্য জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দান-যদি ধনীরা তা দিতে ইচ্ছুক না হয়, দিতে অস্বীকার করে। এটা প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার পন্থা।"[৩]

সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুষমবন্টন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ধনী-গরীবদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে তোলার মধ্যেই যাকাতের ভূমিকা ব্যাপ্ত নয়; বরং আত্মশৃঙ্খলা ও আত্মোন্নয়ন, নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধসহ বিভিন্ন কল্যাণকর মানবীয় গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব রয়েছে। যাকাতের এ দিকটার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, "এ বিষয়ে কোন ভুল থাকা উচিত নয় যে যাকাত দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরোপ করা হয়েছে, 'আত্মশৃঙ্খলা ও সামাজিক অভাবের রক্ষাকবচ। সম্পদ কৃপণতা, স্বার্থপরতা, পরস্পর ঘৃণা ও মনোমালিন্য ও এমনকি নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দেয়। এই সমস্ত ত্রুটির সবচেয়ে ভাল প্রতিকার হচ্ছে টাকা দাতব্য কাজে বিনিয়োগ করা। তা সামাজিক অসাম্য দূর করে ও তার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা আনে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ মহান নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তরে পরিণত হয়। এই উন্নতির সাথে সাথে সদ্ব্যবহারের অভ্যাস পরিপূর্ণ হয়। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত মহান গুণ মানুষকে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শে পরিণত করে। এর মানে হচ্ছে আত্মশৃঙ্খলার মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন।"[৪]

১. দ্রষ্টব্য, বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুয যাকাত
২. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী (অনু. মুহাম্মদ আব্দুল রহীম), ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ৭৯৯-৮০০
৩. উদ্ধৃত: আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২
৪. উদ্ধৃত: খলিফা আব্দুল হাকিম (অনু. সাইয়েদ আব্দুল হাই), ইসলামী ভাবধারা, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, লাহোর, ১৯৭০, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ আবদুল হাকিম সম্পদ ও জনকল্যাণের মধ্যে যাকাতের সম্পর্ক উল্লেখ করে বলেন, "যাকাত হল সম্পদের সাথে সামাজিক জনকল্যাণের সমন্বয়সাধন ও অবাধ অর্থনীতির বিরোধীতা।"[১]

সুতরাং দেখা যায় যে, এভাবেই যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যা দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ, সম্পদের সুষম বন্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও প্রগতি নিশ্চিত করেছিল। এর ফলে অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আধুনিক সমাজকল্যাণেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাকাত ও আধুনিক সমাজকল্যাণ উভয়ই সামাজিক সম্পদের সুষম বন্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজের জনগণের জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য বিধান ও কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মানুষের সামাজিক দায়িত্ব ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে থাকে। ফলে সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে একটি সফল পদ্ধতি হিসেবে যাকাত ও সামজকল্যাণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

তাই ইসলামের বিধি অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে বিরাজমান দারিদ্র্য ও ভিক্ষুক সমস্যার ন্যায় জটিল সমস্যার সমাধান পর্যায়ক্রমে করা সম্ভব। পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণীকে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এতে সমাজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হবে যখন যাকাত গ্রহণকারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় খলিফা উমরের (রা.) শাসনকাল।

বাংলাদেশে যাকাতের ব্যবহার ও কার্যকারিতা :

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ইনডিপেনডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ১৯৯৪-৯৫ শীর্ষক সেমিনারে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ সালে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৪৩.৯%। এক দশকের মাথায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯.২%। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। সেই সঙ্গে চরম দারিদ্র্যের পরিমাণ ২১.৫% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০% এ উন্নীত হয়েছে। সুতরাং সরকারকে আজ অবশ্যই প্রকৃতই কল্যাণমুখী এবং দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।[২]

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়িত ও ব্যবহৃত হয়, যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির এবং ক্ষেত্রবিশেষে নওমুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করা হয় না এবং তা বিলি বন্টনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফা-ই-রাশিদা ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্য ৮টি দফতর ছিল।[৩] রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্য।

যাকাতের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। কেননা, যাকাত স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি, কোন সাময়িক পদ্ধতি নয়। যাকাতের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করে ফেলার জন্য ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি যাতে দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রয়োগের জন্যও ফকীহগণ তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন যে, "ফকীর ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা তাদের অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।" ইমাম শাফী এ মত সমর্থন করেন।[৪] তার সমর্থক ফকীহ্গণ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রার্থিতগণকে তাদের স্ব স্ব কাজে (কুটির শিল্প, কৃষিকাজ, দোকান, দরজীর কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি) স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন। ইমাম মালিক ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য ফকীহ্র মত হল যে, প্রার্থিত ফকীর-মিসকিনকে নিজেসহ পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে।

---

১. খলিফা আব্দুল হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৯
২. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৭০
৩. মহানবী (স.) ও খুলাফা-ই-রাশিদীনের (রা.) সময় যাকাতের অর্থ সামগ্রী ও গবাদী পশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। যেমন-

সায়ী	:	গবাদী পশুর যাকাত সংগ্রহকারী;
কাতিব	:	করণিক
কাসাম	:	বন্টনকারী
আশির	:	যাকাত দাতা ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সমন্ধ স্থাপনকারী
আরিফ	:	যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী
হাসিব	:	হিসাব রক্ষক
হাফিজ	:	যাকাতের অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষক
কায়াল	:	যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী

৪. ড. মাহমুদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ফকীর-মিসকিনকে কিছু দিবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।"[১] মোটের ওপর, যাকাত অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর এবং দ্বিতীয়বার যাকাত প্রার্থী না হবার অবস্থায় আনয়ন করতে চায়। সর্বনিম্ন এক বছর স্বচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে ধনীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল- নিজের পকেট থেকে অর্থ বের করে দিলেই শুধু দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না। অভাবগ্রস্তদের খুঁজে বের করে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে সাদাকাহ ও যাকাতের অর্থ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও ধনীদের পালন করতে হবে।

যাকাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করে না, বরং তা নির্মূল করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টর জন্য বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দূর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে শুধু অসহায় ও দু:স্থ মানবতার কল্যাণই হবে না, বরং সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য হ্রাস পাবে।

যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কারণ সমাজে গরীব, অসহায়, দু:স্থ ও বেকার লোকদের হাতে অর্থ বা ক্রয় ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যাকাত বন্টন করে তাদের হাতে পৌঁছালে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং তারা পূর্বের চেয়ে বেশী পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। ফলে পণ্য সামগ্রীর চাহিদাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে। ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। যাকাত এভাবেই ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করে থাকে। এই উৎপাদনকারীরাই যাকাত দেয়, যা আবার বর্ধিত মুনাফা হয়ে তাদের হাতেই ফিরে আসে। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও প্রকৃতপক্ষে সেই যাকাতদাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে।"[২]

উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও যাকাত পুঁজি তথা নগদ অর্থকে অলসভাবে ধরে রাখার পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখলে বছর বছর যাকাত দিতে দিতেই তা নি:শেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে যাবতীয় সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হয় যাতে কমপক্ষে যাকাতের হারের সমহারে আয় বাড়ানো সম্ভব হয়; অন্যথায় আসল থেকে যাকাত দিতে হবে। ফলে অর্থনীতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়; বেকার লোকদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা আসে, চাহিদা বাড়ে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

এভাবেই যাকাত একদিকে ভোগ অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে। সমাজ হতে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাকাতের আরেক লক্ষ্য। দারিদ্র্য মানবতার প্রধান শত্রু। যে কোন দেশ ও সমাজের জন্য এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনা অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ থেকেই।

বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যাকাত আদায় ও ব্যয় করার ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া অনেক বিত্তশালী মুসলমানই যাকাত দেন না। দিলেও তা বন্টন করা হয় বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিতভাবে। ফলে তা দ্বারা সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হয় না; দারিদ্র্য সমস্যার স্থায়ী কোন সুরাহাও হয় না।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সরকারী সাহায্য, না হয় বিদেশী অনুদান। বস্তুত: পক্ষে এ দেশে এখন বহু এনজিও বিদেশী অনুদান নিয়েই দরিদ্র জনগণ বিশেষত: গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তারা প্রধানত: সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বুদ্ধিজীবি ও সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি হতাশা প্রকাশ করে থাকেন যে তাদের হাতে নগদ অর্থ নেই বলেই দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদি এ দেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাতের বিধানের মাধ্যমে আহরণ ও বিতরণ করা যায় এবং সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে তা ব্যবহার করা যায় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যই সম্ভব।

---

১. ড. মাহমুদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পৃ. ৪
২. আল-কুরআন, সূরা রূম, আয়াত-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি ২০/২৫ হাজার টাকার ওপর যাকাত দিয়ে থাকেন। সাধারণত: তারা এ টাকা থেকে কিছু টাকা ৫/১০ টাকা করে নির্দিষ্ট দিনে গরীব নারী-পুরুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন, বাকীটা শাড়ী-লুঙ্গি আকারে বিতরণ করেন। কখনও কখনও তারা এলাকার ইয়ামিতখানা বা মাদ্রাসার লিল্লাহ্ বোর্ডিং-এ এই অর্থের কিছুটা দান করে থাকেন। এরা মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, অসুস্থ লোকদের কথা আদৌ বিবেচনায় আনেন না। অথচ এরাই যদি পরিকল্পিতভাবে এলাকার দু:স্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন পরিবারের মধ্যে থেকে বাছাই করে প্রতি বছর অন্তত: ৩/৪টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য রিকসা, নৌকা, সেলাই মেশিন, গাভী-ছাগল বা এ জাতীয় কোন উপকরণ কিনে দিতেন তাহলে দেখা যেত তার একার প্রচেষ্টাতেই পাঁচ বছরে তার এলাকার অন্তত: ২০/২৫টি পরিবার স্বাবলম্বী হতে যেত। ভিক্ষুক ও অভাবী পরিবারের সংখ্যাও কমত।

জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারার জন্য বহু ক্ষুধে চাষী ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। এদের এই ঋণও যদি পরিকল্পিতভাবে শোধ করে বন্ধক রাখা জমি ফিরিয়ে দেয়া যেত তাহলে নিঃসন্দেহে দেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেত।[১]

এ জাতীয় পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাকাত প্রদানের জন্য বিত্তবানদের দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। তবেই যাকাতের অন্তর্নিহিত কল্যাণ অর্জন সম্ভব। সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনকল্পে বর্তমানকালে যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন এবং সেই তহবিল থেকেই দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশীয় উৎস হতেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় হতে পারে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দু:স্থ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে আমাদের দেশের বিদেশী এনজিও নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

এক হিসেবে দেখা গেছে বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় করা গেলে নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে ২০৬৬.৮৪ কোটি টাকা যাকাত বাবদ আদায় করা যায়-

১. খাদ্যশস্য থেকে -	১৩৭৩.৭৯ কোটি টাকা।
২. নগদ অর্থ থেকে -	৫৩৪.০৫ কোটি টাকা।
৩. অন্যান্য শস্য থেকে -	২৫.০০ কোটি টাকা।
৪. ব্যবসায়/শিল্পপণ্য থেকে -	১০০ কোটি টাকা।
৫. স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার থেকে -	২৫ কোটি টাকা।
মোট =	**২০৬৬.৮৪ কোটি টাকা।**

যাকাতের এ পরিমাণ থেকে যদি সংখ্যানুপাত ১৩% অমুসলিমদের ভূমি ও সম্পদকে আলাদা করা হয়, তবে যাকাতের পরিমাণ হবে ১৭৯৮.১৪ কোটি টাকা।[২]

যাকাতের মাধ্যমে আদায়কৃত এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বছর দরিদ্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, কর্মে নিয়োগ ও পুণর্বাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বছরেই বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষ বলে কিছু থাকবে না।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে "জাতীয় যাকাত বোর্ড" গঠন করে। এতে প্রতি উপজেলায় যাকাত বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। যাকাত বোর্ডের মাধ্যমেই দু:স্থ, অসহায়দের পুণর্বাসনে টঙ্গীর 'এরশাদ নগর' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। যাকাত বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ায় বোর্ড তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর প্রতি জনগণের আস্থা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা গেলে বাংলাদেশে যাকাত দরিদ্র ও দু:স্থদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
২. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'দারিদ্র বিমোচনে যাকাত: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০০
৩. মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ৩২১-৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যয়ের পরিকল্পনা :

ক) বাৎসরিক সম্ভাব্য আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে উপরে যে ধারণা দেয়া হয়েছে তাকে সঠিকভাবে ও সুষ্ঠু পন্থায় উপযুক্ত লোকদের মাধ্যমে বিতরণের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করা একান্তই প্রয়োজন। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। তার আলোকে বলা যায়- দেশের গরীব, মিসকীন, অন্ধ, অসহায়, শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা, পঙ্গু, আতুর, বিপদগ্রস্ত পথিক এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থোপার্জনে অসমর্থ লোকের মধ্যে যাকাতের টাকা বিতরণের নির্দেশ রয়েছে। এ ধরনের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দেশের প্রতি কেন্দ্রে ছড়িয়ে আছে। এদেরকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীতে তাদেরকে গণ্য করা যায় যারা বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ হতে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। যাকাতের মোট টাকার অর্ধেক তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যয় করা যায় এবং তাদের জন্য গঠিত পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার তাদেরই নামে এ টাকা নির্দিষ্ট হারে জমা করা যায়, যেন এর সুফল তারাই ভোগ করতে পারে। গরীবদের বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং আদালতী বিচার লাভের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। সাধারণ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট অসংখ্য প্রকার কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এ তহবিল দ্বারা সম্ভব। বলাবাহুল্য, যাকাত আদায়ের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত হবে, তাদের বেতনও এ টাকা হতেই দেয়া হবে। বাকী অর্থ নিম্নরূপে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) গরীবদের জন্য স্থায়ীভাবে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং

(২) ব্যক্তিগতভাবে তাদের নগদ টাকা বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে দেয়ার খাতে ব্যয় করা হবে।

স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা :

গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার উপায় হচ্ছে তাদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কৃষি জমি ক্রয় করে দেয়া ও কারখানা স্থাপন করা। বলাবাহুল্য, এ কারখানায় গরীবেরাই মজুর ও পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হবে এবং তারাই হবে এর মালিক ও স্বত্বাধিকারী। অনেক গরীবকে আবার ব্যবসায়ে প্রয়োজন পরিমাণ পুঁজি হিসেবে টাকা দেয়া যেতে পারে।

জমি ক্রয়ের দাম :

কৃষক ও কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে যারা ভূমিহীন কিংবা প্রয়োজন পরিমাণ ভূমি যাদের নেই, তাদেরকে জমি ক্রয় করে দেয়ার জন্য প্রতি বছর মোট যাকাতের একটি অংশ (ধরা যাক ৩০ কোটি টাকা) যদি বরাদ্দ করা হয় তবে তা দিয়ে অনায়াসেই কমবেশী ৬ একর বিশিষ্ট ১৫ হাজার খন্ড জমি ক্রয় করে দিয়ে অন্তত ১৫ হাজার পরিবারকে অভাব-দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

কারখানা স্থাপন :

যাকাত ফান্ডের আরও একটি অংশ থেকে ৫০ কোটি টাকা শুধু কারখানা স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ কারখানায় গরীব, অভাবক্লিষ্ট ও শ্রমজীবী লোকই কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হবে। আর সমবেতভাবে তারাই হবে এগুলোর স্বত্বাধিকারী। উন্নত ধরনের মধ্যম শ্রেণীর কারখানা স্থাপন করলে গড়ে কারখানা প্রতি ৫ কোটি টাকা হিসেবে মূলধন দ্বারা অন্তত: ১০টি উল্লেখযোগ্য কারখানা প্রতি বছর স্থাপন করা যেতে পারে। এতে প্রতি বছর ১০-১২ হাজার পরিবারের এবং ৪০-৫০ হাজার লোকের ভরণ-পোষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে।

ব্যবসায়ে পুঁজি সংগ্রহ :

প্রতি বছর উপার্জনশীল লোকদেরকে ব্যবসায়ের পুঁজি সংগ্রহ করে দেয়অ বাবদ অন্তত: ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ টাকাকে ২০ হাজার অংশে ভাগ করে ততটি পরিবারকে দান করলে শুধু ব্যবসায়ের মাধ্যমেই প্রতি বছর অন্তত: ৮০/৯০ হাজার লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে দান :

উপর্যুক্ত খাতসমূহে যাকাতের টাকা ব্যয় করার পর এ ফান্ডের যত টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা সরাসরি উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে নগদ দান হিসেবে দেয়া যেতে পারে। এ দান এককালীনও হতে পারে, কিংবা মাসিক হিসেবেও তা বন্টন করা যেতে পারে। এ টাকার একটা প্রধান অংশকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করে দিলে অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা এভাবে খরচ করা যায়-

- ১০ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি বাৎসরিক ১০০০ টাকা হিসেবে ১ লক্ষ পরিবারকে।
- ৪ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা মাসিক হিসেবে ৮০ হাজার পরিবারকে।
- ২ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি ২৫০ টাকা হিসেবে ৮০ হাজার পরিাবরকে।
- ২ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি ১২৫ টাকা হিসেবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবারকে।
- ২ কোটি টাকা- পরিবার প্রতি ১০০ টাকা হিসেবে ২ লক্ষ পরিবারকে।

এক কথায়, প্রত্যক্ষ বন্টনের ফলেও প্রতি বৎসর ৬ লাখ ২০ হাজার পরিবার কিংবা ২৪ লাখ ৮০ হাজার (পরিবার প্রতি চারজন হিসেবে) ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক দূর্দশা হতে মুক্তি দেয়া যায়। পূর্বোক্ত হিসেবকেও এর সাথে যোগ করলে প্রতি বছর দেশের ২৮-২৯ লক্ষ নাগরিকের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা যায়। এমতাবস্থায় একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে যাকাত আদায় এবং তার সুষ্ঠু বন্টনের কাজ শুরু করলে এ সময়ের মধ্যে অন্তত: ১ কোটি ৪০ লক্ষ নাগরিককে আর্থিক অনটন থেকে উদ্ধার করা যায়।[১]

খ) ধরা যাক, একটি থানায় ৫০ জন যাকাত দাতা ১০ লাখ টাকা যাকাত স্থানীয় একটি সংস্থাতে জমা দিল। উক্ত সংস্থা ঐ থানায় যাকাত পেতে পারে এমন ১০০ জন লোকের তালিকা নির্ধারণ করল। সংস্থা চিন্তা করল উক্ত ১০০ জনের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণ করা তাদের দায়িত্ব। উক্ত লোকদের শ্রেণীবিন্যাস করে ৩ সালা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা যায়। এতে ২০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন (২০×৩০০০=৬০০০০ টাকা), ২০ জন যুবককে রিক্সা (২০×৭০০০=১৪০০০০ টাকা), ২০ জন অসক্ষম ব্যক্তিকে পানের দোকান (২০×৫০০০=১০০০০০ টাকা), ক্রয় করে দিল। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য আরও ২ জন লোককে চাকুরী দেয়া হল (বেতন দিয়ে)। থানার গরীব জনগণের চিকিৎসার জন্য ৮টি অঞ্চলে ৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হল (৮×২৫০০০=২০০০০০ টাকা), শিক্ষার সুবিধার জন্য ৮টি এলাকায় ৮টি বয়স্ক/অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু করা হল (৮×২৫০০০ = ২০০০০০ টাকা), জ্ঞানার্জনের জন্য ৮টি কেন্দ্রে ৮টি পাঠাগার স্থাপন করা হল (৮×১০০০০ = ৮০০০০ টাকা)। বাকী টাকা মহিলা এবং অসহায়দের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হল সাময়িকভাবে। এভাবে প্রতি বছর যথাক্রমে ৮০/৯০ জন লোককে স্বাবলম্বী করা গেলে ৩ বছরে ২৫০ জন লোককে আর যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা ও ইসলামী দর্শনের দিক দিয়ে এ থানা ৪র্থ বছরে আদর্শ থানার মানে উন্নীত হবে।[২]

বাংলাদেশের যাকাত ভিত্তিক কয়েকটি সমাজকল্যাণ সংস্থা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ :

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯৮২ সালে যাকাত ফান্ড গঠন করে। ১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তার অন্যতম কর্মসূচী ইসলামিক মিশন এর প্রবর্তন করে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হল-দু:স্থ মানবতার সেবা, দারিদ্র দূরীকরণকল্পে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুশীলন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ইসলামের বাণী প্রচার।[৩] ইসলামিক মিশন যাকাত ফান্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ইসলামিক মিশন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন- গ্রামাঞ্চলের দু:স্থ ও দারিদ্রপীড়িত জনগণের চিকিৎসার্থে রোগীদের ব্যবস্থাপত্রসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা প্রদান, ফ্রী প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা, সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচীর আওতায় মা ও শিশুদের টীকা প্রদানের ব্যবস্থা, মিশন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মিশন এলাকায় চক্ষু শিবির স্থাপন, বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তাৎক্ষণিক মেডিকেল টিম প্রেরণ এবং চিকিৎসার সুবিধা প্রদান, মিশন এলাকায় ইমারজেন্সি চিকিৎসা প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল-হেলথ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন দাওয়াতী কার্যক্রম ও উদ্বুদ্ধকরণ, মাহফিলের অনুষ্ঠান, আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধানমূলক কর্মসংস্থান, দু:স্থ ও নওমুসলিম পরিবারকে করজে হাসানা প্রদানের মাধ্যমে স্বাচ্ছল করে তোলা, গণশিক্ষা-মিশন এলাকায় মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান প্রদান, যাকাত ফান্ড কর্তৃক পরিচালিত টঙ্গীর দত্তপাড়া (এরশাদ নগর) শিশু হাসপাতালসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন।[৪]

---

১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
২. এ. জি. এম বদরুদ্দোজা, যাকাতের ব্যবহারিক বিধান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪২-৪৩ এর অনুকরণে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত।
৩. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫
৪. ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ফান্ডের অর্থে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ :

(ক) যাকাত তহবিলের অর্থ দ্বারা দরিদ্র জনগণের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে দত্তপাড়া শিশু হাসপাতাল প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ৩০শে জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ৩৩,৭২২ জন রোগীকে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। হাসপাতালটি দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া হাসপাতালটিতে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধাত্রীরা প্রয়োজন অনুসারে গৃহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩০০শ' রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(খ) সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দু:স্থ পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ। ১৯টি সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জুন ৯৮ পর্যন্ত ৫৭১৯ জন পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) ১৯৮৫ সালে যাকাত বোর্ডের আওতায় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার যাদুকুড়া গ্রামে একটি অবৈতনিক আদর্শ মক্তব (যা বর্তমানে আদর্শ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে) চালু করা হয়েছে। এখানে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয়। মক্তবে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের বই, খাতা ও লেখাপড়ার অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া মক্তবে নৈশকালীন গণশিক্ষা কার্যক্রমও চালু রয়েছে।

(ঘ) দ্বীনি শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য দু:স্থ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতি জেলায় ১৫ জন ইয়াতিম ছাত্র-ছাত্রীকে পোষাক ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য ২০০/= টাকা হারে বৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঙ) দু:স্থ, গরীব, দ্বীনদার ও নওমুসলিমদের হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪৬৮টি রিকসা এবং ১২৮টি ভ্যান গাড়ী বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে প্রতি জেলায় ১টি রিকসা ও ভ্যান গাড়ী বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

(চ) হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে দু:স্থ, বিধবা মহিলাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ জুন পর্যন্ত জনপ্রতি ১০০০/- টাকা হারে ৬৪টি জেলায় ১৯২০ জনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের ১১-১৪ বয়ঃক্রম গ্রুপের কোর্স সমাপনান্তে দু:স্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে যাকাত ফান্ড থেকে অর্থ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রতি জেলায় ৪ জন করে মোট ২৫৬ জনকে জনপ্রতি ২০০০/- টাকা করে প্রদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

(জ) প্রতি জেলায় কমপক্ষে ১ জন দু:স্থ বেকার মহিলাকে যাকাত তহবিল থেকে একটি করে মোট ৯২টি সেলাই মেশিন প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।[৩৯]

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন :

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টর এর সিদ্ধান্তক্রমে ইসলামী ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৪নং ধারা অনুযায়ী 'সাদাকা তহবিল' নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিল আর্ত-মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রমের পরিধি বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই বিস্তৃত কর্ম-পরিধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২০শে মে সাদাকা তহবিলের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' রাখা হয়। এ সময় এর প্রারম্ভিবক তহবিল ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত। এটি স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আর্ত-মানবতার সেবা, শিক্ষা সম্প্রচারণ, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন, ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহ দান, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মানব-সম্পদ উন্নয়ন।[৪০] সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এ যাবত বিভিন্ন মুখী সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে প্রায় ৮ কোটি ৫৫.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

---

১. যাকাত ফান্ড পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ ১৪-১৬

২. Welfare Programmes, Islamic Bank Foundation, Dhaka, 1992, P. 5.

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম (১৯৮৪ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত)[৪১]

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/প্রকল্প	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১।	আয়বর্ধন কর্মসূচী	
	ক) রিক্সা প্রকল্প	২২.৭৭
	খ) সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	২১.৪০
	গ) পল্লী স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৬.৯৬
	ঘ) আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প ও কার্যক্রম	৩৯.৪৬
	মোট	১০০.৫৯
২।	শিক্ষা কর্মসূচী	
	ক) আদর্শ ফুরকানিয়া মক্তব প্রকল্প	৫২.৮৪
	খ) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-বৃত্তি প্রকল্প	৩২.৯০
	গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প	৯৭.৬১
	ঘ) দরিদ্র ছাত্রদের এককালীন মঞ্জুরী দান	১৪.৭৬
	ঙ) শিক্ষার জন্য ঋণদান	.৮০
	চ) অন্যান্য	.৭৯
	মোট	১৯৯.৭০
৩।	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী	
	ক) দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহায়তা দান	২৩.৮৬
	খ) চিকিৎসা মঞ্জুরী (দরিদ্র রুগীদের জন্য)	২৯.২৫
	গ) নলকূপ বসানো	১০.৮৩
	ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ	১.৬০
	ঙ) অন্যান্য	.১০
	মোট	৬৫.৬৪
৪।	মানবিক সাহায্য কর্মসূচী	
	ক) দু:স্থদের এককালীন দান	১৬.৬৫
	খ) কন্যাদায়গ্রস্তদের সহায়তা দান	৮.৫০
	গ) এতিমখানায় সহায়তাদান	৬.৩১
	ঘ) বিবিধ	২১.১৪
	মোট	৫২.৬০
৫।	রিলিফ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী	
	ক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ	১৬৬.৩৮
	খ) বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মুসলিমদের রিলিফ প্রদান	১০.০০
	মোট	১৭৬.৩৮
৬।	দাওয়াতী কার্যক্রম	
	ক) ইসলামী সাহিত্য ও সাময়িকী বিতরণ, যুব ক্লাবে সহায়তা দান, অডিও-ভিজুয়্যাল মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ ইত্যাদি	৯২.১৬
	খ) মসজিদে সহায়তা প্রদান	১১.৫৪
	মোট	১০৩.৭০
৭।	বিশেষ প্রকল্প	
	ক) ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	৯৪.৯৩
	খ) মনোরম (দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র)	৪৯.৭৬
	গ) সার্ভিস সেন্টার (আপদকালীন আশ্রয় এবং সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প)	১১.৮৪
	মোট	১৫৬.৫৩
	সর্বমোট	৮৫৫.১৪

১. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ কায়েমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ আনয়নের পথ হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। যাকাত একাধারে আল্লাহর ইবাদত এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। যাকাত ব্যবস্থাই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যার দর্শন ও আদর্শের অনুসরণে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে।

ইসলামে ওশর ব্যবস্থা

ওশর পরিচিতি :

যাকাতের বিধানাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষিজ পণ্যই এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ভূমি একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। মানুষের রিযক ও জীবন ধারণের মূল উৎস এবং স্থিতি স্থাপনের ক্ষেত্র। এটা যাকাত আইনেরও মূলভিত্তি। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা অনন্য, অপূর্ব ও ইনসাফপূর্ণ। এ ভূমি ব্যবস্থারই অন্যতম দিক হল ওশর ও খারাজ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়ী মালামালের এক চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হয়। গবাদি পশুর জন্য ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ভূমির যাকাতের বিধান অন্যরূপ। কোন কোন অবস্থায় উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ দেয়া ফরয হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ ভাগ দিতে হয়। কিন্তু ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় সহজভাবে বলার জন্য 'ওশর' শব্দটি দ্বারা এর বিশ্লেষণ করা হয়। কোন জিনিসকে সমান দশটি ভাগে বিভক্ত করা হলে তার একটি ভাগকে ওশর বলা হয়। অর্থাৎ এক দশমাংশ। ওশরের অর্ধেককে আরবীতে বলা হয় নিসফুল ওশর। ইসলামী সরকার কর্তৃক ফসলের উপর আরোপিত করকে ওশর ও খারাজ বলা হয়। ওশর মুসলমানদের জমির সাথে সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট। অমুসলিমদের জমিতে ওশর নেই, আছে খারাজ। ওশরকে শুধু কর বলা যায় না, বরং একটি ইবাদাতও। এ জন্যই এটা শুধু মুসলমানদের ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কেননা এটাকে ভূমির যাকাত নামেও অভিহিত করা হয়। আবার খারাজ হচ্ছে নিছক ভূমি কর। এটা অমুসলিমদের জমির সাথে সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট। এর মধ্যে ইবাদাতের কোন দিক নেই। আর ওশর বা নিসফুল ওশর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস অনুযায়ী মুসলমানদের উপর ফরয। যেমন- আল কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং তোমাদের জন্য জমি থেকে আমরা যা কিছু উপাদন করি, তা থেকে ব্যয় করে এবং তোমাদের এই ব্যয় করণে তার মধ্যে থেকে নিকৃষ্ট জিনিসের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ কর না; কেননা অবস্থা এই যে, তোমরা নিজেরাই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া তা কখনই গ্রহণ করবে না। তোমরা অবশ্যই জানবে, আল্লাহ স্বত:ই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[১]

"তিনি আল্লাহ, যিনি নানা প্রকারের লতা-গুল্ম, যা ঝাঁকা দিয়ে উঁচুতে তুলে রাখা হয় এবং যার জন্য তা করতে হয় না, যা নিজ কান্ডের উপর দাঁড়ায়-এইরূপ বৃক্ষরাজি সংলগ্ন বাগান রচনা করেছেন; যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়; যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন-যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সদৃশ হলেও বিভিন্ন স্বাদ সম্পন্ন। তোমরা এ সবের ফল থেকে খাদ্য হিসেবে যা কিছু গ্রহণ কর যখন তাতে ফল ও ফসল ধরবে। আর তা কাটাই মাড়াই করার দিন তার উপর ধার্য আল্লাহর 'হক' দিয়ে দাও। তোমরা অবশ্যই সীমা লংঘন করবে না; কেননা, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না।"[২]

আল-কুরআনের ন্যায় হাদীসেও ওশর ফরয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবী (স.) ফসল এবং ফলের যাকাত অর্থাৎ ওশর দু'ভাবে নির্ধারণ করেছেন। যে সব জমিতে বৃষ্টির পানিতে শস্য উৎপাদিত হয়, তার জন্য ওশর অর্থাৎ এক-দশমাংশ। নানারূপ সেচের পানিতে উৎপাদিত জমির ফসলের ওশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ। মহানবী (স.) বলেছেন,"যে সব জমিতে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত হয় তাতে এক-দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে।"[৩] (আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) বর্ণিত। হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন, "পাঁচ ওয়াসাক থেকে কম যে ফসল তাতে যাকাত নেই।"[৪] আমর বিন দীনার বর্ণনা করেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ফসলকে আকাশের পানি সিক্ত করে, তাতে ওশর, আর যাকে বালতি ও রশি ইত্যাদির সাহায্যে সিক্ত করা হয় তাতে ওশরের অর্ধেক।[৫]

---

১. আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ, আয়াত-২৬৭
২. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত-১৪১
৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, বুখারী শরীফ, কিতাবুল যাকাত।
৪. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ (উর্দু), করাচী, পৃ. ২২৭
৫. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

ওশরী ও খারাজী জমি:

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দু'প্রকার-ওশরী ও খারাজী। হানাফীগণের মতে যে সব জমি ওশরী বলে প্রমাণিত হয় তার ফসলের ওশর দেয়া ফরয। আর যেসব জমি খারাজী বলে প্রমাণিত হয় তার খারাজ দেয়া ফরয। কোন মুসলমানের খারাজী জমি থাকলে তার খারাজ দেয়া ফরয, ওশর দেয়া ফরয নয়। একই জমির উপর ওশর ও খারাজ উভয়ই ফরয হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, "কোন জমির মালিক উক্ত জমির মালিক থাকা অবস্থায় যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে জমি ওশরী জমিতে পরিণত হবে।[১] তিনি আরও বলেন,"ইসলামী সরকার কোন ভূখন্ডের বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে সেখানকার জমি বন্টন করে দিলে সেসব জমি ওশরী হয়ে থাকে। কোন মুসলমান সে এলাকার কোন অনাবাদি জমি আবাদ করলে তাও ওশরী জমিতে পরিণত হবে।[২] মাওলানা হিফজুর রহমান বলেছেন, "যদি কোন গোত্র বা জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের আবাদী জমি, আরবদের জমি, মুজাহিদীন ও গণিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত জমি, পরিত্যক্ত ও কোন মুসলমান কর্তৃক আবাদকৃত জমি এবং উত্তরাধিকারবিহীন যিম্মির মৃত্যুর পর মুসলমানদের দখলে আসা জমিকে ওশরী বলা হয়।"[৩]

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী বলেন,"যদি কোন দেশ সন্ধি চুক্তি দ্বারা বিজয় হয় যে, তথাকার জনসাধারণও মুসলমান হয়ে গেছে, তবে এদের ভূমি পূর্ববৎ এদেরই মালিকানায় থাকবে এবং তাদের উপর ওশর ধার্য হয়ে তাদের ভূমি ওশরী হয়ে যাবে। ------- অথবা কোন দেশ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা জয় করার পর ইমাম যদি সেখানকার ভূমি গণিমতের নিয়ম মাফিক চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করেন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য রেখে দেন তবে মুজাহিদদের ভাগে প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি ওশরী ভূমিতে পরিণত হবে। ------- এমনিভাবে দেশ জয় হবার পর যেসব ভূমি কার মালিকানাধীন ছিল না, বরং পতিত ও অনাবাদী ছিল, ইসলামী সরকারের অনুমতিক্রমে পরবর্তীকালে সে ভূমি চাষাবাদযোগ্য করে তোলা হয়েছে অথবা কোন ঘর-বাড়ী ছিল তা বাগান ও ফসলী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। অমুসলমানদের দ্বারা আবাদ করা হলে এসব ভূমি খিরাজী হওয়া নির্ভর করে নিকটস্থ ভূমির উপর। নিকটস্থ ভূমি ওশরী হলে এসব ভূমিও ওশরী হয়ে যাবে। আর তা খারিজী ভূমি হলে এসব ভূমিও খিরাজী ভূমিতে পরিণত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদের (র.)-এর মতে যে পানি দ্বারা এ ভূমি সিক্ত হয় সে পানি ওশরী পানি হলে এ ভূমিতে ওশরী ভূমিই বলতে হবে। আর পানি খিরাজী হলে ভূমিও খিরাজী নিরূপিত হবে।[৪]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, "কোন দেশ কাফিরদের দখলে ছিল এবং তারাই সেখানে বসবাস করছিল। তারপর মুসলমানগণ আক্রমণ করে যুদ্ধের মাধ্যমে সে দেশটিকে অধিকার করে নিল এবং সেখানে দ্বীন ইসলাম প্রচার করল এবং মুসলিম বাদশাহ কাফিরদের নিকট হতে সব জমি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিল। এরূপ জমিকে শরীয়াতে ওশরী বলা হয়। যদি সে দেশের অধিবাসীগণ সকলেই স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে মুসলমান হয়ে থাকে, তবুও সেখানকার সব জমিকে ওশরী জমি বলা হবে। আরব দেশের সব জমি ওশরী।" (মাসআলা-১) তিনি আরও বলেছেন,"যদি কোন কাফির ওশরী জমি কিনে নেয় তবে তা ওশরী থাকে না। তারপর যদি কোন মুসলমানও সে সব জমি কিনে নেয় অথবা অন্য উপায়ে পায় তবুও তা ওশরী হবে না।[৫] তাঁর মতে, যে জমির অবস্থা কিছুই জানা যায় না এবং তা তখন মুসলমানদের অধিকারে আছে। তা মুসলমানদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে মনে করা হবে।[৬]

মোটের উপর হানাফীগণের মতে যে কোন জমি দুই পন্থায় ওশরী হয়। এক: কোন শহর বা দেশের ওশরী অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের জমি ওশরী হয়ে যায়। যেমন, মদীনা অথবা ইয়ামন অথবা গোটা আরব দেশের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়ায় তাদের জমি ওশরী বলে পরিগণিত হল। দুই: মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করে নেয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অধিকৃত জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সেই জমি ওশরী হয়ে যায়। যে কোন জমি ওশরী হওয়ার পর তা উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী মুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে অথবা এক মুসলিম অন্য মুসলিম থেকে ওশরী জমি খরিদ করলেও তা ওশরী থাকে।[৭]

---

১. ইমাম আবূ ইউসূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫
২. ইমাম আবূ ইউসফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৩. হিফজুর রহমান, (আবদুল আউয়াল অনূদিত), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ১০৫
৪. উশরী ও খারাজী পানি: বর্ষার পানি, কুপের পানি, প্রাকৃতিক কুপের পানি, বড় বড় নদী ও সাগরের পানি যা প্রকৃতিগতভাবেই প্রবহমান, এগুলো যেমন কোন লোক প্রবাহিত করেনি তেমনি এর মধ্যে কারোর কোন কীর্তিও নেই। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো কারোর মালিকানাধীন ও নয়, এহেন প্রাকৃতিক পানিকে শরীয়াতের ভাষায় ওশরী পানি বলা হয়। যেমন- দজলা, ফোরাত, নীলনদ, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ইত্যাদি নদ-নদীর পানি। আর যেসব নহর, নদী-নালা ও উপনদী সরকার কর্তৃক বা কোন জনসমষ্টি দ্বারা তাদের অর্থ ও শ্রম ব্যয় খনন করা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই খননকারী এর মালিক হয় এমন সব নদী-নালার পানিকে শরীয়াতের পরিভাষায় খিরাজী পানি বলা হয়। (মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু. মাও. কারামত আলী নিজামী, ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১৬৯)
৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), বেহেস্তী জেওর, মুকাম্মাল ও মুদাল্লাল (৩য় খণ্ড) উর্দু।
৬. ইমদাদুল ফতোওয়া তাতিম্মা উলা, পৃ.৫০, উদ্ধৃত, সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, উশর, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ১১
৭. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্য দিকে হানাফীগণের নিকট যে কোন জমি চার পন্থায় খারাজী হয়। এক: মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নেয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেখানকার জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন না করে অমুসলিমদের মালিকানায় রেখে দিলে সে জমি খারাজী হয়ে যায়। **দুই:** কোন অমুসলিম দেশের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার পর স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়ে গেলে তাদের জমি খারাজী হয়ে যায়। কারণ এই দুই অবস্থায়ই মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত জমির খাজনা ধার্য করা হয়। এভাবে খারাজী জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী অমুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে তা খারাজীই থাকে। তিন: কোন মুসলিম কোন অমুসলিম থেকে খারাজী জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজীই থাকে, ওশরী হয় না। চার: কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের কাছ থেকে জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজী হয়ে যায়। ওশরী থাকে না।[১]

হানাফীদের মতে মুসলমানদের অধিভুক্ত জমি মূলতঃ ওশরীই হয়, যদি খারাজী হওয়ার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা খারাজী হয়। কারণ মুসলিম জাতির উপর মূলতঃ ওশর ও যাকাতের হুকুমই আরোপিত হয়, খারাজের হুকুম নয়। শরী'আতে খারাজের হুকুম অমুসলিমদের উপর আরোপিত হয়। কারণ তাদের উপর ওশর যাকাতের হুকুম আরোপ করা যায় না। এজন্য মুসলমানদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওশরী গণ্য করাই ঠিক। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে এ কথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে তা প্রথমে ওশরী কি খারাজী ছিল সে জমি ওশরী গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

ওশর ফরয হওয়ার শর্তাবলী :

ওশর ফরয হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া। কেননা, ওশরের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের দিকটিও নিহিত। এজন্য অমুসলমানদের উপর ওশর ফরয নয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ভূমি ওশরী হতে হবে। খিরাজী ভূমির উপর ওশর ফরয হয় না।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে ভূমি থেকে ফসল লাভ করা। তবে কোন কারণে ফসল উৎপাদিত না হলে ওশর দিতে হবে না। তা কোন প্রাকৃতিক কারণে হউক, অলসতা, অবহেলায় চাষাবাদ না করুক,পরিচর্যা বা রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে হউক, সর্বাবস্থায়ই ওশরের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ফসল এমন জিনিস হতে হবে যা ভূমি হতে জন্মানো ও উৎপাদন করার প্রথা রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এর চাষ করে লাভবান হতে হয়। আপনা থেকে উৎপন্ন কোন ঘাস বা অকাজের গাছ-গাছড়া যদি কোন ভূমিতে হয়, তবে তার ওশর হয় না। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যদি ঘাস, বাঁশ জন্মানো হয় তবে তাতে ওশর হবে। আর আপনা হতে কোন গাছ জন্মিলে তাতে ওশর হয় না।[২]

ওশর ফরয হওয়ার জন্য বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। তাই ওয়াকফ করা জমিতেও ওশর ফরয। এমনিভাবে যার নিজের কোন জমি নেই, সে কার থেকে ঋণ বা ইজারা ও ভাড়া হিসেবে ভূমি গ্রহণ করে তাতে চাষাবাদ করে ফসল ফলালে উৎপন্ন ফসলের ওশর আদায় করা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব হয় যে ফসল লাভ করে। ভূমির মালিকের উপর এ দায়িত্ব বর্তায় না।[৩]

এ থেকে এও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি তার জমি নগদ টাকায় ভাড়া দেয় তবে ফসলের ওশর জমির মালিকের উপর ফরয হবে না। যে লোক ভাড়া বা লাগিত নিয়েছে তাকেই ওশর আদায় করতে হবে। কেননা সে-ই চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করেছে। এমতের উপরই ফতোয়া হয়েছে। ----- কেউ যদি ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার শর্তে জমি বর্গা দেয় যেমন $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৩}$ কিংবা $\frac{২}{৩}$ তবে উভয়কেই নিজ নিজ অংশ হারে ওশর দিতে হবে।[৪]

কোন লোক ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করে চাষাবাদ করলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের উপরই ওশর ফরয হবে। ব্যবসায় যাকাত ফরয হবে না। ওশরী জমির চাষাবাদে যদি বৃষ্টি ও পুকুর বা কুয়ার পানি দিয়ে সিক্ত করা হয় তবে অধিকাংশের মতের ভিত্তিতেই ওশর নির্ধারিত হবে। যেমন বৃষ্টির পানিতে বেশি সিক্ত হলে ওশর আর পুকুর, কুপ ইত্যাদির পানিতে বেশি সিক্ত করা হলে অর্ধেক ওশর দিতে হবে।[৫] আর উভয় প্রকার পানিতে যদি সমান সমান সিক্ত হয় তবে অর্ধেক ফসলে ওশর এবং অর্ধেক ফসলের অর্ধ-ওশর ফরয হবে।[৬]

---

১. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২. আল বাদায়েউ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে, মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-৯৩
৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪
৪. অধ্যাপক মো: রুহুল আমীন, ইসলামের দৃষ্টিতে ওশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, ইসলামিক ইকনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৪৭
৫. আল বাদায়েউ, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২
৬. ইমদাদুল ফতওয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন খরচ বাবদ উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ বাদ দেয়ার পর যদি তার পরিমাণ ২৬ মণ বা তার অধিক হয় তবে ওশর প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেছেন, মোট উৎপাদিত ফসলের উপরই ওশর, অর্ধ-ওশর ওয়াজিব। চাষ, বীজ, বপন, শ্রমিক, সংরক্ষণ প্রভৃতি খরচ ওশর আদায়ের পরেই নির্ধারণ করতে হবে। ওশরের সাথে এসব খরচের কোন সম্পর্ক নেই।[১]

ওশর ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত

ওশর জমির উৎপন্ন কৃষিজ সম্পদের যাকাত কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। কৃষিজ পণ্যই যাকাতের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, কৃষিপণ্যই যেমন মানুষের জীবন ধারনের মূল উৎস, তেমনি এটা আবার যাকাত দর্শনেরও মূল ভিত্তি। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। আর অন্যান্য ধন-সম্পদ যেমন-সোনা, রূপা, পশু এবং ব্যবসা পণ্যের ইসলামী বিধান মুতাবিক অপরিহার্য দেয়কে যাকাত বলে। যাকাত ও ওশরের আদায় করার বিধি-বিধানে বেশ পার্থক্য রয়েছে। তাই ইসলামে ওশরকে যাকাত থেকে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে ওশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে-

(ক) ওশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফসলের ওশর দেয়া ফরয হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।[২] এ পার্থক্যের কারণে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ওশর ফরয হয়।

(খ) ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়।[৩] কিন্তু ওশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(গ) ওশর ফরয হওয়ার জন্য আকেল বা বালেগ অর্থাৎ সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল ব্যক্তির ফসলেরও ওশর ফরয হয়, কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।[৪]

(ঘ) ওশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কার জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল উপার্জন করে অথবা ওয়াক্ফকৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে ওশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।[৫]

মোটের উপর জমির বা জমির উৎপন্ন ফসলের মালিক শিশু, বালক, বালিকা বা পাগল হলেও ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে তার জমির উৎপন্ন ফল-ফসল থেকে ওশর অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। কেননা, ধন-সম্পদের যাকাত হচ্ছে বিশুদ্ধ ইবাদাত; তাতে নিয়তের প্রয়োজন, যা একজন পূর্ণাঙ্গ বয়স্ক ও সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মালিকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ওশর এক দিক দিয়ে ইবাদাত বটে; তবে তাতে 'খাদ্য সরবরাহের তাৎপর্য নিহিত। 'ওশর' ইবাদাত হওয়ার কারণে মালিকের শুধু মুসলিম হওয়া শর্ত, এ কারণে কাফিরের নিকট থেকে 'ওশর' নেয়া যাবে না।

ওশরী ফসল :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, "জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, যা ফলিয়ে জমির প্রবৃদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয় এবং বাগানসমূহে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার সব কিছুতেই ওশর ফরয, তার কোন স্থায়ী অর্থাৎ টিকে থাকা ফল হউক, আর নাই হউক। গম,বার্লি, কিসমিস ও খেজুর প্রভৃতি স্থায়ী থাকা ফল-ফসল, আর কাঁচা শাক-সবজি, কাঁচা ফল, যেমন- পেঁপে, কচু, কুমড়া, শশা, ঝিংগা ইত্যাদি, নল-খাগড়া, ইক্ষু, বাঁশ ইত্যাদি সব কিছুতেই ওশর ধার্য হবে।"[৬] কিন্তু ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.) বলেছেন, "খেজুর, আঙ্গুর, গম, বার্লি, মটর, কলাই (বিভিন্ন প্রকার ডাল), চাল ও অন্যান্য যা কিছু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কেবল তাতেই ওশর-যাকাত ফরয। এগুলো ছাড়া অন্য কিছুতেই ওশর ফরয নয়।"[৭]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
২. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ), আল-হিদায়া (১ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৫
৩. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৪. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৬. ফারিশতা জ.দ. য়ায়াস, অনু. হুমায়ূন খাঁন, যাকাতের আইন ও দর্শণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২০২-২০৩
৭. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত, ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) মতে, "(ওশরী) জমিতে উৎপন্ন এমন সব ফসলের উপরই কেবল ওশর আরোপিত হবে, যা মানুষের নিকট সঞ্চিত ও সংরক্ষিত করে রাখা যায়। যে সব জিনিস সঞ্চিত করে রাখা যায় না, যেমন- শাক-সবজি, চারা এবং ইন্ধন বা জ্বালানী এসবের উপর ওশর নেই। যে সব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় না (নষ্ট হয়ে যায়), যেমন-তরমুজ, কাঁকরল, লাউ, খিরা, গাঁজর, বেগুন, বিভিন্ন তরি-তরকারী, তুলসী পাতা, নানারূপ সুবাসিত চারা এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের ওশর নেই।"[১]

তিনি আরও বলেন, "যে সব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় (নষ্ট হয় না), ওজনের পাত্রে ও পাল্লায় মাপা যায়, যেমন-গম, যব, ভুট্টা, ধান-চাল, অন্যান্য খাদ্য-শস্য, পাট, বাদাম, চাল গুঁড়া, আখরোট, পেস্তা, জাফরান, যয়তুন, ধনিয়া, জিরা, মিঠা জিরা, পেঁয়াজ, রসুন এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস জমিতে পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার অধিক উৎপন্ন হলে তার ওশর বা ওশরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব।"[২]

এরূপ আলু, মসুর, বুট, খেসারী প্রভৃতি ডাল, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি শুকনো ফল-এসবের উপরও যাকাত ফরয, যদি তা পাঁচ ওয়াসাক বা তার বেশী উৎপন্ন হয়। এর কম হলে যাকাত ফরয হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) মতে, "আখ ও বাঁশ ওশরী জমিতে হলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা আখ খাদ্য জাতীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত। বাঁশ খাদ্য জাতীয় না হলেও এক মূল্যবান ও উপকারী জিনিস।[৩]

যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না, যেমন-জাফরান ও তুলা এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন,"যখন এগুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়ে যাবে তখন তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।[৪]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)বলেন, "মধু যদি ওশরী জমিতে পাওয়া যায় বা আহরণ করা হয় তাহলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। আর খারাজী জমি, ময়দান, পাহাড়-পর্বত, বন, বৃক্ষাদি বা গুহায় পাওয়া গেলে কিছুই দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যে সব ফল, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা বা বনে-জঙ্গলে উৎপন্ন হয় তাতে ওশর বা খারাজ নেই।

অনুরূপভাবে নারিকেল, জ্বালানী কাঠ, ঘাস, ভূষি ও খেজুরের ডাল-পালা ইত্যাদিতে ওশর নেই।[৫] ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে, মধু অল্প হোক বা বেশী তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। তিনি এতে কোন নিসাব ধার্য করেনি।[৬] ইমাম যুহরী, ইমাম আওযায়ী প্রমুখের মতেও মধুতে ওশর দিতে হবে। কিন্তু ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.), ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে,মধুতে কোন যাকাত নেই।[৭]

ওশরের নিসাব বা পরিমাণ :

কি পরিমাণ ফসলে ওশর ফরয হবে এ নিয়ে বেশ মত পার্থক্য রয়েছে। তবে কি পরিমাণ ওশর আদায় করা ফরয হয় তার বিশ্লেষণে নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ভূমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে ওশর (এক দশমাংশ) ফরয হয়। আর বড় বড় বালতি বা পাত্র দ্বারা কুপ হতে পানি উঠিয়ে যে ভূমিতে ফসল ফলানোর জন্য পানি সেচন করা হয়, তার ফসলের ওশরের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ এক অংশ ওশর আদায় করা ফরয হয়। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযা) এটি একটি সাধারণ অর্থবোধক সহীহ হাদীস। এর সাধারণ অর্থবোধকতা থেকেই ইমাম আবু হানিফা (র.) ও অন্যরা জমির ফসলে কোন নিসাব ধার্য করেন নি। বরং যতটাই উৎপন্ন হোক তাতে ওশর বা ওশরের অর্ধেক দেয়া ফরয। এমনকি তরি-তরকারি, শাক-সবজি প্রভৃতি যে সব জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা যায় না, তাতেও যাকাত ওয়াজিব। কেবল ঘাস, বাঁশ ও নারিকেলে যাকাত নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।[৮]

---

১. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
২. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৩. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৪. বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
৫. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৬. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
৭. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
৮. বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান ফল ও ফসলের নিসাব নির্ধারণের পক্ষে। কেননা নবী করীম (স.) বলেছেন, "পাঁচ ওয়াসকের কম পরিমাণে যাকাত নেই।" পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। তবে পাঁচ ওয়াসাক বলতে কত পরিমাণ বুঝাবে এ নিয়ে সর্বত্রই কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এক ওয়াসাকে ৬০ সা' হয়ে থাকে। ফতোয়া দেওবন্দের হিসেব মতে, ১ সা'র পরিমাণ ৩ সের। কিন্তু ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মতে, পাঁচ ওয়াসাকে আমাদের দেশী ওজনের প্রায় ১৭ মণ।[১] মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ উরূজের মতে ১৮ মণ ৩০ সের। ৩৫ আল্লামা ইউসুফ কারজাভীর মতে ৬৫৩ কেজি।[২] পাকিস্তানের যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নের সময় এ পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সর্বশেষ সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পাঁচ ওয়াসাকে হবে ৯৪৮ কেজি বা সাড়ে ২৬ মণ। পাকিস্তানের যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা আলিমদের মতামত নেয়া হয়। কাজেই এ মতকে এ যুগের আলিমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও এ মতের উপর আমল করা উচিত হবে।[৩]

উল্লেখ যে, সাহেবাইনের[৪] মতে, বিভিন্ন প্রকার ফসলের নিসাবের হিসেব আলাদাভাবে করতে হবে। সব রকম ফসলকে যোগ করে নিসাব নির্ধারিণ করা যাবে না। যেমন-ধান, ছোলা, গম, প্রভৃতি ফসল মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হয়েছে কিনা তা হিসেব করলে চলবে না। আলাদাভাবে মাপার পর ধান যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে তাতে ওশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে ছোলা বা গম প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর ফসল আলাদাভাবে মাপার পর নিসাব পরিমাণ হলে তাতে ওশর দিতে হবে। না হলে দিতে হবে না। তবে ভিন্ন জাতের ধান একসাথে সাদা ও লাল গম এক সাথে এবং বিভিন্ন রকম ডাল এক সাথে হিসেব করলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে ওশর দিতে হবে। না হলে নয়।[৫]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অপর বর্ণনায় বলেছেন,"যদি কোন ওশরী জমিতে আড়াই ওয়াসাক গম ও আড়াই ওয়াসাক যব উৎপন্ন হয়, তবুও তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি এক ওয়াসাক গম, এক ওয়াসাক যব, এক ওয়াসাক ধান, এক ওয়াসাক খেজুর ও এক ওয়াসাক কিসমিস উৎপন্ন হয় এবং সব মিলে পাঁচ ওয়াসাকে পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাতেও ওশর দিতে হবে।"[৬]

আবার কোন ভূমির পানি সেচন যদি কিছু বৃষ্টির পানি এবং কিছু কুপের পানি দ্বারা করা হয়, তখন এক্ষেত্রে অধিক পানি যা থেকে লাভ হবে তদানুযায়ী বিধান হবে। অর্থাৎ বৃষ্টি-বাদল দ্বারা অধিক পানি সেচন হলে তখন উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ আদায় করা ফরয হয়। আর কূপ, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে অধিক পানি সেচন হলে তখন উৎপন্ন ফসলের এক-বিশমাংশ আদায় করা ফরয হয়। আর যে ভূমিতে বৃষ্টির পানি, কূপ বা খাল-বিলের পানি উভয় পদ্ধতিতে সমান ভাবে সেচন করা হয়, সেক্ষেত্রে অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের প্রতি ওশর (এক-দশমাংশ) এবং দ্বিতীয় অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের প্রতি এক-বিশমাংশ (নিসফে ওশর) প্রযোজ্য হয়।[৭]

ফল শুকানোর পর এবং কৃষি ফসলের খোসা পরিষ্কার করার পর নিসাব করতে হবে। তবে যা খোসাসহ পেষা ও গুড়ি করা হয় তা খোসাসহই হিসেব করতে হবে। যেমন-ধান মাড়িয়ে খড় ও আবর্জনা মুক্ত করে মাপতে হবে, চাল করতে হবে না। গম, খড় মুক্ত করে মাপতে হবে।

যাকাত ব্যয়ের যে আটটি খাত ওশরের ব্যয়ের খাতও আটটিই। খাতগুলো (১) ফকির বা দরিদ্রগণ (২) মিসকীনগণ (৩) যাকাতের তহসিলদারগণ (৪) যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট (৫) দাসত্ব মুক্তিতে (৬) ঋণীগণ (৭) আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং (৮) মুসাফিরগণ।[৮]

সরকারী খাজনা ও ওশর :

সরকারী খাজনা দিলেও ওশর আদায় করতে হবে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর ধার্য করা জরুরী শর্ত। অমুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমি কর ধার্য করলে তাতে কোন জমি খারাজী বলে পরিগণিত হয় না। এরূপ করকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে খারাজ বলে গণ্য করা ঠিক নয়। সুতরাং কোন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমিকর পরিশোধ করলে যেমন যাকাত আদায় হয় না তেমনি ওশরও আদায় হয় না। বরং এ দু'টি ফরয অনাদায়ী থেকে যায়। কারণ-

---

১. ইমাম আবূ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
২. সায়িদ আহমদ উরূজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭
৪. শাহ্ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৬০
৫. ইমাম আবূ হানীফার (র.) বিখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানকে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়।
৬. আল্লামা কাসানী, বাদায়েউস সানীয়ে, ২য় খন্ড, মিসর, পৃ. ৬০
৭. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
৯. আল-কুরআন, ৯:৬০

Dhaka University Institutional Repository

(১) এদেশের সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা জমির মালিকানার ভিত্তিতে হয়, ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে হয় না। তাই জমির সম্পূর্ণ খাজনা শুধু তার মালিকের কাছে থেকেই মালিকানার ভিত্তিতে আদায় করা হয়। কিন্তু যে চাষী জমির মালিক নয় তার নিকট থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় না। তাছাড়া জমিতে ফসল উৎপন্ন হউক বা না হউক সরকারী খাজনা দিতেই হয়।

(২) ওশর জমির ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে ফরয করা হয়েছে। তাই কোন মুসলিম জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন কারণে তার ফসল না পায় তার উপর ওশর ফরয হয় না। আবার কোন মুসলিম চাষী কোন ওশরী জমির মালিক না হলেও সে যদি তার ফসল পায় তবে সেই ফসলের মালিক হওয়ার কারণে ওশর দান করা তার উপর ফরয হয়।

(৩) খাজনা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের উপর আরোপ করা হয় কিন্তু ওশর শুধু মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে।

(৪) ইসলামে মুসলিমদের উপর ওশর এবং অমুসলিমদের ওপর খারাজ আরোপ করা হয়েছে। হানাফীদের মতে কোন জমির উপর শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী খারাজ আরোপিত হলে তা খারাজী হয়ে যায় এবং তার ফসলের উপর ওশর আরোপিত হয় না। অনুরূপভাবে কোন ওশরী জমির উপর খারাজ হয় না।[১]

(৫) মুসলিম সরকার কর্তৃক খারাজ আরোপ করতে হয়। অমুসলিম সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন কর খারাজ বলে গণ্য হবে না।

(৬) জমির উৎপাদিত মোট ফসলের $\frac{১}{৫}$ এর কম এবং অর্ধেকের বেশী খারাজ আরোপ করা যাবে না। জমিতে ফসল উৎপন্ন না হলে খারাজও দিতে হবে না। এটি বর্গার মত। একে খারাজে মুকাসামা বলা হয়। খারাজ এভাবে ধার্য না করে জমির পরিমাপ, মান ও ফসলের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি কর নির্ধারণ করা হয় এবং খাজনা জমির ফসলের আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশের মূল্যের কম ও অর্ধেকের মূল্যের বেশী না হয়, তবে একে খারাজে মুআজ্জাফ বলে। নিজ অবহেলা ও অলসতার কারণে উৎপাদন না করলে এর খারাজ আদায় করতে হবে।[২]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) মুহাম্মদ শফী (র.) প্রমুখের মতে, সরকারী খাজনা আদায় করলে ওশর আদায় হবে না। কারণ, এ খাজনা শরয়ী খাজনা নয়। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন,"কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট থেকে যে ইনকাম ট্যাক্স আদায় করে আসছে সেটা যাকাতের নীতি অনুযায়ী আদায় করা হয় না এবং যাকাতের নামে আদায় করে তা যাকাতের খাতেও ব্যয় করে না। অনুরূপভাবে জমির যে সরকারী খাজনা আদায় করে তাও ওশর ও খারাজের শরয়ী নীতির অধীনে আদায় করে না। আবার তার খাতে খরচ করারও কোন ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রের আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স অথবা জমির সরকারী খাজনা দিলে যাকাত ও ওশরের ফরজ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায় না। এ দায়িত্ব বহাল থাকে। বরং সম্পদের মালিকদের নিজ নিজ যাকাত ও ওশর বের করে তার খাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।[৩]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, "আমি এটাই অবগত আছি যে, এতে ওশর আদায় হবে না। যেমন: ইনকাম ট্যাক্স দ্বারা যাকাত আদায় হয় না।"[৪]

সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে ওশরের গুরুত্ব

বাংলাদেশের জমি ওশরী কি না :

উপর্যুক্ত শর্তগুলো সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে শরয়ী খারাজ নেই, কোনদিন ছিল কিনা তাও বলা যায় না। তাই এদেশে মুসলমানদের কোন জমি এখন খারাজী বলে প্রমাণিত হয় না। আর খারাজী প্রমাণিত না হলে তা ওশরী বলে গণ্য হবে এবং ওশর দিতে হবে। মুসলমানদের মালিকানা ভুক্ত ও অধিকৃত জমি একবার ওশরী বলে গণ্য হলে তা তাদের দখলে থাকা পর্যন্ত ওশরীই থাকে। সরকার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তনে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। কারণ, ওশর কোন রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক ধার্য কর নয়। যাকাত ও ওশরকে মহান আল্লাহ ইবাদাত হিসেবে ফরয করেছেন। তাই কোন সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর দান করা হলে যাকাত ও ওশর কোনটাই আদায় হয় না, বরং উভয়ই ফরয হিসেবে বলবৎ থাকে।

---

১. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, উশর, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯২, পৃ.৮
২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

এই মৌলিক নীতিমালার আলোকে এবার বাংলাদেশের মুসলমানদের জমি-জমা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, মুসলমানগণ এদেশকে জয় করে অধিকার করেছিলেন এবং মুসলিম বাদশাহগণ এ দেশের জমি মুসলমানদেরকে দান করেন। এছাড়া মুসলমানগণ এদেশের বহু জমি চাষাবাদ করেছেন। আবার মুসলিম অভিযানকালে বহু এলাকার অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সব অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সব জমিকে ওশরী বলে অবশ্যই গণ্য করা উচিত।

বাংলাদেশ ১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ছিল মুসলিম শাসকদের অধীনে। প্রায় ৬৪০ খ্রীঃ হতে এদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এ আলোকেই বিচার করতে হবে বাংলাদেশের ভূমি ওশরী নাকি খারাজী।

(ক) বাংলাদেশ মুসলমানদের জয়ের পূর্বে বা পরে এ দেশের যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মালিকানাধীন জমি ওশরী।

(খ) যুদ্ধে জয়ের পর মুসলিম শাসকগণ বিজিত এলাকার যে সব জমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেছেন সে সব জমি ওশরী।

(গ) ওয়াক্‌ফকৃত জমি এবং মুসলিম সরকার আলিম ওলামা ও পীর আউলিয়াকে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমতের জন্য যে সব জমি দান করেছেন সে সব জমি ওশরী।

(ঘ) মুসলিম সরকার এদেশে কোন জমিকে ইসলামের বিধান মুতাবিক খারাজী বলে ঘোষণা করেছেন কিনা, করলে তা কোন কোন এলাকার জমি, তার কোন প্রমাণ নেই। অতএব, বর্তমানে পৈত্রিকসূত্রে যে সব জমি মুসলমানদের মালিকানাধীন আছে সে সব জমি ওশরী। যে সব জমি কোন অমুসলিম থেকে কোন মুসলমান খরিদসূত্রে বা অন্য কোন বৈধ উপায়ে মালিক হয়েছেন, কেবল সে সব জমি খারাজীরূপে গণ্য হবে। তবে মধ্যস্বত্ব ভোগী জমিদার, তালুকদার থেকে নেয়া বা পাওয়া জমির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

(ঙ) বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এদেশের জমি বণ্টন করে দেয়ার কোন প্রমাণ নেই।

(চ) এদেশের সব জমি বায়তুল মালের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার প্রমাণ নেই। অবশ্য পরাজিত রাজা ও তার সামন্তদের ব্যক্তিগত জমিগুলো কোথাও কোথাও মুসলিম সরকারের কবজায় রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ছ) বিজিত এলাকার জমির সাবেক মালিকদের মালিকানা পূর্বের ন্যায় বহাল রেখে সমস্ত জমির উপর মুসলিম সরকার খারাজ আরোপ করেছেন। কোন মুসলিম শাসক এদেশের জমির মালিকদের তাদের জমির মালিকানা ভোগ দখল, হস্তান্তর বা বেচাকেনা থেকে বেদখল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তাই বাংলাদেশের জমির অবস্থা বর্তমানে পাকিস্তান ও ভারতের জমির অনুরূপ[১] অর্থাৎ বাংলাদেশের জমি ইসলামের বিধি অনুযায়ী ওশরী। কেননা এ দেশের জমির পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া যায়। যেমন-

১. মুসলিম বাদশাহের সময় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি (২) বাদশাহী আমলের ওয়াকফকৃত জমি (৩) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি, কিন্তু তা বাদশাহী আমল থেকে নয় এবং কিভাবে অধিকারে এসেছে তা জানা যায় না; (৪) যে সব জমি মুসলিমগণ খরিদ করেছেন অথবা দান কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে পেয়েছেন। আর যারা বিক্রি বা দান করেছেন কিংবা অসিয়ত করেছেন তারাও মুসলিমদের কাছ থেকেই হাসিল করেছেন এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। (৫) এমন জমি যা মুসলিমদের কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য মুসলিমদের মালিকানায় এসেছে এবং উপরের দিকে খোজ করে জানা যায় না যে, মুসলিমদের মালিকানায় আছে, কিন্তু পূর্বেকার অবস্থা জানা যায় না যে লোকেরা কিভাবে এ জমি হাসিল করেছে। (৭) এমন জমি যা ইংরেজ সরকার কোন মুসলিমকে দিয়েছে। কিন্তু তা প্রথমে কার ছিল তা জানা যায় না; (৮) এমন সব অনাবাদী জমি যা মুসলিমগণ আবাদ করেছেন এবং তা কারও দখলে ছিল না। (৯) মুসলিমগণ নিজেদের বাসস্থানের যে সব জমি আবাদ করেছেন।[২]

তাই এদেশে মুসলিমদের কোন জমি সাধারণত খারাজী হওয়ার সম্ভাবনা কম। বস্তুতঃ আজ থেকে প্রায় আটশত বছর পূর্বে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জী প্রায় বিনা যুদ্ধে এদেশ দখল করে নেন। তারপর এদেশের বহু অধিবাসী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়। এ দীর্ঘ পরিক্রমায় এদেশে বহু বিপ্লব ও পরিবর্তন, উত্থান ও পতন ঘটেছে। তাই দীর্ঘ সময়ে এদেশের জমি সম্পর্কে আইন-কানুন জারী হয়েছে। এখন দেশের প্রত্যেকটি জমি সম্পর্কে সেই সময়কার সঠিক অবস্থা এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের জমি সম্পর্কে সাধারণ অবস্থার আলোকেই আলিমগণ নিজেদের মতামত পেশ করেছেন। যেমন-মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেছেন,"যে সব জমি সম্পর্কে এরূপ যথেষ্ট

১. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১
২. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণাদি পাওয়া যায় না যে, প্রথমে এসব জমির মালিক ছিল অমুসলিমগণ। পরে তাদের থেকে খরিদ বা অন্য কোন সূত্রে মুসলমানদের মালিকানায় এসেছে সে সব জমিকে ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী 'বর্তমানে জমি যে অবস্থা'য় আছে তারই আলোকে প্রথম থেকেই মুসলমানদের মালিকানা ধরে ওশরী বলা যাবে।"[১]

তিনি আরও বলেছেন,"ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব জমির মালিকানা চলে আসছে এবং কোন অমুসলিম মালিক থেকে তা খরিদ করার কোনরূপ তথ্য ও দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই, তবে ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী "বর্তমানে মালিকানার কি অবস্থা" সে মুতাবিক সে সব জমির প্রথম মালিক মুসলমানদেরকেই মনে করতে হবে। যদিও সে অঞ্চলের সাধারণ জমিসমূহের উপর প্রথম বিজয়কালে সাবেক মালিক অমুসলিমদের মালিকানা বহাল রাখা হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। কেবল একমাত্র এ কারণে বর্তমানে কোন মুসলমানের মালিকানাধীন জমির মালিকানাকে সন্দেহ যুক্ত বলা যেতে পারে না।"[২] এর সম্ভাব্য কারণ অনেক। এসব কারণের মধ্যে এটাও হতে পারে যে, ভূখন্ডটি অনাবাদী, পতিত ও লাওয়ারিশ ছিল, তাই তা বায়তুলমাল অর্থাৎ সরকারের খাস জমির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পরে বায়তুলমালের তরফ থেকে জায়গীরদারী হিসেবে কিংবা সমমূল্যে বিক্রির মাধ্যমে কোন মুসলমানই হয়ত এ জমির প্রথম মালিক হয়ে গিয়েছে।[৩]

এছাড়া ইসলামী বিজয়ের পর সরকারের অনুমোদনক্রমে যে সব জনপদ ও শহর গড়ে উঠে সে সব স্থানের ভূমির মালিক 'অনাবাদী ভূমি আবাদনীতি' অনুযায়ী মুসলমানরাই ছিল। প্রাকৃতিক নদ-নদীর পানি দ্বারা এসব জমি সেচ কাজ হয়ে থাকলে ইমাম আবূ হানিফার (র.) মতে, এগুলো ওশরী জমিরূপে গণ্য হবে।[৪]

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেছেন,"বর্তমানে যে সব ভূমি মুসলমানদের থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর হয়েছে, এসব ভূমির সবই ওশরী ভূমি হবে। মাঝপথে যদি কোন অমুসলমান এ ভূমির মালিক হয়ে থাকে তবে তা ওশরী ভূমি হচ্ছে না। আর যেসব ভূমির অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানার উপায় নেই এবং বর্তমানে তা মুসলমানদের কাছেই রয়েছে তা অবস্থার তাগীদে বুঝতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে থেকেই তা লাভ করা হয়েছে। এ ভূমিও ওশরী ভূমির অন্তর্ভূক্ত হবে।"[৫]

সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী বলেছেন,"মুসলিমদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওশরী গণ্য করাই ঠিক। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে একথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে,তা প্রথমে ওশরী কি খারাজী ছিল, সে জমি ওশরী গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।"[৬]

উপর্যুক্ত যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের জমির উপর কোনরূপ শরয়ী খারাজ বর্তমানে নেই এবং কোনদিন ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানাও যায় না। কাজেই এদিক থেকেও এদেশে মুসলমানদের কোন জমি এখন খারাজী বলে প্রমাণিত হয় না। আর খারাজী বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জমি ওশরী বলেই পরিগণিত থাকবে এবং ওশরও দিতে হবে।

বাংলাদেশের জমি, ফসল ও ওশর :

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল মুসলিম অধ্যুষিত একটি দরিদ্র দেশ। ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল (১,৪৩,৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার) আয়তনের এদেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটার গড়ে বাস করে ৭৭৪ জন মানুষ। বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭% । মানুষের গড় আয়ূ ৪৭ বছর। জনসংখ্যা ৮০% গ্রামে বাস করে। এদেশের প্রায় ৪.৫ কোটি মানুষ ভূমিহীন। প্রায় ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র সীমার নিচে।[৭]

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮০ শতাংশ, জনসংখ্যা মোট কর্ম-সংস্থানের ৮০ শতাংশ এবং রফতানীর ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে।[৮]

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৭
২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-৭৮
৩. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮
৫. ইমদাদুল ফতোয়া, ১ম পরিশিষ্ট, পৃ.৫০
৬. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৭. বাংলাদেশ মসজিদ মিশন বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫, পৃ.৯
৮. অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমি ৬.৮৫ মিলিয়ন একর। চালের ঘাটতি ১৯৭৬ সালে ছিল ২৩৬০০০ টন। আরেক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, দেশের চাষাবাদযোগ্য মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৩২ লাখ ২৫ হাজার ৪ শত ৩৬ একর। এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১ কোটি ১৬ লাখ ৮২ হাজার ৩ শত ১৬ একর। দুই ফসলী জমির পরিমাণ ৮১ লাখ ৯৮ হাজার ৯শত ৮০ একর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১৪ লাখ ৭১ হাজার ৭শত ৩৫ একর।[১]

এবার আমরা দেখতে পারি বাংলাদেশের এসব জমি হতে কি পরিমাণ ফসল ও উক্ত ফসল হতে সম্ভাব্য কি পরিমাণ ওশর আসতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব শাহ্ আবদুল হান্নান এ বিষয়ে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন যা অত্যন্ত যুগোপযোগী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধ হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশে খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয় ২ কোটি টন। এর মধ্যে ওশরযোগ্য ৭৫ লাখ টন। এর থেকে অর্ধ ওশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধরলেও ওশর পাওয়া যাবে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টন। এছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন: চা, পাট, ডাল, তামাক প্রভৃতি থেকেও অর্ধ-উশর হিসাবে কয়েকটি কোটি টাকা পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, "ওশরের পরিমাণ একটি স্বাভাবিক বৎসরে বাংলাদেশে অন্তত দুই কোটি টন খাদ্য শস্য (চাল-গম ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের জনগণের এক বড় অংশ ভূমিহীন কৃষক। তাদের হাতে জমি নেই। জমির অর্ধেক পরিমাণ রয়েছে স্বচ্ছল বা বড় কৃষকদের হাতে। কাজেই বাংলাদেশের উৎপাদিত খাদ্য শস্যের অন্তত ৭৫ লক্ষ টন উৎপাদন করে থাকে স্বচ্ছল কৃষকগণ এবং তাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ নিসাবের অতিরিক্ত হয়ে থাকে, যা যাকাতযোগ্য। যদি এই ৭৫ লক্ষ টনের উপর অর্ধ ওশর (৫%) আদায় করা হয় তবে ওশরের পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, যার মূল্য হবে কমপক্ষে ৪০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল (যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ হবে অনন্তঃ ৫০০ কোটি টাকা) হতে অর্ধ-উশর (৫%) আদায় করা হলে ২৫ কোটি টাকার ওশর আদায় হবে। এ হিসেবের জন্য আমরা ধরে নিয়েছি যে, সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং তাই ওশর (১০%) আদায় না করে অর্ধ-ওশর আদায় করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক জমির ফসল হতে ওশর (১০%) আদায়যোগ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট ওশরের পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে।[২]

এক সরকারী হিসেবে ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসল চাষের জমির ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

ফসলের নাম	চাষের জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
ধান	২৬,৪৬,২০০০ একর	২,৩০,৬৭,০০০ মে.টন
পাট	১,০০৮,০০০ একর	৭,১১,০০০ মে. টন
গম	২,০৫৬,৯৫০ একর	১৮,৩৯,৯৮০ মে. টন
আখ	৪,২১,০০০ একর	৬৯,১০,০০০ মে. টন
চা	১,২০,০০০ একর	১,১৪,৬০,০০০ (IBS)
ডাল (সব ধরনের)	১,২৩,১,০০০ একর	৩,৮৪,০০০ মে. টন
তৈল বীজ	১০,৭৮,০০০ একর	৪,০৬,০০০ মে. টন
মসলা	৬,২৩,০০০ একর	৪০,১০০০ মে. টন
তামাক	৮০,০০০ একর	৩৫,০০০ মে. টন
ভূট্টা	৮,০০০ একর	৪,০০০ মে. টন
জাওয়ার	২,০০০ একর	১,০০০ মে. টন
বার্লি	১,৭০০ একর	৫,০০০ মে. টন
গোল আলু	৬০,১০০০ একর	২,৯৩,৩০০ মে. টন
মিষ্টি আলু	১০,১০০০ একর	৩,৭৮,০০০ মে. টন
শুকনো মরিচ	৪,৩৩,০০০ একর	১,৪৩,০০০ মে. টন
পিঁয়াজ	৮৪,০০০ একর	১,৩৪,০০০ মে. টন.
রসুন	৩৩,০০০ একর	৪০,০০০ মে.টন
সুপারি	১,৯০,০০০ একর	৪৪,০০০ মে. টন
তুলা	৪০,০০০ একর	২৯,০০০ বেল

(BBS-Statistical year book of Bangladesh-2000, 21st.ed. Published June-2003, PP. 115-131)

---

১. দৈনিক ইনকিলাব, ৮-৬-৯৪, উপ-সম্পাদকীয়

২. শাহ্ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

এসব উৎপন্ন ফসলের সবই ইসলামের দৃষ্টিতে উশরী জমি। সামান্য পরিমাণ জমি হয়ত খারাজী হতে পারে। এ সব ফসলের অর্ধেকও যদি উশরী ফসল ধরা হয় এবং তা অর্ধ ওশর (৫%) হিসেবে গণ্য করা হয় তবে বাংলাদেশে শত শত কোটি টাকার ওশর পাওয়া যাবে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ওশর পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়। প্রচলিত খাজনা ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে জমির মালিকানার জন্য সকল নাগরিকই সমহারে খাজনা দিতে বাধ্য। এর বিপরীত ওশর (বা এক-দশমাংশ) ব্যবস্থা চালু হলে কৃষি আয় বণ্টনে বিরাজমান দুস্তর বৈষম্যের অবসান এবং সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের হ্রাস ঘটবে।[১]

যে জমিতে সেচ না দিয়েই ফসল উৎপন্ন করা যায় সেই জমির ফসলের এক-দশমাংশ বা ১০% এবং যে জমিতে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করতে হয় সেই জমির ফসলের এক-বিংশতি অংশ বা ৫% ওশর হিসেবে শরয়ী বিধান রয়েছে। জমির মালিক হয় তা সরাসরি যারা যাকাতের হকদার তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবে অথবা বায়তুলমালে জমা করে দেবে। এ ব্যবস্থার ফলে সম্পদের বিশেষ কৃষি পণ্যের আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হবে।

প্রচলিত খাজনা পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি এজন্য আরও উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর আদায় করতে হবে না। আজকে খাজনা ব্যবস্থায় বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের খাজনা ও উৎপন্নের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। পক্ষান্তরে ওশর ব্যবস্থায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী এমনকি বর্গাচাষীরা নির্যাতনমূলক খাজনা দেয়া হতে রেহাই পায় সঙ্গত কারণেই। এর ফলে ধন বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওশর আদায় করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে আমাদের সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করা অপরিহার্য। তাছাড়া ইসলামও দারিদ্র্যকে পছন্দ করেনি। আল-কুরআনে দারিদ্রকে নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "দারিদ্র্য অন্তরকে কঠোর করে দেয়।[২]

"দারিদ্র মানুষকে কুফরির পর্যায়ে নিয়ে যায়" (আল-হাদীস)। ইসলাম অনুমোদিত বৈধ নিকৃষ্ট কাজের অন্যতম হল ভিক্ষাবৃত্তি।

দারিদ্র্য নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালানো ইসলামের বিধিবদ্ধ ফরযের পর অন্যতম ফরয। দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করা একটি দীনি কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্যতম পন্থা হল যথার্থভাবে ওশর ব্যবস্থা কায়েম করা। এ ব্যাপারে আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ,সমাজবিদ ও অন্যান্য সবারই উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এজন্য ওশর সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান জনগণকে জানানো অত্যন্ত জরুরী। কেননা, জনগণ এ সম্পর্কে অবহিত নয়।

ইসলামে খারাজ ব্যবস্থা

খারাজ কি?

মুসলমানগণ যুদ্ধ করে কিংবা সন্ধির ভিত্তিতে অমুসলিমদের যে এলাকা দখল করে নেয়, সেই এলাকার জমি জায়গা, তা পূর্ব মালিকের দখলে থাকতে দেয়ার শর্তে তার উপর যা কিছু ধার্য করে দেয় তাই খারাজ নামে অভিহিত।[১] মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল খারাজ বা ভূমি রাজস্ব (Land Tax)। খারাজ হচ্ছে অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমিকর। অমুসলিম কৃষিজীবী নাগরিকদের উপর মহানবী (স.) এ কর ধার্য করেন। বিজিত দেশে যে সব ভূমি মহানবী (সা.) বিজিতদেরই অধিকারে থাকতে দিয়েছিলেন, যে সব অমুসলিমদের সাথে আপস ও সন্ধি হয়েছে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও আশ্রয়ে জিম্মিত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের জমিজমাকে খারাজী ভূমি বলা হয়। শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা জরুরী শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, খারাজ মূলত : এক ধরনের ফাই। কেননা মামুলী ধরনের যুদ্ধের পর যদি কাফিররা পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করে তাহলে তাদের কাছ থেকে লব্ধ সম্পদ ফাই হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ইমাম আবূ ইউসূফ তাঁর মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন, "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের নিকট গ্রামবাসীদের নিকট থেকে যা-ই ফিরিয়ে দেন, তা আল্লাহ, রাসূল, নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন ও নি:স্ব পথিকের জন্য ----------- যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ধন-সম্পদ সীমিতভাবে আবর্তিত হতে না থাকে।"[৩]

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশনস, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৮
২. আল-কুরআন, সূরা-আনআম, আয়াত-৪৩
৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ.২৩
৪. ইমাম আবু ইউসুফ,প্রাগুক্ত, পৃ.২৪
৫. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত ৭

Dhaka University Institutional Repository

খারাজের সূচনা ও তাৎপর্য :

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে খারাজ চালু করেন। তাঁর সময়েই সিরিয়া, ইরাক ও মিসর যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন ইরাক বিজয়ী বাহিনী প্রধান হযরত সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) মিসর বিজয়ী সেনাপতি হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা.) এবং সিরিয়া বিজয়ী সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) মুজাহিদদের দাবি অনুযায়ী বিজিত এলাকার জমিগুলো গণীমতের মাল হিসেবে তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার আহবান জানিয়ে খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে পত্র পাঠালেন। তিনি সে পত্রের জবাবে মুজাহিদদের দাবি অস্বীকার করে শুধু অস্ত্র-শস্ত্র পোশাক-বর্ম ও অন্যান্য বহনযোগ্য দ্রব্যাদি বণ্টন করার এবং জমিসমূহ সেসবের পূর্ব মালিকদের নিকট থাকতে দিয়ে জমির উপর খারাজ ধার্য করার নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীনের উপরোক্ত নির্দেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মুজাহিদ সাহাবীর মনে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণের জন্য রাজধানী মদীনায় সাহাবীদের উপস্থিতিতে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে খলিফা বললেন, 'জমিগুলি বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তাতে স্থায়ী ও বংশানুক্রমিকভাবে মীরাসী আইন কার্যকর হতে থাকবে। তা হলে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজন কী করে পূরণ করা হবে? চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশ করার ব্যয়ভার কেমন করে বহন করা যাবে? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, এ সব কাজের জন্য লোক নিয়োগ করা হবে এবং তাতে খরচ সরকারকেই বহন করতে হবে? সিরিয়া, জাযীরাতুল আরব, কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলসমূহ রক্ষার জন্য সৈন্য মোতায়েন রাখা একান্তই প্রয়োজন। তা ছাড়া আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বিশাল এলাকার পরবর্তী বংশধর, সম্ভ্রান্ত ও বিধবাদের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও সরকারের উপরই বর্তায়। আসলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখ না। এ সব কারণে জমিগুলো পূর্ব মালিকদের দখলে রেখে তাঁর উপর খারাজ ধার্য করাই উত্তম।

হযরত উমর (রা.) তাঁর মত প্রকাশকালে কুরআনের কয়েকটি আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করলেন।[১]

"আল্লাহ যা কিছু গ্রামবাসীদের থেকে তাঁর রাসূলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তা আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, নিকটবর্তীদের জন্য, ইয়াতীম মিসকীন ও নি:স্ব পথিকদের জন্য যেন ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেবেন তা-ই তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন আযাবদাতা।" "যেসব লোক তাদের ঘরবাড়ী ও ধন-মাল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, সেই মুজাহির ফকীরদের জন্য। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। বস্তুত: তারাই সত্যবাদী সততাপন্থী।"

"আর যারা তাদের পূর্বেই ঘর-বাড়ী ও ঈমানের আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের নিকট হিজরত করে আসা লোকদেরকে তারা ভালবাসে, তাদের যা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের মনে তা থেকে কিছু পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না; বরং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় তাদের নিজেদের ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও। বস্তুত, যে লোকেরা নিজের মনের লোভ সংবরণ করে,তারাই সফলকাম।"

"আর যারা তাদের পরে এসেছে,তারা বলেঃ হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমাদের সেই ভাইদের যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের দিলে ঈমানদারদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। হে রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল ও বড়ই দয়াবান।"

এ আয়াতসমূহ পরপর পেশ করে তিনি বললেন, "এসব কয়টি আয়াতেই পরে আসা লোকদের অধিকারের কথা বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। কাজেই 'ফাই' সম্পদে বর্তমান ও ভবিষ্যত-এর সব মুসলমানকেই শরীক করতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রকে কী করে বর্তমানের মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারি? পরে যারা আসবে, তাদেরকে বঞ্চিতই বা করতে পারি কীভাবে?"

শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাদেরকে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শরীক করতে চাচ্ছি। আমি তো আপনাদেরই একজন। আমার মতকেই আপনারা মেনে নেবেন, এমন কথা আমি বলছি না। আপনারা নিজেরাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। যারা মনে করে যে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি, তাদের কথাও আপনারা শুনেছেন। আমি জুলুম করা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। হ্যাঁ, আমি যদি তাদের কোন জিনিস অন্য কাউকে দিয়ে থাকি, তাহলে অবশ্য আমি অন্যায়ই করেছি। কিন্তু এখানে তো সে রকম কোন ব্যাপার নয়। শেষে উপস্থিত সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন, 'আপনার মতই ঠিক এবং আমরা সবাই আপনার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করছি।[২]

---

১. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত ৭-১০

২. মাও.মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামী অর্থনীতিতে 'ওশর' ও 'খারাজ', অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বিজিত অঞ্চলের জমি তার অমুসলিম পূর্ব-মালিকদের ভোগ দখলে রেখে দিয়ে তার উপর খারাজ ধার্য করার রীতি চালু হয়ে গেল এবং রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের একটা আয়ের উৎস হিসেবে নির্ধারিত হল। খারাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎস। তা সাধারণ জনকল্যাণে ব্যয় হবে। মূলত তা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি-ক্ষেতের উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অংশ। অন্যকথায়, খারাজ হচ্ছে জমির উপর ধার্যকৃত কর; আর শরী'য়াতের পরিভাষায় মুসলমানদের সন্ধি কিংবা যুদ্ধ জয় দ্বারা বিজিত অমুসলিম নাগরিকদের ব্যবহারধানী জমির কর।

খারাজ জিযিয়া নয়। এ দু'টির মধ্যে কয়েকটি দিক দিয়েই পার্থক্য রয়েছে, যদিও অপর কয়েকটি দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে মিলও রয়েছে। এ উভয়ই অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। আর এ দু'টির ব্যয়ের খাত অভিন্ন এবং তা হচ্ছে 'ফাই' সম্পদের খাত। তা আদায় করতে হয় বাৎসরিক হিসেবে, পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর। বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তা আদায় করা যায় না। এ দু'টির প্রামাণিক ভিত্তি এক নয়। খারাজ ধার্য হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে; কিন্তু জিযিয়া কররূপে ধার্য হয় কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে খারাজ-এর কম বা বেশি পরিমাণ নির্ধারিত হয় ইজতিহাদের মাধ্যমে; কিন্তু জিজিয়ার নিম্নতম পরিমাণ নির্ধারণ হয় শরী'য়াত দ্বারা। তবে বেশি পরিমাণ নির্ধারণ হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে।[১]

এই পর্যায়ের শেষ কথা হচ্ছে, অমুসলিম ও মুসলিম উভয়ের তরফ থেকে খারাজ নেয়া যেতে পারে; কিন্তু জিজিয়া নেয়া হয় শুধু অমুসলিমদের নিকট থেকে। তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তা তাদের উপর থেকে প্রত্যাহার করা হয়। প্রথমটিকে 'খারাজুল অযীফা' বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'খারাজুল মুকাসিমা'। প্রথমটির দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উমর (রা.) সওয়াদের জমি দখল করে তা তার ভোগ দখলকারীদের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন এবং জমির ব্যাপ্তির পরিমাণ অনুযায়ী ও তাতে সম্ভাব্য উৎপাদনের প্রকারভেদ অনুপাতে বিভিন্ন পরিমাণের খারাজ ধার্য করে দিয়েছিলেন। এই খারাজ ধার্য হওয়াটা জমি থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অনুপাতে হয়ে থাকে। তা চাষাবাদ না করা হলেও তা দিতে হবে। অবশ্য বৃষ্টি-বাদল, বন্যা-স্রোত, পানিবন্দী বা প্রয়োজনীয় সেচ বন্ধ হওয়া ও এ ধরনের কোন কারণে যদি জমি নষ্ট হয়ে যায়, যাতে জমি মালিকের ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই, তা হলে খারাজ দেয়া বাধ্যতামূলক হবে না।[২]

আর 'খারাজুল মুকাসিমা' উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ কিংবা এভাবে কোন নির্ধারিত অংশ পরিমাণ খারাজ হিসেবে নেয়ার চুক্তি হয় এবং চুক্তি অনুযায়ীই তা দিতে হয়। এ নিয়মে খারাজ ধার্য করা সম্পূর্ণ জায়েয। হযরত মুহাম্মদ (স.) খায়বরবাসীদের সাথে এরূপ চুক্তিই করেছিলেন।[৩] খায়বর বিজয়ের পর মহানবী (স.) সর্বপ্রথম সেখানকার ইয়াহূদীদের উপর খারাজ ধার্য করেন। ইহূদীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ও খারাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে কৃষি ভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে। অমুসলিমদেরকে চাষাবাদ করার জন্য এই যে জমিদান, ইসলামী রাষ্ট্র সে জমির মালিক হিসেবে ঐ জমির উৎপাদিত শস্যে অংশগ্রহণ করত। ইসলামী রাষ্ট্রের অংশই ছিল খারাজ। অংশের পরিমাণ আলোচনার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হত।

খারাজ আদায়ের পদ্ধতি ছিল দু'টি: (১) আনুপাতিক খারাজ- যা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে আদায় করা হত (২) নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ- যা জমির পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হত। সাধারণত: আনুপাতিক খারাজ কোন ফসল আসার পরপরই আদায় করা হত। জমির উৎপাদন ক্ষমতা ফসলের বিভিন্নতা ও সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি উপাদানের উপর ভিত্তি করে খারাজ নির্ধারিত হত। জমির মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেলে উক্ত জমির উপর খারাজ দিতে হত না। খারাজ খাত থেকে যে অর্থ বায়তুলমালে জমা হত তা সামরিক খাতে ব্যয়িত হত। খারাজের যাবতীয় অর্থ মহানবী (স.) সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একজন বিবাহিত সৈনিক একজন অবিবাহিত সৈনিকের দিগুণ পেতেন।[৪]

---

১. মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯
২. ঐ, পৃ. ২৭৯।
৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।
৪. আল মাওয়ার্দী, আহকামুস সুলতানিয়া, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ওয়াক্ফ ব্যবস্থা

ওয়াক্ফ পরিচিতি :

ইসলামে মানব কল্যাণের স্বার্থে জাগতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের একটি দিক হল ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। ওয়াক্ফ এমন একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণমূলক পদ্ধতি। এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাধারণত কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলমানের সহায় সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে।

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার অন্যতম প্রধান উৎকৃষ্ট মাধ্যমে হল ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। এজন্য ইসলাম এর ব্যাপক প্রচলন ও প্রসারের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করেছে। মহানবীর (স.) শিষ্যগণ কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্ফ বলতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক করা, বাধা দেয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ মূলত: কোন বস্তুকে রক্ষা করা, ওটাকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাধা দেয়া। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর সংজ্ঞানুসারে 'ওয়াক্ফ' শব্দের অর্থ হল, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত যে কোন ধার্মিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা। একই উদ্দেশ্য অমুসলিম দান করলেও তা এর অন্তর্ভূক্ত হয়। (Waqf means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognised the muslim law as pious, religious charitable and includes any other endowment or grant for the aforesaid purposes, a waqf by user and a waqf created by a non Muslims)[১]

ইমাম আবু হানিফার মতে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্ফ বলে।[২]

Dictionary of Islam- এ বলা হয়েছে, "Waqf lit."Standing shopping, healting." A term which in the language of the law signifies the appropriation or dedication of property to charitable uses and the service of God. An endowment. The object of such an endowment of appropriation must be of a perpetual nature and such property or land cannot be sold or transferred."[৩]

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে ওয়াকফের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, ওয়াক্ফ বলতে এমনসব বস্তু বুঝায় যার মালিক ঐ বস্তুর স্বত্ব ও আয় হস্তান্তরের অধিকার এই শর্তে ত্যাগ করে যে, ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকবে এবং তার উৎপন্ন আয় শরীয়াত সম্মত সৎ কার্যে ব্যয়িত হবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এ ধরনের দান সম্পাদিত হয়, তাকেই প্রকৃত পক্ষে ওয়াক্ফ বলা হয়।[৪] মালিকীদের মধ্যে তথা মরক্কো, আলজিরিয়া এবং তিউনিসে এ প্রকার প্রদত্ত বস্তুকে সাধারণত 'হুবুস' অথবা সংক্ষিপ্তাকারে 'হুবস' (বাধা দেয়া, সংযত করা) বলা হয়।[৫]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) খায়বরে প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দামি সম্পত্তিটি যখন ওয়াক্ফ করে দেন তখন মহানবী (স.) তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তা এমনভাবে সাদাকাহ কর যে তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বণ্টন করা হবে না, বরং এর উপযোগ ব্যয় করা হবে।[৬] হযরত উমর (রা.) উক্ত শর্তাধীনে জায়গীরটি ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্ত করা, মুসাফির, অতিথি সেবা ও অন্যান্য ভাল কাজের জন্য ওয়াক্ফ করেন। তিনি বলেন যে, মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) এ থেকে তার প্রয়োজনীয় খোরপোশ নিতে পারবেন। তবে তিনি তা সঞ্চয় করতে পারবেন না। সঙ্গতভাবে নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবেন।[৭]

---

১. S.A. Hasan, The Waqfs Ordinance, 1962 Bangladesh Law Book Company, Dhaka-1999, P.103.
২. বুরহানউদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (অনূ. আবূ তাহের মিছবাহ), আলহিদায়া, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-২০০০, পৃ. ৫৮৩
৩. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam, Premier Book House Anarkali, Lahore, 1964, P.664
৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৫০
৫. Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, Vol-15, Macmillan Publishing Company-New York, 1986, P. 337
৬. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খণ্ড ,আল-মাকতাবা আল রশিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৯৮৫, পৃ. ২০৫
৭. হিফজুর রহমান (অনূ. আব্দুল আউয়াল), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনায় যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই হল ওয়াক্‌ফের যথার্থ সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোন সম্পত্তি কিংবা কোন বস্তু মহান আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করা হলে তার আয় ফকীর, গরীব, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমদের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। তাকে বিক্রি কিংবা দান করতে পারবে না এবং যিনি ওয়াক্‌ফ করেছেন, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনও করা যাবে না। ওয়াক্‌ফ দ্বারা ওয়াক্‌ফকারীর অধিকার নিঃশেষ হয়ে মালিকানাটি আল্লাহর নিকট চলে যায়।

সুতরাং ইসলামের পরিভাষায় কোন বস্তু আল্লাহর মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে দরিদ্র-অসহায়দের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণ খাতে দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলা হয়। যিনি ওয়াক্‌ফ করেন তাকে ওয়াক্‌িফ এবং যার উপর ওয়াক্‌ফ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাকে মুতাওয়াল্লী বলা হয়।

ইসলামে ওয়াক্‌ফ নীতিমালা :

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি খলিফা কিংবা প্রশাসকের ওয়াক্‌ফ স্বার্থবিরোধী সকল প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। এজন্য তাতে ওয়াক্‌ফের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে হ্রাস পেতে পারে কিংবা উক্ত সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণও বৈধ হবে না। ওয়াক্‌ফকারী কর্তৃক বিভিন্ন বৈধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শরীআতের স্পষ্ট বিধি-বিধানের মত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে এটাই সব চাইতে বেশী লক্ষ্য করার ব্যাপার। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া ওয়াক্‌ফের স্বার্থবিরোধী অধিক কর ধার্য করা এবং ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোরই এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, ওয়াক্‌ফ করার পর সে সম্পত্তি আর কারও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না। তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[১]

ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহ :

কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হয়। আর এ শর্তসমূহের কতকটা সম্পর্ক ওয়াক্‌ফকারীর সাথে কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে আর কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে। ওয়াক্‌ফকারীর সঙ্গে যেসব শর্ত সম্পৃক্ত তা হল- ওয়াক্‌ফকারীকে পূর্ণ মানসিক বৃত্তি সম্পন্ন, পূর্ণবয়স্ক এবং স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ, শিশু ও ক্রীতদাসের ওয়াক্‌ফ সঠিক হবে না। ওয়াক্‌ফ সঠিক বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াকিফের মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। কোন জিম্মি যদি বিধি মুতাবিক ওয়াক্‌ফ করে তবে তা বৈধ হবে।

আবার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ হল- যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হবে তার স্বত্ব-স্বামীত্ব ওয়াক্‌ফ করার সময়ে ওয়াক্‌ফকারীর থাকতে হবে। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয়, নিজেকে শুধু মুতাওয়াল্লী মনে করে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে তবে ঐ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে। উক্ত ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করা হবে তা হল, ঐ ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি আদান-প্রদানের ক্ষমতা ছিল কিনা। ওয়াকিফ কর্তৃক কোন সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি হলেও সে ঐ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে পারবে যদি শেষ পর্যন্ত সে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে। ওয়াক্‌িফ যদি ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নাও হয় এবং সে যদি তা ওয়াক্‌ফ করে এবং মালিক কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়, তাহলেও ঐ ওয়াক্‌ফ অবৈধ হবে না। কিন্তু ওয়াক্‌ফ দ্বারা যদি উত্তরাধিকারীদেরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঐ ওয়াক্‌ফ কার্যকরী হবে না।[২] ওয়াক্‌ফের বস্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কেউ যদি বলে যে, 'আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম' কিন্তু কোথাকার কোন জমি তা নির্দিষ্ট করে বলল না, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না।[৩] তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ী যা সবাই চেনে, তার পরিমাপ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবে।[৪]

ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, ওয়াক্‌ফ বস্তু কোন স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পদ হবে না, বরং স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র এর ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সহ আরও অনেক সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং মহানবী (স.) তা অনুমোদনও করেছিলেন।[৫]

---

১. ইবনুল আবেদীন, রাদ্দুল মোহতার আলাল দুররিল মুখতার, ৩য় খন্ড, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ, আল মাকতাবা আল মাজিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৩৮৮ হি., পৃ. ১৭৭
২. গাজী শামছুর রহমান, ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য, ঢাকা ল'বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ৭
৩.ফতোয়ায়ে আলমগীরী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৫৫
৪.ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৫
৫.ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী হল- ওয়াক্ফ হতে হবে এমন কোন পূণ্য কর্মের জন্য যা ইসলামের দৃষ্টিতে নেকীর কাজ। ওয়াক্ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে না। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্ফ।[১] ওয়াক্ফকালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। এরূপ কোন শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[২]

ওয়াক্ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। এরূপ করলে ওয়াক্ফ বৈধ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এভাবে ওয়াক্ফ করে মসজিদ তৈরী করলে বৈধ হবে, কিন্তু বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্ফটি স্থায়ী হতে হবে। অতএব, সীমিত সময়ের জন্য কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হবে না। অধিকন্তু ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যও স্থায়ী ধরনের হতে হবে। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। ওয়াক্ফ নামায় এমন কোন শর্ত যদি থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে সম্পত্তিটি ওয়াক্বিফের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে, এরূপ ওয়াক্ফ বৈধ নয়। অথবা ওয়াক্ফ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে একজন উপস্বত্ব ভোগকারী বন্ধক গ্রহীতা হলে এবং ঐ সম্পত্তিতে তার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তার ওয়াক্ফটি স্থায়ী হবে না। কিছুদিনের জন্য লীজ নেয়া জমির উপর বাড়ীর ওয়াক্ফ হবে না। কারণ তা স্থায়ী নয়।[৩] আবার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা, এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াক্ফের বিষয়বস্তু :

যে কোন প্রকার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে। কেবল স্থাবর সম্পত্তিরই নয়, বরং অস্থাবর সম্পত্তিরও বৈধ ওয়াক্ফ করা চলে। যেমন, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ার, সরকারী অঙ্গীকারপত্র এবং এমনকি টাকারও ওয়াক্ফ হতে পারে। ফসলের জমি, বাড়ী, গোসলখানা, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত। জমি ওয়াক্ফ করলে তাতে অবস্থিত বৃক্ষ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াক্ফের অন্তর্ভূক্ত হবে। জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে তবে তা সহই জমি ওয়াক্ফ করতে হবে। বৃক্ষ ছাড়া কেবল জমি ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হবে না। জমির অংশ বিশেষ ওয়াক্ফ করলে কতটুকু অংশ তা উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য যদি সবটুকু জমিই ওয়াক্ফ করা হয় তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা জরুরী নয়।[৪]

কোন অস্থাবর সম্পত্তি যদি স্থাবর সম্পত্তির অধীনে থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তির অধীনে তার ওয়াক্ফ বৈধ। যেমন কোন জমিতে চাষাবাদের সামগ্রী আছে, এখন জমির মালিক যদি জমির সঙ্গে সেসব সামগ্রীও ওয়াক্ফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফের প্রচলন যদি থাকে তার ওয়াক্ফ বৈধ। যেমন জানাজা ও কবর খননের সামগ্রী।

আল-কুরআন ও দ্বীনি পুস্তকাদি ওয়াক্ফ করা বৈধ। ওয়াক্ফকারী যদি কোন নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য কুরআন মাজীদ ওয়াক্ফ করে তবে তা সে মসজিদেই সংরক্ষিত রাখা উচিত। অন্যত্র স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। আর যদি মুসল্লীদের জন্য ওয়াক্ফ করে, নির্দিষ্ট কোন মসজিদের জন্য নয়, তবে তা অন্য মসজিদে নেয়া বৈধ হবে। টাকা-পয়সাও ওয়াক্ফ করা বৈধ। তবে ওয়াক্ফ বস্তুর মূলকে অবশিষ্ট রেখে কেবল তার উৎপাদন উপযোগ দ্বারাই উপকার লাভ বৈধ। তাই এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, আসল টাকা ব্যয় করা যাবে না; বরং তার লভ্যাংশ ব্যয় করতে হবে।[৫]

মাশা অর্থাৎ কোনও সম্পত্তিতে কারও অবিভক্ত অংশ (তা ভাগ করার উপযোগী হউক বা না হউক) দ্বারাও ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অংশ মসজিদ বা গোরস্থানের জন্য সৃষ্টি ওয়াক্ফের ব্যবহার করা যেতে পারে না। সম্পত্তির প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হোকনা কেন ওয়াক্ফ সৃষ্টি করার সময় অবশ্যই ওয়াক্ফকারীর মালিকানাভূক্ত হতে হবে এবং তা হস্তান্তর করার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার তার থাকতে হবে।[৬] যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিক অথচ তার ধারণা যে, সে ঐ সম্পত্তির একজন মুতাওয়াল্লী, সেক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তি বৈধভাবে উক্ত সম্পত্তির ওয়াক্ফ করতে পারে। এক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় হল-ঐ সময়ে ওয়াকিফের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল কি না।

---

১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫২
২. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫২
৩. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন, অরণি প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১, পৃ. ২৯৯
৪. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫৫
৫. ইবনুল আবেদীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫
৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

বন্ধক কিংবা ইজারা দেয়া সম্পত্তিরর ওয়াক্‌ফ করা চলে। খায়-খালাসী বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ করতে পারে না। কারণ, সে তার মালিক নয় এবং বন্ধক হল সুদের বিরুদ্ধে মুসলিম আইনের ব্যবস্থাকে এড়াবার একটি পন্থামাত্র। কুঞ্জবনে বৃক্ষাদির উপর মালিকের স্থায়ী অধিকর ও পূর্ণ স্বত্ব রয়েছে। অতএব কুঞ্জবনের অধিকারের ওয়াক্‌ফ বৈধ।[১] ওয়াকিফ সম্পত্তি ক্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী তাতে দখল প্রাপ্ত হলে তিনি ঐ সম্পত্তির বৈধ ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে পারেন। অবশ্য যদি বিক্রয়টি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়।[২]

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম :

ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, ওয়াক্‌ফের মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রেখে তার লাভ বা উৎপাদন-উপযোগ ওয়াক্‌ফ খাতে ব্যয় করা হয়। কাজেই ওয়াক্‌ফের ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর নিয়তে এটা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, যে যে বস্তু ওয়াক্‌ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শব্দ বা শর্ত যুক্ত করা যাবে না, যদ্বারা উক্ত শর্তের লংঘন ঘটে এবং ওয়াক্‌ফ মেয়াদী হয়ে পড়ে বা কোন এক সময়ে তার ব্যয় খাত শেষ হয়ে যাবে।

ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। ওয়াক্‌ফ লিখিতভাবেও করা যেতে পারে, আবার মৌখিকভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয়। দাতা 'ওয়াক্বাফাতু' 'হাববাসতু' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে তৃতীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে "উহা বিক্রয় করা, দান করা অথবা ওয়াসিয়াত করা যাবে না।" (অন্যথায় তা সাদাকা হবে)। অধিকন্তু ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণনা করবেন এবং ঠিক ঠিক ভাবে উল্লেখ করবেন কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্‌ফ করছেন।[৩]

সুতরাং ওয়াক্‌ফের ভাষা হবে নিম্নরূপ, 'আমার এই জমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ,' 'আমার এই জমি গরীবের জন্য ওয়াক্‌ফ,' 'আমার এ জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ,' 'আমার এ জমি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ।' এটা বিক্রি করা যাবেনা এবং এর মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার এই জমির ফসল স্থায়ীভাবে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমার মৃত্যুর পর এই জমির ফসল অমুক পাবে এবং তারপর তার আত্মীয় এবং তারপর গরীবগণ। মোটকথা, ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহের পরিপন্থি না হয় এমন যে কোন ভাষাই ব্যবহার করা যেতে পারে।[৪] তবে কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দলিলে বা বর্ণনায় "ওয়াক্‌ফ" শব্দটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রকৃতি এবং ওয়াক্‌ফ দাতার আচরণ থেকে এটা যে একটি ওয়াক্‌ফ তা সহজভাবে বোধগম্য হতে হবে। কোন জমি হস্তান্তর করলে তা আসলে ওয়াক্‌ফ কিনা, তা যেখানে সহজে বোধগম্য হয় না, সেখানে ওয়াক্‌ফের উক্তি এবং যে উদ্দেশ্যে ও যেভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিচার করে সম্পত্তি হস্তান্তরের আসল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে।

ওয়াক্‌ফদাতা তার জীবনকালে অথবা ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে যেতে পারেন। ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে তিনি যদি তাতে শর্ত জুড়ে দেন যে, তার যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে ওয়াক্‌ফ বলবৎ হবে না এবং পরে যদি সত্য সত্যই তার পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তাহলে একমাত্র এ কারণেই ওয়াক্‌ফটি অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোন মুসলমান তার সমস্ত সম্পত্তিই ওয়াক্‌ফ করে যেতে পারেন। কিন্তু ওয়াসিয়তের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা হলে অথবা মুমূর্ষ অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা হলে তা তার মোট সম্পত্তির তিনভাগের মাত্র একভাগের উপর বলবৎ হবে। তবে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ (উত্তরাধিকারীগণ) সম্মত হলে সমুদয় সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বলবৎ হতে পারে।[৫]

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ছাড়া ক্ষতিকর কোন শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। কারোরই এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পাদনের পর তা বেচাকেনা করা বা অন্য কোনভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে না। বরং যে কাজে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তজ্জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করা হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের জন্য তাতে দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। ওয়াক্‌ফ করার পর সে সম্পত্তি কারও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থাকে না। তা জনকল্যাণে একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[৬] ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে, সেভাবে ওয়াক্‌ফ করা না হলে তা ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে না।

---

১. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-৯১
২. উল্লেখ্য যে, স্বামীর উত্তরাধিকারগণকে প্রতারিত করে বিধবা কোন ওয়াক্‌ফ নামা সম্পাদন করলে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হবে, এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ বিধবা যে অংশ পাবে তার ক্ষেত্রেও ওয়াক্‌ফটি কার্যকরী হবে না। আবার কোন বিধবার জন্য প্রাপ্য দেনমোহর ঋণ তাকে দেয়া হবে কিনা তা অবশিষ্ট ভোগীদের ইচ্ছা, তাই উক্ত ঋণের টাকার ওয়াক্‌ফ হবে না।
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২১১
৪. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৬৬৫
৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৬. ইবনুল আবেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

কিভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হয় :

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)- এর মতে, ওয়াক্‌ফদাতার জীবদ্দশায় পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফ ঘোষণা দ্বারাই কার্যকরী হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ওয়াক্‌ফদাতা কর্তৃক শুধু ঘোষণাই নয়, বরং মুতাওয়াল্লী নিয়োগ ও তার নিকট সম্পত্তির দখল দান না করলে কোন ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হবে না।[১] বৈধ ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন। যেমন-

* ওয়াক্‌ফ করতে হবে চিরকালের জন্য। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুকূলে স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় তা থেকে অর্জিত আয় তার মৃত্যুর পর দরিদ্রের জন্য বরাদ্দ করে ওয়াক্‌ফ সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং তা হস্তান্তর যোগ্য নয়।

* ওয়াক্‌ফ অবিলম্বে কার্যকরী হবে, তা স্থগিত রাখার অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবে না। তবে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত যদি স্থগিত রাখার শর্ত লাগানো হয় তাহলে তা ওয়াসিয়্যাতের অনুরূপ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

* ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্‌ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে।[২] সুতরাং হানাফী ওয়াক্‌ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পণের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথাবিহিত মোকাদ্দমা আনয়ণ করতে পারে। বিচারক আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের সিদ্ধান্তের যে কোনটি অবলম্বনে বিচার করতে পারেন। আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফ বহাল রেখে আবেদন নাকচ করতে পারেন।[৩]

ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আরও প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে- যাদের অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। জনকল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু কোন একজন লোক ব্যবহার করলেই অর্পণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে মালিকী মাযহাব মতে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য নয়, যথা: ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি একমাত্র ওয়াক্‌ফকারীই নয়, বরং তদীয় উত্তরাধিকারীগণও প্রত্যাহার করতে পারে।[৪]

ওয়াক্‌ফকারী স্বয়ং নিজেকেই প্রথম মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারে। ওয়াক্‌ফকারী এবং মুতাওয়াল্লী একই ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় মতেই দখল প্রদানের প্রয়োজন হয় না এবং মালিক হিসেবে তার নামের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর নামেও বদলী করতে হয় না। ঘোষণা দ্বারা ওয়াক্‌ফ সৃষ্ট হবে বটে, তবে ঐ ঘোষণা অকৃত্রিম হতে হবে। যদি ওয়াক্‌ফদাতা ওয়াক্‌ফ নামা শুধু নিজের নিকট রেখে তার উদ্দেশ্যে কোন কাজ না করে, তবে এতে প্রতীয়মান হবে যে, ওয়াক্‌ফদাতার ঐ ওয়াক্‌ফ কার্যকরী করার ইচ্ছা ছিল না, হয়ত ওয়াক্‌ফদাতা তার বিরুদ্ধে কোন দাবিকে পরিহারের জন্য তার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের ঘোষণা করা হয়নি, কিংবা দখল প্রদান করা হয়নি, সেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি দানের জন্য পৃথক করে রাখলেও কিংবা তার আয় আকাংখিত দানের জন্য ব্যয় করলেও তা ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।[৫] তবে একবার যদি কার্যকরীভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হয় তা প্রত্যাহার করা যাবে না। ওয়াক্‌ফদাতা একবার যদি ওয়াক্‌ফ করার আকাংখা ঘোষণা করে এবং মুতাওয়াল্লী হিসেবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে তা হলে কোনক্রমেই ঐ ওয়াক্‌ফ অগ্রাহ্য করা যাবে না এবং ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকারী যদি সেটাকে ওয়াক্‌ফ নয় বলেও দাবী করে, তাহলেও তা বৈধভাবে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফ বলে ধার্য হবে।[৬] সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যবস্থা ওয়াক্‌ফ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে যে তা ওয়াক্‌ফ নয় বলে দাবী করবে তাকেই তা প্রমাণ করতে হবে।

ওয়াক্‌ফ যদি দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে ওয়াক্‌ফদাতার প্রকৃত ইচ্ছা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি ওয়াক্‌ফ দলিলক্রমে সম্পাদিত হয় তাহলে শুধুমাত্র এর অর্থ দ্ব্যর্থক হলে ওয়াক্‌ফকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচার করার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৭]

---

১. বুরহান উদ্দীন আলী, আল হিদায়া, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৫৪৬
২. সারাখসী, মাবসূত, ১২ খন্ড, কায়রো, ১৩৬৫ হি., পৃ. ২৭
৩. আলহিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫
৪. Nasir Jamal, The Islamic Law and Personal law, London, 1986, P. 248
৫. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৭. Kulsom Bebee V. Golam Hosein (1905) 10, CWN, 449, 484

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষ ওয়াক্ফ :

ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে যদি ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে ওয়াক্ফকারী যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন। মৃত্যু শয্যায় সৃষ্টি ওয়াক্ফ সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। যদি ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে না হয়, তাহলে ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফ করার সময়ে প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেয় তাহলে ঐ ওয়াক্ফ বৈধ হবে না। তবে ওয়াক্ফ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সংরক্ষিত না রাখতে পারলে ওয়াক্ফ হতে যারা উপকৃত হবে তাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা তিনি সংরক্ষিত রাখতে পারেন। ওয়াক্ফ সৃষ্টি করার সময় তা হতে যারা উপকার পাবে তাদের সংখ্যা অথবা তাদের অংশ কম-বেশী করার ক্ষমতা ওয়াক্ফদাতা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারেন।[১]

উক্তরূপ ক্ষমতা সংরক্ষন ব্যতীত ওয়াক্ফকারী তার সৃষ্ট ওয়াক্ফের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারেন না, অথবা মুতাওয়াল্লীদের সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও করতে পারেন না। ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও অংশ হ্রাসের ক্ষমতা তিনি এমনভাবে করতে পারেন না, যার ফলে কোনও সম্পত্তি ওয়াক্ফ হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। অথবা ওয়াক্ফের কোনও উদ্দেশ্যে তিনি এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারেন না, যার ফলে একটি বৈধ উদ্দেশ্যের স্থলে একটি অবৈধ উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে।[২]

আবার ওয়াক্ফদাতা ইচ্ছা করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিবর্তনের শর্তও আরোপ করতে পারেন। সে পরিবর্তনের ক্ষমতা তার নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারেন আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত করতে পারেন কিংবা নিজের ও অন্যের উভয়ের উপরও তা ন্যস্ত রাখতে পারেন। যার উপরই ন্যাস্ত করা হোক না কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। ওয়াক্ফকারী যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে সেক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির অবস্থা দু'রকম হতে পারে- এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং আরেক অবস্থায় বৈধ নয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি অচল হয়, তা কোনও উপকারে আসে না, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- (ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, কিংবা (খ) ফসল জন্মালেও যার ব্যয় আয়ের চেয়েও বেশী হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে থাকলে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না।[৩]

কোন ওয়াক্ফের কার্যকারিতা কোনও অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হলে ওয়াক্ফটি অচল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোনও ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে তার সাথে এরূপ একটি শর্ত যোগ করে দেন যে, তিনি যদি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যান, কেবলমাত্র তাহলেই ওয়াক্ফের সম্পত্তি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে; তাহলে ওয়াক্ফটি অচল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এক্ষেত্রে ওয়াক্ফের কার্যকারিতা ও ওয়াক্ফদাতার নি:সন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার মত একটি অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি এরূপ একটি শর্ত আরোপ করেন যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতে তার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে হবে, অথবা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন যাবত ওয়াক্ফ সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি তার ব্যক্তিগত কার্য্যে ব্যয় করবেন। তাহলে ওয়াক্ফ অচল বা অবৈধ হবে না। কারণ, এখানে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা অনিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে ওয়াক্ফদাতা তার ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতে তার দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[৪]

ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যাবলী :

ইসলামী আইন অনুসারে যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হবে তা অবশ্যই ধর্মীয় দাতব্য বা নেকীর কাজ বলে স্বীকৃত হতে হবে। ওয়াকিফ অবশ্য পরিবার, পুত্র-কন্যা অথবা বংশধরদের জন্যও তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যেতে পারেন। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা যায়। যেমন-

---

১. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭
২. আলহিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫
৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য, রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড, পৃ. ৪২৪, ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৮
৪. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

* মসজিদ নির্মাণ ও ইমামের বেতন-ভাতা প্রদান;

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং তথায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান;

* পয়:প্রণালী, বাঁধ ও পাঠশালা বা সরাইখানা নির্মাণ বা মেরামত;

* গরীবদের জন্য দান-খয়রাত এবং মক্কা শরীফে গিয়ে গরীব ব্যক্তিগণ যাতে হজ্বব্রত পালন করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দান;[১]

* জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ইয়াতিম, বন্দী এবং দু:খীদের আল্লাহর ওয়াস্তে দান খয়রাত করা এবং আত্মীয় ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা;

* ঈদগাহে অনুদান দেয়া;

* মহানবী (স.)-এর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী তথা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন করা;

* পবিত্র মুহররম মাসে গরীব-দু:খীদের খাওয়ানো ও দান করা;

* দাতব্য চিকিৎসালয়, ইয়াতিমখানা, ধর্মীয় ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পরিচালনা, মেরামত ও সংরক্ষণ করা এবং বেওয়ারিশ ব্যক্তিদের লাস দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা;

* পবিত্র কুরআন শরীফ প্রকাশ্য স্থানে এবং গৃহে তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা;

* ওয়াকিফও তার পরিবারের বাৎসরিক ফাতিহা সম্পন্ন করা।[২]

* পবিত্র মক্কায় হাজীদের জন্য 'বোরাত' বা বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা;

* ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করা;

* দরগাহ/মাযার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা।[৩]

* ইমাম বাড়া মেরামত।[৪]

* খানকা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণ;

* মসজিদে বাতি দান ইত্যাদি;

অবৈধ উদ্দেশ্য:

* ইসলামে নিষিদ্ধ কার্যাবলী; যেমন কোন গীর্জা বা মন্দির নির্মাণ কিংবা সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ।[৫]

* ওয়াক্ফকারীর দাস-দাসীর ভরণ-পোষণ;

* ওয়াক্ফকারীর সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ নয়, এমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভরণ-পোষণ।[৬]

* তাৎক্ষণিক দান হিসেবে প্রদত্ত হলেও একান্তভাবে আগন্তুকদের পক্ষে সৃষ্ট কোন ওয়াক্ফ অবৈধ;

* ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্যাপনকালে প্রতি বৎসর কাদসী মেমনদেরকে ভোজ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কোন নির্দেশ থাকলে তা অবৈধ হবে।[৭]

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ না করলে বা না থাকলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যায়। যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়তার সাথে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফটি বাতিল হয়ে যাবে। তবে উদ্দেশ্য সমূহের নামোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অথবা যেখানে উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যে কত টাকা খরচ হবে তাও উল্লেখ করার কোন আবশ্যকতা নেই।[৮] ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য হিসেবে যদি কেবলমাত্র "দাতব্য ও জনহিতকর কার্য" অথবা "ধর্মীয় কার্য" অথবা "মুতাওয়াল্লী যাকে নেকীর কাজ বলে মনে করবেন, সেই কাজ" প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়, তা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোনও ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য যদি "সৈয়দ গণকে, অর্থাৎ রাসূলের বংশধরগণকে অর্থ দান করা" হয় তা হলে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ কে বা কারা যে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের বংশধর তা নির্ণয় করা অসম্ভব।[৯]

---

১. আলহিদায়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫৪-৪৬

২. ফাতিহা অর্থ মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা এবং তৎসহ গরীব-দু:খীকে ভিক্ষা দান করা।

৩. D.F. Mollah, Principles of Mohammadan Law, Calcutta Eastern Law House, 1556,P.164

৪. কোনও বাসগৃহ বা ইমারতের কোনও অংশকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা হলে তাকে ইমাম বাড়া বলা হয়ে থাকে।

৫. আলহিদায়াহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫৩

৬. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত,. ৮৫

৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫, সূত্র. Abdul Karim V. Rahima (1946) 48 Bom. L.R.67 ('48), A.B. 342

৮. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

৯. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫, সূত্র. Abdul Karim V. Rahima (1946) 48 Bom. L.R.67 ('48), A.B. 342

Dhaka University Institutional Repository

কোন ওয়াক্‌ফ একাধিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকলে এবং পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক পরিমাণ সম্পত্তি নির্দিষ্ট থাকলে, কতিপয় উদ্দেশ্য যদি বৈধ এবং কতিপয় উদ্দেশ্য অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অবৈধ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বহাল থাকবে না, সে ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তিই বৈধ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে, কোন ওয়াক্‌ফ অন্যান্য সকল দিক থেকে বৈধ হয়ে থাকলে এবং ওয়াক্‌ফনামায় দান করার সদিচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকলে যে নির্দিষ্ট অর্থে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তা যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি দরিদ্রদের উপকারের জন্য অথবা যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে তার নিকটতম অপর কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।[১]

ওয়াক্‌ফের শ্রেণী বিভাগ:

ওয়াক্‌ফ প্রধানত দু'প্রকার: (ক) ওয়াক্‌ফ আলাল-খায়ের বা কল্যাণ ওয়াক্‌ফ (খ) ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্‌ফ। ওয়াক্‌ফ আলাল খায়ের অনুযায়ী কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণের জন্য দান করা হয়। আর ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ অনুসারে ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা হয়। এ ধরনের ওয়াক্‌ফকে সন্তান-সন্তুতি ও আত্মীয়-স্বজনের নামের সাথে কল্যাণকর কাজের কথাও থাকে।

ওয়াক্‌ফ আল খায়েরকে ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌ও বলা হয়। মসজিদ, ঈদগাহ্‌, মাদ্রাসা, কবরস্থান, মুসাফির খানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কুপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্‌ফ করা যায়। এরূপ ওয়াক্‌ফ দ্বারা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ সকলের জন্যই এরূপ মসজিদে সালাত আদায় করা, কবরস্থানে দাফন করা, মুসাফির খানায় অবস্থান করা এবং কুপের পানি ব্যবহার করা বৈধ।

ওয়াক্‌ফ করার সময় কবরস্থানে গাছপালা থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্থান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছপালা ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফ করার পর কবরস্থানে যদি বৃক্ষাদি জন্মায়, তবে তা হবে রোপণকারীর। রোপণকারী অজ্ঞাত থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্‌ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[২] মহানবী (স.) মুসাফিরদের জন্য একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার জন্য 'রুমা' নামক কূপ ক্রয় করে তা ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[৩]

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা খুবই পূণ্যের কাজ। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ দু'ভাবে হতে পারে: মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান এবং মসজিদের উন্নয়ন কার্য ও আসবাবপত্রসহ খরচাদির জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করলে তা সমর্পন না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পন কথা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফদাতা যদি একথা বলেন যে, 'আমি এ জমিতে মসজিদ বানালাম', তবে তাই যথেষ্ট। এর দ্বারাই তা মসজিদরূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদের মতে, মসজিদের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং জামাতের সাথে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আজান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না এবং তা মসজিদরূপে গণ্য হয় না।[৪] মসজিদ সাব্যস্ত হওয়ার পর ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না এবং তা বিক্রি করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাতে আরও মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকে না।

মসজিদের উন্নয়নকার্য ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরীব-দু:খীদের সাহায্য করার কথা যোগ করাও বৈধ এবং তা না করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হয়ে। গরীবদের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা হলে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে। এমনিভাবে গাছ-পালা ও টাকা-পয়সা ইত্যাদিও ওয়াক্‌ফ করা যায়। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়, সাজ-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করা যাবে না।[৫]

---

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
২. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, ৪৭৪
৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, মাকতাবা মুস্তফা, দেওবন্দ, ১৩৯৯ হি., পৃ. ৩৮৯
৪. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী ২য়খন্ড, পৃ. ৪৬০-৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ আলাল আউলাদ সম্পর্কে বলা হয়- কোনও মুসলিম তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তার আয় হতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তার পরিবার, সন্তান-সন্তুতি বা বংশধরদের আর্থিক সাহায্য বা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া তিনি নিজের যাবজ্জীবনের ভরণ-পোষণ এবং নিজের দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থাও করতে পারেন।[১] এরূপ ওয়াক্ফকে ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বলা হয়। এরূপ ওয়াক্ফের একটি শর্ত হল- এর উপকার ও সুবিধা ভোগের অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেষ পর্যন্ত দরিদ্রের জন্য অথবা কোনও ধর্মীয় কাজের জন্য বা ধর্মীয় কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। ওয়াক্ফদাতার পরিবার, সন্তান- সন্তুতি দরিদ্রের জন্য বা ধর্মীয় কার্যে ব্যবহার করা যাবে না বলে এই প্রকারের ওয়াক্ফ অচল বা অবৈধ হবে না। এরূপ কোনও ওয়াক্ফ নামায় যদি সম্পত্তি ফারায়েজ করার কোনও নিয়ম বর্ণিত না থাকে, তাহলে পুরুষ ও মহিলাগণ সমান অংশে ভাগ পাবেন এবং ভাই-বোনের ও তাদের সন্তান-সন্তুতি মাথা প্রতি হিসেবে ভাগ না পেয়ে একসঙ্গে ভাগ পাবেন।

আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলে মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই তার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ওয়াক্ফের আয় থেকে তাদেরকে মাথা পিছু সমান হারে বন্টন করা হবে। শুধু আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফদাতার মা, বাবা, দাদা ও ঔরসজাত সন্তান তার অন্তর্ভূক্ত হয় না। পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে।[২] এরূপ ওয়াক্ফ সম্পর্কে Encyclopedia of Religion, Vol-15 তে বলা হয়েছে, "It (Waqf) may also be ahli or dhurri, that is, designated for one's own descendants since it is also laudable to provide for them. In the past of the advantage of making one's property or part of it mauquf and designating the income for ones heirs lay in the fact that the state could not then seize the waqf at the founder's death. Such a seizer was particularly likely to happen in the case of a state official, on the justification that whatever property he had been able to amass had belong to the state in the first place. The family waqf also served to avoid the application of the Islamic inheritance laws which would normally entail a share of the property for other relatives, such as parents and brothers, and involve a prograssive fragmentation of the property among the heirs of the heirs."[৩]

মুতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটি নিয়োগঃ

ইসলামী বিধি অনুসারে কোনও ওয়াক্ফ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ওয়াক্ফকারীর নিকট হতে হস্তান্তরিত হয়ে আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয়। এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য যিনি নিযুক্ত হন তিনি মুতাওয়াল্লী নামে পরিচিত ও অভিহিত হন। ওয়াক্ফ সম্পত্তি তার উপর বর্তায় না এবং সেগুলো উপর তার কোনও হকও সৃষ্টি হয় না। তিনি এ সবের নিছক একজন পরিচালক মাত্র। পরিচালক হিসেবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তদারক করা এবং যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সৃষ্টি হয়েছে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ওয়াক্ফদাতা নিজেকে বা তার পুত্রকে বা অন্য কোন লোককে বা তার বংশধরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন। এমনকি তিনি কোন মহিলা অথবা কোন অমুসলিমকেও মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লীর কার্যের মধ্যে সেখানে নামাযের ইমামতি করা বা দরগায় খাদেম হিসেবে কাজ করা প্রভৃতি ধর্মীয় দায়িত্ব থাকে, সেখানে মহিলা বা অমুসলিম নিয়োগ করা যেতে পারে না। ওয়াক্ফকারী মুতাওয়াল্লীর ধারা অর্থাৎ কার পর কে মুতাওয়াল্লী হবে তার নামোল্লেখ করে অথবা বংশের ধারা উল্লেখ করে তিনি তা মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া তিনি মুতাওয়াল্লীর যোগ্যতা নির্ধারণ করতে এবং তাকে পরবর্তী মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষমতাও দিয়ে যেতে পারেন।[৪]

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান কার্য পালনে সক্ষম ব্যক্তিকেই এ পদে নিয়োগ দান করা বৈধ। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং চক্ষুস্মান ও অন্ধের কোন প্রভেদ নেই। উপযুক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকাই নিয়োগ দানের জন্য যথেষ্ট। নাবালিগকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হলে বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালিগ হওয়ার পর সে মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে।[৫]

---

১. আলহিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫১
২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য, ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৯-৩৮০
৩. Encyclopedia of Religion, Vol-15, P. 338
৪. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

কোন মুতাওল্লীর মৃত্যু হলে অথবা তিনি কাজ করতে অস্বীকার করলে অথবা তিনি আদালত মারফত অপসারিত হলে অথবা অন্য কোনভাবে উক্ত পদ শূন্য হলে তা নিম্নোক্ত পর্যায়ে পূরণ করতে হবে-

১. ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন; অথবা

২. তার অছি থাকলে তিনি মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন, অথবা

৩. বর্তমান মুতাওয়াল্লী নিয়োগ তার মারজুল মাওতের (মৃত্যু রোগ) সময় সাময়িকভাবে একজন নতুন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে পারেন, অথবা

৪. প্রশাসকের মাধ্যমে নতুন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা যেতে পারে।

আবার মুতাওয়াল্লী ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদন করতে পারে। তবে এ নিয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[১]

সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফের বিবর্তন ও তাৎপর্য :

মহানবীর (স.) প্রাক নবুওয়াত যুগে ওয়াক্‌ফ প্রচলিত ছিল না। ঘর-বাড়ী, জমি-জমা ওয়াক্‌ফ করা হত না। পবিত্র কুরআনে ওয়াক্‌ফের কোন উল্লেখ নেই। হাদীসে এর প্রবর্তনের এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাহাবাগণ এবং প্রথম খলিফাগণ ওয়াক্‌ফ করেন। সুতরাং ওয়াক্‌ফ প্রথা মহানবী (স.)-এর আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়। আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মসজিদ নির্মাণ করার জন্য বানু নাজ্জার-এর নিকট হতে মহানবী (স.)-বাগান খরিদ করতে চাইলে তারা মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় তা দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[২] ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসের উপর আইন প্রণয়নকারীগণ বেশী জোর দেন। তা হল এই যে, হযরত উমর (রা.) খায়বারের সম্পত্তি বিভাগের সময় একখন্ড পছন্দসই মূল্যবান জমি নিজ ভাগে পেয়ে উক্ত জমি সাদাকারূপে দান করে দেয়া সম্পর্কে নবীর (স.) পরামর্শ চান। এতে নবী (স.) বলেন, "জমিটুকু নিজের অধিকারে রেখে তার উৎপন্ন আয়, ফল-শস্যাদি সৎকাজে ব্যয় কর।" হযরত উমর (রা.) তা-ই করেন এবং শর্ত করেন যে, উক্ত জমি বিক্রি বা ওয়াসিয়াত করা চলবে না, তার আয় দরিদ্র (অভাবগ্রস্ত), আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, মুসাফির, মেহমান এবং ধর্ম প্রচারার্থে সদকা স্বরূপ দান করা হবে; মুতাওয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে পারিশ্রমিক পাবে এবং নিজের জন্য তা থেকে সঞ্চয় না করে বন্ধুকে খাওয়ালে পাপ হবে না।"[৩]

"তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে যতক্ষণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ প্রকৃত পূণ্য লাভ করতে পারবে না।" (৩:৯২)-এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আবু তালহা আনসারী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! 'বীরহা' আমার ভূ-সম্পত্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমি সেটাকে আল্লাহর পথে দান করে দিচ্ছি। এর প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছ থেকেই কামনা করি। আপনি ইচ্ছামত এটাকে ব্যয় করতে পারেন। রাসুল (স.) বললেন, না, না, এটা উৎপাদনশীল সম্পত্তি। মূল বাগানটা নিজের মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে রাখ এবং উৎপন্ন ফসল দান কর।" সেই মতে, আবু তালহা বাগানটি উবাই এবং হাসসানকে দান করে দেন।[৪] এটা ছিল ইসলামে প্রথম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। হযরত আবু তালহার একটা বাগানে 'বীরহা' নামক একটা স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির কুপ ছিল। পরে এই কুপের নামে পুরো বাগান খ্যাত হয়। এরপর থেকে ওয়াক্‌ফের রীতি চালু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটা প্রধান উৎসে পরিণত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসের সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ও সকল সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা চালু হয়। এতে দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়। এরপর হযরত উমর (রা.) তাঁর খায়বরের জমি ওয়াক্‌ফ করেন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ নিজ জমি ও বাগান ওয়াক্‌ফ করেন। এভাবে কিছু না কিছু ওয়াক্‌ফ করা থেকে কোন সাহাবীই বাদ থাকেননি। তারপর হযরত উমরের (রা.) শাসনামলে একাজ নতুন করে আবার শুরু হয়। নিজের একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই এ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদেরকে ডাকেন ও সাক্ষী রাখেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী বলেনঃ রাসূল (স.)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে আমি যাদের চিনি, তারা সকলে নিজ নিজ জমি-জমা থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই

---

১. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
২. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল ওয়াসিয়্যা, বাব, ২৮, ২৯
৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাব আস শুরূত, বাব-১৯
৪. ইমাম মুহিউদ্দীন নববী, রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, (অনূদিত), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-ঢাকা-২০০১, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর পথে দান করেছেন। এ দান এমন ছিল যে, তা কেনাও যায় না, দান করাও যায় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও হস্তান্তরিত হয় না। বস্তুত একেই ওয়াক্‌ফ বলে। এরপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমানগণ ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। তারা ফসলি জমি, বাগান, ঘর-বাড়ি ও ফসলাদি জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্‌ফ করে দিতেন এবং তাতে মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হত। এ ধরনের ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল অগণিত।

* সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয় তা হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে লোকেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করত এবং এক্ষেত্রে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। এমনকি খলিফা, রাজা ও সম্রাটগণও মসজিদ নির্মাণে, বিদ্যমান মসজিদের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। এরপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়।
* কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বল হারা, পথহারা মুসাফিরদের জন্য মুসাফির খানা ও খাবার ঘর এবং এসব জায়গায় স্থান সংকুলান সাপেক্ষে লোকেরা যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারত। খানকাহ ও ইবাদতখানা অবসর প্রাপ্ত ও বৃদ্ধ লোকদের লোকালয় থেকে দূরে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার জন্য, ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ধরনের খানকা ও ইবাদখানা এবং দরিদ্র ও দু:স্থ লোকেরা যারা নিজের ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না, তাদের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করে দেয়া হত। জনসাধারণের চলাচলের পথে জায়গায় জায়গায় খাবার পানির কূপ খনন করা হয়েছিল যাতে কৃষিকাজে, পশুদের ও পথিকদের পিপাসা মেটাতে কাজে লাগে। এসব কূপ বেশীরভাগ মক্কা ও বাগদাদের মাঝপথে ছিল। এছাড়া দামেস্ক ও মদীনার মধ্যবর্তী রাস্তায়ও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বিভিন্ন ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ও অন্যান্য শহর ও পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যবর্তী সড়কেও এগুলো এত বেশী ছিল যে, তৎকালে কোন পথিকের পিপাসায় কষ্ট পেতে হত না। মক্কায় হাজী সাহেবদের থাকার জন্য প্রচুর ঘরবাড়ী নির্মাণ করা হত। বেকার লোকদের জন্য বিনামূল্য খাদ্য বিতরণের জন্য ঘর নির্মাণ করা হত।[১]
* মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের প্রহরার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হত, যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত লংঘন করে ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে। এসব সীমান্ত রক্ষীদের জন্য বরাদ্দকৃত এ ধরণের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ী ছিল। এসব ঘরে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন খাদ্য, পোশাক, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সহজেই পেত। ঘোড়া, তরবারী, বর্শা, তীর, ধনুক ও সরঞ্জামের অভাব বোধ করত না। তাই মুসলিম দেশগুলোতে সামরিক শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শহরগুলোতে বড় বড় কল-কারখানা নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিমা দেশের ক্রুসেডারগণও শান্তির সময় মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত এবং অস্ত্র কিনত। এজন্য ইমামগণ ফতোয়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, শত্রুদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়। আবার এমন কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল যার আয় আল্লাহর পথে জিহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সেইসব সামরিক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ ছিল, যাদের ব্যয় ভার বহন করা সরকারের সাধ্যে ছিল না।

এমন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থাকত যার আয় দিয়ে রাস্তা, সেতুর সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হত। কিছু কিছু সম্পত্তি কবর, গরীব ও অনাথদের দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হত। সাধারণভাবে দু:স্থ মানুষের সাহায্যের জন্য যেমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিল তেমনি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন, খাতনা দেয়া ও লোকদের খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থাকত। কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন, তাদের জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের খাদ্য ও চিকিৎসার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত লোকদের পেছনে ব্যয় করার জন্য এবং যে সকল অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বিয়ের খরচ ও মোহরানা ইত্যাদির দায়ভার বহন করতে পারত না, তাদের সার্বিক সাহায্যে বেশ কিছু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[২]

---

১. ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী, ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম, পৃ. ৭
২. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ প্রকারের ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস ও খাদ্য সরবরাহ এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে যেত তখন এ দিয়ে তাদের বিচরণের জন্য মাঠ তৈরী করা হত। এ ধরনের ময়দানকে 'মারজুল আখজার' বলা হত।

মহানবী (স.)-এর আমলে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটালেও ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান গৃহীত হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকে। দানশীলতার প্রতি প্রবল আবেগ ও অনুরাগ ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য এবং তাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কারণ। সাবেক তুর্কী সাম্রাজ্যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমগ্র আবাদী ভূমির প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝির দিকে আলজিরিয়ায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল আবাদী জমির অর্ধেক। তিউনিসে ১৮৮৩ সনে ছিল $\frac{১}{৩}$, ১৯৩৫ সনে মিসরে $\frac{১}{৭}$ এবং ১৯৩০ সনে ইরানে প্রায় শতকরা পনর ভাগ। ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশ নামার ধারা মতে শরীআত এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনা করবে।[১]

ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কোন আইন প্রচলিত না থাকায় তা যথেচ্ছা ব্যবহৃত হত। সুতরাং এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক ১৯১৩ সালে ' ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্ট' নামে আইন জারি করা হয়। তখন হতে প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশে ওয়াক্ফের স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইনের কার্যকারিতার জন্য ১৯৩৪ সালে 'বঙ্গীয় ওয়াক্ফ এ্যাক্ট' নামে আইন জারী করে ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্তে ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ জারী করা হয়।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ও সমাজকল্যাণে এর অবদান :

বাংলাদেশেও বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। এগুলো মসজিদ, মাযার, মাদ্রাসা ইত্যাদির রক্ষণা বেক্ষণে নিয়োজিত। এগুলো তদারকের জন্য একজন ওয়াক্ফ কমিশনারের অধীনে একটি সরকারী দফতর রয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট-এর বলে এই সংস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশে ইয়াতিম, দু:স্থ, অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এগুলো সমাজ সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩ । মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ৯৭০৬৬টি রেজিষ্ট্রিকৃত, ৪৫৬০৭টি মৌখিক ও ৭৯৪০টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে। ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে থাকা জমির পরিমাণ ১,১৯,৬৯৫.৪০ একর। তন্মধ্যে ৭০৬৭০.১৮ একর হল কৃষি ভূমি আর বাকীগুলো অকৃষি ভূমি। এছাড়া ওয়াক্ফ সম্পত্তিভূক্ত মসজিদের সংখ্যা ১২০০৬টি, মাদ্রাসা ৪,৩১৭টি,মাযার/দরগাহ ১৪০০টি, ঈদগাহ ২১১৬৩টি, গোরস্থান ৪৩১৭ এবং ইয়াতিমখানা/সরাইখানা/মুসাফিরখানা ৩,৪৫৯টি। এসব ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত।[২]

বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনে ১৫০০০টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভূক্ত আছে। তালিকাভুক্ত এস্টেটের মধ্যে ২১০টি দরগাহ/মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট রয়েছে। তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ২৬৬১টি ওয়াক্ফ আলাল আউলাদ এবং ১২৩৩৯টি ওয়াক্ফ লিল্লাহ। বাকী বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে যাচ্ছে তালিকার বাইরে। প্রয়োজনীয় জনবল না থাকাতে সেগুলো তালিকাভূক্ত করা যাচ্ছে না। তালিকাভূক্ত সম্পত্তির বিভাগীয় ও সাবেক জেলা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

---

১. ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী, ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম, পৃ. ৭
২. ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. ঢাকা জেলা (বৃহত্তর)	১৬১০	২১৯	৪৯
খ. ময়মনসিংহ জেলা (বৃহত্তর)	৭৩৬	১০১	০৭
গ. টাংগাইল জেলা (বৃহত্তর)	৩০৫	৩১	০৭
ঘ. ফরিদপুর জেলা (বৃহত্তর)	১৮৫	৫৮	০১
মোট =	২৮০৬ +	৪০৯ = ৩২৪৫	৬৪ = ৬৪

চট্টগ্রাম বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. চট্টগ্রাম জেলা (বৃহত্তর)	১৯৬৬	২২২	৩৯
খ. নোয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	১০০২	২৯৬	০৮
গ. কুমিল্লা জেলা (বৃহত্তর)	১০০৯	৮১	১৮
ঘ. সিলেট জেলা (বৃহত্তর)	৪৪৮	১৪১	১৪
মোট =	৪৭২৫ +	৭৪০ =৫৪৬৫	৭৯ = ৭৯

রাজশাহী বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. রাজশাহী জেলা (বৃহত্তর)	৮৫৮	১৩২	২১
খ. রংপুর জেলা (বৃহত্তর)	৬৪৫	৬৫	১১
গ. দিনাজপুর জেলা (বৃহত্তর)	৭৫০	১৫৭	০৫
ঘ. বগুড়া জেলা (বৃহত্তর)	৭৮১	১৫৯	০৯
ঙ. পাবনা জেলা (বৃহত্তর)	১৩৬	৩৮	০২
মোট =	৩১৭০+	৫৫০ = ৩৭২০	৪৯ = ৪৯

খুলনা বিভাগ	লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ	আওলাদ ওয়াক্ফ	দরগাহ/মাযার সংখ্যা
ক. খুলনা জেলা (বৃহত্তর)	১৬৫	৪১	০৪
খ. যশোর জেলা (বৃহত্তর)	৯২	১৯	০২
গ. কুষ্টিয়া জেলা (বৃহত্তর)	৯৮	৩৭	০১
ঘ. বরিশাল জেলা (বৃহত্তর)	৭০৫	৩৪৩	০১
ঙ. পটুয়াখালী জেলা (বৃহত্তর)	৫৪৮	৫২২	০১
মোট =	১৬০৮+	৯৬২ = ২৫৭০	+ ৯
মোট =	১২,৩৩৯ +	২৬৬১ = ১৫০০০	২০১

(সূত্র: মো: নিজাম উদ্দীন, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ১০-১১)

বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এ দেশে চালু আছে এবং তারই বিধান বলে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং তদসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াক্ফ এস্টেট সমূহ তালিকাভুক্ত করা, ওয়াক্ফ প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা, ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য ও প্রদান করা, হিসাব বিধিমত প্রণয়ন করা, ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে দাখিল করা, দায়েরকৃত মুকাদ্দমা নিস্পত্তি করণ, জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এছাড়া মুতাওয়াল্লী চাঁদা পরিশোধ ও হিসেব প্রদানে ব্যর্থ হলে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি; বৃত্তিভোগীদের ভাতা প্রদানসহ ওয়াক্ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার কর্তব্য পালন না করলে তাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করার বিধান আছে। কোন মুতাওয়াল্লী ব্যক্তিগত কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করে টাকা আত্মসাৎ করলে পি.ডি.আর. এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে তা আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসকের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১৫

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন বাস্তব ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা, অনুমোদিত নগণ্য জনবল, ওয়াক্‌ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা শুনানীর সনাতন প্রক্রিয়া, ওয়াক্‌ফ আদালতে মীমাংসীত বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকা জনিত কারণে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন গতিশীল করা দুরূহ ব্যাপার। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষাকরণ, তালিকাভুক্তি নয় এরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি গ্রহণ এবং ঐগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বর্তমানে কর্মরত ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের স্বল্প জনবল দ্বারা সম্ভবপর নয়।

ওয়াক্‌ফের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক সংস্থা বিধায় জনহিতকর কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এসব ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম ইয়াতিমখানা, কদম মোবারক ইয়াতিমখানা, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যেমন- আজহারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, Various Mosques and Madrashas under different Waqf Estates in the coutnry take up several programs in order to expand religious education and culture in the counrty. These Institutions play an important role by running charitable hospitals. Mass literacy programs and other socio-economic development programs. Moreover, internal roads within the Estate horticulture, tree plantation establishment of dairy farms, excavation and excavation of ponds for pisciculture purpose are being carried out by the respective Waqf Estate with their own found. Arrangement for rehabititation of poor, helpless, shelterless, ill fated people excluding distribution of foods and clothings among them are made with the increased earning of the Estate. Sewing machines are distributed among the distitute and helpless woman for their employment and arrangement are also being made for establishment of poultry and dairy farms for them. The increased income of the waqf Estates is also provided for co-operative cultivation, handloom Industries and for setting up of small scale cottage industries. Moreover, active co-operation is provided for setting up of technical training centres and big industrial units for employment of poor and handless people of our country.....A huge countribution is made for scientific progress in Bangladesh by setting up herbal medicines (unani ayurvedic) factories, jute mills, glass factories etc. within the waqf estates. Besides, Segnifecant role is played in preaching Islam by observing various religions festivals and fanctions in the important days at different institutions under different Waqf Estates. In this connection, the name of a Waqf Estate "Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh" can be cited, this Waqf Estate has been serving the poor and needy people in the society with free medical treatment and other charitable achivities. Hamdard has taken a scheme for setting up a science town over 100 acres of land within a short time in Bangldesh.[১]

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনাঃ

ইসলামের দানশীলতার প্রতি প্রবল আবেগ ও অনুরাগই এই ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের কারণ। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় মানবতার আদর্শে তারা সহজেই আবেগ ও অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়েন। ধর্মীয় অনুভূতি, অনুশাসন ও মানবিকতা বোধের প্রেরণায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে বাংলাদেশের মুসলমানগণ সমাজ সেবা তথা তাদের সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফ করে থাকেন। বর্তমানে অনেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী/বৃত্তি ভোগীদের মাঝে ওয়াক্‌ফকারীরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ওয়াক্‌ফ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে তেমন কোন গুরুত্ব না পাওয়ার এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে অনেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অস্তিত্ব দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ ওয়াক্‌ফদাতা যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃজন করেছেন সেই সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহ ধর্মীয় ও লিল্লাহ খাতে ব্যয় করার বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

---

১. Mohammad Azharul Islam, Awaqf Experience of Bangladesh in South Asia, Country Paper, New Delhi 1999, P.3

Dhaka University Institutional Repository

তাই ওয়াক্‌ফ এস্টেট (প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি করে) নিয়মিত তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংহত করে কোটি কোটি টাকা আয় করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তদ্বারা দু:স্থ মানবতার সেবায়, দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ার, ইয়াতিমদের প্রতিপালনে, ছিন্নমূল অসহায় নি:স্ব মানুষের চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ এস্টেটের প্রশাসনিক, আইনগত, অর্থনৈতিক যে সকল সমস্যাগুলো[১] চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন তার বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের আয় বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন-

* তালিকাভূক্ত এস্টেটের দাবি পুন: নির্ধারনসহ নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
* অতালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট সমূহকে জরুরী ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত করা সম্ভব হলে যথেষ্ট পরিমাণ আয় বেড়ে যাবে।
* রাজধানী ঢাকাসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং প্রতিটি জেলা ও অনেক থানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহুসংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের খালি জায়গা রয়েছে। এ সমস্ত এস্টেটগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও শিল্প কারখানা স্থাপন করলে এস্টেটের আয় বর্তমানের তুলনায় প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
* ঢাকা মহানগরীসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এবং খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগীয় সদর দফতরে অবস্থিত অধিকাংশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মসজিদ/দরগাহ/মাযার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খালি জায়গায় দোকানপাট, মার্কেট, বাণিজ্যিক ভবন, ফ্লাট এবং বহুতল ভবন নির্মাণ করে ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
* বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় জেলাতেই ওয়াক্‌ফ স্টেটের অধীন প্রচুর অনাবাদী ও পতিত জমি রয়েছে, যা সেচের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে শাক-সবজী, ফল-মূলের চাষ এবং গাভী, ছাগল ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।
* বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে এলাকায় বহু সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেট আছে যেখানে চিংড়ী চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এসকল এলাকায় সমতল ভূমিতে লবণ চাষের মাধ্যমে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
* চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায় পাহাড়ী এলাকায় ওয়াক্‌ফ এস্টেটের জমিতে উন্নতজাতের বৃক্ষ রোপন করলে এস্টেটের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এছাড়া যে সকল এস্টেটের অধীনে চা বাগান আছে তার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা যায়।
* বাংলাদেশের জেলা শহর এবং গ্রামে গঞ্জে অবস্থিত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওতাধীন বহু পুকুর ও জলাশয় আছে। এ সমস্ত পুকুর ও জলাশয়ে মৎস অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে উন্নতজাতের মাছের চাষ করলে এস্টেটের আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
* বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে-গঞ্জে বহু সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটে হাট-বাজার রয়েছে। এসকল ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হাট-বাজারে দোকান-পাট নির্মাণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এস্টেটের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
* দেশের বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি অনেক স্বার্থপর এবং লোভী লোক অবৈধভাবে দখল করে আছে। অর্থাভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। আইন-আদালত করে এসব মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে বহন করা যায়।

উক্ত বর্ধিত আয় দ্বারা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ধিত আয় দ্বারা ওয়াক্‌ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ লিল্লাহ খাতে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সংস্কার ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ বিনামূল্যে লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ আয় দ্বারা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে কম সুবিধাভোগী অসংখ্য মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, কুটির শিল্প, তাঁত ও যন্ত্রচালিত ছোট ছোট শিল্প-কারখানা তৈরীর ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান, দু:স্থ ও অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ এবং হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে গরীব, ভাগ্যাহত, বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিশেষভাবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক লিল্লাহ ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দু:স্থ মানবতার সেবায়, দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়া, ইয়াতিমদের প্রতিপালনে, ছিন্নমূল অসহায় মানুষের চিকিৎসায়, ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে।

---

১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য ১৯শে মার্চ ৯৫ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনে ১নং কমিটি কক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ, যা ৪, নিউ ইস্কাটন রোডে অবস্থিত ওয়াক্‌ফ ভবন অফিসে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাদাকাহ্ বা দানশীলতা

সাদাকা বা দান প্রথা :

দানশীলতা হচ্ছে একটি বিশেষ মানবিক গুণ। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সকল কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা থেকে আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে দানশীলতা অন্যতম প্রধান। অপরের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে এবং বিনা শর্তে ও স্বার্থ ত্যাগ করে দানের প্রবণতাকে দানশীলতা বলা হয়। দানশীলতার বিশেষ রূপই হচ্ছে সাদাকাহ্। ইসলামের অন্যতম সমাজসেবা পদ্ধতি হচ্ছে এই সাদাকাহ্ বা দানশীলতা। সাদাকাহ্ বা দানের মূল লক্ষ্য হল, সমাজের আর্ত-পীড়িত, দুঃস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাহায্য করা। মানব সমাজে দানশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রেরণা মানব মনে হঠাৎ করে আসেনি কিংবা পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা নির্ভর সমাজকল্যাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেও গড়ে উঠেনি, বরং ধর্মীয় প্রেরণা ও মানবতাবাদী আদর্শই মুখ্যত মানুষকে দানশীল হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করেছে।[১] দানশীলতার লক্ষ্য আর্ত-পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাতে তাদের সমস্যা লাঘব হয়। এরূপ সাহায্য প্রধানত ধনবান ব্যক্তিরাই পারলৌকিক মুক্তি, ইহলৌকিক পাপমোচন, বিপদ আপদ হতে মুক্তি লাভের আশায় প্রদান করে থাকে। তাছাড়া দানশীলতা বা সাদাকার মাধ্যমে মানবপ্রেমিকগণ মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভের বাসনাও চরিতার্থ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হয়। শুধু যাকাত প্রদানে করলেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পর সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করারও দায়িত্ব রয়েছে। তাই সাদাকাহ্ বা দান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। আল-কুরআনে সাদাকাহ্ বা দান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাদের (বিত্তশালীদের) ধন সম্পদে অভাবগ্রস্ত প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[২] "যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" "যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে।" "যদি এমন বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ কর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।" "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কিছু গোনাহ্ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন।" "যারা আল্লাহর পথে নিজ সম্পদ ব্যয় করে; তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।"[৩] "হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিজক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যেদি না আছে বেচা কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব।"[৪]

সাদাকা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এটা দানশীলতার ব্যাপক পরিধির অন্তর্ভূক্ত। তবে সাদাকার সাথে যাকাতের যথেষ্ট মিল আছে। মালের যেমন যাকাত প্রদান করতে হয়, তেমনি জানের সাদাকাও করতে হয়। নিজস্ব জান-মালকে পরিচ্ছন্ন ও হালাল করার সাথে সাদকা এবং যাকাত প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে যাকাত যেমনি বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ করতে হয় সাদাকার ক্ষেত্রে তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। স্বেচ্ছাধীনভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সাদাকা প্রদান করে থাকেন। বিপদ-আপদে কিছু মানত করা, মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত কিংবা অসুস্থ্য ব্যক্তির আরোগ্য উপলক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় দান করাও সাদকার অন্তর্ভূক্ত।[৫] এমনকি নেক আমল, সদ্ব্যবহার এবং হাসিমুখে কথা বলাও সাদাকা।

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৮০
২. আল-কুরআন, ৫১ ঃ ১৯
৩. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৬২; ৭১ ঃ ৬১
৪. আল-কুরআন, ২ ঃ ২৫৪
৫. আব্দুল হক তালুকদার, সমাকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এ সাদাকা বা দানশীলতা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছা প্রণোদিত। সামাজিক বা ধর্মীয় কোন বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। ব্যক্তির সামর্থ ও ইচ্ছার উপর সাধারণত সাদাকা বা দানশীলতা নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা অসংগঠিত এবং দান গ্রহীতাদের নির্ভরশীল করে রাখে। অনেক সময় দানশীলতাকে ভিক্ষা দানের সমান বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটা সঠিক নয়। এদের মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ভিক্ষা দানের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকালের আত্মার শান্তি লাভ। মানব কল্যাণ এখানে গৌণ। পক্ষান্তরে দানশীলতা বা সাদাকার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দু:স্থ ও আর্তমানবতার সেবা। সাধারণত ক্ষুদ্র ও সামান্য বৈষয়িক দানকে ভিক্ষা দান বলা হয়। পক্ষান্তরে সাদাকা বা দানশীলতা দ্বারা বড় ধরনের বৈষয়িক সাহায্যকে বুঝায়। ফলে দানশীলতার মাধ্যমে অনেক সময় বৃহৎ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যা ভিক্ষা দানের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সম্পদশালী ও দানশীল ব্যক্তির ইচ্ছা মাফিক অসংগঠিত এবং অপরিকল্পিত বৈষয়িক সাহায্য দানই হচ্ছে দানশীলতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১] কিন্তু ইসলামে দান ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় মদীনা সমাজে। তৎকালীন মদীনা সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল এই দান ব্যবস্থা। ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকীর বর্ণনা মতে, "আনসারগণের সার্বক্ষণিক মেহমানদারী ছাড়াও নিয়মিত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত দানই ছিল মুসলিম সমাজের আয়ের প্রধান উৎস এবং কেবল মদীনা আমলের গোঁড়ার দিকের কষ্টের সময়েই নয়, ইসলামী রাষ্ট্র যখন রাজনৈতিক শীর্ষ মর্যাদায় আসীন হয়, তখনও এই আর্থিক প্রথা প্রচলিত ছিল। .... একদিন একজন ক্ষুধার্ত লোক রাসুল (স.)-এর নিকটে আসে। কিন্তু তাঁকে দেবার মত তাঁর কাছে কিছু ছিল না। তখন আবু তালহা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে খুবই ভালভাবে খাইয়েছিলেন। সেজন্য কুরআন শরীফে তাঁর প্রশাংসা করা হয়।"[২]

হাদীস বেত্তা ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল (স.) একবার একটি নওমুসলিম গোত্রের জন্য সাহায্যের কথা বললে সবাই তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন; কেউ খাদ্য, কেউ কাপড় নিয়ে আসেন, আর একজন আনসারী বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেন।[৩] বদর যুদ্ধে বন্দী মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানগণই উদারতার সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[৪] একই রকমভাবে মুসলমানগণ হুনায়ন এবং তাইফের যুদ্ধের পরে হাওয়াজিনের ৬০০০ যুদ্ধ বন্দীকে পরিধানের কাপড় দিয়েছিলেন।[৫]

যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে অথবা অভিযান চলাকালে দানশীল মুসলমানগণ সব সময়েই বায়তুল মালে দান করতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময়ে সাদ বিন উবাদাহ, জাবির বিন আবদুল্লাহ এবং আরও কয়েকজন সাহাবী মুসলিম সেনাবাহিনীকে খাদ্য ও খেজুর যুগিয়েছিলেন যদিও পরিমাণে তা অল্প ছিল। পরবর্তী বনু কুরায়জার যুদ্ধের সময়ে সাদ বিন উবাদাহ মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য বোঝা বোঝা খেজুর পাঠিয়েছিলেন।[৬] একইভাবে 'যীকারছ' অভিযানকালেও সাদ তাঁর পুত্র কায়েসকে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর জন্য কয়েক বোঝা খেজুর এবং দশটি জাযূর প্রেরণ করেছিলেন। আবু দাউদের বর্ণনা মতে, খায়বার যুদ্ধের সময়ে এমনকি মুসলিম নারীগণ পর্যন্ত কাপড় বুনে যা উপার্জন করেছিলেন তার সবই দান করেছিলেন।[৭]

স্বেচ্ছামূলক দানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাবুক অভিযানের ঘটনা থেকে। রাসুল (স.) ঘোষণা করা মাত্রই মুসলমানগণ সকলে তাঁর বাড়িতে ছুটে যান এবং মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাসুল (স.) এর সামনে নানারকম দ্রব্য সামগ্রী স্তুপীকৃত হয়ে উঠে। আবু বকর (রা.) নিজের সর্বস্ব নিয়ে আসেন, তা ছিল ৪০০০ দিরহাম। আর হযরত উমর (রা.) নিজ স্পদের অর্ধেক দান করেন। অন্যান্য যারা যথেষ্ট পরিমাণ মাল দান করেছিলেন, তারা হলেন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, সাদ বিন উবাদাহ, মুহাম্মদ বিন মাসলামা। আব্দুর রহমান ইবন আউফ এর মালের পরিমাণ ছিল ২০০ উকিয়া রূপা (৮০০০ দিরহাম), আর আসিম ইবন আদী দিয়েছিলেন ৯০ ওয়াসক (প্রায় ৯০ কুইন্টাল) খেজুর। সবচেয়ে বড় পরিমাণের দান এসেছিল উসমান বিন আফফানের (রা.) নিকট থেকে। তিনি সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয় বহন করেছিলেন। বস্তুত যখনই প্রয়োজন হত রাসূল (স.) সাহায্য চাইতেন এবং মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় সাদাকাহ প্রদান করতেন। তবে কারও নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু আদায় করা হত না।[৮]

---

১. মোঃ আতিকুর রহমান, স্নাতক সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১২৪
২. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৬৮
৩. বুখারী ও মুসলিম, বাবুল মাগাজী, কিতাবুস সাদাকাত দ্রষ্টব্য।
৪. বুখারী ও মুসলিম, বাবুল মাগাজী, কিতাবুস সাদাকাত
৫. ইবন ইসহাক, সীরাতু রাসুলুল্লাহ, পৃ. ৩০৯
৬. জবেহ করার উটকে জাযূর বলা হয়।
৭. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯
৮. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

জমিজমা দান করার ঘটনাও বেশ উল্লেখ করার মত ঘটনা। হিযরতের সময়ে রাসূল (স.) কুবাতে কুলসুম ইবন হিদমের বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কুলসুমই সেই প্রস্তাবিত মসজিদের জন্য একখন্ড জমি দান করেন। উম্মে আনাম নাম্মী এক আনসারী মহিলা রাসূল (স.)কে তাঁর জমি উপহার দিলে তিনি তা নিজের ধাত্রী উম্মে আয়মানকে প্রদান করেন। মদীনার আনসারগণ তাঁদের জায়গা-জমি, বাগান, মাঠ, ঘর, মুহাজির ভাইদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। হারিসা ইবন নুমান বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি নিজের কয়েকটি ঘর ও জমি রাসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে উপহার দিয়েছিলেন। একটি বাড়ী উপহার দিয়েছিলেন নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.) কে তাঁর বিয়ে উপলক্ষে।[১] বানু নাজ্জার বংশীয় একজন আনসারী রাসূল (স.) কে একটি প্রাসাদ উপহার দেন সম্ভবত জনগণের প্রয়োজনে।[২] মুহাজিরগণও যে ভূসম্পত্তি বিশেষ করে কূপ দান করেছিলেন, তারও কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। হযরত উসমান (রা.) জনগণের কল্যাণের জন্য 'রুমা' নামক কূপটি ক্রয় করে দান করেন। রাসূল (স.) এর অন্যান্য ধনী ও দানশীল সাহাবীও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য অবশ্যই আরও কূপ ওয়াক্‌ফ করে থাকবেন, এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাদাকা বা দান প্রথা অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত হলেও রাসূল মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত ছিল না। ছিল প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক পরিকল্পিত উপাদান। সাদাকাহ্ দেয়ার জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক বা সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে সাদকাহ্ দানকারী নিজ হাতে তা বন্টন করে দিবে, সামাজিক পদ্ধতিতে সাদাকাহ্ দানকারী তা রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিবেন। সাদাকাতের অর্থ গ্রহণ ও তা বিলি বন্টনের কাজ মহানবী (স.) স্বয়ং করতেন। মহানবী (স.) এর নির্দেশে সাদাকাত বাবদ গৃহীত অর্থ ও মালের হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)।[৩] বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি তথা সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগতভাবে দানের ফলে দানশীলতার প্রকৃত কল্যাণ যাওয়া যাচ্ছে না। সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে যদিও দানশীলতা আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তবুও এর কতগুলো দূর্বল দিক রয়েছে। যেমন,

- সাদকা বা দানশীলতা অপরিকল্পিত বিধায় এর মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান দেয়া যায় না।
- দানশীল ব্যক্তির উদ্দেশ্য তামিলই এতে মূখ্য হয়ে দেখা দেয়। দু:স্থ অসহায় ব্যক্তির প্রয়োজন এবং চাহিদদা পুরণের প্রতি কম গুরুত্ব দেয়া হয়।
- দানশীলতা স্বাবলম্বন নীতি বঞ্চিত বিধায় মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে পরনির্ভরশীল মানসিকতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে।[৪]

দানশীলতা দানশীল ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম।

সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে সাদাকাহর বা দানশীলতার গুরুত্ব :

ইসলাম ধর্মে সাদাকাহর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজের দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সম্পদশালীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের সুযোগ দান করে সাদাকাহ্। ইসলামের বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মুসলমানকে দু'টি কর্তব্য পালন করতে হয়। প্রথমত: স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য (হককুল্লাহ), দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য (হক্কুল ইবাদ)। সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন সাদাকাহ্ বা দানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সাদাকার মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতাবোধ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়, তেমনি সাদকাহ্কারী ত্যাগ, নিরহংকার, অন্তরের প্রশস্ততা, ঔদার্য ইত্যাদি সৎগুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয়। এজন্য যাকাত ফরজ করে দেয়া সত্ত্বেও সাদাকাহ্ বা দান করতে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করে মুসলমানদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।[৫]

যাদের ধন-সম্পদ বলতে কিছু নেই তারা এই অজুহাতে দান সাদাকাহ্ থেকে বিরত থাকেন। বস্তুত দান-সাদাকার বিশেষ তাৎপর্য এবঙ সামাজিক মূল্য রয়েছে। একবার সাহাবীগণ রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হুজুর, যদি কারও নিকট দান সাদাকাহ্ করার মত কিছু না থাকে? নবী (স.) জবাব দিয়েছিলেন সে যেন নিজের হাতে উপার্জন করে; এরপর নিজেকেও লাভবান করে এবং অন্যকেও দান করে।"[৬]

---

১. দ্রষ্টব্য : বুখারী, বাব ফাজলুল মানীহাহ।
২. দ্রষ্টব্য : বুখারী, কিতাবুল সালাকিব
৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'মহানবী (সঃ)-র অর্থ প্রশাসন, অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা, ১৪১৭ হি., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ২৩৬
৪. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৫. আল কুরআন,২ ঃ ২৬৮; ৭১ ঃ ৬১
৬. দ্রষ্টব্য, বুখারী, কিতাবুস সাদাকাত

Dhaka University Institutional Repository

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ যাতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকে, নির্লিপ্ত জীবনে অভ্যস্ত না হয়। তাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যে নিঃস্ব, অসহায় তাকে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কঠোর শ্রম এবং অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তখন স্বাভাবিক কারণেই তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে এবং দান সাদাকাহ করতে সক্ষম হবে। তাই দান সাদাকাহ প্রদানের মনোবৃত্তি গড়ে উঠলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থেই ব্যক্তি তার অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সচেষ্ট হবে।

বাধ্যতামূলক নয়, বরং মনের তাগিদে সহানুভূতি ও সমানুভূতিশীল হয়েই মানুষ সাদকাহর মাধ্যমে সমাজের দু:স্থ, অসহায়দের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালনে উৎসাহিত হয়। এ জাতীয় অনুপম মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের লক্ষ্যেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সাদাকাহর কথা বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

আধুনিক সমাজকল্যাণের দৃষ্টিতে সাদাকা বা দান ব্যবস্থার কিছুটা ক্রটি এবং দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও সমাজকল্যাণের বিকাশে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। ইসলামে এমন অনেক সাদাকাহ রয়েছে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ ও বিতরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, সমাজের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। যেমন- "সাদাকাতুল ফিতর" খোলাফা-এ-রাশেদীনের যুগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে থাকেন। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে এসব দান সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ করা হলে, আর্তমানবতার কল্যাণে সাদাকার অর্থ বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তদুপরি আমাদের ন্যায় অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অত্যন্ত সীমিত বিধায় সাদাকাহ দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণীর নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সাদাকাতুল ফিতর ও কুরবাণীর পশুর চামড়া

সাদাকাতুল ফিতর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য :

ইসলামে সমাজ সেবার অন্যতম সংস্থা বা প্রথা হল সাদাকাতুল ফিতর। পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদের দিন অর্থাৎ ১লা শাওয়াল বিত্তশালীদের উপর গরীব দুঃখীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। ইসলামের অন্যান্য দান-খয়রাত প্রথা হতে সাদাকাতুল ফিতর ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যান্য দান প্রথা যেখানে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, সাদাকাতুল ফিতর সেখানে বাধ্যতামূলক। রমজান শেষে ঈদুল ফিতর নামাজ আদায়ের পূর্বে স্বচ্ছল ও সম্পদশালী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মাথা পিছু নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দেয়া বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)। আবার কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ দান করাও বাধ্যতামূলক।[১] সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

মহানবী (স.) দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতরের আদেশ জারি করেছিলেন।[২] তিনি ফিতরার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (স.) সদকায়ে ফিতরা হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন এবং পরাধীন (গোলাম) মুসলমানের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।[৩] খেজুর এবং যব চাড়া অন্যান্য দ্রব্যও সাদাকাতুল পিতর হিসেবে দেয়া চলে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.)বলেন, আমরা সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' খাদ্য এবং এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা'পনির অথবা এক সা' যাবীব(শুকনো আঙ্গুর) দিতাম।"[৪]

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা নবী করীম (স.) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তাঁর সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে দিতেন। এর ফলে ফকির মিসকীনেরা ঘুরে সাওয়াল করতে গিয়ে নামাজ থেকে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে না, বরং আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।[৫]

মহানবী (স.) বলেছেন, "সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত রোজাদার ব্যক্তির রোজা আসমান ও যমীনের মাঝখানে জুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, আল্লাহর নিকট পৌছায় না।[৬] যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবারবর্গ ও

---

১. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
২. তারিখে তাবারী, পৃ. ১২৮১
৩. বুখারী, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য
৪. বুখারী, কিতাবুয যাকাত দ্রষ্টব্য
৫. আলহিদায়া, ১ম খন্ড, কিতাবুজ যাকাত, বাব সাদাকাতিল ফিতর
৬. বুখারী, কিতাবুয যাকাত

Dhaka University Institutional Repository

পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। এটা ব্যক্তিগত দান হলেও মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলামের সোনালী যুগে সাহাবীগণ ফিতরাকেও একটি সুশৃঙ্খল খয়রাতে রূপ দান করেন। অধিকাংশ সাহাবা দু' একদিন পূর্বেই তাদের ফিতরা বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিতেন।[১]

ইমাম বুখারী লিখেছেন, "লোকজন (তাদের সাদাকাহ্) সরাসরি ফকির মিসকীনকে না দিয়ে ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীকে দিয়ে দিত। যাতে সব মাল একত্রিত হয়ে পরবর্তী সময়ে ইমাম কর্তৃক (গরীবদের মধ্যে) সুচারুরূপ বন্টিত হয়।"[২] স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) সদকায়ে ফিতর একত্র করার জন্য আবু হুরায়রাহকে (রা.) কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[৩]

সাদাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে গরীবরা উৎকৃষ্টমানের খাদ্য পায়। এ ছাড়া ওশরের নামে মুসলমানদের কাছ থেকে শস্যের আকারে যে কর আদায় করা হয় তারও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীবদের উৎকৃষ্ট জাতের শস্যের মধ্যে অংশীদার করা যাতে এগুলো খেয়ে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ্ বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা যা আয়-রোজগার করেছ আর আমরা জমি থেকে যা উৎপন্ন করে দিয়েছি তার মধ্যে যা হালাল ও উৎকৃষ্ট তা হতে (সৎকাজে) ব্যয় কর।"[৪]

কুরবানীর চামড়ার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন :

জিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে বিত্তবান ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে গরু, ছাগল, দুম্বা, উট প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু আল্লাহ্ তায়ালার নামে উৎসর্গ করার প্রথাকে কুরবানী বলা হয়। এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত হল, "এই কুরবানীর রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, এর গোস্তও নয়; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় কেবল তোমাদের তাকওয়া।"[৫] আর এই তাকওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মুমিনের সংকল্প যে প্রয়োজন হলে সে তার সবকিছু এমনকি নিজের জীবনটিও আল্লাহর নামে কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, "আল্লাহ্ মুমিনের জান-মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"[৬] এজন্যই আল কুরআনের এই নির্দেশ "অনন্তর আপনার প্রতিপালক রবের জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন।"[৭]

সমাজকল্যাণ প্রথা হিসেবে সাদাকাতুল ফিতর ও কুরবানীর তাৎপর্য :

সমাজের দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কেবল যাকাতই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সাদাকাহও এ তহবিলকে শক্তিশালী করতে পারে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ফিতরা প্রদান এবং ঈদুল আযহার সময়ে কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের তার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, অসহায় পথিক কিংবা হঠাৎ বিপদগ্রস্ত লোকের যথাসম্ভব সাহায্য করাও কর্তব্য। ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারে ঈদুল ফিতরের দিন যে মুসলমানের ঘরে যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকবে তাকে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করে দিতে হয়। ফিতরার এ অর্থ পুরোপুরি দরিদ্রদের হক। ফিতরার পরিমাণ সাধারণতঃ ১.৭০ কেজি গম বা তার বাজার মূল্য ধরা হয়। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যানুপাতে ঐ পরিমাণ গম বা তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করার বিধান রয়েছে। এভাবে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে যে বিপুল পরিমাণ ফিতরা দেয়া হয় তা দরিদ্র জনগণ পেলেও পরিকল্পিতভাবে এ অর্থ ব্যবহারের অভাবে এতে দরিদ্রদের যে কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জিত হতে পারত, তা আদৌ হয় না।[৮]

অনুরূপভাবে ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানীকৃত পশুর চামড়া বা তার মূল্য গরীব দু:স্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণত কুরবানী দাতা নিজ উদ্যোগেই এ অর্থ নিজস্ব পছন্দ মত দরিদ্রদের মাঝে বিলি বন্টন করে দেন। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু সমাজসেবী সংগঠন ও মাদ্রাসাসমূহের লিল্লাহ্ বোর্ডিং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য কুরবানী দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুরবানীর পুরো চামড়া অথবা

---

১. ইমাম মালিক, মুয়াত্তা, কিতাবুয যাকাত, বাব সাকাকাতিল ফিতর
২. বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, কিতাবুয যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর বাব।
৩. তারিখে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮১
৪. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭
৫. আল-কুরআন, ২২ : ৩৭
৬. আল-কুরআন, ৯ : ১১১
৭. আল-কুরআন, ১০৮ : ২
৮. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশবিশেষ সংগ্রহ করছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এককালীন বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজনের কিছুটা হলেও পূরণ হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ চামড়ার বিক্রয় লব্ধ অর্থ কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া অভাবী জনগণের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। এতে সাময়িকভাবে তাদের চাহিদার কিছুটা পুরণ হলেও তাদের অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব রয়ে যায় স্থায়ীভাবেই। অথচ এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেই অনুসারে এ অর্থ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যবহার করলে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র দূর হয়ে যেতে পারত।

বাংলাদেশে কুরবানীর চামড়া বিক্রি থেকে কত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা অতি অল্প। এক্ষেত্রে বছর ওয়ারী হিসেব দেয়া সম্ভব না হলেও একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, এদেশে গড়ে প্রতি বছর উৎপাদিত গরু, মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পিস। এর মধ্যে বিদেশ থেকে আনা গরুর চামড়াও রয়েছে। যারা চামড়া ব্যবসার সাথে জড়িত, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও আধা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ট্যানারী ও ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করে থাকে, তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, তাদের বার্ষিক সংগৃহীত চামড়ার মধ্যে কমপক্ষে ২০% চামড়া সংগৃহীত হয় শুধুমাত্র ঈদুল আযহার দিনে। তাদের মতে, এদিনে সংগৃহীত গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় সাধারণতঃ ৩ঃ২। এ হিসেব অনুসারে এদিনে প্রাপ্ত ৩০ লাখ পিস চামড়ার মধ্যে গরুর চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ পিস এবং ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ লক্ষ পিস।[১] ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এদেশে পরিবারের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। এর মধ্যে যদি অন্তত:পক্ষে ১৫% পরিবার ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করে তাহলেও ৩০ লাখ পশু কুরবানী হওয়ার কথা। গরুর কাঁচা চামড়ার আকার নির্বিশেষে প্রতিটি গড়ে টাকা ৬০০/= এবং ছাগলের চামড়ার দাম প্রতিটি গড়ে ৭৫/= টাকা ধরলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০ কোটি টাকা। বাস্ত বে এর পরিমাণ আরও বেশী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং দরিদ্রের হক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারেই তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি দক্ষ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সসৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আল্লাহ নির্দেশিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনা আয়াসে প্রাপ্ত এই বিপুল অর্থ ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে ব্যয়িত হওয়ার মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই। সর্বোপরি, ইসলামের এই প্রথাদ্বয়ের উদ্দেশ্য হল গরীব আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঈদের আনন্দ দান এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন। এর ফলে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। বর্তমান কালেও এর মাধ্যমে দরিদ্র মুসলিম জনগণের কল্যাণ সাধন ও ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করতে দেখা যায়। তাই সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এর অবদান একেবারে কম নয়।

করজে হাসানা

ইসলামের অপর একটি সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠান হল করযে হাসানা। এর অর্থ সুদমুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহুর্তে বিনা সুদে ও শর্তসাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করযে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সাহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে ঋণ দানের চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করেছে। এ বিষয়কে উপেক্ষা না করে পবিত্র কুরআনে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য করজ দেয়া নেয়ার একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। সুদমুক্ত হওয়া ও যখন সক্ষম তখন পরিশোধ করার শর্তে করজ দেয়া নেয়া বৈধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরূপ করযকে সুন্দর করয বা করযে হাসানা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ অভাবগ্রস্ত ভাই-বোনদের সাহায্য করার একটি অকৃত্রিম ও আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে এর উৎপত্তি। আর এটা প্রতিবেশীদের দুঃখ-দূর্দশার সুযোগ নিয়ে দর কষাকষি করার প্রবণতা থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই সুন্দর করযকে আল্লাহকে করয দেয়া বলা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আয়াত হল- "সে কে, যে আমাকে সুন্দর করয (করযে হাসানা) দেবে, যা আল্লাহ্ দ্বিগুণ ও বহুগুণ করে তার হিসাবে জমা দেবেন? আল্লাহ অভাব কিংবা প্রাচুর্য দান করেন এবং আল্লাহর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"[২]

---

১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ১৭৮
২. আল-কুরআন, ২:২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ইসলাম সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করলেও বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ বলে মনে করা হয়। স্বচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রসূলের (স.) ইন্তিকালের বড়জোড় এক বছর পূর্বেকার। তাই নবী যুগে এর জন্য কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।[১] রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে ধনাঢ্য সাহাবীরা বিত্তহীন সাহাবীদেরকে ঋণ হিসেবে সুদবিহীন করযে হাসানা প্রদান করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) একবার চল্লিশ হাজারের একটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।"[২] ইমাম বুখারীর মতে, ২০,০০০ দিরহাম ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩]

সরকারী ব্যয়খাতেও করযে হাসানার জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য খলিফার যুগে এ ধরনের অসংখ্য নজীর পাওয়া যায় যে, লোকজন নিজেদের বেতনের জামানতে সরকারী বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করত। ইসলামই প্রথম বিশ্বের নিয়মিত করযে হাসানা সমিতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।[৪] প্রকৃত পক্ষে কোন না কোন সময়ে একজন স্বচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়।অতএব সে যখন অন্য একজন স্বচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে যখন ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন করযে হাসানা ব্যবস্থা থাকার দরুন এসব অভাবগ্রস্তের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোন কারণই রইল না। খুব সম্ভব বিশ্বের বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান হতে পারে যে, স্বয়ং রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বয়ং খলিফাও বায়তুলমাল হতে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকতেন। খলিফা উমর (রা.) নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ঋণ চাইতেন।[৫] হযরত উমর (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তাঁর কাছে বায়তুল মালের আশি হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। অতঃপর তাঁর পুত্ররা ঐ ঋণ পরিশোধ করেন।[৬] হযরত উমর (রা.) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঐ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৭]

বায়তুল মাল থেকে সাধারণ ঋণ ছাড়া উৎপাদনশীল ঋণ দানেরও ব্যবস্থা ছিল। এমনকি মহিলারাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বায়তুলমাল থেকে করযে হাসানা গ্রহণ করত। হিনদা বিনতে উতবা হযরত উমর (রা.) এর কাছে এসে ব্যবসা করার জন্য বায়তুল মাল থেকে চার হাজার দিরহাম ঋণ প্রার্থনা করেন এবং এর জামানতও দেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে ঋণ দান করেন। অতঃপর তিনি (হিন্দা) বনু কিলাবের শহর গুলোতে গমন করে পণ্য দ্রব্য বেচাকেনা করেছিলেন।[৮]

বসরার গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ব্যবসা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং উবাইদুল্লাহ বিন উমরকে বায়তুল মালের বিরাট অংকের অর্থ করযে হাসানা হিসেবে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইরাক থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে মদীনার বাজারে তা বিক্রি করেন। অত:পর বায়তুল মালের সম্পূর্ণ অর্থ এবং এই সাথে অর্ধেক মুনাফাও মদীনার কেন্দ্রিয় বায়তুল মালে জমা দেন। কৃষকরাও ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।[৯]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১৩৮
২. নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল বুয়ু, বাবুল ইসতিকরাজ দ্রষ্টব্য।
৩. M. A, Sabjwari, Economic and Fiscal System During the Life of Mohammad (Sm.), The Journal of Islamic Banking and Finance, October-December, 1984, P. 22.
৪. ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৫. এটা হিজরী ২০ সনের ঘটনা। দ্রষ্টব্য, তাবাকাত ইবন সাদ' ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৮
৬. তাবাকাত ইবন সাদ' ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৮
৭. এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায়, বায়তুল মাল খলিফা এবং তাঁর প্রতিনিধিদের হিফাজতে থাকলেও বায়তুল মালের অর্থের উপর ব্যক্তিগতভাবে খলিফার অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়তুল মালের আমীন (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ছাড়া কিছুই ছিলেন না। তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের সম্পত্তি আমানত হিসেবেই থাকত। (শরহে মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫০)
৮. তারিখে তাবারী, পৃ. ২৭৬৬
৯. ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য খলিফার আমলেও বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা দান করা হত। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় সাদ' বিন আবি ওয়াককাস (রা.) কে বায়তুল মাল থেকে করযে হাসানা মঞ্জুর করা হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কৃষি উৎপাদনের জন্য ইরাকের কৃষকদের বিশ লক্ষ দিরহাম করযে হাসানা হিসেবে দান করেছিলেন।[১]

তাই দেখা যায়, বিনা সুদে ঋণ দান প্রথম দিকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে বিনা সুদে ঋণ দান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হত। সরকারী কর্মচারীগণ তাদের চাকুরীর আমানতে বায়তুলমাল হতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারত। মূলত: ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। সুদমুক্ত ঋণের ধারণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। করযে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রকে আরও দরিদ্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখা যায়। অতীতে এর খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেলেও এর আবেদন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে এর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

মালে গানীমাহ্

গানীমাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধন বা মাল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিনিময় ছাড়া কোন বস্তু গ্রহণ করা। পরিভাষাগত অর্থ-সে সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত হয়। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত কাফির শত্রুদের নিকট হতে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও অস্থাবর আসবাবপত্র হস্তগত করা হয় তা সকলই মালে গানীমাহ্র অন্তর্ভূক্ত। এক কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালই গানীমাহ্। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকালে এটি ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উৎস। গানীমাহ্ বা বিজিত সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রাক ইসলামী যুগে যুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদই বিজয়ী সেনা বা গোত্র প্রধানগণ ভোগ করতেন। ইসলাম মুজাহিদদের মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের চার-পঞ্চমাংশ তাদের উন্নয়নকল্পে এবং এক-পঞ্চমাংশ সমাজিক কল্যাণে ব্যয়ের রীতি প্রচলন করে। কুরআন বলছে, "জেনে রাখ গানীমাহ্ হিসেবে যে মাল তোমাদের হাতে আসে তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূলের,রাসূলের নিকটাত্মীয়দের,ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।"[২]

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পরিত্যক্ত যে সমস্ত সম্পদ হস্তগত হত সেগুলি একত্রিত করে পাঁচ ভাগের একভাগ মহানবী (স.) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে বাকী পাঁচভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে দায়িত্ব ও পদমর্যাদানুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ পদাতিক সৈন্যদের দ্বিগুণ পেত। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, অশ্বারোহী সেনা পদাতিক সেনার তিনগুণ পেতেন।[৩] অমুসলিম যুদ্ধবন্দী নর-নারীকে গানীমাহ হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।[৪] মহানবী (স.) মালে গানীমাহ বিভাগের কর্মকান্ড পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত মুয়াযকিব বিন আবি ফাতিমা (রা.) কে।[৫] মালে গানীমাহকে লুণ্ঠিত দ্রব্য মনে করা ভুল। মুসলিম সেনাবাহিনী প্রধান সুসংগঠিতভাবে এবং পূর্ণ সুবিবেচনার সাথে বিজয়ের পর মুজাহিদদের গনীমতের মাল সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। এতে কোন প্রকার আত্মসাৎ করাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হয়। যখন সকল মালামাল সংগ্রহ করা সমাপ্ত হয় তখন শত্রুদের পক্ষের আবেদন ও অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করা হয়। যখন দেখা যায় যে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই তখনই কেবল বিধান মাফিক তা বণ্টন করে দেয়া হয়। মহানবী (স.)-র সময় মুজাহিদদেরকে কোন প্রকার বেতন বা ভাতা প্রদান করা হত না। তাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মালে গানীমাহর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মালে গানীমাহ্র অংশ প্রাপ্তি তাদের পরবর্তী প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে সাহায্য হত। এর মাধ্যমেই মুজাহিদগণ তাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতেন।

---

১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
২. আল-কুরআন, ৯:৪১
৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, বাবুল গনীমাত দ্রষ্টব্য।
৪. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-৩২
৫. সাইয়েদ হাসান মুসান্না, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

খুমুস

খুমুস বা খুমস অর্থ পঞ্চমাংশ। গানীমাহর পাঁচ ভাগের এক ভাগ যা বায়তুলমালে জমা হত তা-ই 'আল-খুমুস'। গানীমাহর পাঁচ ভাগের একভাগ বা খুমুস মহানবী (স.) তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ[১] অনাথ, দীন-দরিদ্র, মুসাফির এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয়িত হত। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, মহানবী (স.) উক্ত খুমুস বা পাঁচ ভাগের একভাগ পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। এ তিন ভাগের একভাগ মহানবী (স.)-এর জন্য, আর একভাগ মহানবী (স.)-এর পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ বায়তুল মালে জমা হয়ে পরবর্তীতে ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ব্যয়িত হত। মহানবী (স.)-এর অংশও রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফিয়ীর মতে, মহানবী (স.) জীবিত থাকাকালে মালে গানীমাহর যে অংশ গ্রহণ করতেন তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং সাধারণত তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[২]

আল ফাই:

মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল ফাই বা প্রত্যাবৃত ধন। মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যদি অমুসলিমরা নিজেদের জমি জমা, বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় এবং যা কার্যত মুসলমানদের দখলে এসে পড়ে এরূপ পদ্ধতিতে লব্ধ সম্পদকে 'আল ফাই' বলে। যুদ্ধ ব্যতীত যে সম্পদ লাভ করা হয় তাকেই ফাই বলা হয়। অন্য কথায় বিনা যুদ্ধে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূসম্পত্তি মুসলমানদের দখলে আসে তাকেই বলা হয় ফাই। কুরআন: "আর যে ধনমাল আল্লাহ তা'আলা তাদের দাসত্ব হতে বের করে তাঁর রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দিলেন, সেজন্য তোমরা তো আর ঘোড়া দৌড়াওনি, আর না উট হাঁকিয়েছ; এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের যার উপর ইচ্ছা কর্তৃক ও আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শক্তিশালী।"[৩] এ আয়াতে যে ধনসম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথমে বনী নজীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসে। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহুবলে এ সম্পদ মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসেনি বরং আল্লাহ তাঁর নবী (স.) তাঁর সংগী-সাথী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা, দাপট ও ইমেজ দান করেছেন এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত ফল। তাই এ সম্পদ মালে গানীমাহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সৈন্যদের মধ্যে এ সম্পদ যুদ্ধ সামগ্রীর মত বণ্টন করে দেয়া যায় না, কারণ তা বিনা যুদ্ধেই হস্তগত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে তাই ফাই ও গনীমতের হুকুমকে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে আল ফাই সম্পদকে বায়তুলমালের আয়ের উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পদের ব্যয়ের খাতও কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। কুরআন বলছে: "আল্লাহ এ জনপদবাসীদের (আহলিল কুরা) কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয় স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যে ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর।"[৪]

জিযিয়া:

মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল জিযিয়া। অমুসলিমদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়েছিল। অমুসলিমদের জীবন ও সম্পদের এবং মান ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য যে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা হত তাই জিযিয়া। কারণ তারা ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত। মূলত জিযিয়া হচ্ছে নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। সামরিক বাহিনীতে মুসলিম নাগরিকদের যোগদান ছিল অপরিহার্য। সেখানে বলা হচ্ছে, "যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সব হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোকে তারা হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে যারা নিজেদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে না তাদের সাথে লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না তারা জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হয়।"[৫] জিযিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত খাজ না নয়। অমুসলিম গরীবদের কাছ থেকে কোনরূপ জিযিয়া নেয়া হত না। মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সন্তান-সন্ততি, শিশু, স্ত্রীলোক, পঙ্গু, অসহায়, ধর্মপ্রচারক ও বিকৃতমস্তিষ্ক লোকদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হত না। খাজনা হলে এ থেকে কেউ অব্যাহতি পেত না। প্রতিবছর সামর্থ্যবান পুরুষদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১ দিনার আদায় করা হত।[৬] এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব অমুসলমান দেশরক্ষা কাজে যোগদান করবে তাদের জন্য জিযিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। জিযিয়া হতে যে অর্থ বায়তুলমালে আয় হত তা সামরিক ও সৈন্যদের কল্যাণে ব্যয় করা হত।

---

১. নবী করীম (স.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের খাত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু কুরআনে বর্ণিত বাকী খাতগুলো রয়েছে। খুমুসের খাতের আয় থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরও দেয়া যেতে পারে।
২. ড. এম.এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮
৩. আল-কুরআন,
৪. আল-কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত-৭
৫. আল-কুরআন, ৯:২৯
৬. ইমাম আবু ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সর্বগ্রাসী সুদপ্রথার উচ্ছেদ

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবনধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা উপহার প্রদান ইসলামী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিপুল। অর্থ ছাড়া জীবন ধারন সুকঠিন। তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ-অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে সম্পদ উপার্জন, সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধ সবচেয়ে বেশি কঠোর।

সুদ কি?

সুদের সংজ্ঞা সম্পর্কে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ যে মতামত প্রদান করেছেন, তার কয়েকটি হল হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, "কেউ কারও কাছে কোন জিনিস বিক্রি করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে তার দাম পরিশোধ করার সময় দিত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে না পারলে বিক্রেতা পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে দিয়ে নতুন সময় নির্ধারণ করে দিত।[১]

মুজাহিদ (র.) বলেন, "জাহেলী যুগের 'রিবা' ছিল নিম্নরূপ। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলত, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশি দেব।[২]

আবূ বকর জাস্সাস (র.) বলেন, "জাহেলী যুগে লোকেরা ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হত। তাতে বলা হত, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি অর্থ ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।"[৩]

ইবনু হাজার আসকালানী (র.) বলেন, "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে রিবা। যেমন, এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার।"[৪]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, "জাহেলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিত এবং তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করত। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণ গ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হয়। যদি সে আদায় করতে না পারত তা হলে আর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হত এবং সুদ বাড়িয়ে দেয়া হত।"[৫]

তদানীন্তন আরবে প্রচলিত এ ধরনের ব্যবসাকে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নাম দিয়েছিল এবং কুরআন মাজীদ একেই হারাম ঘোষণা করেছে।

সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী :

মানুষ নির্যাতনের এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী যত প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সুদ তাদের অন্যতম। তাই সুদকে পরিহার করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৭টি আয়াতের মাধ্যমে সুদের পরিণতি, কুফল এবং স্বেচ্ছায় যারা সুদ পরিহারে অনিচ্ছুক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেন। ইসলাম পূর্বকাল থেকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক সম্পদ বৃদ্ধি লাভের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যে ভুল প্রথা (সুদ প্রথা) জন্মেছিল, তা পরিবর্তন করে সম্পদ বৃদ্ধি লাভের প্রকৃত পক্ষে তাদের কি ধারণা থাকা উচিত তারই শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন: "মানুষের ধন-সম্পদ তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে (যাকাত)। অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"[৬]

এ বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ সুদী কারবারে মগ্ন সমাজে একটা নতুন চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যাতে শোষণমূলক অর্থনীতির মোহান্ধতা ত্যাগ করে মানুষ সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটি চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে। সুদের মাধ্যমে আয় করা হারাম, এ বিধান জারির মাধ্যমে প্রশ্ন হতে পারে, সুদী আয় এবং বাণিজ্যিক আয়ের মধ্যে তফাৎ কি? (যা তৎকালে কাফিররা করেছিল)[৭] উভয় আয়ের পার্থক্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন। আর সুদকে হারাম করেছেন।"[৮]

---

১. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, (অনু. আব্বাস আলী খান ও আব্দুল মান্নান তালিব), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯, পৃ. ৮৬-৮৭
২. ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী, কায়রো: দারুল মা'আরিফা-১৪০১ হি., খ.৩, পৃ. ৬২
৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন কর্তৃক উদ্বৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪. ইবনু হাজার আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৫. ইমাম আল-রাজী, তাফসীরে কাবীর,দারুল ইলম, লেবানন-১৩৯৮ হি., খ. ২, পৃ. ৩৫১
৬. আল-কুরআন, ৩০:৩৯
৭. আল-কুরআন, ২:২৭৫
৮. আল-কুরআন, ২:২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদানে অর্থ কমে যায় আর সুদ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি পায় কথাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য হলেও বাস্তবে তার বিপরীত। (অর্থাৎ সুদে অর্থ হ্রাস পায় এবং যাকাতে অর্থ বৃদ্ধি পায়) সুতরাং এরূপ ধারণা পরিহার করার জন্যে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।"[১]

সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণদাতা নিশ্চিন্তে নির্ধারিত হারে অর্থ আহরন করে। এটা শুধু ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়নের অন্তরায়। যা সম্পূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী। এজন্যই আল্লাহ মুমিনদেরকে এ পদ্ধতিসহ পূর্বেকার সকল সুদ পরিহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন, " হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[২]

ইসলাম পূর্ব সমাজে সুদ পদ্ধতির একটি ছিল যে, ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ ও আসলকে পুনরায় পুঁজি নির্ধারণ করে দ্বিতীয় মেয়াদে (নতুন শর্তে) পরিশোধের অবকাশ থাকত। এমনিভাবে যতক্ষণ না ঋণগ্রহীতা সুদ আসল সম্পূর্ণ পরিশোধ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চক্রাকারে তার ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ এরূপ প্রথাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।"[৩]

পূর্বোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সুদ ত্যাগ করে সাধারণ মানুষকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দানের আহবান করার পরও যারা এরূপ নাশকতামূলক কাজ পরিহার করতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন, "অত:পর যদি তোমরা (সুদ পরিত্যাগ) না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"[৪]

আল্লাহ তাঁর বিধি-বিধান মান্য করার জন্যে মানব জাতিকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদানসহ নানা রকম ভয়-ভীতিও প্রদান করেছেন। কিন্তু সুদ পরিহার করার জন্যে যতটা কঠোরতা (যুদ্ধ ঘোষণা) দেখিয়েছেন অন্যান্য ব্যাপারে ততটা পরিলক্ষিত হয় না। অত:পর সুদের কুফল ও পরিণতির ভয়ে যারা স্বেচ্ছায় ফিরে আসার সংকল্প করে, তাদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ বলেন, "কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করনা এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।"[৫]

মক্কা বিজয়ের ফলে যখন গোটা আরব মুসলমানদের অনুকূলে চলে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করার অনুকূলে চলে আসে তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করে ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণতা প্রদান করেন।

সুদ সম্পর্কে হাদীসঃ

মেয়াদী সুদের (রিবা আন-নাসিয়া) অবৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আর নগদ বিনিময়ী বা মহাজনী সুদের (রিবা আল-ফা্দাল) অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী (স.) ইসলাম-পূর্ব সমাজের মহাসংক্রামক এ ব্যাধির অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে সুদের বিপক্ষে বিভিন্ন বাণী প্রদান করেন। যার সংখ্যা চল্লিশোর্ধ। এক্ষণে কয়েকটির উদ্বৃতি দেয়া হলঃ

মহানবী (স.) প্রথম সাধারণভাবে রিবা আল-ফাদাল-এর সংজ্ঞা এবং এর অবৈধতা বর্ণনা করে বলেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ (বিনিময় করা হলে সে ক্ষেত্রে) পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দিবে কিংবা গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। এতে সুদ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ২:২৭৬
২. আল-কুরআন, ২:২৭৮
৩. আল-কুরআন, ৩:১৩০
৪. আল-কুরআন, ২:২৭৯
৫. আল-কুরআন, ২:২৭৯
৬. সহীহু মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং-২৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করা স্বাভাবিক যে, যিনি সুদ গ্রহণ করবেন তিনিই শুধু অপরাধী। সুদদাতা কিংবা এতদসংক্রান্ত সহযোগীরা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। মহানবী (স.) সুদ দাতা, গ্রহীতা এবং এতদসংক্রান্ত সকলকে অভিসম্পাত করেন। এ মর্মে হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ মহানবী (স.) থেকে বর্ণনা করে বলেন: "আল্লাহর রাসূল (স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেন-দেন সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন তারা সকলেই সমান অধিকারী।"[১]

সুদগ্রহণ করা হারাম, কিন্তু তা কোন পর্যায়ের? পৃথিবীর যত প্রকার হারাম কাজ আছে তন্মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের হারাম হল আপন মাকে বিবাহ করা এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যা বেনজির। আর সুদ খাওয়া তারই সাদৃশ্য। মহানবী (স.)-এর ভাষায় সুদের মধ্যে তিহাত্তরটি (৭৩) গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হল নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় (পাপ)।"[২]

নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া:

সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদের ক্ষতিকর দিক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক রূপ দেখা দেয়। সুদের এ সর্বগ্রাসী রূপ দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চস্বরে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে এ ধরনের বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সুদের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্খা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যন্ত সমগ্র মানবিক কর্মকান্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, মানসিক কাঠিণ্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে।[৩]

সুদের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মানুষের স্বার্থপরতার কারণে সুদের প্রচলন হয়েছে। সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ খায়, তাদের মধ্যে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জরুরী ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসায়ী নিজের আপদকালে সুদ দিতে ব্যর্থ হয় বলে দেউলিয়া হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়।[৪] এক কথায় সুদী সমাজে সুদই যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যারা সুদ দিতে সক্ষম তাদের জন্য মহাজন এবং মহাজনদের দ্বারা গঠিত ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অক্ষম তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতিটুকু দূর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "এ ধরণের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।"[৫] আফজালুর রহমান বলেন, "It inculcates habit of miserliness, selfishness, cruelty, love of money, greed for accumulation of wealth etc. among individuals it spreads class-struggle and class-hatred among people and checkst he growth of ideals of mutual help and co-operation."[৬]

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহয্যেই। স্বল্পঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থ লাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

---

১. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং-১১২৭
২. সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২২৬৬
৩. আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬
৫. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, Islam and the Theory of Interest, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987, P. 148
৬. Afzalur Rahman, Economic Doctorines of Islam , Vol-III, P. 127

Dhaka University Institutional Repository

সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরও ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্থ মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করজে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আটির মত তাকে সুদ শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তী অর্থ পেয়ে ধনী আরও ধনী হয়। আর ক্রমে ক্রমে নি:শেষ হয়ে যায় দরিদ্র লোকজন।

সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দূর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দূর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা তা বন্ধক রেখে সুদ-আসলসহ শুধতে হয়। তা না হলে কি মহাজন কি ব্যাংক সকলকেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়।

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে। ঋণ গ্রহীতারা কঠোর পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করে তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্য দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ঋণের দায়ে তাদের ভিটেমাটি পর্যন্ত মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। এতে সমাজে সাধারণভাবে সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ-আপদ ও সংকটকে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাদের অমানবিক আচরণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুদখোরদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধু ভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে।

ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী বলেছেন, "The money lender continued to be feared and detested by all people in out of their clutches."[১]

সুদী সমাজে সুদ ছাড়া ঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জরুরী প্রয়োজনে, বিপদ-আপদ ও দূর্বিপাকের চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়াও চক্রবৃদ্ধি সুদের হার ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, "The borrower has no occasion to borrow as a producer. When he does any borrowing of money he does it for securing personal necessities."[২]

এ অবস্থায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সুদে-আসলে ঋণের বোঝা বিরাট হয়ে যায় এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অধিকাংশ গ্রহীতা তাদের শেষ সম্বল ভিটে মাটিটুকু বিক্রি করেও ঋণের বোঝা থেকে রেহাই পায় না। কখনও কখনও বংশানুক্রমে ঋণের বোঝা চলতে থাকে। স্বল্প আয়ের লোকদের দু'বেলা পেট পুরে আহার করার মত অর্থও তাদের থাকে না। তারা অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে ঋণের ভারে জর্জরিত বিরাট এক জনগোষ্ঠী সর্বদাই ঋণদাতাদের চাপের মুখে নিদারুণ অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে নি:শেষ হতে থাকে। তাদের কর্ম দক্ষতা হ্রাস পায়। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাদের নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এবং জাতীয় উৎপাদনকেও নিম্নমুখী করে দেয়।

সমাজে ঋণগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্পবেতনের কর্মচারীগণ সর্বদা মহাজনের চাপের মুখে থাকে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনটুকু মহাজনকে দেয়ার ফলে অর্থাভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দিতে পারে না। ফলে এসব ছেলে মেয়েরা সুশিক্ষার অভাবে বিপথগামী হয়ে ওঠে। এতে অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হতে থাকে। তদুপরি সুদী সমাজে লাভ পাবার আশায় বিনিয়োগকারীগণ এমন খাতে বিনিয়োগ করে যা নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে।

---

১. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, op.cit, P. 161
২. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক ও মারাত্মক। সুদ অর্থনীতিতে পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতি শ্লথ করে দেয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে এবং চরম অস্থিরতা ও মন্দা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। জন লক যথার্থই বলেছেন, "High interest decays trade. The advantage from interest is greater than the profit trade which makes the rich merchants give over and put out their stock to interest and the lesser merchants break."[১]

সুদ পুঁজি গঠনকে যেমন বাধাগ্রস্থ করে তেমনি পুঁজি বৃদ্ধির গতিকেও হ্রাস করে। অর্থনীতিবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, সুদ মূলধন গঠনে তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সে সময় আমেরিকায় মাত্র ১% সুদের হারে সঞ্চয় এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উচ্চতর সুদের হার থাকাকালে তা কখনও সম্ভব হয়নি।[২] অর্থনীতিবিদ প্যারেটো তাই বলেছেন, "সঞ্চয় সুদের হারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং সুদের হার যদি শূন্যেও নামিয়ে আনা হয় তাহলেও সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।"[৩]

পুঁজি গঠনে সুদের ইতিবাচক প্রভাব নেই-অর্থনীতিবিদদের এ আবিষ্কার নি:সন্দেহে একটি যুগান্তকারী অবদান। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, সুদের হার পুঁজি গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিশ্বের উন্নয়নকে পিছিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে জে.এম. কীনস বলেন, "That the world after several millennia of steady individual saving, is so poor as it is in accumulated capital-assets, is to be explained in my opinion, neither by the improvident propensities of mankind, nor even by the destruction of war, but by the high liquidity premiums-formerly attaching to the ownership of land and now attaching to money."[৪]

অর্থনীতিবিদগণ সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লর্ড কীনস তাঁর 'জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে যায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কম থাকলে মানুষ বেশি ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে মানুষ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। লর্ড কীনস দেখিয়েছেন, সুদের হার শূন্য হলেই কেবল পূর্ণ বিনিয়োগ হয় এবং দেশের বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। অন্যথায় সুদের হার যত বাড়ে, বিনিয়োগ তত কমে যায় এবং বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদ তত বেশি অব্যবহৃত থাকতে বাধ্য হয়। এ জন্যই লর্ড কীনস শূন্য সুদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুদের হার যাতে শূন্য হয় সে জন্য তিনি সরকারকে আইন প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৫]

সুদী অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় সঞ্চয়কারীদেরকে অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প তথা উৎপাদন কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার হয়, সঞ্চয়কারীগণ তা করতে রাজি হয় না, তারা সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রেখে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই নিরাপদ মনে করে। সুদ না থাকলে সঞ্চয়কারীগণ নিজেরা বা অন্য কোন বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে তাদের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করবে এবং নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতা খাটিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করার প্রয়াস পাবে। অর্থনীতি এদের মেধা ও শ্রম থেকে উপকৃত হবে এবং তারা নিজেরাও অধিকতর লাভবান হবে।

সুদমুক্ত অর্থনীতির তুলনায় সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদন কম হয়। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ যে পর্যন্তই হয় এবং সুদের হার শূন্য হলে পুঁজি প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত আরও যে পরিমাণ বিনিয়োগ হতে পারত, সেখানে তা বেকার থেকে যায়। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে অর্থনীতি এ পরিমাণ বিনিয়োগের উৎপাদন থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়।

সুদী সমাজে পুঁজির বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয় না। সঞ্চয়কারীদের মধ্যে আলস্য সৃষ্টি হয় এবং কল্যাণকর ঝুঁকি বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ হয় খুব কম। তদুপরি বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন সুদী অর্থনীতিতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা থাকে না এবং উৎপাদিত পণ্যের কার্যকর চাহিদা থাকে খুবই কম। ফলে এ সমাজে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয় তা বিক্রি হয় না। আর এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না বরং কখনও কখনও উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য হতে হয়।

---

১. J.M.Keynes, এই উক্তিটি উদ্বৃত করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, op.cit, P. 37
৩. Guide & Risht, A History of Economic Doctoriens, P. 723
৪. J.M. Keynes, General Theory of Interest, Money and Employment, P. 242
৫. J.M. Keynes, op.cit, P. 351

Dhaka University Institutional Repository

আবার সুদ দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি করে দেয়। স্বাভাবিকভাবে সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য সুদের সমান বেড়ে যায়। ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীগণ যখন সুদের বিনিময়ে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে, তখন তারা এ সুদকে উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করে। এতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় সুদের সমান বৃদ্ধি পায়। অত:পর উদ্যোক্তাগণ তাদের কাঙ্খিত মুনাফা ধরে পণ্যের দাম ধার্য করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সুদমুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বেশি হয়।

সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে উৎপাদন কম হওয়ায় যোগান কম হয় এবং দাম বেড়ে যায়।

সুদ না থাকলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌছবে। একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দামও কম হবে। পণ্যের চাহিদা ও বিক্রি বেশি হবে। উৎপাদনকারীর মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। তারা উৎসাহিত হবে এবং আরও অধিক বিনিয়োগ ও উৎপাদনে এগিয়ে আসবে। দ্রব্যের যোগান ও দাম আরও কমে আসবে।[১]

সুদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। সুদ যেমন বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে তেমনি বেকারত্ব বৃদ্ধিও করে। বেকার সমস্যা সুদী অর্থব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য। সুদমুক্ত অর্থনীতিতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়, সুদী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ তার চেয়ে কম হয়। সুদী অর্থব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে আসা পর্যন্ত যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা যেত, সে পরিমাণ পুঁজি অনিয়োজিত বা বেকার থেকে যায়। পুঁজির এ বেকার অংশটুকু বিনিয়োগ করে যে সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব এবং যে পরিমাণ অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার করা যায়, সুদী অর্থনীতিতে শুধু তার সবটাই বেকারত্ব সৃষ্টি হয় না, বরং সে সাথে অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারও সম্ভব হয় না।[২]

পুঁজি অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ ফটকাবাজীর উদ্দেশ্যে পুঁজির একটা বিরাট অংশ অলসভাবে নগদ ধরে রাখে এবং আর একটা বড় অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। পুঁজির এ অংশগুলো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে এবং বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সুদের বর্তমানে পুঁজির এ অংশ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় না বলে এসব শ্রমিক ও সম্পদ বেকার থেকে যায়, আর তাতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়।[৩]

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সুদ পুঁজিবাদী শোষণ, বৈষম্য ও জুলুমের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদ অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়, অর্থ বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ফটকা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সর্বোপরি সুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সুদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা হতে সুদ প্রথা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এসব কুফল থেকে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই।

---

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ভারত-বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ও সংস্কারে সূফী সাধক ও দরবেশগণের অবদান

* উপস্থাপনা
* ভারতে ইসলাম বিকাশের ধারা
* অবিভক্ত বাংলার ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট
* অবিভক্ত বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রভাব
* সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারে তাদের অবদান
  ক) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে
  খ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাদের অবদান
  গ) সমাজ জীবনে তাদের প্রভাব
  ঘ) শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা :

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রকট বর্ণভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও এর আক্রমণাত্মক প্রভাব প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায় সিন্ধু আক্রমণকারী আরবদের (৭১২ খ্রী.) স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সহজ-সরল রীতি-নীতি, সহিষ্ণুতা ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরব বণিক, ধর্মপ্রচারক, পীর-দরবেশ, শাসকবর্গ প্রমুখ উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সুদীর্ঘ ৮শ বছর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারি পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অনন্য আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাধ ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে দু:স্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসাতির হয়।

ধর্মপ্রচারক সুফী-সাধক ও দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্, দরগা বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং এর পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর, দিঘি, কুপ ও খাল খনন, বৃক্ষ রোপণসহ্ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ইসলামী প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-যাকাত, দান, সাদাকা, ফিতরা, ওয়াক্ফ, ওশর প্রভৃতিও এ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

উপমহাদেশে ইসলাম বিকাশের ধারা :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক (৬০০ খ্রী.) আরব ভূমিতে ইসলাম প্রচারের এক শভাব্দী কালের মধ্যে মুসলমানদের আধিপত্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে উত্তর আফ্রিকা (মিশর) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলাম পরবর্তী আরবের সাথে অপরাপর অঞ্চলের মত ভারতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। তাই পি. কে. হিট্টি বলেছেন, "In the Islamic age of Arabeans were not a military people, their history was that of trader of a prosperous maritine civilization in the south which linked Indian with Africa."[১]

আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে পাওয়া যায়। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এ সব উপনীবেশে নৌবহর এসে নোঙ্গর করত। ফলে বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হত তেমনি সংবাদাদির আদান-প্রদানও চলত। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই তা এদেশের জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।[২]

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যাবহিত সময় পর্যন্ত সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার (আরবসহ) মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।[১] এরূপ ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময়ও ভারতবর্ষে আরবদের গমনাগমন অব্যাহত ছিল। কে. এস. লালের মতে, "With the rise of Islam Persians and Arabs (now turned) Muslim maritines entered into the inhabitance of their predecessors."[৩] এন্ড্রু উইঙ্ক বলেন- "Early Islam was highly receptive to novelties and favoured the transmission not only of men and goods but also of technology, information and idias"[৪]

১. P.K. Hitti, The Aryan, London-1956, P. Intro.
২. মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন, বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্য সূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা-১৯৮৮, পৃ. ৩৪৫
৩. K. S. Lal, Early Muslim in India, New Delhi, 1984, P. 1
৪. Andre Wink, Al-Hind -The making of the Indo-Islamic World, vol-i, E. J. Brill the Natherlands, 1991, P. 10

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়টি সম্পর্কের ক্ষেত্র নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে মহানবী (স.)-এর আমলে আরব মুসলমানগণ ভারত অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তার বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি 'হিন্দ' বা 'সিন্ধ' এর কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন-ভারতের আদর্শিক বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (স.) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দিবেন। তার মধ্রে একটি হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল। আরেকটি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.)-এর সহযোগী সেনাদল।"[১] হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। তাই সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। সেখানে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব আর যদি মঙ্গল মত ফিরে আসি তবে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি পাব।"[২]

ড. তারা চাঁদ আরব, ফিলিস্তিন ও মিসর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি প্রাচীন পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে তাদের ঐক্য ইসলাম পূর্বকাল থেকে সূচিত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া তীব্র গতি সঞ্চার করে। মুসলিম বাহিনী দ্রুত সিরিয়া ও পারস্য দখল করে এবং ভারত সীমান্তে অভিযান শুরু করে। মুসলিম বণিকরা অনতি বিলম্বে পারসিকদের নৌ-বাণিজ্যের উত্তরাধিকারে প্রবেশ করেন এবং আরব নৌ-বহর ভারত সাগরে দ্রুত ধাবিত হয়। আরব নৌ-বহর লোহিত সাগরের উপকূল থেকে অথবা দক্ষিণের উপকূলে যাত্রা শুরু করত। তাদের লক্ষ্য থাকত সিন্দু নদের মুখে ও উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্বে উপসসাগরের অথবা মালাবার উপকূলে মাল খালাস করা, যাতে কৌলম সহ সরাসরি অন্যান্য বন্দরে পৌছে যাবার জন্য মৌসুমী বায়ুর সহায়তা পেত। পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে বাণিজ্য জাহাজগুলো মৌমমী বায়ুর সাহায্যে একই পথে কৌলম, মালয় উপদ্বীপ, পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে পৌছে যেত। খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে ৬৩৬ খ্রী. মুসলিম নৌ-বহর ভারতীয় পানি এলাকায় উনীত হয়, তখন বাহরায়েন ও ওমানের শাসক (গভর্ণর) ছিলেন উসমান শফিকী। তিনি সমুদ্র পথে তানাতে সৈন্য প্রেরণ করে খলিফা কর্তৃক তিরস্কৃত হন।"[৩]

খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে ভারত অভিমুখী স্থলপথ আবিস্কারের বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা শেষ পর্যন্ত অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের ত্বরান্বিত করে। এ সময় নৌ-বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলছে। মুসলমানগণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের তিনটি শহর ও সিংহলে তাদের বসতি স্থাপন সম্পন্ন করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর পরে পারসিক ও আরবীয় বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করেন। এ ধরনের বসতি স্থাপন মালাবার উপকূলেই খুব ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য। মনে হয় বন্দর এলাকায় বিদেশী বণিকদের বসতি স্থাপনের উৎসাহ দানের নীতি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন-সিংহলের রাজা উপহার স্বরূপ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কতিপয় মুসলিম বালিকা প্রেরণ করেন যারা তাঁর দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এ সব অনাথ বালিকা ছিল সেখানকার মৃত মুসলিম বণিকদের কন্যা।"[৪] আরবীয় নৌ-বহর অষ্টম শতাব্দীতে ব্রোচ ও কাথিওয়ার উপকূল বন্দর আক্রমন করে। তাঁদের বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। বসতি স্থাপনের পরেই তাঁরা ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। নবম শতাব্দী শেষ হবার আগেই তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

সে সময়ে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত চলছিল। নব হিন্দু মতবাদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান পতনের যুগ। চের রাজ বংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল, আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল নতুন রাজবংশ। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মানসিক অবস্থা তখন অস্থির ছিল। নতুন ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা ছিল উন্মুখ। এ সময় দৃশ্যপটে আসে ইসলাম তার সরল বিশ্বাস, অনাবিল আদর্শ ও মানবতার মুক্তির সওগাত নিয়ে। ফলে এর প্রভাব হয় অতিবিস্ময়কর। চেরুমল পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, মুসনাদ-ই-আহমাদ, সাওবান বর্ণিত হাদীস অধ্যায়

২. নাসাঈ শরীফ, প্রাগুক্ত

৩. ড. তারা চাঁদ (অনু. এস. মুজিব উল্লাহ), ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ২৯

৪. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায় যে, তিনি এক স্বপ্ন দেখে এই নবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন-যেন চাঁদ দুই খন্ড হয়ে যাচ্ছে। এর অব্যাবহিত পরেই সিংহল থেকে প্রত্যাগত একটি মুসলিম ধর্ম,

প্রচারক দলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দলের নেতা শায়খ সিককে উদ্দীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজাকে ইসলামের দীক্ষা দেন এবং তাঁর নাম রাখের আব্দুর রহমান সামরী। দীক্ষা গ্রহণের পর রাজা মালাবার ত্যাগ করে আরবের শাহরে উপনীত হন এবং চার বছর পর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখান থেকে মালিক বিন দীনার, শরীফ ইবনে মালিক, মালিক ইবনে হাব্বি ওতাঁর পরিবার-পরিজনকে চিঠি দিয়ে মালাবার প্রেরণ করেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও মুসলমানদেরকে কিভাবে সংবর্ধনা দিতে হবে তার নির্দেশ দেন।[১] উপরন্তু আলী রাজা নামের একটি মুসলিম পরিবার কোলাত্তিরি রাজাদের মন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তী শতাব্দী সমূহে ইসলামের প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পায়। মাসুদী, সুলায়মান, আবুল ফিদা, ইবনে বতুতা প্রমুখ মুসলিম পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায় তা পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের আগমন অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে পূর্ব উপকূল এবং তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সময়ে সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। একদিকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় শাসকদের মন্ত্রী, নৌ-সেনাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রদূত ও রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদার হন, অন্যদিকে তারা অনেক লোককে নিজ ধর্মে দীক্তি করেন। নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেন। মসজিদ ও সমাধি স্তম্ব নির্মাণ করেন-যেগুলি পরবর্তীতে দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায়ই সমুদ্র পথে আগত বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম ভারত উপমহাদেশে পৌছে।

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও এ উপমহাদেশে মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তারা এদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে হিজরী ১৪/৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। উসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী তাঁর ভ্রাতা মুগিয়া সাকাফী, হারেস বিন মুররি আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্দুর সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। ৪৪ হিরীতে (৬৬৬ খ্রীঃ) মু'আবিয়ার শাসনামলেসেনাপতি মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বানা' ও 'আহ্ওয়াজ' নামক স্থানে পৌছেন। মুহাল্লাবের পরে আব্দুল্লাহ ইবনে সারওয়া, রাশেদ ইবনে জাদীদী, সিনান ইবনে সালামাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনজির ইবন জারুদ আবদী কয়েকবার সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।"[২] অবশেষে খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তরুণ ও সুদক্ষ যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে একটি অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সিন্ধু জয় করেন এবং মুলতান ও সিন্ধুকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর অভিযান সমাপ্তকরেন। এ অভিযানে তিনি চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যের সাহায্য পান। তিনি যখন পুরনো ব্রাহ্মণ্যবাদ জয় করেন তখন তাঁর পক্ষে 'সারওয়ান্দার' মুসলিম অধিবাসীগণ যোগ দিয়েছিলেন।[৩] মুহাম্মদ বিন কাশিম নতুন জনপদ জয় করে সেখানে এজন শাসক নিয়োগ করেন। তিনি দেবল (করাচী) জয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানে চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের অনেককে জায়গীরও দান করেন।[৪]

আবার মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান পরিচালনা করেছেন কিংবা মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি নির্মাণ করেছেন সেখাইে মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ উপস্থিত হয়েছেন। আবু হিফাম বিন সাহিব আল আদাবী আল বসরী সিন্দু আসেন এবং সেখানেই ১০৬ বছর হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মনসুর হাল্লাজ নৌ-পথে ভারতে আসেন দশম হিজরীতে। তিনি স্থলপথে উত্তর ভারত ও তুর্কিস্তান হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সহযাত্রী একদল দরবেশ নিয়ে বাবা রিহান বাগদাদ হতে ব্রাচে আসেন। নূর আলদীন বা নূর সওদাগর (১০৯৪-১১৪৩ খ্রী.) গুজরাটের কুনবী, খাবভাস ও কোরীদের ইসলামে দীক্ষিত করেন। 'কাশফুল মাহযুব' গ্রন্থের প্রণেতা আলী বিন উসমান হুজরী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে ভ্রমন করে লাহোর চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। একাদশ শতাব্দীতে আসেন শায়খ ইসমাইল বোখারী। দ্বাদশ শতাব্দীতে আসেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুনতিক-উত-তায়ির' ও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'র লেখক ফরিদ উদ্দিন আত্তার। খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমীরে আসেন ১১৯৭ খ্রী. এবং ১২৩৪ খ্রী. সেখানে ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

১. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২. আব্দুল গফুর, 'মহানবীর যুগে উপমহাদেশ', অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫৫
৩. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত, ইবনে বতুতার সফর নামার (উর্দু) অনুবাদ আযায়েবুল আসফার (২য় খন্ড), দিল্লি, ১৯১৩, পৃ. ৫২
৪. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অবধারিতরূপে একটি প্রচারমূলক ধর্ম মত। আর বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি মুসলমান এক একজন প্রচারক। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করে সকল প্রকার অংশীবাদী পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করা এবং মানব সমাজকে ইসলামের মূলনীতি তাওহীদের আওতায় এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করা। মূলত এ আদর্শের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আরব মুসলমানগণ নবীর (স.) ইন্তিকালের পরপরই নিজেদের আবাস ভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বের নানা অঞ্চলে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই উপমহাদেশে ইসলাম বিজয়ী একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইসলামের আবির্ভবকালে ভারত-বাংলাদেশের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট :

আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীদাহ, কালীদেবীর নামে নরবলি, আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হয়ে উঠে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ যেন আর্তনাদ করছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে। বর্ণপ্রথা তখন এতই কঠোর ছিল যে, কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেটে যেত, তাহলে তাকে ফাঁসি দেয়া হত। মানুষে মানুষে এত প্রভেদ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় নি। বহু ঈশ্বরবাদ, কুসংস্কার ও বহু বিবাহের ব্যাপারে ভারত ও আরবের অবস্থা ছিল একই।[১]

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে তৎকালীন ভারতীয় বাংলায় কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি এবং এ দেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু তাদের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন ও সমাজ সৃষ্টি হয়নি। ছিল গ্রাম্য সভ্যতা, যেখানে আপন ধারায়, বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সমাজ চালু ছিল। এই গ্রাম্য সমাজের কর্তা ছিল হিন্দুগণ। সমাজের মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল। সেন আমলে কৌলিণ্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় তা নূতন ও আদর্শ সমাজ সংগঠনের পথে প্রবল বাধা ও অন্তরায় ছিল। সেখানে জাত্যাভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে অধিকার করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উপর প্রভূত্ব করত। আলবেরুণীর বর্ণনায়, They are houghtly foolishly vain, self-concieted and stolid. They are by nature niggardly in communicating what they know and take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their peoples, still much more, of course, from any foreigner. According to their belief, there is no other country on the earth but theirs, no other race of man but theirs, and no created beings besides them have any knowledge or science whatsoever.[২]

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। যথা-হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম। আর্যদের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের লোকেরা বৈদিক ধর্মের সংগে পরিচিত হয়। সম্রাট অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধধর্ম ও প্রসার লাভ করে। গুপ্ত যুগে বাংলায় তান্ত্রিক মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শৈব। লক্ষণসেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করলেও সেন আমলে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মই প্রবল হয়ে উঠে। সেন রাজাগণ পৌরাণিক দেবতাদের পূঁজার ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাংলায় ম্লান হয়ে যায় এবং হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে, বাংলায় বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি ছিল। সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধগণ জ্ঞান ও ধর্ম নিষ্ঠায় সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সপ্তম শতকে শীলভদ্র নামে এক বাঙালী বৌদ্ধচার্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য পদ অলংকৃত করেছিলেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক বিষ্ণু মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। রাজা লক্ষণসেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা সম্ভবত বাংলায় সর্ব প্রথম প্রচলিত হয় এবং পরে তা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত হয়।

গুপ্ত যুগে শৈব ধর্ম প্রচলিত ছিল। ৬ষ্ঠ শতকে মহারাজ ধৈন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন্। পাল সম্রাট নারায়ণ পাল একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং মন্দিরের পূজারীদের ভূমি দান করেছিলেন। সদাশিব ছিলেন সেন রাজাদের ইষ্ট দেবতা। সেন রাজাদের মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি খোদিত দেখা যায়। বাংলায় প্রাচীনকালে শাক্ত পূজারও প্রচলন ছিল। বাংলার বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায় নানাভাবে দেবীর উপাসনা করতেন। বাংলার বহুতান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত মতের কথা বলা হয়েছে।

---

১. Saydur Rahman, An Itroduction to Islamic Culture & Philosopy, Dacca, 1963, P. 21

২. আল বেরুনী, ভারত বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় সৌর সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন সূর্যপূজারী ছিলেন। হিন্দু রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎখাতের চেষ্টা চলে এবং এ প্রক্রিয়া সেন আমলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সে সময়ে মহাশক্তির পাদমূলে নরবলীর প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্তিসহকারে প্রত্যেকে শীলা ও শিবপূজা, শরৎকালে দূর্গাপূজা এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য, শিব, মহেশ্বর, শ্যামা, কালী, চন্ডী, কার্তিক, গনেশ, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা করত। বাংলায় ৭০টি বিহার, ৮০০০ ভিক্ষু এবং ৩০০টি দেব-দেবীর মন্দির ছিল।[১] সেকালের হিন্দুরা, গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র নদীতে স্নান করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করত। প্রথমটা দশহারা ও পরবর্তীটা অষ্টমী স্নানরূপে পরিচিতি ছিল। বাংলা মাঘ মাসের ৭ তারিখে কোন পবিত্র নদীতে মাঘী সপ্তমী স্নানরূপে পরিচিতি ছিল।[২] দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও হোলী উৎসব খুবই প্রচলিত হয় এ যুগে। দ্বাদশ শতকের পূর্বে হোলী উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রচুর ফসল কামনা করে হিন্দুরা দেবীকে (কালী) প্রসন্ন করতে নরবলীর মাধ্যমে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। এর সঙ্গে যৌনভাবমূলক নৃত্যগীতও থাকত। হোলীর সঙ্গে কাম দেবতার উৎসব জড়িত ছিল।[৩] পাল রাজাদের আমলে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষীণ বল হয়ে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা ও বিহারে বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁদের আমলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। পাল রাজাগণ বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও তা ব্রাক্ষণ ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। পালযুগের পর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা মূল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পৃথক ছিল। আধুনিক মহাযান মতবাদ বজ্রযান ও তন্ত্রযান ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এদেরকে সহজিয়া বা সহযান ধর্ম বলা হয়ে থাকে।[৪] বৌদ্ধ ধর্ম যখন পরবর্তীকালে বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী দেবতা বা তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তখন সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধসংঘ প্রথমে একান্তভাবে পুরুষদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের পালিকা মাতা মহাপ্রজাপ্রতির ঐকান্তিক অনুরোধ বুদ্ধ তাঁকে এবং আরও কয়েকজন মহিলাকে সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন। পরিণামে এর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রভাবের বিশেষ করে তান্ত্রিকতা ও যৌনতা ইত্যাদির প্রভাবের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে, বৌদ্ধরা 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযান পন্থী বৌদ্ধরা তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সময়কার ঐতিহ্য বজায় রাখে। মহাযান বৌদ্ধরা তাদের নিকট দেবতায় পরিণত হয় এবং 'তারা' দেবরূপে ও তার (বুদ্ধের) শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধ ও 'তারা' এই দু'য়ের আরাধনার বিভিন্ন ভঙ্গি ও শক্তির বিভিন্ন বিকাশ বৌদ্ধদের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-দেবীরূপে পরিণত হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের আচার অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তন্ত্র গ্রন্থসমূহ লিখিত হয়।"[৫]

সহজিয়া ধর্ম মতে গুরুর স্থান সকলের উপর। বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক বিরোধী সহজিয়া পন্থীগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে বিদ্রূপ করে থাকে। সহজিয়া ধর্ম মতের আর্যগণ 'সিদ্ধাচার্য' নামে পরিচিত। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব ঘটে। এরা অপভ্রংশ ও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।[৬] সিদ্ধাচার্যগণ প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমর্তের তীব্র সমালোচনা করে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় দেন। সহজিয়া সাধন প্রণালী নানাবিধ রহস্যে আবৃত। চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপাথ রহস্যে আবৃত থাকায় সহজিয়া ধর্ম ক্রমেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[৭] এরূপ কারণে হিন্দুরা তন্ত্রোক্ত সাধনাও একই অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হয়ে বাংলার ধর্ম জগতে এক বীভৎসতার সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে সহজিয়া ও অন্যান্য তন্ত্র সম্মত ধর্মগুলি প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন-ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা ছিলেন সৎ এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করার মত যাদের প্রতিভা ছিল, তাদের ব্রাক্ষণ বলা হত। এরই শিক্ষা লাভ করতেন এবং শিক্ষা দান করতেন। এরা গুরু বা শিক্ষক হিসাবে সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান

---

১. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা' বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩, পৃ. ১১৩
২. R.C. Majumdar, History of Bengal, Dhaka University, P. 608
৩. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ৩১৮
৪. কে. এম. রইছ উদ্দীন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ১৫১
৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫
৬. কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১২৯
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করতেন। যারা দৈহিক পরাক্রম অর্জন করতেন, সে সব রাজা রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধাদের বলা হত ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি ও শ্রম শিল্পে আত্মনিয়োগ করতেন এবং সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনে আনন্দ লাভ করতে তাদের বলা হতো বৈশ্য। এ সব বৃত্তি বা পেশার পক্ষে আবশ্যক মেধা যাদের ছিল না, যারা ছিল সাদাসিধে ও রূক্ষ, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একমাত্র কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করত তাদের বলা হত শূদ্র। শূদ্রদের জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তারা উচ্চ শ্রেণীর দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হত। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করত না। তাদের খাদ্য গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান লংঘন করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্য করতে হত। অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও 'গোসল' করে ব্রাহ্মণদের শূচিতা অর্জন করতে হত। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়ে বেশী সম্মান পায়।[১]

বৌদ্ধ রাজাদের যুগেও ব্রাহ্মণবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি, বরং ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্নই ছিল। তাদের চেষ্টায় কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে শূদ্রদের চেয়ে নিচ আরও একটি অন্তজ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এরা হল কাপালি, যোগী, চন্ডাল, শবর, ডোম, মালগ্রহী, কুড়র, বড়র, বাউরী, তক্ষণকার, চর্মকার, ঘটজীবী, ভোলাবাহী, মল্লযুক্কম, পুলিন্দ, ডস, খর, কামবাজ, সুম্র, কর্মকার, শৌন্ডিক, ব্যাধ, তাঁতী, ধুনুরী, ঋষি, মলবাহী, মাহুত, নটনটী ইত্যাদি।[২] এদেরকে শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। সমাজ জীবনে তাদের যেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না তেমনি তাদেরকে মানুষই মনে করা হত না। তাদের জীবন ছিল পশুর চেয়েও অধম। শূদ্র ও তার নিচের শ্রেণীর লোকেরা লোকালয়ের বাইরে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত। কোনক্রমে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি শাস্ত্রবাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের কর্ণকুহরে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা, এমনকি দেশীয় ভাষায় শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করা বা বলা দুই-ই নিষিদ্ধ ছিল। বিধান ছিল-

"অষ্টাদশ পুরাণিক রামন্য চরিতানিব
ভাষা রং মানবা শ্রুত্বা রৌর রং নরকং ব্রৎ।"

অর্থাৎ "লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পূরান ও রাম চরিত্র ইত্যাদি যে মানব শুনবে তার ব্যবস্থা বৌরং নরকে।"[৩]

বাংলার প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধগুণের মহীমা কীর্তন এবং ব্রক্ষ হত্যা, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ব্যাভিচার ইত্যাদি কঠিন পাপ বলে গণ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজে দূর্নীতি এবং অশ্লীলতা প্রচলিত ছিল। তৎকালে আর্য হিন্দু সমাজ অধ:পতিত ছিল। অব্রাহ্মণদের উপর, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার যেমন ভয়াবহ ছিল তেমনি সবরকমের দুর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনকে কলূষিত করেছিল। সেন রাজারা মন্দিরের সেবায় 'দেবদাসী' ও যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাদের নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে উচ্চ শ্রেণীর ও প্রভাবশালী হিন্দুদের উপভোগের জন্য একটি উপাদানের সংস্থান হয়। ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিকতার পতন ঘটে এবং দূর্নীতি ও অনাচার সামাজিক ও জীবনের সর্বস্তরের ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের বর্ণপ্রথা উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকে শূদ্র রমণী বিয়ে করতে অনুমতি দেয় না। কিন্তু এ প্রথা একজন ব্রাহ্মণকে শূদ্র রমনীর সঙ্গে যৌনাচার করা থেকে নিবৃত্ত করেনি। এমনকি এ ধরনের একটি নৈতিকতা বিরোধী ও অসামাজিক কার্য করার পরেও সামান্য মাত্র জরিমানা দিয়ে সে তার কৌলিন্য বজায় রাখতে পারত।"[৪] কবি বৃহস্পতির মতে, সে কালের মেয়েরা বেশি রকম যৌনবিলাসিনী ছিল। গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা ও গৌরাঙ্গের রাজ অন্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন তার বিবরণ বাৎস্যায়নই রেখে গেছেন।"[৫] এমনকি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন-দূর্গাপূজা, হোলি উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে, মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলত। 'কামমহোৎসব' নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে হিন্দু নারী-পুরুষেরা দেবতাকে খুশি করে পুত্র সন্তান ও সম্পদ লাভের জন্য এক ধরনের যৌন নৃত্য করত।[৬]

---

১. আবুল হাশিম (অনু. মুসলিম চৌধুরী), ইসলামের মর্ম কথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮১, পৃ. ৭২
২. M.A. Rahim, Social & Cultural History of Bengal, Karachi-1963, P. 7
৩. উদ্বৃতি, মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৪. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, পৃ. ৫২৫
৫. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, পৃ. ৫২৫
৬. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, পৃ. ৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তবে সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধন-সম্পত্তি তথা সমাজে তাদের আইনগত কোন অধিকার ছিল না। ড. এম.এ. রহিম উল্লেখ করেছেন, "During the Hindu period in Bengal, as in rest of India, a woman had hardly any indipendent legal or social status, except as a member of the faimly of her father and husband. Early marriage of the girls was the common custom in the Hindu Society. Jimutavahana in his Dayabhaga quots with approval the injunctions of Vishnu and paithinase that dire consequences would follow, if a girl is married after puberty, and the statement of Manu that "The nubile age is twelve years for a girl to be married to a man aged thirty, and eight years for one to be espoused by a man aged twenty four; and the age prescribed for entry into another order is fifty years. Marriage able age for bride and bridegroom, according to the social prescriptions, was in the ration of 1 to 3. If a girl attained puberty in her fathers house, her father become guilty of killing embryo (bhrunapatya), and the girl is deemed to be Vrishli; one who married such a girl become unfit for Sraddha for sitting in the same line."[১]

এভাবেই প্রাক ইসলাম যুগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরের অধ:পতন নেমে আসে। এ অধঃপতের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণের নির্বিচার প্রাধান্যই ছিল বহুলাংশে দায়ী। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ফলে সমাজ দেহ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজের উচ্চাসনে। জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম প্রচেষ্টা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত না। নবম ও দশম শতকে রচিত বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে এবং বর্মসেন আমলের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

সমাজে ব্রাহ্মণের পরে ছিল শূদ্রদের স্থান। আর তাদের পরে ছিল অগণিত অন্তজ- ম্লেছ সম্প্রদায়, যারা দুঃখের দাহতে দগ্ধীভূত হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত গণমানুষের দল। সমাজে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ বাধার প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের অন্তর্বিরোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গোপন বিষক্রিয়া শুরু হয় যা একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাংলার সমাজ দেহকে কলূষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছিল। বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছিল। একদিকে সামাজিক গোঁড়ামী ও অধিকার বঞ্চিত ব্রাহ্মণেতর মানুষের নিদারুন হাহাকার, অন্য দিকে ঐশ্বর্য বিলাস ও কামবাসনার উচ্ছ্বাসময় আতিশয্য। একদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহগত বিলাস, চারিত্রিক অধ:পতন, অমানবিক ঘৃণা ও অবহেলা এবং অন্যদিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যেও যৌন কামনা-বাসনার মদিরতা বাংলার সমাজকে অন্ত:সারশূন্য করে দিয়েছিল।

আবার কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর পরিমাণে বেড়েছিল। এ ঐশ্বর্যে ধনীর ধনাঢ্যতা ও বিলাস-আড়ম্বর বৃদ্ধি পেলেও এবং রাজপরিবার, রাজ কর্মচারী ও ব্রাহ্মণ সমাজের উদর স্ফীত হলেও বাংলার সাধারণ মানুষ এ থেকে লাভবান হয়নি। এর একমাত্র কারণ সামাজিক অবিচার ও অসম ধন বন্টন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ধনোৎপাদনে যাদের ভূমিকা ছিল শূণ্যের কোঠায় সেই ব্রাহ্মণ সমাজই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল। আর সাধারণ মানুষ হয়েছিল শোষিত ও নির্যাতিত। সাধারণ মানুষ ছিল করভারে জর্জরিত। এ কর রাজপুরুষদের পক্ষ থেকে নেয়া হত, ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকেও নেয়া হত। এ চাড়াও ছিল চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারী এবং আচারান্ধ সমাজপতিদের নিদারুণ বিধান-এ সবের সর্বগ্রাসী পীড়নে, অবিচ্ছিন্ন অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের নির্মম আবর্তে ভূমিহীন, অর্থ-সম্বলহীন, সামাজিক সম্মানহীন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবস্থা ছিল কল্পনাতীত।[২]

বাংলাদেশ ইসলামের আবির্ভাব ও প্রভাবঃ

বাংলাদেশের জনমানব ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটি শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তা এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্য এশিয়ায় বহু পীর দরবেশ ও সূফীসাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[১] তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ইসলামের প্রচার কাজে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি,

---

১. M.A. Rahim, op.cit, P. 9
২. চর্যাপদ, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা এর বরাতে, আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৫০-৫১
৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৪৮, পৃ. ১৬-২০

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জরিত এ দেশের জনসমাজের সম্মুখে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে নিরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে।[১] এস.এম. তাইফুর বলেছেন, "Another equally important factor about the increase of muslim population was the missionary and proselytising zeal of the great sufis who preached principles of Islam. In fact the missionary activities were first started by Arab navigators and merchants long before the conquest of Bengal by Bakhtyar Khalji. The sufis came from west hazarding perilous journey and sacrificing everything dear and precious in life only to raise the degraded Hindus of Bengal to the high standard of Islamic civilization. The masses of Bengal were then groaning under the heels of the heaven born Brahmin oligarchy who used them helots and outcastes and denied them even the elementary right of human beings."[২]

সুতরাং খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতেন এবং এভাবে ভারতের সঙ্গে ও তাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের (সোমপুর বিহার) ধ্বংসস্তুপে আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি আরবীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রী.) ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে আল-মুহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।

মুসলিম ভৌগোলিক ও পর্যটকদের মধ্যে সুলায়মান (জ. ৮১৫ খ্রী.) আবু জায়দুল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবনে খুরদাদবা (মৃ. ৯১২ খ্রী.), আল মাসুদ (৯৫৬ খ্রী.), ইবনে হাওকাল (৯৭৬ খ্রী.), আল-ইদরিসী প্রমুখের বর্ণনা মতে আরাকান হতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগটি খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এসব আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকগণ তাঁদের বর্ণনায় এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে এবং বন্দরকে বাংলাদেশের উপকূলের একটি বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাঁরা এদেশকে 'রুহমী' বা 'রাহমী' নামে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে 'সমন্দর' নামে অভিহিত করতেন। ঐতিহাসিকদের অনেকেই তাদের গবেষণালব্ধ বহু যুক্তি প্রমাণের আলোকে আরব ভৌগোলিকদের বর্ণিত উক্ত 'রাহমী' দেশকে বাংলাদেশ এবং 'সমন্দর' বন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৩]

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে' একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে, ৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের আরাকানের রাজা সুলতয়ঙ্গ চন্দয়ত সুরতন জয় করে সে দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তাগৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[৪] এখন প্রশ্ন হল, আরাকান রাজা কাদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচিন নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন? মুসলমানদের সাথে? চট্টগ্রামে কি তখন আরবীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কি আরাকান রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল? এ সম্ভাবনার পক্ষে কোন কোন পন্ডিত জোরালো সমর্থন দিলেও কেউ কেউ আবার একে অতিরঞ্জিত বলে মন্তব্য করেছেন।[৫]

উপরন্তু ইসলামের আবির্ভাবের যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (স.)-এর জীবনকালেই তাঁর মাতুল সাহাবী আবূ ওয়াককাস (রা.) (যিনি ইসলাম গ্রহণকারী নবম ব্যক্তি) সমুদ্রপথে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। ৬১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী কায়স ইবন হুযায়ফ (রা.), উরওয়া ইবন আছাছা (রা.) এবং আবূ কায়িস ইবন হারিস (রা.)। আবূ ওয়াক্কাসের (রা.) নেতৃত্বে দলটি আবিসিনিয়ার হাবশা হতে যাত্রা করার পর অনূন্য নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সময় অতিবাহিত করে চীন পদার্পন করেন। তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থানকালে যে কোয়াংটা মসজিদ নির্মাণ করেন, কালের নিরব সাক্ষী হিসেবে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৬] চীনে পর্দাপণ করার পূর্বে তিনি যে নয় বছর পথিমধ্যে অতিবাহিত করেন, এ সময় তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম (সমন্দর) বন্দরেও অবস্থান করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

---

১. কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ: কিছু ভাবনা, মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯
২. S.M. Taifur, Glimpses of old Dacca-1965, Intro.
৩. Dr. A.H.Dani, Proceding of the Pakistan Conference 1st session, Karachi-1951, P. 191
৪. ড. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৬
৫. এর সম্ভাবনার পক্ষে মত দিয়েছেন ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫,
আর এ সম্ভাবনার বিপক্ষে মত দিয়েছেন ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
৬. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে (খ্রী.৭ম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুবাল্লিগ) বাংলাদেশে আসেন। এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মাহমুদ ও মুহামিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদ উদ্দীন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দীন (রা.), হযরত মুর্তযা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ও হযরত আবূ তালিব (রা.)। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র বা বই-কিতাব থাকত না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এ দেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্মপ্রচার করতেন।...... .... "এঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং সফর করে ধর্ম প্রচার করা এঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এঁদের বলা হত আবিদ। এঁরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতেন।"[১]

এরপর ইসলাম প্রচারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রচারকদের আগমন অব্যাহত থাকে। এ উপমহাদেশে বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের মুক্তি দানে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যর্থতার ফলে ইসলামের আহবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। সুতরাং দেখা যায়, খ্রীস্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতকের বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। তবে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের সকলের নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত একটা পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানগণের যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তেমনি চট্টগ্রাম বন্দরও আরব উপনিবেশে পরিণত হয় এবং আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী ভূ-ভাগ আরব বণিকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। আরবীয় বণিকগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচারেও মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামে বায়াত দিয়ে স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এসব বণিকদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম সূফী ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমন করেন।

বাংলায় বিদেশাগত সূফী দরবেশগণের আগমনের ধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে (ক) মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল (খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়।) (খ) মুসলিম বিজয় থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০১ থেকে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। (গ) ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকাল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যেসব সর্বত্যাগী ওলীগণ সত্য প্রচারের অদম্য বাসনা নিয়ে বাংলায় আগমন করেন, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন, কখনও বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করে আল্লাহ ও রাসূলের সত্যবাণী জনসমাজে প্রচার করেন। নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে স্থানীয় লোকেরা হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে দরবেশগণের আদর্শ জীবনধারার প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগে। কেউ কেউ ইসলামের সহজ সরল উন্নততর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে কোন দরবেশের প্রতি অনুরাগী হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। স্থল বিশেষে স্থানীয় রাজা উপাধিধারী কোন প্রতাপশালী ভূস্বামী আতঙ্কিত হয়ে ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, দরবেশগণের উপর উৎপীড়ন চালান। দরবেশগণ অগত্যা আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শহীদ হন, কোন কোন ক্ষেত্রে জয়ী হন। সেখানে এরূপ প্রচারের ধারা স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়। ধর্মপ্রচারকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। প্রয়োজন হলে এরূপ কাজে শহীদ হওয়াকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতেন এবং পরকালে অনন্ত সুখের জীবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করতেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকারের মহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা সব ত্যাগের এরূপ মহান কাজে মগ্ন হতেন। তাঁদের সে ত্যাগ বৃথা যায় নি। পরোক্ষভাবে তাঁরা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাজশক্তি বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।

মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে যেসব সূফী দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের রামপালের বাবা আদম শহীদ, ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মদনপুরে শাহ সুলতান রুমী, বগুড়া জেলার মহাস্থানের শাহ সুলতান মাহী সাওয়ার এবং পাবনা জেলার শাহজাদপুরের মাখদুম শাহদৌলা শহীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২] মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে ৫০/৬০ বছরের ভেতরে বাংলাদেশে কোন বিদেশী সূফী দরবেশ এসে থাকলেও তাঁদের পরিচয় জানা যায় না। এমনকি বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশে সূফী প্রভাব অতি ক্ষীণ ছিল, যদিও খ্রীস্টীয় একাদশ

১. ড. হাসান জামান, সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ২১২

২. এ সকল সূফী সাধকদের জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য, ড. আব্দুল করীম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৭ ও Social History of Muslims in Bengal, Chittagong-1985, Dr. M.A. Rahim, Socail & Cultural History of Bengal, Karachi-1963 ও Dr. Mohammad Enamul Haq, A History of Sufism in Bengal, Dacca-1975.

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতে উপমহাদেশে সূফী প্রভাবের স্রোত অবাধ গতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময়েই আরব, পারস্য, ইরাক, ইয়ামন ও মধ্য এশিয়ার সূফী-দরবেশগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশেও এসব ধারাই সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত বাংলা অঞ্চলের সূফী মতকে উত্তর ভারতীয় সূফী মতবাদের শাখাস্রোত বলা হয়।

এরূপ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সূফীগণ ইসলাম প্রচার ও মানব সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রূপে বিবেচনা করে থাকেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে তাঁরা সেই পরমসত্তার সান্নিধ্যে যেতে চান যেখান থেকে তাঁরা এসেছেন। বাস্তবিকই মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) বলেছেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়ঃ। কাবা তো কেবল ইবরাহীমের গৃহ, কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র আবাস।"[১] ধর্ম প্রচার ও মানব কল্যাণকর কার্যাবলীর এই সমুদয় আদর্শ নিয়েই ইসলামের প্রথম যুগের সূফীগণ বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। সূফীগণ শুধু সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না, বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্দির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

সূফীদের এ চিন্তাধারা মহানবী (স.)-এর ইন্তিকালের পরে প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে বেশ জোরালো হয়ে উঠে এবং আরব ও পারস্য ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে এ মতবাদ পাক-ভারতে এবং বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মুসলিম আমলের প্রাথমিক যুগের সূফীগণ সবাই বহিরাগত পরে অবশ্য বাংলাদেশেও অনেক সূফী জন্মগ্রহণ করেন। সূফীগণের যাত্রা পথের চলবার প্রক্রিয়া অনুসরণের ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সকল তরীকার মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত সূফী দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন। সূফীগণ অনেক তরীকাতে বিভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা চিশতিয়া ও সোহারাওয়ার্দীয়া তরীকার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বাইরের দেশ থেকে আগমন ঘটলেও বাংলাদেশ সূফীবাদ বিস্তারে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। সুফীবাদ সমগ্র বাংলাদেশ এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খানকাহ্ ও দরগাহ্ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মাটিতে সূফীবাদ এত বেশী প্রসার লাভ করে যে, কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী সূফীর শিক্ষার ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি নতুন মরমী সম্প্রদায়ের বিকাশ সাধিত হয়।"[২]

বাংলাদেশে যেসব তরীকার সূফীগণ আগমন করেন এবং ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র.) কর্তৃক জৌনপুরে শার্কী সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে বাংলাদেশের কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। রাজা গণেশের নির্যাতনের হাত থেকে বাংলাদেশের সূফীদিগকে রক্ষার জন্য এই চিঠিখানি লিখিত হয়। তিনি বলেন, "সব প্রশংসাই আল্লাহর! কি চমৎকার দেশ এই বাংলা, যেখানে অসংখ্য সাধু-দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন। উদাহরণস্বরূপ পীরানা পীর হযরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর সত্তরজন নেতৃস্থানীয় মুরীদ দেবগায়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে শায়িত আছেন। সোহরাওয়ার্দী তরীকার কয়েকজন সূফী পুরুষ মহীসুনে এবং জালালীয়া সম্প্রদায়ের সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন। শায়খ আহমদ দামিস্কীর কয়েকজন প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। 'কদরখানী' দ্বাদশ সূফীদের অন্যতম হযরত শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁরই প্রধান মুরীদ ছিলেন হযরত শায়খ শারফুদ্দীন মানেরী। এছাড়া হযরত বদর আলম এবং বদর আলম জাহেদী ছিলেন। মোটকথা বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যেখানে পুণ্যাত্মা সূফী পুরুষগণ গমন করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি। সোহারাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষদের অনেকেই বিগত কিন্তু যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সংখ্যাও অনেক।"[৩]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৩. Dr. Hasan Askari, Bengal: Past & Present, Vol. LXVII, Serial No-130, 1988, P. 35-36

Dhaka University Institutional Repository

এতে দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাভূক্ত সূফীগণ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের কর্মতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বাহাউদ্দীন যিকরীয়া মুলতানী। তিনি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার আদি পুরুষ শিহাবুদ্দীন আবূ আমর সোহরাওয়ার্দীর খলিফা ছিলেন। তিনি মুলতানে ১১৬৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে ১২৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মুরীদগণ ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে চিশতীয়া পন্থি পন্থীদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সোহরাওয়ার্দীয়া পন্থীদের পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাঁদের আগমন ঘটে এবং অসামান্য অবদান রাখেন, তাঁরা হলেন চিশতীয়াপন্থী সূফীগণ। উপমহাদেশের চিশতীয়া সম্প্রদায়ের অগ্রদূত ছিলেন ভারতের বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) (১১৪২-১২৩৬ খ্রী.)। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে নবীন রাজশক্তির সঙ্গে নতুন ভাবধারা প্রচলনের অগ্রদূত। তাঁর ইন্তিকালের পর ভারতের নানা স্থানে চিশতীয়াপন্থী সুফী দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুঘল যুগে দিল্লী এই চিশতীয়াপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১]

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে আর কোন নূতন সূফীগণের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। অতঃপর নূতন এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কাদিরিয়াপন্থীদের। বাগদাদের জিলান নগরের অধিবাসী শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) (১০৭৮-১১৫৬খৃ.) এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কোনদিন ভারতে আসেননি বটে; কিন্তু তদ্বংশজাত সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস জিলানী ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে এসে এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ভারতের রাজপুতনায় 'উচ্চ' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[২]

কলন্দরীয়া তরীকাপন্থীগণ সম্ভবত চিশতিয়া পন্থীদের পর বাংলাদেশে আগমন করেন। বু-আলী শাহ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন স্পেন দেশীয়। তিনি প্রথম চিশতিয়াপন্থী হলেও পরে এ সম্প্রদায়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে নিজস্ব একটি মতবাদ গড়ে তোলেন এবং তাকে সংগঠিত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন এবং দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩] বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় কলন্দর আখ্যাধারী দরবেশগণ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশেষভাবে আসতে থাকেন বলে প্রকাশ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁরা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ 'কলন্দর' শব্দ দ্বারা সর্বশ্রেণীর সূফী-দরবেশকে অভিহিত করতেন।[৪]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে উপমহাদেশে নকশবন্দীয়াগণ প্রবেশ করেন। এ তরীকার আদি পুরুষ তুর্কীস্তানের অধিবাসী খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দীয়া। ভারতের এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ। তিনি তুর্কীস্তান থেকে এ মতবাদ ভারতে আনয়ন করেন। ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন।

হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী প্রবর্তিত সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) প্রবর্তিত চিশতীয়া তরীকার অনুসারী সুফী দরবেশগণ অদ্বৈতবাদে (ওয়াদাতুল অজূদ) বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাথমিক যুগের সূফী দরবেশগণের প্রায় সবই এ দুই তরীকাপন্থী। কাজেই তাঁরা অদ্বৈতবাদের অনুসারী ছিলেন। পাক-ভারত-বাংলাদেশের মানসক্ষেত্রে এ মতবাদ অনুকূল ছিল বলে এই দুই পন্থীদের মতবাদ এ দেশে সহজেই স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ হয়। আনুষ্ঠানিক ইসলামে এ মতবাদ কখনও স্থান পায়নি।[৫]

হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-প্রবর্তিত কাদিরীয়া তরীকায় ও হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ-প্রচলিত নক্শবন্দীয়া তরীকায় দ্বৈততা অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য স্বীকার করা হয়। এ দুই পন্থীদের মতবাদ অতি ধীরে এ দেশের মাটিতে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তায় সোহরাওয়ার্দীয়া ও চিশতিয়া মতবাদকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি; বরং তাদের প্রভাবে উপমহাদেশে ইসলামী শরী'আতের মূল পর্যন্ত নড়ে উঠে।

---

১. S.A. Abbas Rezvi, A History of Sufism in India, Vd-2, New Delhi, 1983, P. 279
২. ড. গোলাম সাকলায়েন বাংলাদেশের সূফীসাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৮
৩. উদ্বৃত. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, ৪৫, ৫৯
৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

এ অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে আসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিজ্ঞ আলিম নকশবন্দিয়া তরীকাপন্থী হযরত শায়খ আহ্মাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) ষোল শতকে বিরাট সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারের ফলে কাদিরীয়া ও নকশবন্দীয়া পন্থীগণ উপমহাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ সময় থেকে সংস্কৃত নকশবন্দীয়া অনুযায়ী "মুজাদ্দিদিয়া" নামে পরিচিত হয়।[১] সূফী মতবাদের এ ধারাই বর্তমানে প্রচলিত। কেননা, "Many distinguished sufis such as Shah Waliullah, khaja Mir Nasir, Khaja Mir Dard, Ghulam Yahya, Shah Rafiuddin and Shah Syed Ahmed Brelwi who flourished after the Mujaddid accepted his teachings with minor modification and tried to inspire Muslims with the motto-"Away from platinus and his host and back to Mohammd."[২]

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সূফীদের অবদান :

সূফী-দরবেশগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের কার্যাবলী শুধু তাঁদের খানকার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁরা জনগণের মন ও সমাজের ওপরও প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরব-পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে এসে মুসলমানগণ যখন এ দেশ জয় করেছিলেন, তাঁদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক আগমন করে এদেশের নব সমাজ গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বাংলার জনমানস ও চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ দেশের হিন্দু বৌদ্ধ জনসমাজে, মননে ও চিন্তায় মুসলিম সুফী-সাধক ও পীর-দরবেশগণের নিকট থেকে অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনাচরণের আদর্শ লাভ করল যা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম পীর-ফকিরগণ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথা-বেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসঙ্কোচে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই তাঁদের আবাসস্থল ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর দৃশ্যস্থান রয়েছে। সর্বত্র তাঁরা তাঁদের চরিত্র ও কাজের প্রভাব রেখে গেছেন। নানাভাবে তাঁরা ইসলাম ও সমাজের সেবা করেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁরা মুসলিম বিজেতা, সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী অবদান রেখে যান। আরব, ইরাক, মিসর, আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের যে সকল পীর দরবেশ আমাদের দেশে এসে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Sufis or Pirs played an important role in consolidating Muslim Power and infusing culture among the masses. The biographical sketch of the sufis reveal that their activities were confined not only within the four walls of their khanqahs, rather they exerted a great influence in the people mind and in the society. They come form established khanqahs, imprerted instructions, while some of them settled and died in this country---their dargahs and tombs are visited and venerated by hundreds of pepople even today."[৩]

সূফী দরবেশগণ এদেশে আগমন করে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় খানকাহ্ নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁর চতুস্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিতি হতেন। এতে শিষ্যদিগকে নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হত। সূফীগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল সাধু-দরবেশগণের সাধুতা, নিষ্ঠা, নির্লিপ্ততা এ দেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে শিষ্যগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন, তাদের কেউ কেউ পীরের খানকাহর নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাদের ইন্তিকাল হত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরগাহগুলো দেখে মনে হয় আরব, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ থেকে আগত সূফী সাধকগণের চতুস্পার্শ্বে যে ভক্তগণ এসে উপস্থিত হতেন তারা কেবল বড় বড় শহর বন্দরেই খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন না, তাঁরা দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এমনকি তারও অভ্যন্তরে

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২. Saydur Rahman, op.cit, P. 238
৩. A.K. Banarjee, West Bengal District Gazeteer (Howrah), Calcutta-1922, P. 128

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ করে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করতেন। ড. আব্দুর রহিম তাই বলেছেন,"Hundreds of Sufis came to Bengal in different times from the lands of Islam in western and central Asia as well as Northern India. They belonged to various orders particularly to the Chishtia and Suhrawardia. Though imported from outside, Bengal proved to be most congenial field for the development of Sufism. It spread throughout Bengal even to the remotest villages, so that khanqahs and shirines grew up in every nock and corner of the country. Sufism had prospered so much in the soil of Bengal that several new mystic orders developed on the basis of the teachings of some of the distinguished Bengali Sufis."[১]

সূফীদের আদর্শ চরিত্র, অসাধারণ নৈতিক বল এবং দু:স্থ মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলিম জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য যা সূফীসাধক তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধ:পতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন। সুতরাং এ সকল নিষ্ঠাবান আদর্শ সূফী পুরুষের প্রচারকার্য অমুসলিম, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুদেরকে ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল।[২]

হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও তাঁর অনুগামী শিষ্যগণের প্রচেষ্টায় উত্তর বঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা পান্ডুয়া আগমন করলে বিপুল সংখ্যক লোক তাঁদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক, তদীয় পুত্র হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলম প্রমুখ সূফীগণের প্রচেষ্টায় উত্তর বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটে। মুরদেশীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতার মতে, সিলেটের অধিবাসীগণ হযরত শাহ্ জালালের (রহ.) এর ধর্মীয় প্রচারকার্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। একটি লোক সঙ্গীতে উল্লেখ আছে, সিলেটে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান ছিল না। শাহ্ জালালই সর্বপ্রথম সেস্থানে আযান দেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন।[৩]

হযরত শাহ্ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সিকান্দার খান গাযী কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয় হয়। হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) ও তাঁর খলিফাগণের প্রচারের ফলেই সিলেট জেলা এবং পার্শ্ববর্তী ভূভাগে ইসলাম বিস্তৃত হয়। উপরন্ত তাঁর অনেক খলিফাই ঢাকা, নোয়াখালী, কাছাড়, রংপুর ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা চব্বিশ পরগণার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরচাঁদ তাঁর খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর মাযার জেলা ২৪ পরগণার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে।[৪]

মুজাহিদ দরবেশ খানজাহান আলীর প্রচেষ্টায় খুলনা ও যশোরে ইসলাম বিস্তার লাভ করেন। এই দুই জেলায় ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আদর্শ প্রচারে তাঁর কর্মতৎপরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই অঞ্চলে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ চরিত্র মাহাত্মে এ অঞ্চলের বিধর্মীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় ও অকৃত্রিম ভক্তে পরিণত হয়।[৫]

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চল চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। তথাপি এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান। এটা কীভাবে সম্ভব হল? ড. আব্দুর রহিম বলেছেন,"বাস্ত বিক এটা ছিল মুসলমান সূফী দরবেশগণের অমর কীর্তি, তাঁরা এই অমুসলমান অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস লোকদের মধ্যে বিস্তার করেন। স্থানীয় জনপ্রভাব এই মহান দরবেশগণের কীর্তিরাজিতে উজ্জ্বল। ইতিহাস সম্মত সঠিক প্রমাণের অভাবে এই সব কিংবদন্তির অনেক বর্ণনাই হয়তো গ্রহণ করা কঠিন, তবুও এগুলোতে বাংলার বিভিন্ন এলাকার সূফী দরবেশগণের ব্যাপক ধর্মপ্রচারমূলক কার্যাবলীর প্রতিফলন দেখা যায়।"[৬]

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কবি কৃত্তিবাসের মতে, মুসলিম প্রভাব এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের ভয়ে পূর্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পৈতৃক ঘরবাড়ী ত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন যে,"তাঁর পূর্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা, যিনি সোনারগাঁয়ের দনুজমর্দন দেবের একজন সভাসদ ছিলেন, (ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে) তিনিও ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন।"[৭]

---

১. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 76
২. সি.সি. ব্যানার্জী সম্পাদিত, নিরঞ্জনের রুস্মা, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।
৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৭. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 289

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানগণ সোনারগাঁও অঞ্চল জয় করেন ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাহলে কীভাবে সে সময় ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের দ্বারা ব্রাহ্মণরা তাদের জাত ও কৌলিণ্য হারাবার মত অবস্থার সম্মুখীন হয়? এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজয়ের বহু পূর্বেই পূর্ব বঙ্গে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছিল। মনে হয় এই অগ্রগতির মূলে আরব বণিকগণ বা অন্যান্য ধর্মপ্রচারকগণ যারা চট্টগ্রাম ও উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের সপ্তদশকে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে খানকাহ্ ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহিমের মন্তব্য উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন, "Sonargaon was a lively seat of learning from the later year of the thirteenth century. It began under the propitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Maulana Abu Tammana founded this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at his place. His renown as a scholar attracted students from far and near."[১]

এই এলাকায় মুসলমানদের জন্য এমন একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, শায়খ আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁয়ে আগমনের পূর্ব থেকেই সেখানে মুসলিম অধিবাসী ছিল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সোনারগাঁয়ে মুসলিম জনসংখ্যার অস্তিত্ব সূফী-দরবেশগণের প্রচারমূলক কার্যাবলীরই ফলশ্রুতি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফীগণের অবদান :

বিদেশ থেকে আগত সূফী-দরবেশগণের মধ্যে অনেকে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আলিম ছিলেন। সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে প্রথম আগমনকাল থেকেই লোকদের শিক্ষা দানের দিকে মনসংযোগ করেন। সেজন্য খানকাহ্র সঙ্গে তাঁরা মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা গণশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্গুলো ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। এসব শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। কিছু সংখ্যক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায় যেগুলি সূফী-দরবেশগণের খানকায় গড়ে উঠেছিল এবং এগুলোর বিচ্ছুরিত জ্ঞানালোকে বাংলা ও উত্তর ভারত আলোকিত হয়েছিল। এ শিক্ষা প্রাথমিক স্ত র থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ছিল।

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী (মৃ. ১২১৮ খৃ.) বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে একজন খ্যাতনামা পন্ডিত। তিনি ছিলেন আলী মর্দান খিলজীর (১২১০-১৩ খৃ.) রাজত্বকালে লক্ষণাবতীর কাজী তাঁকে সমরকন্দে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও সূফী কাজী রুকনুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলীর সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। ব্লকম্যানের মতে, "তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতী বা গৌড়ের কাজী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন 'কিতাবুল ইরশাদের' লেখক এবং 'আল খিলাফি ওয়াল জাদাল' (দার্শনিক বিরোধিতা) বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে বুখারায় মৃত্যু বরণ করেন।"[২] কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগী লক্ষণাবতী আসেন এবং তার সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় পরাস্ত হন। ইসলামের উচ্চতর আদর্শ অনুধাবন করে এই হিন্দু যোগী ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এত বেশী পারদর্শীতা লাভ করেন যে, মুসলিম ধর্মোবেত্তাগণ তাঁকে মুফতীর মর্যাদা দেন এবং ধর্ম বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি কাজী রুকনুদ্দীনকে 'অমৃতকান্ড' নামক একখানা গ্রন্থ উপহার দেন, যা হিন্দু মরমীবাদের উপর লিখিত। এই যোগীর সহযোগীতায় কাজী রুকনুদ্দীন 'অমৃতকান্ড'[৩] গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন অভ্যাস করেন।[৪]

পরবর্তীকালে অম্ভাহনাথ নামে আরেক জন ব্রাহ্মণযোগীর সহায়তায় জনৈক অজ্ঞাতনামা[৫] লোক কর্তৃক 'অমৃতকান্ড' পুনরায় আরবীতে অনুদিত হয়। এ যোগীও ভোজর ব্রাহ্মণের ন্যায় কামরূপের অধিবাসী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন, "মরমীবাদ সম্পর্কিত এই সংস্কৃত পুস্তকের আরবি ও ফারসী অনুবাদ মুসলিম বাংলার সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাস্তবিকই এটি আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু মরমিয়া চিন্তাধারা যে মুসলিম সূফীবাদে সঞ্চারিত হয়েছে অমৃতকান্ডের অনুবাদের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে যে ঘটনাটি জড়িত আছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকগণ ইসলামের মহান আদর্শ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ফলে তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। দু'জন ব্রাহ্মণ যোগী ও পন্ডিতের ইসলাম গ্রহণ এই সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।"[৬]

---

১. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 289
২. Historical Society Journal, Dacca-1953, P. 86
৩. অমৃত কান্ড, এর আরবী নামকরণ করা হয়েছে 'কিতাবু মারা আতুল মাআনী ফী ইদারাকিল ইলমুল ইনসানী' অর্থাৎ মানব জগতের পরিশুদ্ধির গুপ্ত বা গূঢ়ার্থের আয়না।
৪. Journal of Pakistan Historical Society, op.cit. P. 46
৫. ব্লকম্যানের মতে, এই অজ্ঞাতনামা লোকটি দামেস্কের বিখ্যাত দার্শনিক ইবনুল আরাবী।
৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পন্ডিত ও দরবেশ হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা। ইলামী শিক্ষা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার বুৎপত্তি ছিল। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল তৎকালের এক বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত হতেন। আবূ তাওয়ামা 'মাকামাত' নামে তাসাওউফ বা ইসলামী মরমীবাদের উপর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী শিক্ষিত মহলে মাকামাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এই গ্রন্থের চাহিদা লাহোরের মত সুদূর অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।[১] সোনারগাঁও থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর লিখিত 'নাম-ই-হক' গ্রন্থটি সমগ্র উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার খ্যাতনামা শিষ্য ও জামাতা মাখদূম শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী কর্তৃক ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাসাওউফের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। শায়খ মুনায়রী সেসব গ্রন্থ সোনারগাঁয়ের শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট থেকে অর্জিত মূল্যবান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন।

শায়খ আলাউল হকের শিষ্য সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সীমনানী ছিলেন বাংলার আর এক মূল্যবান সৃষ্টি। তাঁর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ফার্সী ভাষায় সূফীবাদ সংক্রান্ত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ 'লাতাইফ-ই-আশরাফী' সংকলন করেন তারই শিষ্য হাজী গরীব ইয়েমেনী। তাঁর মাকতুবাত (চিঠি পত্র) সংকলন করেন আব্দুর রাজ্জাক১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে। এতে তাঁর সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ব ও মরমী বিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[২] চতুর্দশ শতকের প্রথমে 'কামাল-ই-করিম' রচিত 'মাজমু-ই-খানি ফী আয়নাল মাআনী' নামে ফিকহ শাস্ত্রের উপর একখানী গ্রন্থ আরবী ভাষায় সংকলিত হয়।

হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ের মত আরও অনেক উঁচু মানের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষণাবতীতে, বর্তমান রাজশাহী জেলার মাহীসুনে, সাতগাঁও-এ, নগোর-এ, মান্দারণে, পান্ডুয়ায়, বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রামে।[৩] শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক এবং নূর কুতুব আলম এঁরা সকলেই তাদের বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারেই নয়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। নূর কুতুব আলম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান হোসেন শাহ্ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। এই খ্যাতনামা সূফী পুরুষ ও পন্ডিতদের খ্যাতি উত্তর ভারত ও বাংলার সর্বত্র থেকে শিষ্য ও শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ নাসির উদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ হোসেন যুক্কারপোশ এবং উত্তর ভারতের আরও অনেকে শায়খ আলাউল হকের নিকট তাঁর পান্ডুয়া শিক্ষাকেন্দ্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। হুশামুদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ কাকো ও অন্যান্যরা অন্যতম। হযরত নূর কুতুব আলমের যে সামান্য কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে তাতে তাঁর ইসলামী মরমীবাদ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এ সব পত্রাদির কিছু সংখ্যক দরবেশ, উলেমা ও শিষ্যদের নিকট লিখিত হয়েছিল।[৪] তঁর রচিত 'আনিসুল গুরাবা' হাদীসের ব্যাখ্যাসহ একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এতে তাঁর কুরআন, ইসলামী শিক্ষা ও ফার্সী ভাষায় গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় মেলে। নূর কুতুব আলম ফার্সী ভাষায় একজন ভাল কবিও ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু কবিতা 'সুবহ-ই-গুলশানে' প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

এ সময়ে মুসলমানদের সাহিত্য চর্চা প্রসংগে পর্যালোচনা করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন, "এ সময়ে মুসলমানদের উদ্যোগে বাংলা পদ্যে কয়েকখানা ধর্মীয় ও সূফীবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এই সব গ্রন্থকারদের আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা ও ইসলামী বিষয়াদিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারগণ কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় ও মরমীবিষয়ক গ্রন্থগুলোকে তাদের সংকলনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকেরা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার জন্য ধর্মীয় বিষয়াদি তারা বাংলায় লিখেন। তাদের লেখায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকারগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকম মিশ্র ভাবধারার অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যে ইসলামী ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ইসলামের বিধি ব্যবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখা এবং তাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করার ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রচনায় এটাও প্রতিফলিত হয়েছে যে, সমসাময়িক মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল ছিল এবং সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ধর্মীয় বিষয়াদি

---

১. Journal of Asiatic Society of Bengal-1923, PP. 274-277

২. Prof. Hasan Askari, op.cit, P. 38

৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-৭২

৪. Prof. Hasan Askari, op.cit, P. 38

৫. S. Hossain, East Bengal Culture, P. 12 হতে উদ্ধৃত. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র আরবি ও ফারসি ভাষাতেই লিখিত হতে পারে। কিছু সংখ্যক পন্ডিত ও কবি অবশ্য সমাজের এই ধরনের রক্ষনশীলতা পরিহার করে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে বাংলায় ধর্মীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার চিন্তা করেন। প্রতিভাশালী কবি শাহ্ মুহাম্মদ সগীর যিনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১০৯৮-১৪০৯ খ্রী.) রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি এ ভাবধারাই রূপ দান করেছেন। তিনি তাঁর 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক গ্রন্থে বলেন যে, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লিখলে অপরাধ হয় এরকম চিন্তা করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাংলায় ধর্মের বিষয় লেখা পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের অতীতের মহান ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশিত হবে। মুসলমানদের প্রতি সেবার স্পৃহা নিয়েই শাহ মুহাম্মদ সগীর সাধারণ মুসলমানের ভাষা বাংলায় তার স্মরণীয় গ্রন্থ 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করেন।"[১]

বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। শিক্ষা কর্তব্য ও সামাজিক সম্মানের বিরষয়রূপে বিবেচনা করা হত। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তব্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। এ সকল মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকের বাড়ীর নিকটবর্তী ছিল। ফলে প্রত্যেক শহর এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক শিক্ষায়তন বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব মক্তবের ব্যয়ভার হয়ত রাষ্ট্র থেকে নয়ত স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জমি দান ইত্যাদি থেকে বহন করা হত। হিন্দু এলাকায় ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়ায় মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য মক্তব ছিল। কবি মুকুন্দ রামের মতে, "মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলে-মেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলভীগণ শিক্ষা দিতেন।"[২] মুসলমানদের বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর চার মাস এবং চার দিন বয়সে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল। একজন জ্যোতিষীয় সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত এবং শিক্ষক পবিত্র কুরআন থেকে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।[৩]

ধর্মীয় শিক্ষা দান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতি সমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হত। এইচ. জি. রলিনসনের মতে, "এখানে মক্তবে সে (শিশু) কলেমা বা ধর্মবিশ্বাস ও কুরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্ত করত যা তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় প্রয়োজন হত। কুরআন মুখস্ত করার একটি সাধারণ রীতিও প্রচলিত ছিল। এরই সঙ্গে পয়গাম্বরের বাণী, ফারসী ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। সুচারু লিখন পদ্ধতির চর্চা করা হত এবং বালক শিল্পকলার শিক্ষার জন্য আগ্রহী হলে তাকে একজন শিক্ষকের কাছে শিক্ষানবিশীর জন্য প্রেরণ করা হত।"[৪]

মাধ্যমিক শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন, "মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হত। উৎকীর্ণ লিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রদেশে (বঙ্গে) বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকা সমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। বহু মসজিদ ও ইমারত বাড়ী মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। -----সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করেছেন। কাজী নাসিরুদ্দীন ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্যাদি এবং মূলগ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পান্ডুলিপি নকল করার জন্যে দরকারী জিনিসপত্র সবকিছু পেত। কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন-যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসায় পড়ান হতো।"[৫] পাঠ্য তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন, "প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত; এসবগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ব করা যেতে পারে।"[৬]

---

১. ড. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
২. মুকুন্দরাম, চন্ডীদাস মঙ্গল কাব্য, পৃ. ৩৪৪
৩. K.M. Ashraf, Life & Condition of the people of Hindustan, P. 189
৪. H.G. Rawlinson, India etc. P. 372
৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫
৬. আইন-ই-আকবরী, (অনু. ব্লকম্যান), ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য এ সকল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা দান ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সূফী দরবেশগণ। মাদ্রাসার বাইরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ একাডেমীও ছিল। ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বলেছেন, "Apart from the Madrasas and perhapes more important in their scope and influence were the `academics' or `Seminaries' that grew up at a number of places -------. One of the earlist of such centres of learnings was organized by Makhdum Jalal Tabrizi at Deatola, about 15 miles north of Pandua --------. Another centre of Higher education which came into being early in the Muslim period was at Gangarampur, Dinajpur at the instance of Shaikh Ata who was also leader of a Muslim Settlement there ------- parallel to and in some ways outshining these were the Seminary organized at Pandua by Shaikh Ala-ul-Haq,"[১]

সমাজ জীবনে সূফীদের অবদান :

সমাজ জীবনে সূফী দরবেশগণ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যে সব অঞ্চলে সূফী দরবেশগণের খানকাহ্ বা ধর্মপ্রচার কেন্দ্র থাকত লোকজন সেখানে যাতায়াত করত। তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা, জ্ঞান ও অসাধারণ কার্যাবলীর সাথে পরিচিত হত। তাঁরা সমাজে বিভিন্ন স্তরের অধ্যাত্মবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তাঁরা সঠিকভাবে আধ্যাত্মিকতার পরিমন্ডলে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং ইহজগতের প্রতি একটা অনীহা ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁরা ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গি জনসমাজে তুলে ধরেন। ফলে সাধারণ লোকজন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হত। দলে দলে তারা আসত দরবেশগণের দোয়া নিতে। এভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে ভাব বিনিময় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে এ দেশের সাধারণ মানুষ পীর-দরবেশগণের নিকট হতে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেন। পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর দরবেশগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁরাই বাংলাদেশের ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এ সব পীর দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ায় দূর-দূরান্তর থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের ভাষায়, "In fact, by the continued activities of the sufis or men inbued with the sufistic idias Bengal was once so over flooded that the visible effect of that influence can still be marked in many beliefs, practices songs and out pouring of the Bengali hearts like the silt deposited on a paddy field after a flood.----- From these things, we can now only imagine. How vast and deep was the magnitude of the influence of the sufis on Bengal."[২]

বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগী সূফী-দরবেশগণ এ দেশে আসতেন এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের চারপাশে মুরীদ জড়ো করে শিক্ষা দান করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। যে সকল সূফী এ দেশে জন্মেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাঁরাও একই সাংস্কৃতিক বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এভাবে সূফীগণ মুসলিম সমাজে শাসক শ্রেণী ও আলিমগণের সঙ্গে আরও একটি শক্তির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেছেন, "বিভিন্ন সময় শত শত সূফী-দরবেশ ও তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে এমনকি প্রদেশের নিভৃততম কোণেও ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং অতীন্দ্রিয়বাদ ও স্বর্গীয় প্রেমের প্রসার সাধন করেন। এভাবে তাঁরা মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন। তাঁদের আদর্শ চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দু:স্থ মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকেও তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, যা সুফী পুরুষগণ তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধ:পতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন।[৩]

সুতরাং এ সকল আদর্শবান পুরুষের প্রচারকাজ অমুসলমান, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণকে ইসলামের ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল। তারা নিজেদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করত। আবার সে সাথে তাদের কিছু ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া-পদ্ধতি অটুট থেকে যেত; অবশ্য নাম বদলে যেত। এ রকম পরিবর্তনের কথাই শূন্য পুরানে 'নিরঞ্জনের রুস্মা'য় বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা হযরত মুহাম্মদ (স.) রূপে এবং বিষ্ণু পয়গাম্বররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় সত্যপীর-এর জনপ্রিয়তার মূলে ছিল এই ব্যাপক পরিবর্তন। সত্যপীর কোন ওলী ছিলেন না। সম্ভবত কল্পনা থেকেই তার উদ্ভব। তাকে কেন্দ্র করে পীরসুলভ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে নানা জায়গায় তাঁর দরগাহ দেখা যায় এবং বহু লোকগাঁথায় তাঁর নামের উল্লেখ শুনতে পাওয়া যায়।

---

১. Dr. Mohammad Mohor Ali, History of Muslims of Bengal, Vol-IB, Riyadh-1985, PP. 832-36

২. Dr. Mohammad Enamul Haq, op.cit, P. 260-61

৩. ড. আব্দুল করিম, (অনু. এন.এম. রহমান), বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সূফীগণের দরগাহগুলোর শুধু অবস্থান বিবেচনা করা হলে দেখা যায় সূফীগণ শুধু প্রধান শহরগুলোয়ই জড়ো হননি, পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পশ্চিমে মঙ্গলকোট ও পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পান্ডুয়া থেকে উত্তরে কান্তাদুয়ার ও রংপুর পর্যন্ত সারা দেশে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। জীবনকালে তাঁরা জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং আজও শত শত মানুষ তাঁদের দরগাহ ও সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসে।

সূফী-দরবেশগণের খানকাহ্সমূহ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখানেই স্রষ্টাসন্ধানী মানুষেরা তাদের মনের শান্তি খুঁজে পেত এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সকল আকাংঙ্খা পরিতৃপ্ত হত। খানকাহগুলো ছিল একাধারে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং আশ্রয় স্থান, যেখানে দু:স্থ, বদ্ধ উন্মাদ এবং রুগ্নব্যক্তি সরাসরি আশ্রয় লাভ করত। তারা শায়খ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট হতে চিকিৎসা, সেবা ও যত্ন লাভ করত। প্রতিটি খানকাহর সঙ্গে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকত যেখানে থেকে গরীব ও অভূক্ত লোকদের খাবার দেয়া হত, লঙ্গরখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তিও দান করা হত। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও পান্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী-দরবেশগণের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্সমূহের বিরাট আয়ের লাখেরাজ জমি ছিল। এভাবে সাধু-দরবেশগণের খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলো দু:স্থ বিপন্ন মানুষের নিকট এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সাধু দরবেশগণ দেশের দীন-দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে এবং তাদের অনুভূতি ও আশা-আকাংখা বুঝতে সক্ষম হন।[১]

জনসাধারণ ভাবত যে, তাঁরা ছিলেন অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী। সূফী-দরবেশগণের অন্তর ঐশী জ্যোতিপ্রাপ্ত ও ঐশী প্রেরণার উদ্বুদ্ধ; তাদের প্রার্থনা বিফল হয় না। সুতরাং তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, মৃতকে জীবন দান করেন, ইচ্ছা করলে জীবিতদের প্রাণ হরণ করতে পারেন, দরিদ্রকে অঢেল সম্পদ দান করতে পারেন, শারীরিক ও মানসিক সব রকম ব্যাধি নিরাময় করতে পারেন। একই সময় তারা বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু জানেন। অলী-দরবেশগণ পরকালে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে পাপীকে নাজাত দিতে পারেন। তাই তারা সকল শ্রেণীর লোকের পরম নির্ভর। তাঁদের খানকাহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের নিরাপদ আশ্রয়। দেশী-বিদেশী, ধনী-দরিদ্র, আর্ত-পীড়িত, পথিক-আগন্তুক সকলের জন্য তাঁদের খানকাহ অবারিত দ্বার। তাঁদের লঙ্গরখানায় সবার জন্য ভোজ্য ও পানীয় সর্বদা মজুদ ও সহজলভ্য থাকত। এ জন্যই সূফীদের দরগাহগুলোকে দুনিয়ার বিশ্রাম দানকারী অট্টালিকারূপে বিবেচনা করা হত যেখানে জনসাধারণের আশা পুরণ ঘটে।[২] ড. এনামুল হকে ভাষায়, "জনসাধারণ তাঁদের সম্পর্কে মনে মনে এই ধারণা পোষণ করত যে, তারা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ; অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাঁরা পীড়িত ও তাপিতকে সবল ও নিরাময় করতে পারেন; শোকাতুরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে তার মনের ক্লেদ ও গ্লানী মুহূর্তের মধ্যে মুছে দিতে পারেন। শুধু তাই নয় মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ স্পন্দনে সঞ্জীবিত করতে পারেন এবং ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কেও সব কথা অভ্রান্তরূপে বলতে পারেন। তাদেরকে জিতেন্দ্রীয়, ভোগ-বিলাস বিমুখ ও সংসার বিরাগী দেখে মানুষ তাদেরকে কখনও কখনও অতিমানব বা দেবতারূপে ভুল করেছে। এদের কর্মের দিক সম্পর্কে আলোচনা করলে ভক্তি ভরে মস্তক আপনা আপনি বিনত হয়ে পড়ে। সংসারের সুখ-দু:খ, জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করে কর্ম ও সাধনার জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।"[৩]

তাঁরা (দরবেশগণ) বাংলাদেশের দু:স্থ, নিপীড়িত ও নির্যাতিত ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখে প্রাণ খুলে কেঁদেছিলেন; তাদের নিরাশ ও মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করে ও ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি দান করে এ দেশের প্রাণ, মন, আত্মাকে হরণ করেছিলেন। তারা জাতির কথা চিন্তার করেন নি, সমাজের কথা ভাবেন নি যেখানেই মানুষের পতন হয়েছে, যেখানে মানুষের করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, সেখানে মান-অপমানের কথা ভুলে গিয়ে তারা মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে স্থান দিয়েছেন। সমাজ জীবনে দরবেশগণ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসে তাদের সেবা শুশ্রুষা করেছেন; মৃত্যুর পরেও কাঁধে করে কবর দিয়েছেন। এদের সংস্পর্শে এসে পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করে সাধু হয়েছে; সংসারী পরোপকারে আত্মবিলিয়ে দিয়েছে; বস্তুতপক্ষে তাঁদের দেখলে সত্যই মনে হত যে, তাঁরা 'শান্তির দূত'। তাই মানুষ সুফী দরবেশগণের পেছনে পেছনে ছুটে চলত। এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজ জীবনে পূণ্যশ্লোক এই সাধকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল গভীর।[৪]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২. Abid Ali Khan, Memuirs of Gaur & Pandua, P. 140
৩. Dr. Mohammad Enamul Haq, op.cit, P. 262
৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

সূফী-দরবেশগণের খানকাহগুলো হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকল মতের লোকদের মিলন কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রগুলো অবারিত প্রতিষ্ঠান ও খোলাখুলি আলোচনার স্থানে পরিণত হয়। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সব প্রতিষ্ঠান একটা উদারনৈতিক ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতকে বুঝতে পারে। এই উদার পরিবেশে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক মতবাদ 'সত্যপীর' পূজার উদ্ভব হয় এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

সূফী-দরবেশগণের সততা ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের মানবতা ও সেবা, প্রীতি ও উদারতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর হিন্দুকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদের অনেকেই দরবেশগণের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে সূফী-দরবেশগণ এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, দেশের শাসক ও সুলতানগণ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন এরা সেখানে আশাতীতরূপে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। এক কথায় বলা যায়, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্র বল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য এরা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের জীবনে ইসলামের সনাতন আদর্শ এমন অকৃত্রিমভাবে প্রকটিত হতে দেখে এদেশের মানুষ অতি সহজেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার অনেকেই নিজেদের ঐতিহ্যগত ধর্ম বিশ্বাসকেই রক্ষা করে আসছিল। তথাপি তারা সুফী-দরবেশগণের একান্ত ভক্ত হয়ে উঠে এবং তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানায়। তারা পীর পূজা শুরু করে এবং তাদের অন্ত রাকাংঙ্খা পূর্ণ করার মানসে পীরের আশীর্বাদ কামনা করে। এমনকি বহু শতাব্দীব্যাপী হিন্দুরা ভক্তির সঙ্গে সূফী-দরবেশগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে এবং তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায় মাযার শরীফ পরিদর্শন করছে।[১]

বিদেশাগত সূফী-দরবেশগণ যখন বাংলায় আগমন করে তখন বাংলায় সর্বত্র উৎকট তান্ত্রিক গুরুবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। কালীসেবী সুরাপায়ী তান্ত্রিকতাবাদের বীভৎস নরবলীর ভয়ে যখন সারাদেশ আতংকগ্রস্ত সে সময়ই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অলী-দরবেশগণ এ দেশে আগমন করেন। তাদের নিকট তান্ত্রিক মারণ, উচাটন ও বশীকরণ সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র নিস্ফল প্রমাণিত হয়। তান্ত্রিক গুরুগণ দরবেশগণের নিকট পরাজিত হতে হয় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। গুরুর পরাজয়ে স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ফলে তান্ত্রিক শক্তি বিলুপ্ত হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সূফী-দরবেশগণ ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রধানত দেশীয় ভাষা বাংলা ব্যবহার করেছেন। অমুসলিম জনসাধারণ আরবী, ফারসী ভাষা বুঝতে না পারার কারণে পীর-দরবেশগণ এদেশের লোকজনের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। আবার কুরআন, হাদীসের বিষয়বস্তু আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নবদীক্ষিতদের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। ফলে বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়। এব্যাপারে ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিমের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য "The teaching and preaching of Islam to the common people gave impetus to the Bengali language. The sufis and mystics preached the religion in local language, the dialect of the people, because it was through this medium that they could come in direct contact with them. Many literate muslims felt that the converted muslims in general did not understand Arabic and Parsian and hence they were not properly acquinted with teh teaching of Islam. They thought it their only to write books appertaining to Islamic Sociology and religion in Bengali, so that the common muslims might understand them and regulate their life in accordance with the teachings of their religion."[২]

মুসলমান পীর-দরবেশগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জনহিতকর কার্যাবলীর দ্বারা হিন্দু জনগণের মনে গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত 'শেক শুভোদয়ার' লেখক হলায়ুধ মিশ্র শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেন। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আশায় তারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করত ও তাঁর পবিত্র নামে তাদের বিষয় সম্পত্তি অর্ধেক উৎসর্গ করত। মাধবী নাম্নী

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
২. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 216

Dhaka University Institutional Repository

এক মহিলার মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীকে শায়খ পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনই তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থেকে ছিল।[১] সপ্তদশ শতকের হিন্দু কবি ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের পীর-দরবেশগণের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে প্রশংসা কীর্তন করেছেন।[২] হিন্দু কবি বিদ্যাপতি মহান তাপস খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, জাফর খাঁ গাযী, বড় খাঁ গাযী ও ইসমাইল গাযীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর কাব্য 'সত্যপীর পাঁচালী' মুসলমান পীর-দরবেশ সত্যপীরের আদেশে রচনা করেন।[৩]

বাংলাদেশের সূফী-দরবেশগণ উত্তর ভারতের সূফীদের অনুকরণে খানকাহ্ পরিচালনা করতেন। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে এসে সেখানে একটি খানকাহ্ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর খানকাহতে অগণিত লোকজন প্রতিপালিত হত। তাঁদের খানা খেতে সময় লাগত। ফলে তাঁর প্রধান শিষ্য শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ তাতে তাঁর সময় নষ্ট হত; লেখা-পড়ার ব্যাঘাত ঘটত।[৪] সিলেটের হযরত শাহ্জালালের আস্তানায় বহু লোকের যাতায়াত ছিল। তাঁরা আসবার সময় সঙ্গে করে খানা নিয়ে আসতেন এবং তখনই তা শিষ্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। স্বহস্তে খানকাহ্ পরিস্কার করতেন এবং কাপড়-চোপড় ধৌত করতেন।[৫] শায়খ আলাউল হক সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁর খানকাহতে হাজার হাজার দু:স্থ, দরিদ্র ও মুসাফির প্রতিপালিত হত, "The Khanqa of the vastly learned Sufi Shaikh Ala-al-Haq and his distinguished son Shaikh-Nur-Qutb-Alam was a renowned seat of learning as well as spiritual knowledge. Hazrat Nur-Qutb-Alam built a great madrasa and hospital at pandua. Sultan Ala-al-Din Hossain Shah made a land grant for its support. This great religious seminary attracted seckers after knowlege from different parts of the sub-continent and it produced a number of celebrated scholars and sufis who shed the lustre of their spiritual presonality and knowledge for several centuries. The descendants of this distinguished family of saints were also noted for their peity as well as learning."[৬]

আগেই বলা হয়েছে যে, জনসাধারণ বিশ্বাস করত যে, তাঁরা কারামাত বা অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী; তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত; তাঁদের অন্তর ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আলোকিত এবং তারা হচ্ছেন সত্যের ভান্ডার। তাঁরা সরল ও অত্যন্ত আত্মসংযমী জীবন যাপন করা সত্ত্বেও জনগণের মনে এ সব বিশ্বাস ছিল। তাঁরা সামান্য কাজ এমনকি গুরুর আদেশে ঝাড়ু দারের কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী তাঁর পীর শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর জন্য এবং শায়খ আলাউল হক তাঁর পীর শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমানের জন্য উষ্ণ খাদ্যসহ্ উত্তপ্ত উনুন সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতেন। শায়খ নূর কুতবুল আলম জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতেন; পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন। তাঁর ভাই আযম খাঁন তাঁকে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বলতেন,"I have no necessity of your wealth and grandcur which are perishable. To carry faggots for the monestery is better (than wealth), the post of dignitaries is for you."[৭] শায়খ নূর কুতবুল আলম বলেছেন যে, তাঁর গুরু (তার পিতা শায়খ আলাউল হক) তাঁকে দয়ার সূর্য, বিনয়ের পানি এবং ধৈর্যের মাটির মত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮]

মহান সূফী-সাধকদের এসব অসাধারণ কার্যবলী ও গুণাবলীর জন্যই তাঁদেরকে নানাবিধ উপাধি প্রদান করা হত। শায়খ আলাউল হককে 'সদয় শ্রদ্ধেয় দরবেশ'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে- "যারা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত পূণ্য কাজগুলো মনোহর ও মহিমান্বিত। আল্লাহ্ ঐশী জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে তাঁর হৃদয় আলোকিত করুন, তিনি হচ্ছেন গৌরবমন্ডিতদের ধর্মের পথ প্রদর্শক।"[৯] শায়খ নূর কুতবুল আলমকে উল্লেখ করা হয়েছে-"হযরত শায়খ উল ইসলাম, জাতির মুকুট, দরবেশগণের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ, যিনি আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হয়েছেন"- "হযরত সুলতান-উল-আরিফীন (দরবেশগণের সুলতান, কুতুব উল আকবর (আলোর আলো বিকিরণ কেন্দ্র), "ধর্মের আকাশের সূর্য এবং সত্যের ভান্ডারের চাঁদ, আধ্যাত্মিকতার প্রদর্শকরূপে।"[১০]

---

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত, শেক শুভোদয়া, কলিকাতা-১৯২৭, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২. ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৭
৩. এম.কে. সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৮০
৪. A.K. Banarjee, Calcutta Review-1939, P. 177-210
৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলিকাতা-১৯৬৬, পৃ. ৪৬৯
৬. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 289
৭. Dr. Mohammad Enamul Haq, op.cit, P. 173
৮. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৯. S. Ahmed Inscriptions of Bengal, Vol-iv, 1960, P. 33
১০. Abid Ali Khan, op.cit, P. 104, 170

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক স্বীকৃত "দেবদূত সদৃশ স্বভাবের অধিকারী এবং ধর্ম ও বিশ্বের সুলতান।"[১] সূফী-সাধকদের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্র বল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে লোকজন সূফীদের খানকাহ ও আস্তানায় গিয়ে ভীড় জমাত এবং ইসলাম গ্রহণ করে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করত। জাগতিক কোন কারণ স্থানীয় জনগণকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেনি। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য এবং বর্ণগত বাধা, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন, নিশ্চিতভাবেই ধর্মান্তরণের প্রধান কারণ ছিল। ব্রাহ্মণরা কীভাবে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেছিল এবং কীভাবে বৌদ্ধরা খোদা, পয়গাম্বর, পীর, গাযী ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে শূণ্যপুরাণের 'নিরাঞ্জনের রুষ্মা' অধ্যায়ে।[২]

তাতে বৌদ্ধরূপে চিহ্নিত ধর্ম পূজারীদের উপর ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নের একটি চিত্র আঁকা হয়েছে। নিপীড়িত বৌদ্ধগণ ধর্মের সাহায্য প্রার্থনা করলে ধর্ম নিজেকে যবন বা মুসলমানে রূপান্তরিত করে ব্রাহ্মণ উৎপীড়কদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এতে দেখা যায় কোন কোন স্থানে দলবদ্ধভাবে একটি সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নির্দিষ্টভাবে জাজপুর (উড়িষ্যা) ও মালদহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীদের মুসলমান নামকরণ করা হয়েছে। খোদা, পয়গাম্বর, বেহেস্ত, মুহাম্মদ, আদম, গাযী, ফকির এবং মৌলানার উল্লেখ করা হয়েছে। মাদার বা শাহমাদার নামে একজন পীরের উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে সর্বশ্রেণীর জনসমাজেই সূফী-দরবেশগণের প্রভাব ছিল বিপুল। গলি থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁদের প্রভাব সমভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তৎকালীন সমাজে সুফীবাদ একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সূফী দরবেশগণ এ দেশে আগমন করে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় খানকা নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁদের চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিত হতেন। এতে শিষ্যদিগকে নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হত। সূফীগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন, তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল সাধু-দরবেশগণের সাধুতা, নিষ্ঠা এ দেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন। তাঁদের কেউ কেউ পীরের খানকাহর নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁদের ইন্তিকাল হত।

উপরন্তু বাংলাদেশে সূফী সাধকগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমাণ তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী সহজে এ দেশে সূফী-দরবেশগণের আগমন ও ধর্ম প্রচারকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করত এবং নির্যাতন চালাত। সে কারণে তাদের সঙ্গে অনেক সময় যুদ্ধও করতে হয়েছে। যুদ্ধে অনেকে শহীদ হয়েছেন। অনেকে তাঁদের জীবনচরিত্র, কর্ম ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলামের প্রভাব বিস্তার পড়েছে। সূফী-দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামতি দেখিয়েও লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি একত্ববাদ ও ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌত্তলিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা জয় লাভে সমর্থ হয়েছেন। সুতরাং সূফীগণ ও তাঁদের দরগাহগুলো বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সূফীগণকে কেবলমাত্র তাঁদের জীবদ্দশায় সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন তা নয়, বরং মৃত্যুর পরেও তাঁদের মাযার বা দরগাহগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এখনও করছে। বাংলায় অনেক দরগাহ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাঁদের উরসের দিবে বা মৃত্যু বার্ষিকীতেই নয়, সারা বছরই এগুলোতে জনতার ভীড় লেগে থাকত। চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ কোন দান বা উপহার গ্রহণ করতেন না, তাঁরা নিতেন ফুতুহ বা অযাচিত দান। তাঁদের দরগাহগুলো ছিল জীর্ণ-শীর্ণ এবং শিষ্যদের নিয়ে তাঁরা দীনহীন ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু পাণ্ডুয়ার শায়খ নূর কুতবুল আলমের দরগাহকে বলা হয় শাস হাজারী বা ছয় হাজারী, অর্থাৎ দরগাহর ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ছয় হাজার টাকা। আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ এ জমি দান করেছিলেন, তবে দরবেশের জীবদ্দশায় নয়, তাঁর মুত্যুর পরে। এতে দেখা যায় যে, সূফীরা তাদের মৃত্যুর পরেও যেমন মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তেমনি সূফীগণের পূর্ব পুরুষরা রাষ্ট্র থেকে ইনাম বা দান হিসেবে জমি লাভ করতেন এবং এভাবে তারা ইনামদার বা জমির মালিক হতেন।[৩] সুতরাং সূফীগণ ও তাদের দরগাহগুলো বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাস্তবিকই মুসলিম পীর-দরবেশগণ যথার্থরূপে বাংলার আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন।

---

১. Ibid, P. 104
২. সি. সি. বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।
৩. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

শাসন কর্তৃপক্ষের উপর সূফী-দরবেশগণের প্রভাব :

বাংলাদেশের সূফী-সাধকগণ বিভিন্নভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁরা অনেক সময় এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন এবং কখনও কখনও বাদশাহদের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের উপর তাঁদের উপর প্রভাব খাটাতেন। ইসলামে যেহেতু পেশাদার ধর্ম প্রচারকদের কোন ব্যবস্থা নেই সেহেতু ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদেই দরবেশগণ দেশের সর্বত্র ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তারা ইলামের জন্য মানব কল্যাণমূলক কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা পুণ্যাত্মা হিসেবে প্রতিভাত হতেন। মানব সেবাকেই তারা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রূপে বিবেচনা করে থাকেন। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলেছেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়ঃ। কাবা তো কেবল ইব্রাহিমের গৃহ কিন্তু হৃদয়ই হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র বাস।"[১]

ধর্ম প্রচার ও মানবকল্যাণকর কার্যাবলীর এই সমুদয় আদর্শ নিয়েই তাঁরা ইসলাম প্রচার করতেন। "বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমান বিজেতা এবং শাসকগণও কৃতিত্বের অংশীদার। এ ব্যাপারে তাঁদের কৃতিত্ব সূফী-দরবেশদের তুলনায় ততটা তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও উল্লেখযোগ্য। বহুক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী সেই সব মহান আধ্যাত্মিক সাধকদের কার্যের পরিপূরক ছিল। পীর-দরবেশদের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং প্রদেশে মুসলমান শাসন সংহত করণে সাহায্য করেছে; মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ তাদের মহান ব্রতের অগ্রগতির জন্য নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। ধর্মান্তরিত লোক সংগ্রহে এবং ধর্মের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ সৃষ্টিতে বাস্তবিকই রাজকীয় শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন ধর্মীয় নেতাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় এর উন্নতি বিধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় বাংলাদেশে শক্তিশালী থাকলে তা প্রদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমর্থনের উৎস হবে এবং একে শক্তি জোগাবে। সুতরাং তারা উলামা ও পীর-দরবেশগণকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাদেরকে সমর্থন দান করতেন।"[২]

অনেক স্থলে সূফীগণ বংশ পরম্পরায় ইসলাম প্রচারে জান-মাল কুরবান করাকে জীবনের পরম পাওনা বলে মনে করতেন। তবে বহু স্থানে তাদের নিজেদের জীবিকা বা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের চিন্তা করতে হত না। মুসলিম শাসক ও সুলতানগণ স্বেচ্ছায় সে ভার বহন করতেন। সূফীদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে সুলতানগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় উপদেশ দান, শিক্ষা প্রচার ও সূফী বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করেন। সুলতানগণের ন্যায় তাদের আমীর-উমারাও সূফী-দরবেশ প্রিয় ছিলেন এবং বহু স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী শায়খদের জন্য অনেক খানকাহ নির্মাণ করেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।[৩]

মিনহাজের মতে, গিয়াস উদ্দিন আওয়াজ খিলজী পীর-দরবেশদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সূফী-দরবেশগণকে বৃত্তি ও ভাতা দানের ব্যাপারে আওয়াজ খুব উদার ছিলেন। যেমন- তাঁর শাসনামলে খ্যাতনামা আলিম ও ধর্ম প্রচারক মাওলানা জালালুদ্দীন গজনবী লক্ষণাবতীতে আগমন করেন। আওয়াজ খিলজী তাঁকে দরবার কক্ষে একটি ভাষণ দানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। বক্তৃতা শেষে তিনি তাকে প্রায় দু'হাজার তংকা উপহার দেন এবং আমির, মালিক, মন্ত্রী ও অন্যান্যদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা উদারভাবে উপহার দিয়ে মাওলানাকে সম্মানিত করেন। এভাবে মাওলানা তিন হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লাভ করেন। মিনহাজের ভাষায়, "লক্ষণাবতী থেকে মাওলানা স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে আরও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার মুদ্রা উপহার হিসেবে সংগৃহীত হয়। এভাবে উদার প্রকৃতির এই খ্যাতনামা সুলতানের দৃষ্টান্তধর্মী ধর্মানুরাগের ফলে সেই ইমাম ও ইমামের পুত্র মাওলঅনা জালালুদ্দীন দশ হাজার মুদ্রা অর্জন করেন।"[৪]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৩. তাবাকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ১৫১
৪. তাবাকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান বলবনের সময়ে বাংলা শাসনকর্তা মুগীস উদ্দিন তুগ্রিল পীর-দরবেশগণের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশগণকে তিন মণ স্বর্ণ দান করেন।[১] ইবনে বতুতার মতে, ফকির ও সূফী-দরবেশগণের প্রতি ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্র গভীর ভক্তি ছিল। তিনি বলেন, "ফকিরদের প্রতি ফখরুদ্দীনের এতবেশী ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি সৈয়দানা নামে একজন কলন্দর দরবেশকে সাদকাওয়ানে (চট্টগ্রামে) তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তিনি ফকিরদের ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করেন এবং ঐ ভ্রমণকালে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।[২] সুলতান ফখরুদ্দীন নির্দেশ দেন যে, নদী পথে ফকিরদের নিকট থেকে কোনরূপ ভাড়া নেয়া হবে না এবং যাদের নিকট কোন কিছুই নেই তাদেরকে ভ্রমণ পথে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। যখন কোন ফকির গ্রামে আগমন করেন, তখন তাঁকে দিনার দেয়া হবে।[৩]

রাষ্ট্র ও সুলতানদের প্রতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিভিন্ন রকম। সোহরাওয়াদীয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁরা সুলতান ও যুবরাজদের নিকট হতে উচ্চ পদ ও ধনদৌলত গ্রহণ করতেন। অপরদিকে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ দরবার ও সুলতানদের নিকট থেকে দূরে থাকতেন এবং তাদের প্রতি উদাসীন ছিলেন। রাষ্ট্র প্রদত্ত কোন উপহার বা উচ্চপদ গ্রহণ করতেন না। সে যাই হোক, দিল্লীর সুলতানগণ সূফীদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোন সূফী দরবেশ দিল্লী আগমন করলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজধানীর বাইরে চলে আসতেন। বলবন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত শক্তিশালী সুলতানগণও সমসাময়িক দরবেশগণের প্রতি অনুগত ছিলেন।[৪]

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ পীর-দরবেশগণকে খুব সম্মান করতেন। গোরক্ষপুর অঞ্চল বিজয়কালে তিনি বাহরাইনে অবস্থিত শায়খ মাসউদ গাযীর মাযার যিয়ারত করতেন। সে সময় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি তিনি দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তিনি শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ্ যিয়ারত করবেন এবং এই বিখ্যাত দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যখন সুলতান ইলিয়াস শাহ্ সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক 'একঢালা' দূর্গে অবরুদ্ধ হন, সে সময় পাণ্ডুয়ায় শায়খ রাজা বিয়াবাণী মৃত্যু বরণ করেন। সুলতান ইলিয়াসস শাহ্ এই দরবেশের খুব অনুরক্ত ছিলেন। দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইলিয়াস শাহ্ ফকিরের ছদ্মবেশে 'একঢালা' দূর্গ থেকে বের হয়ে আসেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি প্রিয় শায়খের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।[৫]

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ সূফীদেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু শায়খ নূর কুতবুল আলমকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতেন। জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ সূফী দরবেশগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সোনার গাঁয়ে নির্বাসিত দরবেশ শায়খ যাহিদকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রায়ই তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। বাংলার আফগান শাসক সুলায়মান কররানী ১৫০ জন শায়খ ও আলিমের সঙ্গে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় কাঁটিয়ে দিতেন।

মুসলমান সভাসদবর্গ ও কর্মচারীগণ শায়খদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শাসনকর্তা ও সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। পীর দরবেশগণের মাযার যিয়ারতের ব্রত গ্রহণ করা তাদের মধ্যে খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। তাঁরা পীর-দরবেশদের মাযারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন এবং তাদের দরগাহ্ ও লঙ্গরখানা সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করতেন।

প্রথম যুগের মুসলমান শাসকগণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। তাদের কেউ কেউ শরীয়াতী শাসন কায়িমের জন্য বেশ সচেতন ছিলেন। ইসলামী আইনের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার ফলে একজন সামান্য নারী বা পুরুষ এমনকি একজন শক্তিশালী সুলতানের বিরুদ্ধেও নালিশ করতে পারতেন এবং অধিনস্থ কর্মচারী কাযী সুলতানকে পর্যন্ত একজন সাধারণ আসামীরূপে বিচারালয়ে ডেকে পাঠাতে পারতেন। কথিত আছে যে, একদা সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ যখন তীর নিক্ষেপের অভ্যাস করছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি তীর এক বিধবা মহিলার পুত্রের শরীরে বিদ্ধ হলে সে মারা যায়।

---

১. জিয়া উদ্দিন বারণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

২. M.K. Batta Sali, Ibn Battuta, Coins & Chronology etc. P. 136-140

৩. Ibid, P. 140

৪. K. A. Nizami, Some Aspects of Religion and Politics in India in the Thirteen Century, P. 240-248

৫. গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃ. ৯৭

পুত্রহারা মা কাযীর দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করে। কাযী সুলতানকে ডেকে পাঠালে সুলতান একজন সাধারণ আসামীর মত কাজীর দরবারে উপস্থিত হন। কাযী সাধারণ অপরাধীর মতই সুলতানের বিচার করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এতে সন্তানহারা মা সন্তুষ্ট হয়ে আইনানুমোদিত কিছু স্বর্ণ গ্রহণ করে সে সুলতানকে ক্ষমা করে দেয়। শরীয়াতের অনুশাসন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের জন্য সুলতান কাযীর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেন।[১]

বাংলার মুসলিম শাসকগণ তাদের ধর্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব এবং শরীয়াতের অনুশাসনের প্রতি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ধর্মীয় চরিত্রের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। সুলতান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতেও নেতৃত্ব দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতেন। তারা মক্কা মদীনার পবিত্র শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করতেন এবং হজ্জ পালনের জন্য লোকদেরকে সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর শিষ্য মুযাফফর শামস বলখীর অনুরোধে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ সূফীদের হজ্জের জন্য কয়েকখানি জাহাজের ব্যবস্থা করতেন। এ সব জাহাজ হজ্জযাত্রীদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আরবে নিয়ে যেত।সুলতানের নিকট একটি পত্রে মুযাফফর শামস লিখেন, "এখন হজ্জের মৌসুম আসছে; মক্কায় যাবার উদ্দেশ্যে গরীব দরবেশগণের একটি দল আমার নিকট জমায়েত হয়েছে; তাদেরকে প্রথম জাহাজেই জায়গা দানের নির্দেশ দিয়ে চাটগাঁয়ের কর্মচারীদের নিকট অনুগ্রহ পূর্বক একটি ফরমান জারি করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।"[২]

মুসলমান শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলোতে তাঁদের ধর্মীয় আবেগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। আমির-উমারা, রাজকর্মচারীগণ এবং এমনকি অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ সুলতানদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেন। অসংখ্য মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বহু শহর ও গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে।

১৩৬৪-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক পান্ডুয়ার আদিনায় নির্মিত বিরাট মসজিদটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাড়ে সাতান্ন ফুট দীর্ঘ এবং দুইশত সাড়ে পঁচাশি ফুট প্রস্ত। বিশাল চিত্তাকর্ষক মসজিদটি এ উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন। আদিনা মসজিদটি সুলতান সিকান্দর শাহের আবেগের মূর্ত প্রতীক এবং বিরাট জামাতের নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদের সংহতির জন্য তার আগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশ।[৩]

মুসলমান শাসক ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তেমনি তাঁরা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ[৪] ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ এদের প্রত্যেকের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। একটি উৎকীর্ণ লিপি সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহকে এ যুগের একজন বড় আলিমরূপে উল্লেখ করে। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় পান্ডিত্য প্রদর্শন করেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন।[৫] মুসলমান শাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও এদের উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। মিনহাজ বলেন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার লক্ষণাবতীতে একট মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৬] সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে কাযী আল নাসির মুহাম্মদ ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[৭] জাফর খান কর্তৃক ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি 'দারুল খায়রাত' নামে পরিচিত হয়।[৮]

---

১. গোলাম হোসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৮
২. গোলাম আলী আজাদ, খাজিনাহ্-ই-আমিরাহ্, কানপুর-১৯০০, পৃ. ১৮৪
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৪. Inscription in Journal of Asiatic Society of Bengal, 1870, P. 290
৫. Journal of Asiatic Society of Bengal, 1873, P. 282-286
৬. তাবাকাত-ই-নাসিরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৭. Inscription in Epigraphia Indo-Muslimica, 1917, P. 13
৮. Inscription in Journal of Asiatic Society of Bengal, 1874, P. 303

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমান শাসকদের প্রতি সূফী-দরবেশগণের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তাঁরা দরবেশগণের ভরণ-পোষণের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন এবং তাঁদের কার্যকলাপে সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রভৃতি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতেন। এ সব মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা নিয়ে এক একটা বিশালায়তন ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত, যেখানে শিক্ষার্থী ও দু:স্থ মানুষের জন্য থাকত শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় যখন সূফী দরবেশগণ ছড়িয়ে পড়লেন এসব মানব কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানেও তখন সারাদেশ ছেয়ে গেল। কোথাও তা হত মহাবিদ্যালয়ের অনুরূপ।[১]

এ সব প্রতিষ্ঠান বংশ পরম্পরায় সূফী দরবেশগণের প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় ইসলাম সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং সুলতানদের দরবেশ ও আলিম প্রীতিই এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম বিস্তৃতির প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "যে সকল কারণে দরবেশগণের এহেন প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে মুসলমান নরপতিদের দরবেশ প্রীতিই প্রধান। মুসলমান রাজত্বের সময় এই দেশের কোন পেশাধারী ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু বিদেশী ও দেশী দরবেশ সম্প্রদায় এবং 'মৌলানা' ও 'মৌলভী' আখ্যাধারী উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণ, মুসলমান রাজত্বের এই অভাবপূর্ণ করিয়াছিলেন। ----বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান সুলতান এক একজন মহাদরবেশ ভক্ত বা শিক্ষাপ্রিয় বক্তি ছিলেন। বঙ্গীয় দরবেশগণ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই দেশীয় মুসলমান নরপতিদের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ফলে তাহারই জন্য এই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের যেমন হাত ছিল তেমন ভারতের আর কোন প্রদেশে ছিল কিনা তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। -----মুসলমান বাদশাহ্ ও দেশের আমির-উমরাগণ ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা দেশে যে সকল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, তাহা এক একটি বংশ পরম্পরাগত প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হইয়া গেল। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই আশ্রমগুলি হইতে চতুপার্শ্ববর্তী স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারিতও হইয়াছে। এইরূপভাবে সংস্কার মুক্ত ও উদার দরবেশগণের প্রচারের ফলে দেশের সর্বত্র ইসলামের মত একটি বিদেশীয় চিন্তাধারা ও ধর্ম পদ্ধতি বাংলার ঘরে ঘরে আরব, পারস্য, সমরকন্দ ও বোখারার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।"[২]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলায় সুলতান ও সূফীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর ভিন্নতর চিত্রও পাওয়া যায়। এমনও দেখা যায় যে সূফীগণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সুলতানদের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণকে তারা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। আবার মাঝে মাঝে সুলতানগণও কোন কোন সূফীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সর্ব প্রথম এর শিকার হন শায়ক শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা। সাধারণ লোক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরের লোকজন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হওয়ায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন শংকিত হয়ে পড়ে এবং রাজ্য কেড়ে নেয়ার ভয়ে আবূ তাওয়ামাকে সোনার গাঁয়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেন।[৩]

সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-৯২ খ্রী.) শায়খ আলাউল হককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও এক পর্যায়ে তার শ্রদ্ধেয় শায়খকে সোনার গাঁয়ে নির্বাসিত করেন। কেন তিনি নির্বাসনের শিকার হলেন? কারও মতে, দরবেশের বদান্যতা ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত বা শঙ্কাগ্রস্ত হয়েই সুলতান তাঁকে নির্বাসনে পাঠান।[৪]

তবে এটাকে যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয় না। ড. আব্দুল করিম যুক্তি দিয়ে বলেছেন, "গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক মতভেদ বিশেষ করে অমুসলিম কর্মচারীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বিষয়ে মতভেদই নির্বাসনের প্রকৃত কার।[৫] কেননা এরূপ নীতির ফলেই সাময়িকভাবে হলেও রাজা গণেশের গৌড়ের সিংহাসন দখল করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতান সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহকে (১৩৯২-১৪১০ খ্রী.) বিহারে সূফী মাওলানা মুযাফফর শামস বলখী যে সকল পত্রাদি লেখেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

১. আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ২২৪-২৫
২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৪. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিয়া, দিল্লী, ১৩৩২ হি., পৃ. ১৪৩
৫. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন-"---সংক্ষেপে বলতে গেলে কুরআন মাজীদের তাফসীরকারকগণ বলেন যে মুমিনগণের কখনও উচিত নয় যে অমুসলিম ও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ এবং মন্ত্রণা দাতারূপে গ্রহণ করে।[১] এ সব থেকে মনে হয় সুলতান সিকান্দার শাহ্, সুলতান ইলিয়াস শাহ্ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ রাজনৈতিক সুবিধা হিসেবে অমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন এবং সম্ভবত সুলতান সিকান্দার শাহের সঙ্গে শায়খ আলাউল হকের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যই তার নির্বাসন দন্ডের কারণ। তাই ড. আব্দুর রহিম যথার্থই বলেছেন, "সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী নীতির সমর্থক ছিলেন। সাধারণত তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখনও নির্বিকার থাকেননি। বাংলায় ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ রাজকার্যে অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদও তাদের উপর ন্যাস্ত করেন। এ ধরনের জাতীয় নীতি অনুসরণ করে তাঁরা উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। ---- কিন্তু ঐ সময়ে দরবেশ ও উলেমা রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ অসমীচীন মনে করেন। শেখ আলাউল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ধরনের নীতি অনুসরণের মধ্যে বাঙ্গালী মুলমানদের জন্যে বিপদের সম্ভাবনা নিহিত আছে। সেজন্য শেখ আলাউল হক সুলতান সিকান্দার শাহের নিকট এ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁর কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেননি। উপরন্ত পান্ডুয়া অধিবাসীদের উপর শেখের বিরাট প্রভাবে শংকিত হয়ে তিনি তাঁকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শেখ আলাউল হক রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যালোচনায় সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ছিলেন। যদি সুলতান সিকান্দার শাহ্ শেখের পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাহলে রাজা কংসের মাধ্যমে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন মুসলমানদেরকে যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হয় তা শুরুতেই এড়ান যেত।"[২]

হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার মত নির্বুদ্ধিতায় সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে পরামর্শ দেয়াকে শায়খ তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সুলতান সেদিকে কর্ণপাত করেন নি। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের খুব দূর্ভোগে পড়তে হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্র এক মহাবিপদে পতিত হয়। হযরত নূর কুতবুল আলমের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিম রাষ্ট্র এই বিপদ থেকে মুক্তি পায়। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানগণ হয়ত এ রকম উদারনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান এবং উলামা-দরবেশগণের উপর তাঁর অকথ্য উৎপীড়ন নির্যাতনে বিচলিত হয়ে শায়খ নূর কুতবুল আলম রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি এই সংকটাপন্ন অবস্থা হতে মুলসমান ও মুসলিম রাষ্ট্রকে উদ্ধারের জন্য জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীকে অভিযানের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি সৈয়দ সিমনানীকেও ইবরাহীম শার্কীর নিকট পত্র লিখে বঙ্গীয় মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আসতে অনুরোধ করার জন্য বলেন। ফলে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাংলার পুণরুদ্ধার সম্ভব হয়।[৩] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The saints also saved the Muslim states and Society in times of crisis. Traditions have preserved a few instances where the saints stood for the as the guardians of the muslims in their misfartunes and calamities. By their great spiritual and moral force they stopped persecution of the Hindu chiefs or the muslims of their territories. To save the muslims they even took up arms where moral persecutin was of no avail. Hajrat Nur Qutb Alam saved the Muslim state and society in Bengal from a great catastrophe. ----- At this crisis, Nur Qutb Alam, who led the life of a holy man could not remain indifferent to the fate of the muslim community and state. He exerted himself to close the differences of the muslims and units them to a common cause. The saints stood as champions of Islamic policy in the administration of the muslim state in Bengal."[৪]

সুতরাং দেখা যায় যে বাংলার সূফী সাধকগণ কেবল ইসলামই প্রচার করেননি। ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপও করেছেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে সংহতি রক্ষা পায়। তাই ডঃ মুহাম্মদ্ আব্দুর রহিম বলেছেন, "বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সংহতির ক্ষেত্রেও সূফী দরবেশগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক ও ভৌগোলিক বিজয়ের সঙ্গে সূফী-দরবেশগণ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী ও শিষ্য সংগ্রহ্ করে নৈতিক বিজয় যুক্ত করেন এবং এভাবে একটি অমুসলিম দেশে মুসলিম রাষ্ট্রের স্তায়িত্ব ও শক্তির উৎস প্রদান করেন। সাধু-দরবেশগণের নিরব সাধনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্যদের উপর নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ধর্মীয় অধিবাসীদের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখা মুসলমান শাসকদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।"[৫]

১. Journal of the Bihar Research Society, Part-42, Vol-II, 1956, P. 8
২. Dr. Mohammad Abdur Rahim, op.cit, P. 143
৩. Prof. Hasan Askari, op.cit, PP. 35-36
8. Dr. M.A. Rahim, op.cit, P. 143
৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১88

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ ও সমাজসংস্কারে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান

-হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩)
-হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)
-ফরায়েজী আন্দোলন ও হাজী শরীয়াত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)
-মুহাম্মদ মুহসীন উদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬০)
-আলীগড় আন্দোলন ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)
-মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)
-সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)
-নওয়াব ফয়জুন্নেসা (১৮৩৪/৪০-১৯০৩)
-বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১)
-বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)
-নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)
-শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৮৬২)
-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)
-খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)
-মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)
-মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)
-আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম
-আঞ্জুমান-ই-হিমায়াত-ই-ইসলাম
-খাদিমুল ইনসান সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান :

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তন ও বিকাশে যাদের অবদান চিরস্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে তাঁরা হচ্ছেন মানবহিতৈষী সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক ও সমাজকল্যাণকর্মী। আধুনিক সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান-দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ তারা যদিও পাননি, তথাপি সমাজ ও মানবকল্যাণে তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মানবপ্রেম এবং নিরলস অধ্যবসায়, কর্মপ্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের কোন ঘাটতি ছিল না। মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দু:স্থ, দরিদ্র, অসহায়, অক্ষম, অসুস্থ, দীন-দু:খী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসেন এবং সাধারণ মানুষের দু:খ-দূর্দশা ও সমস্যা থেকে উদ্ধারকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা করে সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। তন্মধ্যে বহু মনীষী, দানবীর ও মানবহিতৈষী ব্যক্তি একক বা যৌথ প্রচেষ্টায় জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্রতী হন, যারা সমাজসেবক বা সমাজকল্যাণকর্মী। আবার অনেক সমাজ সংস্কারক সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মূলোৎপাটনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন ও সমাজকল্যাণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতিতেই সমাজকল্যাণ আজ সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকজন স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার পরিচিতি ও সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণে তাঁদের অবদান উল্লেখ করা হল।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬৩)

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্ম-অনুসন্ধান ও চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের বীজ বপন করেন এবং ইসলামী নৈতিক দিক-নির্দেশনার সামাজিক অকল্যাণকর অবস্থার নিরসনে সচেষ্ট হন। তিনি ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম আবুল ফাইয়াজ আহম্মদ কুতুবদ্দীন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রহিম। আবদুর রহিম ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলের একজন খ্যাতনামা আলিম। বাল্যকাল থেকেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ শুরু করেন এবং ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠেন। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়, পনের বছর বয়স থেকে শুরু হয় আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সতের বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রহিমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। সাতাশ বছর বয়সে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মক্কা শরীফে হজ্বব্রত পালন করেন এবং তিন বছর সেখানে অবস্থান করে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হজ্জ্ব সম্পন্ন করে নিজ দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে পুনরায় তিনি মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত রহিমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।[১]

সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান :

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ধর্মকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পেরেছিলেন। তাঁর ধারণায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্যে ধর্ম পালনের আবশ্যকতা।[২] তিনি ইতিহাসের আলোকে মুসলিম সমাজের অধ:পতনের কারণ উদঘাটন করেন এবং সবাইকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর লেখা 'ইজলাতুল খিফা' বইতে মুসলিম সমাজের আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা, চরিত্র, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে সৃষ্ট বিভিন্ন ত্রুটিগুলোর ক্রম-বিস্তারধারা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, খলিফাত থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে গতি পরিবর্তন এবং ইজতিহাদের প্রাণশক্তির মৃত্যু ও মন-মস্তিকের উপর অন্ধ অনুসারীর বিপুল আধিপত্যই মুসলিম সমাজকে বর্তমান অধ:পতিত অবস্থায় নিয়ে এসেছে।[৩] সমাজ জীবনে শরীয়াতবিরোধী চিন্তাভাবনা ও আচার-অনুষ্ঠান এরূপ অবস্থারই ফলশ্রুতি। সুতরাং সমাজের অবাঞ্ছিত অবস্থা দূরীকরণে আত্মসচেতন হয়ে খিলাফতের পথে জিহাদ করেই এ অধ:পতিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য এ দেশে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার তেজোদীপ্ত চেতনায় মুসলিম সমাজকে উজ্জীবনে ও কল্যাণকর জীবন লাভে উদ্বুদ্ধকরণে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মনোনিবেশ করেন।

---

১. হুমায়ুন আব্দুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ৩৭-৪০
২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, (১৭৫৭-১৯১৮), লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৬৪
৩. আবুল আলা মওদুদী (অনু. আব্দুল মান্নান তালিব, ইসলামী রেনেসা আন্দোলন, জাতীয় গ্রন্থ বিতান, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৬৩-৮১

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্ব মানব মুক্তির জন্য সকল মানুষকে ইসলামের নৈতিক তামুদ্দনিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন গঠনে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান। 'তিনি নৈতিক ব্যবস্থার উপর একটি সমাজ দর্শনের (Social Philosophy) ইমারত তৈরী করেন।'[১] এ ব্যাপারে তাঁর রচনা 'ইজলাতুল খিফা', 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', 'বুদুরে বাজিগা', 'তাফহিমাত', 'মুসাফফা' ও 'মুসওয়া' ইত্যাদিতে জ্ঞানগর্ভ মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি মানবীয় দৈনন্দিন কার্যাবলীর শিরোনামায় উন্নত পারিবারিক জীবন গঠন, সামাজিক আদব-কায়দা অর্জন, ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা, কল্যাণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা ও সামরিক সংগঠন এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দান করে সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের পন্থা নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, "শাসকের মনে রাখা উচিত যে প্রীতির বন্ধন লৌহের চেয়েও দৃঢ়। জনসাধারণকে প্রাথমিক ও অর্থকরী শিক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। মালিক ও মজুরের মধ্যে এবং মনিব ও চাকুরের মধ্যে সম্প্রীতি থাকা চাই- তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, একথা সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি স্থায়ী হয় না।"[২] বস্তুত কি করে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাজ-সম্পর্ক লাভ করা সম্ভব, কিভাবে রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকর রূপদান করা যায়, মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের অর্থবহ বিকাশের উপায় কি, কর্মজীবী মানুষের নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কি ব্যবস্থা নেয়া যায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন তিনি ইসলামী দর্শনের প্রয়োগিকতায়।

সংস্কারমুখী তৎপরতায় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ স্পষ্ট মনোভাব পোষণ করেছেন। ধর্মীয় অবনতি প্রতিকারের উপায় হিসেবে ইসলামের আদি সারল্য ও বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তনকে সুপারিশ করেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন, বিবাহ অনুষ্ঠান ও মৃত্যুর কল্যাণ কামনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমিত ব্যয় ও অনাবশ্যক আড়ম্বরের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং পীর-ফকির প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।[৩]

সমাজ পুনর্গঠন ও সামাজিক সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনে শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তা-ভাবনা ও আহ্বান ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কল্যাণ লাভের একটি পথ নির্দেশনা দেয়। সমাজের অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার, বিলাসিতা ও সম্পদের অপচয় ইত্যাদির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। তাঁর এ সমালোচনা শুধু সমালোচনার খাতিরে নয়, বরং তা ছিল আত্মবিশ্লেষণমুখী ও সংশোধনমূলক।[৪]

ভারত উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৭৬৩ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও দর্শন অধ:পতিত মুসলিম সমাজের কাছে আজও আশার আলোক বর্তিকা ও উন্নত জীবন লাভের পথ-নির্দেশনা হিসেবে সমাদৃত।

হাজী মুহাম্মদ মুহসীন (১৭৩০/৩২-১৮১২)

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় সমাজসেবার ক্ষেত্রে যে সব মনীষীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তাঁদের মধ্যে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের নাম প্রথম ও প্রধান। তাঁর দানশীলতা, উদারতা, পরোপকারিতার বিশালতার জন্য তাঁকে 'বঙ্গের হাতেম তাই' অভিধায় ভূষিত করা হয়ে থাকে।[৫] পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার এক সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী মুসলিম পরিবারে ১৭৩০ সালে মতান্তরে ১৭৩২ সালে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী ফয়জুল্লাহ ছিলেন একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। পূর্বপুরুষরা ছিলেন পারস্য দেশের ব্যবসায়ী। গৃহ শিক্ষকের নিকট তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সেখানে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় প্রতিভা বলে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জনসহ পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্ত করেন। অত:পর তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ ইরান, তুরস্ক, মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। পরিশেষে মক্কায় হজ্জ পালন করে ১৭৮৯ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই নি:সন্তান সৎ বোন মন্নুজান ইন্তিকাল করেন। ফলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী মন্নুজানের বিশাল সম্পত্তি হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের মালিকানার অন্তর্ভূক্ত হয়। তিনি সর্বদা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত থেকে তার বিশাল সম্পত্তির সমুদয় মানব কল্যাণে দান করে যান। ১৮১২ সালে ২৯শে নভেম্বর দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন ইন্তিকাল করেন।

---

১. আবুল আলা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ - ৮১
২. আবুল আলা মওদুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ - ৮১
৩. অনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.
৪. হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৫. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কুরআন মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের অবদান :

১৭৮৯ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন ব্রিটিশ শাসনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করেন। তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত জনগণের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এজন্য বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর সম্পত্তির বিরাট অংশ "ওয়াকফ" করে যান। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে ১৮০৬ সালে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার সম্পত্তি তহবিলে "মুহসীন ট্রাষ্ট" গঠন করেন। অদ্যাবধি 'মুহসীন ট্রাষ্টের বৃত্তি' দান প্রচলিত রয়েছে।[১] তিনি অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরও শিক্ষা লাভের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদান হচ্ছে 'হুগলী কলেজ' এবং 'হুগলী মাদ্রাসা'। বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার অধঃপতিত মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার দান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

চিকিৎসা ও জনসেবার ক্ষেত্রেও হাজী মুহসীনের অবদান অপরিসীম। দরিদ্রদের চিকিৎসার সুবিধার্থে তিনি হুগলীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর অমর কৃতিত্ব ও নির্দশনগুলোর মধ্যে হুগলীর 'ইমাম বাড়ী' অন্যতম। সমাজসেবক হাজী হাজী মুহাম্মদ মুহসীন প্রতি রাত্রে দু'হাজার টাকা সাথে নিয়ে গোপনে গরীবদের অকাতরে বিতরণ করতেন। অনেক দুঃস্থ, অসহায়, গরীব পরিবারের সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজে পালন করতেন।

হাজী মুহসীন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও তাঁর মধ্যে কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামী বা কুসংস্কার ছিল না। তিনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বিপদগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্তকেই মুক্ত হস্তে দান করতেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর বৃত্তির টাকায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২]

খুলনা ও যশোরের লোনা পানি পান করার উপযোগী ছিল না এবং শস্য নষ্ট হত দারুনভাবে। জমিদারীর আয়ের এক অংশ দিয়ে তিনি এ অঞ্চলের প্রজাদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য দীঘি ও পুকুর খনন করেন। লবণাক্ত পানির কবল থেকে ফসল রক্ষার্থে বাঁধ ও বেড়ী নির্মাণ করেন।[৩]

ইসলামের শিক্ষার জন্য তিনি বহু মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকদের বেতন এবং গরীব অসহায় ছাত্রদের কুরআন-হাদীস বিতরণ এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে নিজে করতেন। জনকল্যাণের জন্য উৎসর্গকৃত দানপত্র বা তৈলতনামা আরবী, ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ আকারে হুগলীর ইমাম বাড়ীর রেকর্ড রুমে ইংরেজি-বাংলা অনুবাদসহ সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। মনীষী বিরট তাই বলেছেন, "It is said that he was even won't to disguise himself and wonder through the poorest quartars of the town seeking out the furnished beggar, the starving widow and the helpless orphan relieving their distress".[৪]

ফরায়েজী আন্দোলন ও হাজী শরীয়ত উল্লাহ্

ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীতে ফরায়েজী আন্দোলন নামে এক বিখ্যাত আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরিয়তউল্লাহ্ ও তাঁর ছেলে দুদু মিয়া। তা প্রথমে মুসলমানদের ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠে ও পরে শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনেররূপ পরিগ্রহ করে। "ফরায়েজী" কথাটি ফরজ থেকে এসেছে। ফরজ মানে আল্লাহ্ নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় রীতি-নীতি। আভিধানিকভাবে ফরায়েজী হল ফরজপন্থী বা আল্লাহর আদেশ অনুসরণকারী। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ নির্দেশিত পথ অনুসরণের জন্য ধর্মাবলম্বীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে হাজী শরিয়তউল্লাহ্ এ আন্দোলনের সূচনা করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল-

প্রথম পর্যায়ে :

১. মুসলমান সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক অনাচার ও কুপ্রথা দূর করা এবং ধর্মমতে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কাজ ছাড়া অন্যান্য শরিয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ হতে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করা।

২. কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদেরকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনা।[৫]

---

১. 'মুহসিন ট্রাষ্ট' নয় (৯) শেয়ারে বিভক্ত ও আয়-ব্যয়ের খাত নির্ধারিত। তন্মধ্যে তিন (৩) শেয়ার ধর্মীয় কার্যক্রম ও ইমাম বাড়ী পরিচর্যার জন্য; ৪ (চার) শেয়ার দাতব্য কাজে এবং অবশিষ্ট দুই (২) শেয়ার মুতাওয়াল্লীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করার জন্য। (F. B. Birt Bradley, Eminent Bengalees in the Ninetinth Century, New Delhi, Inter India Publication, 1985, P. 51)

২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৩. ডঃ মুহম্মদ মজীবুর রহমান, 'দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন', দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই জুন, ১৯৮৯

৪. Birt Bradley, op.cit, P. 46.

৫. হুমায়ুন আব্দুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী পর্যায়ে :

১. সামাজিক শোষণ বঞ্চনার হাত হতে অবহেলিত মানুষকে রক্ষা করা ও অত্যাচার-উৎপীড়ন বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করা।

২. ব্রিটিশ সরকারের শাসন হতে মুক্ত হওয়া ও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।[১]

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরিয়তউল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে এক তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২] মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি মক্কা গমন করেন এবং সেখানে ২০ বছর আরবী ভাষা ও ধর্মতত্ত্বে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করে ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে আসেন।[৩] দেশে এসেই মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে সৃষ্ট অনাচার ও শোষনমূলক নিপীড়ন দেখে তা সংস্কার করতে মনোনিবেশ করেন।

রাজা রামমোহন রায় যখন কলকাতায় হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনে রত, ঠিক সেই সময়ে হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমান সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। শরীয়তউল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়া, কুসংস্কার দূর করা। তাঁর সংস্কার আন্দোলনে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত 'ফরজ' কর্তব্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয় বলেই ইহা 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে অভিহিত হতে থাকে এবং পরবর্তীকালে এ নামেই এই আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করে। পীর বাদশা মিয়া ও হাজী সাহেবের পরবর্তী বংশধরগণের মতে তিনি ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু করেন।[৪]

ফারায়েজী শব্দটি 'ফরজ' বা আল্লাহর আদেশ অনুসরণকারী শব্দ হতে উদ্ভুত। যারা ফরজ পালন করেন তাঁরাই ফরায়েজী। তবে হাজী শরীয়তউল্লাহ যে ফরজের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ফরজের অনুসরীদেরকেই শুধু বলা হয় ফরায়েজী।[৫] ফরায়েজীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত প্রজা এবং বাংলার শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে বেকার শ্রমিক দল।[৬]

ধর্মান্তরকরণের পূর্বে এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ছিলেন হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিংবা প্রকৃতি উপাসক। মুসলিম শাসনের প্রভাব, পীর-দরবেশদের প্রভাব, চরম বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে স্থানীয় অধিবাসীরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের ফলে মুসলমান হলেও জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তারা পূর্ব ধর্মজাত অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে।

মক্কায় ওহাবী সংস্কারের পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান ও শিক্ষা লাভ করে শরীয়তউল্লাহ উপলব্ধি করলেন প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হতে বাঙালী মুসলমানগণ অনেক দূরে সরে গেছেন। তাই দেশে ফিরেই তিনি মুসলমান সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে কৃতসংকল্প হলেন এবং সর্বপ্রথম ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী এলাকায় তাঁর মতবাদ প্রকার করতে থাকেন।[৭] কৃষকদের মাঝে তাঁর প্রচারণা অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে আনে এবং আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এতে জমিদার ও ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর টনক নড়ে। তারা সরকারের সহায়তায় শরীয়তুল্লাহকে ঢাকা জেলা হতে বের করে দেয়।[৮] তিনি প্রথম চাষী এবং কারিগর শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। মোঘল ও কোম্পানির আমলে এরাই সর্বপ্রকার শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন। তাদের প্রতি কোন শাসকগোষ্ঠীর সহানুভূতি ছিল না, বরং তাদেরকে শোষণ করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।[৯] এরপর তিনি নিজ গ্রাম শামাইলে সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে বাংলার মানুষদের বুঝিয়ে দিতেন যে, বড় লোকেরা দরিদ্রদের যে রক্ত শুষে নেয়, তা ইসলাম বিরোধী কাজ। তাঁর সামনে ছিল মহানবীর (স.) আদর্শ ও শিক্ষা। এ ধর্মে মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করা হয় না। বিধর্মীকে ভালবাসা ও মানব সেবা এ ধর্মের অঙ্গ। ন্যায়বিচারের জন্য আবশ্যক হলে জিহাদ করতে হবে। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান প্রকৃত জিহাদ।[১০]

---

১. A. R. Mallick, British Policy and The Bengal, Asiatic Society of Bengal, Dacca, 1961, P. 74
২. ডঃ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৮৪
৩. Mainuddin Ahmed Khan, On Inscription of Haji Shariatullah, JASP-vo. iii, 1958, P. 195
৪. জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, তোমাদের স্মরণ করি, পূর্ব পাকিস্তান, পৃ. ২০
৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ৪৮০
৬. আর. সি. মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫৮
৭. ডঃ মোঃ আবদুল হক তালুকদার, সমাজকর্ম, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৪৪
৮. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৯৫
৯. আব্দুস সাত্তার (সম্পা.) মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ, ৮ম খন্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৭
১০. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মুসলমান কর্তৃক অনৈসলামিক কার্যাবলীকে মহাপাপ বলে ঘোষণা দেন। এসব পাপকে তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেন- (১) বিদআত ও (২) শিরক। শিরক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন- কবর পূজা, পীর পূজা, সিজদা দেয়া প্রভৃতিকে। আর বিদআত বলতে-পঞ্চপীর, পীর বদর, খাজা খিজিরের দোহাই দেয়া, গাজী-কালুর প্রশস্তি গাওয়া, ভেলা ভাসানো, জারী গান গাওয়া, জন্মের সময় ছুটি পালন করা, মুহাররমে শোক পালন করা ইত্যাদি বুঝিয়েছেন।

মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় চেতনা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, "ইংরেজদের শাসনাধীন থেকে এ দেশ দারুল হরব্ বা বিধর্মী শাসিতের দেশে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানে ইসলামের বিধানের প্রতিপালন অসম্ভব। সুতরাং এই প্রতিকূল পরিবেশে এদেশে 'জুমুআ' ও 'ঈদের' নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাঁর এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি মুসলিম সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যতদিন ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন মুসলমানদের স্বাভাবিক ধর্ম-কর্ম পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মের খাতিরেই তাদেরকে দেশে পুনরায় দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। হাজী শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর সংস্কার আন্দোলনে কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত 'ফরজ' বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফরজ নির্দেশিত কর্তব্যগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন -

১. "হক্কুল্লাহ" অর্থাৎ ঈমান, রোজা, নামাজ, হজ্ব, যাকাত ও ধর্মীয় বিধান বা শরিয়তী আইনসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ ও পালনা করা।
২. "হক্কুল ইবাদ" বা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, মানুষের প্রতি মানুষের কল্যাণ সাধন করাকে বোঝায়। সেখানে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, অধিকার হরণ প্রভৃতি অপকর্মের স্থান নেই। বরং রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক 'খিদমতে খালক' বা মানব কল্যাণ তথা সমাজ সেবা।

তিনি পীর দরবেশদের মাজারে মানত করা ও শিরনী দেয়া, মুহাররমে তাজিয়া বের করা, হিন্দুদের পূজা-পার্বনের গান-বাজনায় শরীক হওয়া, বিয়ে-সাদীর অনুষ্ঠানাদিতে অহেতুক অর্থের অপচয় করা প্রভৃতি কার্যকলাপ ইসলাম বিরোধী বলে অভিহিত করেন এবং মুসলমানদের এ সকল কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। ফরায়েজীরা গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন এবং কুরআন অননুমোদিত সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করেন। চান্দ্র মাসের দশ তারিখকে তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করতেন। কারণ এই দিনেই বাবা আদম ও মা হাওয়া পৃথিবীতে আগমন করেন এবং একই দিনে আরশ (নবম আসমান) এবং কুরসী (অষ্টম আসমান) ও বেহেশতের সৃষ্টি হয়। সেজন্য ঐদিন এবং তার পরবর্তী দিন তারা রোজা রাখতেন। রাত্রিতে নামাজ পড়তেন এবং নবী করিম (স.) কর্তৃক নির্দেশিত দরিদ্র ভোজন, বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে বৈরীভাব অবসানের চেষ্টা করতেন।[১]

নবজাতকের জীবনের প্রথম চৌদ্দ দিনের মধ্যে উদযাপিত পট্টি, ছুট্টি এবং ছিল্লা প্রথা ফরায়েজীরা বাতিল করেন। তবে অধিকাংশ সময় পুরুষ সন্তানের জন্য দু'টি ও কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল উৎসর্গ করার নিয়মকে তাঁরা অনুমোদন করেন। শিশু সন্তানের মাথা কামানোর উৎসবটি এই সময় অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবা-মার আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী ক্ষৌরীকৃত চুলের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ বা রৌপ্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিয়ের উৎসব হতে তাঁরা অর্থহীন লৌকিক প্রথাসমূহের উচ্ছেদ সাধন করেন। নৃত্যগীত প্রভৃতি বাদ দিয়ে কেবল বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের জন্য 'এলেমা খানার' (ওয়ালিমা) জন্য অর্থ ব্যয় অনুমোদন করা হয়।[২] ফরায়েজীদের কবর মাটির সমান রাখা হত এবং তার উপর ইট বা পাথর নির্মিত কোন ইমারত বা সৌধ তোলা যেত না। তিনি ঘোষণা করেন, এক আল্লাহ্ ছাড়া মুসলমান আর কাউকে ভয় করে না, আল্লাহর নির্দেশিত ফরজ কর্তব্য পালনেই তাদের বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। তিনি প্রচলিত পীর-মুরীদ প্রথারও সংস্কার সাধন করেন। পীরদের মর্যাদা ওস্তাদ বা শিক্ষকের এবং মুরিদের মর্যাদা সাগরেদ বা ছাত্রের মত হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন, মুরিদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ, শাহী বালাখানা নির্মাণ, পীর হয়ে শাহানশাহী কায়দায় চলাফেলা করা ধর্মবিরোধী কাজ। এ ধরনের মানুষ ধর্মের মুখোশ পরে পীরপূজা ও গোরপূজায় সাহায্য করে। এদেরই একদল ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মকে পিছিয়ে দিয়েছেন।[৩]

---

১. আব্দুস সাত্তার (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
২. আব্দুস সাত্তার (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৩. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ বাংলার পল্লীতে ঘুরে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমানদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম জাতিকে ধর্মনিষ্ঠ করে নৈতিক বলে বলীয়ান করা, সুশিক্ষিত ও সুসংহত পুনর্জাগরণে অণুপ্রাণিত করা, অত্যাচারী জমিদার ও দালালদের অত্যাচার থেকে জাতিকে রক্ষা করা। এ আন্দোলনের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আন্দোলনের জোয়ার আসে। অতি অল্প সময়েই ফরায়েজীরা একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। সমকালীন সময়ের সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার মোকাবিলা সম্পর্কে জেমস টেলর বলেন, "They (the Faraejees) profess to adhere to the strict letter of Koran and reject all ceremonies that are not sanctioned by it .... The commemoration of the martyrdom of Hasan and Hossain .... is not only forbidden but even witnessing the ceremonies connected with it, is avoided by them. They reject rites Puttee, Chuttee and Chilla, which were perfomed between the first and forteenth day after the birth of a child and observe the rite of 'Aquiqa' .... In the same way they have divested the marriage ceremony of its formalities .... The funeral obserquies are concluded with a corresponding degree of simple city. Offering of fruits, flowers at the grave and the various fatiha ceremonies being prohibited, their graves are not raised above the surface of the ground; not marked by and building or brick of stone."[১]

ফরায়েজী মতবাদ প্রচারের সাথে সাথে তিনি কৃষকদের মধ্যে জমিদার ও নীলকর বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর মতে, জমিদার-নীলকরগোষ্ঠীর কোন অধিকার নেই কৃষকের শ্রমে অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার। সব মানুষ আল্লাহর চোখে সমান তাই এখানে কারও অধিকার নেই মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করার। প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতির উপর আঘাত হানার প্রতিবাদে বহু মুসলমান তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে।[২] পক্ষান্তরে তাঁর মতবাদ নির্যাতিত মুসলমান কৃষককে অত্যাচারী হিন্দু-জমিদারদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিতে পারে এই ভয়ে হিন্দু জমিদারগণও তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও কায়েমী স্বর্থবাদী মহাজনদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, "কৃষকদের দৃঢ় ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ দেখে জমিদার-নীলকরগোষ্ঠী অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। শ্রেণী স্বার্থের প্রতি এ ছিল বজ্রাঘাততুল্য। তাই তারা সুকৌলে হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। এমনকি শরীয়তউল্লাহ্ এবং তাঁর সাগরেদদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এ সংস্কার আন্দোলন বিভিন্ন বিদয়াতী কাজে লিপ্ত বহু বাউল ফকিরের স্বার্থহানি ঘটিয়েছিল বলে তারাও বিরুদ্ধবাদীদের দলে যোগ দেয়। কিছু কিছু স্বধর্মী যেমন মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী হাজী শরীয়ত উল্লাহর আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু বিধর্মী বা স্বধর্মী কর্তৃক উথাপিত সকল বাধা-বিপত্তি সত্বেও শরীয়তউল্লাহর সংস্কার আন্দোলন অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ছিলেন দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের উস্তাদ, বন্ধু ও বিপদ-আপদের সহায়। লোকে তাঁকে বিপদে পরামর্শদাতা, দুঃখ-দুর্দশায় সান্ত্বনাদানকারী পিতার মত সম্মান করত। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক ডক্টর জেমস্ ওয়াইজ হাজী শরীয়তউল্লাহর সংস্কারবাদী আন্দোলন ও জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে তাঁর Mohammadans of Eastern Bengal গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। "That he .... should have been the first preacher to denounce the superstitions and corruptions, which along contact with Hindu politician had developed, is sufficiently remarkable; but that the apathetic and careless Bengali peasants should have been roused to enthusiasm is still more extraordinary. To effect this required a sincere and sympathetic preacher, and no one ever appealed more strongly to the sympathies of a people than Shariatullah."[৩]

প্রাথমিকভাবে ফরায়েজী আন্দোলন ধর্ম সংস্কারমূলক হলেও এটি অন্য ধর্মের বিরোধিতা করেনি। পরবর্তীতে এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম একে অনেকটা সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দেয়। ফারায়েজী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রায়তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং জমিদাররা ছিল হিন্দু। ফলে শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশেষে সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপ নেয়। এছাড়া জমিদার বনাম রায়তদের এ দ্বন্দ্বে ইংরেজ সরকার জমিদার পক্ষকে সমর্থন দেয়। ফলে মুসলমান রায়তেরা এ আঁতাতকে হিন্দু-ইংরেজ মিতালী হিসেবে গণ্য করে। আর তাই যা শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে বিবেচিত, তাই ঘটনাচক্রে হয়ে পড়ে ধর্মীয় প্রতিরোধ আন্দোলন।[৪]

---

১. James Taylor, A Sketch of the Topography and Statistics of Dhaka, Calcatta, 1840, P. 148,
উদ্ধৃতঃ হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২৪১
৩. James Wiase, Mohammadans of Eastern Bengal, as qouted – Dr. Md. Abdul Haq Talukder, op.cit, P. 147
৪. Ibid, P. 147.

মুহাম্মদ মহসীন উদ্দীন দুদুমিয়া (১৮১৯-১৮৬০)

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে সীমাবদ্ধ রইল না; তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদুমিয়ার মত একজন শক্তিশালী পুরুষের নেতৃত্বে তা ব্যাপক আকারে কৃষকমুক্তি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। দুদুমিয়ার অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, সাহসী মনোভাব ও আপোষহীন সংগ্রামই ফরায়েজী আন্দোলনকে এরূপ চরম শিখরে উন্নীত করে এবং এ আন্দোলনকে সমস্ত পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে দেয়।

মুহাম্মদ মহসীন উদ্দিন ওরফে দুদুমিয়া ১৮১৯ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলার মুলফতগঞ্জ থানার বাহাদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর পর্যন্ত দুদুমিয়াক পিতার কাছ থেকে ফার্সী ও আরবী শিখেছেন। তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্কায় যান। দুদুমিয়া মক্কা যাওয়ার পথে কোলকাতায় ছিলেন কয়েকদিন এবং সে সময় তিতুমীরের সাথে দেখা করার জন্য কোলকাতা থেকে তিতুমীরের গ্রামের বাড়ী যান। তিতুমীর আদর করে কিশোর দুদুমিয়াকে উপহার দিয়েছিলেন এক ছড়া তসবী। এ উপহারটুকু নাকি দুদুমিয়া কখনও হাতছাড়া করেননি।[১] তারপর পাঁচ বছর মক্কায় অবস্থান করে দুদুমিয়া পুনরায় নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

১৮৪০ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহর ইন্তিকালের পর দুদুমিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন। 'ওস্তাদ নির্বাচিত হওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। মন দিলেন সংগঠনের দিকে। ঠিক করলেন জমিদারের শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে কৃষকদের। এ সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুদুমিয়া শুধু সংগ্রাম করে গেছেন।[২]

কৃষক আন্দোলনে দুদুমিয়ার অবদান :

দুদুমিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে সংগঠনের ক্ষেত্রে। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দান করেন। কৃষকদেরকে একটি একক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার এ নীতিবোধ ও কর্মপন্থা বাংলার মুসলমান কৃষককূলকে সহজেই আকৃষ্ট করল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে বাধ্য করল। অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত দরিদ্র প্রজাকূল এ আন্দোলনের মধ্যে এসে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সুযোগ পেল। ফলে সংস্কার ধর্মী ফরায়েজী আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার নীলকরদের সকল প্রকার কর দান করতে নিষেধ করেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে জমিদারী জমি ছেড়ে সরকারী খাস জমিতে চলে যাওয়ারও নির্দেশ দেন।[৩] প্রকাশ রায় বলেন, "দুদুমিয়া সহসাই কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি ঘুরে ফিরে সকলকে বললেন যে সকল মানুষই সমান এবং আল্লাহর সৃষ্টি সম্পদের উপর কর ধার্য করার অধিকার কারও নেই। কৃষক-শ্রমিক মানুষ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে খুঁজে পেলো শত প্রকারের কর আদায়কারী জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জমিদার, নীলকর-মহাজন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ইংরেজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার অসীম ও অনমনীয় শক্তি। এই সাহস ও শক্তির বলেই তারা দুদুমিয়ার নেতৃত্বে জমিদার গোষ্ঠী আর ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলতে আরম্ভ করলো।"[৪] দুদুমিয়া ফরায়েজীদের নিয়ে খলিফা নিযুক্তিদানের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ও সুশৃঙ্খলভাবে কৃষকমুক্তি আন্দোলন হিসেবে ফরায়েজী আন্দোন পরিচালনা করেন।

দুদুমিয়া সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ফরায়েজী আন্দোলনের ছত্রছায়ায় হিন্দু-মুসলিম, কৃষক-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা দেখে সকল জমিদার ও সকল নীলকর দুদুমিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা কৃষকদের ফরায়েজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল নির্যাতন ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়। ফরায়েজী ও কৃষক জাগরণ দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। দুদুমিয়ার নির্দেশে ফরায়েজী শক্তির হাতে জমিদার ও নীলকর শক্তি মার খেতে শুরু করে। এমন অবস্থায় ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যে কৃষক অভ্যুত্থান দমনের সংকল্প ঘোষণা করে এবং বহুসংখ্যক পুলিশ ও জমিদার নীলকরদের লাঠিয়াল নিয়ে কৃষক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরাকর কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর না করতে পেরে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করে।[৫] তারপরও অজস্র রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটিয়ে যখন কৃষকদেরকে দমন করা গেল না তখন সরকার দুদুমিয়াকে মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে।[৬] কিন্তু দুদুমিয়ার এরূপ গ্রেফতারের পরও সংগ্রাম চলতে থাকে।

---

১. মুনতাসির মামুন, তীতুমীর ও দুদুমিয়া, শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, ১৩৮৭ বাংলা
২. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত।
৩. হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
৪. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৫. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫
৬. A. R. Mullick, "British Policy and the Muslim Bengal," Dhaka, 1961, P. 74

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক মুক্তি সংগ্রামে দুদুমিয়া কানাইপুরের শিকদার ও ফরিদপুরের ঘোষ-এ দু'টি জমিদারের অত্যাচার-উৎপীড়ন বন্ধ করেন। তিনি নীলকর অত্যাচার থেকেও কৃষক প্রজাকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। দুদুমিয়া সাহসী হাতে তাঁর প্রধান শত্রু নীলকর ডানলপকে কঠোরভাবে দমন করতে সক্ষম হন।[১]

দুদুমিয়া কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য শুধু সংগ্রাম, প্রতিকার ও প্রতিরোধেই স্বীয় কর্মকান্ড সীমিত রাখেননি। বরং শোষণমুক্ত ও নিরাপদ একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলারও আয়োজন করেছিলেন। তিনি সমস্ত পূর্ববাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রত্যেক অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একজন খলিফা নিযুক্ত করেন। খলিফাদের কাজ ছিল দলীয় লোককে সুসংঘবদ্ধ করা এবং সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। তিনি ফরায়েজীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মত এক ধরনের সভা চালু করেন। গ্রামে সবচেয়ে বয়স্ক ফরায়েজীর অধীনে একটি আদালত বসত। এ আদালত সব ধরনের বিরোধের বিচার করতো এবং এর রায় ফরিয়াদী-আসামী দু'পক্ষেই মেনে নিতে হতো। তাঁর এরূপ বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠে।[২] জমিদারের 'পূজাকর' প্রভৃতি অন্যায় কর আদায়ের কবল হতে রক্ষা পাবার জন্য কোন কৃষক দুদুমিয়ার সাহায্য প্রার্থী হলে দুদু তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতেন, তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে মামলার অর্থ সংগ্রহ করে দিতেন, প্রয়োজন হলে জমিদারের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল দলও পাঠাতেন।[৩]

সমাজকল্যাণ কর্মী হিসেবে তাঁর অবদান :

দুদুমিয়া দরিদ্র কৃষক মুক্তি আন্দোলনের এক সংগ্রামী মহানায়ক। এ দিকটি ছাড়াও সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর বিপদাপদে সাহায্য দানে তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। 'মুসলমান কৃষক, কারিগর, প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতি দুদুমিয়ার গভীর দরদ এবং সকল প্রকার শোষণ হতে তাদের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য অল্পকালের মধ্যেই দুদুমিয়া পিতার মতই দরিদ্রের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতার আসন লাভ করেন।[৪] তিনি ভূমিহীন দরিদ্র প্রজার সমর্থন পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের সবাইকে সমান ভাবতেন এবং প্রচার করতেন যে তাঁর কাছে নিম্নবিত্তের আয়-উন্নতি এবং উচ্চবিত্তের আয় উন্নতি একই সমান। তিনি প্রতিবেশীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব কামনা করতেন এবং দু:খে পতিত হলে অন্যজনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করতেন। এরূপ উদ্দেশ্য থাকলে তাতে কোন অন্যায় বা দোষ হতে পারে না। দুদুমিয়ার এই ঘোষণা সবাইকে একত্রিত হতে সক্ষম করল এবং তাঁর অনুসারীরা ন্যায় ও নীতিগতভাবে তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করতে এগিয়ে এল।[৫]

বাহাদুরপুর গ্রামে তাঁর কেন্দ্রীয় কর্মস্থলে সব মুসলমান আগন্তকদেরকে খাওয়া-পরার জন্য ব্যবস্থা থাকত, সমস্ত বাংলায় তাঁর গুপ্তচর নিয়োজিত থাকত এবং তারা স্বীয় দলভূক্ত পরিবারের যত্ন দিত।[৬] দুদুমিয়া তাঁর উদার চরিত্র দ্বারা হাজার হাজার জনতার মন জয় করতে সক্ষম হন এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য-সম্পত্তি সব কিছুই তাদের কল্যাণে নিয়োগ করেন। এ বিষয়টির বর্ণনায় ফরিদপুরে জেলা গেজিটিয়ারেও বলা হয়, "তিনি ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু সকল সম্পত্তিই তাঁর নিজের ও অন্যান্যদের মোকদ্দমা পরিচালনায় এবং সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হওয়ায় তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়ে।[৭] তিনি ১৮৬০ সালে ৪১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আলীগড় আন্দোলন ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮)

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক বিখ্যাত আলীগড় আন্দোলনের জনক এবং মুসলিম তথা জাতীয় পুনর্জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত হচ্ছেন সৈয়দ আহমদ খান। ইংরেজ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বদেশবাসীর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা, হতাশা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোড়ামী ও অত্যাচারের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধারকল্পে তিনি ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং আমরণ তাদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্রতী হন।

---

১. হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত।
২. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত।
৩. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
৪. সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
৫. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত
৭. উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

১৮১৭ সালের ১৭ অক্টোবর দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সৈয়দ আহমদ খান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর মুহম্মদ মুত্তাকী খান সম্রাট ২য় আকবর এর বন্ধু ও দরবারে উজির ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন আরব থেকে আগত এবং আওলাদে রাসূল রাসূল (স.)-এর বংশধর)।[১] শৈশবে পিতৃহারা আহমদ মাতামহ খাজা ফরিদ আহমদের অধীনে প্রতিপালিত হন। একজন মৌলভীর অধীনে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। তাছাড়া, মাতা আজিজুন্নেছা অত্যন্ত যত্নসহকারে ছেলের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। সৈয়দ আহমদ আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, উর্দু এবং কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ও কালাম শাস্ত্র (Theology), আইন প্রভৃতিতে গভীর জ্ঞানার্জন করেন।[২]

১৮৩৮ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দিল্লীর ফৌজদারি বিভাগে মুহাফিজ খানায় সেরেস্তাদার (Record-keeper) হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের ফলে তিনি আগ্রায় নায়েব বাহাদুরের কমিশনার হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৮৪১ সালে তিনি ফতেহপুর সিক্রিতে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব চলাকালে তিনি বিজানোরে সদর-আমিন (সাব জজ) পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি সরকারের প্রতি অনুগত থাকেন এবং বহু ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করেন। সরকার তাঁকে এ আনুগত্যের পুরস্কার প্রদান করেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিস্বার্থে কোন সুযোগ-সুবিধা কাজে না লাগিয়ে জাতির কল্যাণে ব্যয় করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেন এবং ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেন। তাছাড়া তিনি কয়েকটি সরকারী কমিশনেও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে তিনি ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'স্যার' ও 'কে-সি-এস-আই' উপাধিতে ভূষিত হন।"[৩] ১৮৯৮ সালের ২৭মার্চ এ মহৎপ্রাণ, কর্মবীর ও মুসলমানদের অকৃত্রিম বন্ধু ইন্তিকাল করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান : সৈয়দ আহমদ ছিলেন একজন মহান সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। সমাজকল্যাণে তাঁর অবদান ব্যাপক ও অপরিসীম।

আলীগড় আন্দোলন ও সমাজসংস্কার :

পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে মুসলিম জাগরণের মহানায়ক স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক পরিচালিত সমাজসংস্কার আন্দোলনই আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইংরেজদের রোষানল থেকে রক্ষা, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বর্জন, মুসলমানদের হতাশা, বঞ্চনা ও নির্যাতন, হিন্দুদের উন্নতি এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ও গোঁড়ামির প্রেক্ষাপটে সৈয়দ আহমদ সমঝোতামূলক উপায়ে আলীগড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।[৪]

আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্যসমূহ :

১. অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী দূরীকরণ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং মুসলমানদের হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।
২. ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং সরকারের আস্থা অর্জন।
৩. মুসলমানদের ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিতি হয়ে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনয়ন।
৪. ব্রিটিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
৫. হিন্দু সম্প্রদায়ের কংগ্রেসের ন্যায় মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলা হয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন :

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলমানরাও ইংরেজদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। প্রথম দিকে ইংরেজ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া হিন্দু-তোষণ নীতি গ্রহণ করেন এবং মুসলমানগণকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিতে যত্নবান হন। হিন্দুগণ ইংরেজ সরকারকে স্বাগত জানাইয়া, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং প্রশাসনের উচ্চপদগুলি দখল করে।[৫] ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর মুসলমানদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সৈয়দ আহমদ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এগিয়ে আসেন যা উভয়ের জন্য খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল।

---

১. ড. মোঃ আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
২. মোঃ নূরুল ইসলাম, সমাজকর্ম: ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪২০
৩. আব্দুস সামাদ, আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুঁথিঘর লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৭
৪. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।
৫. ড. অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা :

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন সম্প্রীতি আনয়ন, সমাজসংস্কার, আন্দোলন পরিচালনা এবং সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রগতি আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'আলবাব-ই-ভাগাওয়াৎ-ই হিন্দ (১৮৫৯) এবং এর ইংরেজি সংস্করণ 'The Causes of Indian Mutiny' (১৮৭৩) ও 'The Loyal Mohammedans of India' গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করেন। আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট (উর্দু ও ইংরেজি), 'তাহজিব-উল-আখলাক' (উর্দু) 'The Mohammedan Social Reformer' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। তিনি বিভিন্ন কুসংস্কার, দাসপ্রথা, পীর-মুরীদ সম্পর্ক ইত্যাদি দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালান। তাঁর এসব প্রগতিশীল বিশ্বাস ও ধারণা 'তাহজিব-উল-আখলাক' (নৈতিক ও শিষ্টাচারের উন্নয়ন) নামক পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।[১] স্যার সৈয়দের গ্রন্থ 'The causes of Indian Mutiny, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের অভিযোগ তদন্তের জন্য ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়। "স্যার সৈয়দ আহমদের অভিযোগ ব্যতীত হান্টার ভারতীয় মুসলমানদের দূর্দশা ও ব্রিটিশ সরকারের উৎপীড়নের কথা তাঁর 'Indian Mussalman's' গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন না।[২]

বিজ্ঞান সমিতি :

সৈয়দ আহমদ ১৮৬৩ সালে গাজীপুরে একটি বিজ্ঞান সমিতি ও কোলকাতায় একটি মুসলিম শিক্ষা সমিতি (Mohammedan Literary Society) স্থাপন করেন। বিজ্ঞান সমিতি পরে আলীগড়ে স্থানান্তরিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা, প্রচার, পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ইংরেজি ও উর্দুতে অনুবাদ করা। এজন্য ১৮৬৪ সালে এক অনুবাদ সমিতি (Translation Society) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে এটি শিক্ষা ও বিজ্ঞান সমিতি (Literary and Scientific Society) নামে অভিহিত হয় এবং মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।[৩] সৈয়দ আহমদ বাইবেলের ভাষা (তাবীন-উল-কালাম), হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত, রিসালা-ই-আহকাম-তা'ম-ই-কিতাব, আইন-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী এবং দিল্লীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি :

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য এ সমিতি গঠন করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে মুসলমানদের জন্য উচ্চতর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার জন্য এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি ও তাঁর পুত্র ইউরোপের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করেন (১৮৬৯-৭০) এবং দেড় বছর বিলেতে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন। দেশে ফিরে উচ্চ শিক্ষার কমিটি (Committee for Advancement of Learning) ও তহবিল গঠন করেন। কমিটি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। সরকার ও তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন (১৮৭২ খ্রী.)। ১৮৭৫ সালে 'আলীগড়ে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল (Mohammedan Anglo Oriental-MAO) কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারিতে লর্ড রিটন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এম. এ. ও. কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা, ইসলামী সংস্কৃতি প্রভৃতি শিক্ষার ও উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এখান থেকেই বিদ্যার্জন করেন। 'ষাট বৎসর পূর্বে কলিকাতার হিন্দু কলেজ হইতে হিন্দু সম্প্রদায় যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল, এ্যাংলো ওরিয়ন্টাল কলেজ হইতে মুসলমান সম্প্রদায় সেই অনুপ্রেরণা লাভ করে।"[৪]

শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গাজীপুরে ইংরেজি স্কুল (১৮৬৪) যা কলেজে রূপান্তরিত হয় ও মাদ্রাসাতুল উলুম এবং ১৮৬৪ সালে স্থাপিত শিক্ষা কমিটি উল্লেখযোগ্য।

---

১. Gover B. L and Grover S.A, New Look at Modern Indian History, S. Chand and Co. Ltd. New Delhi, 1993, P. 376
২. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫৬৩
৩. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, বই বিতান, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৮
৪. ড. অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৩

মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন :

১৮৮৬ সালে শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারে 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' (Educational Conference) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা সভা, বৈঠক ও সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি প্রচারিত হয় এবং মুসলমানদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যুগোপযোগী পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষা বিস্তার, সচেতনতা সৃষ্টি ও ইঙ্গ-মুসলিম সম্পর্কোন্নয়নে এটি অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ১৯০৬ সালে শিক্ষা সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

মুসলিম নবজাগরণ :

সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ, মন-মানসিকতা ও মূল্যবোধে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন এবং প্রগতি অর্জনে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটান। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "যে আলস্য, তন্দ্রা, অজ্ঞতা ও অবনতিতে মিজ্জিত, তা থেকে তোমরা বেরিয়ে এস।"[১]

ঐক্য ও সহযোগিতা :

ভারতে বসবাসরত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সৈয়দ আহমদ ঐক্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি প্রচার করেন (১৮৮৪ খ্রী.) হিন্দু ও মুসলমান একই দেশের অধিবাসী, একই দেশের মাটির উপর সমাধিস্ত ও দাহ করা হয়। শুধু ধর্মের পার্থক্য হিসেবেই 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' কথাটির ব্যবহার প্রচলিত। হিন্দু কিংবা মুসলমান ও এমনকি যে সকল খ্রীষ্টান এই দেশে বসবাস করে তারা সকলেই একই জাতিভূক্ত। এ সকল ধর্মীয়গোষ্ঠী এক জাতি বলে বর্ণনা করা যায় এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। Do you not inhabit the same land? Are you not burned and buried on the same soil? .... Remember that the words Hindus and Mohammedan are only meant for religious destination, otherwise all persons, whether Hindu or Mohammedan, evn the Christians, who reside in this country are all in the particular respect belonging to one and the same nation. Then all these different sects can be described as one nation, they must each and all unite for the good of the country which in common to all.[২]

অন্যান্য সংগঠন :

ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও মুসলমানদের জন্য বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন 'ব্রিটিশ ভারত সমিতি' (British Indian Association) গঠন করনে। এছাড়া তিনি 'এডুকেশনাল কংগ্রেস', ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্রেট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন' ও 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামক সংস্থা স্থাপন করেন। এম. এ. ও. কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক (Theodor Back) এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

ইসলামের ব্যাখ্যা :

আধুনিক জীবনধারা ও বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য বিধানে সৈয়দ আহমদ খাঁন তৎপর হন। তিনি কুরআনকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বিজ্ঞান, প্রকৃতি, মানবতা ও যুক্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মানুষের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, "So long as freedom of thought is not developed there can be no civilised life." তিনি ধর্মান্ধতা ও সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে সতর্ক করে দেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।[৩]

রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি :

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটান। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমদিকে হিন্দুদের সাথে একযোগে কাজ করেন। তিনি 'ইলবার্ট' বিল আন্দোলনে একই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে বক্তৃতা করেন। ইংল্যান্ডের মত তিনি ভারতেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুসলমানদের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রাণিত ও সুসংগঠিত করেন।

---

১. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২. উদ্বৃত : ডঃ অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
৩. ডঃ অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে লক্ষ্যণীয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান সমাজসংস্কার, সামাজিক আন্দোলন, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর সংস্কার আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায়। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন, "তিনি বিভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উৎপীড়িত মুসলিম জাতিকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার দৃঢ় সংকল্প করেন। জাতীয় জীবনে এই সন্ধিক্ষণে সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব না হইলে মুসলিম জাতি কোনদিনই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিত না।"[১]

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

নওয়াব আবদুল লতিফ এবং মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই সোসাইটি সম্পর্কে জানতে হলে একই সঙ্গে নওয়াব আবদুল লতিফ সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সনের মার্চ মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] কলকাতা মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৮৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ সালে আবদুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী ও আরবীর অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৪৯ সনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে তিনি ১৮৫২ সনে প্রথম শ্রেণীর বিচারকের ক্ষমতা লাভ করেন এবং কিছুকাল পর তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য জাস্টিস অব পিস নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ সনে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার প্রথমে তাঁকে 'খাঁন বাহাদুর' এবং পরে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৩ সনে ৬৫ বছর বয়সে কলকাতাস্থ বাসভবনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান :

স্যার সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যা করেছেন নওয়াব আব্দুল লতিফ বাংলার মুসলমানদের জন্য তা করে গেছেন। মুসলমান সমাজের কল্যাণ এবং স্বার্থরক্ষা ছিল আবদুল লতিফের জীবনের অন্যতম ধ্যান-জ্ঞান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ব্যর্থতা, ইংরেজী শিক্ষা বর্জন এবং ইংরেজ সরকারের সাথে অসহযোগ নীতির কারণেই মুসলমান সমাজ অনগ্রসর থেকে যাচ্ছে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা লাভ, যুগোপযোগী চিন্তা ও কুসংস্কার দূর করে মুসলমান সমাজের পুনঃজাগরণের চেষ্টা করেন।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমিতি (Mohammedan Literary Society) প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির কর্মধারা ছিল মূলত দু'ধরনের -

(১) আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে মুলসমান সমাজকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।[৪]

(২) মুসলমানদের উন্নতি বিধানের জন্য সরকারকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেয়া এবং মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমান তরুণদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সোসাইটির মাধ্যমে নিখিল ভারত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল- "ইংরেজী শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা"। এই প্রতিযোগিতা ছাত্রদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই সময় কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-পারসীয়ান বিভাগ খোলা হয়।[৫]

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২
২. Gover B. L and Grover S.A, New Look at Modern Indian History, S. Chand and Co. Ltd. New Delhi, 1993, P. 367.
৩. আব্দুল মওদুদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঢালী, বাংলাদেশ দর্শন, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৪
৫. ডঃ মোঃ আব্দুল হক তালুকদার,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের গোড়া হতেই রাজনীতি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা ও আদর্শের মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়; ফলে এই দুই সম্প্রদায় পৃথক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধি আরও প্রসার লাভ করে। তাই ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে নওয়াব আব্দুল লতিফ কলকাতায় 'মুসলমান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সমাজ' (Mohammedan Literary and Scientific Society) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল- 'সমাজ, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা, বিবৃতি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা।[১] সোসাইটির মাসিক সভা লতিফ সাহেবের কলকাতার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। মাসিক সভা ছাড়াও সমিতির মাধ্যমে সংবর্ধনা সভা, বার্ষিক মেলা, বিশেষ ধর্মসভা ও শিক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা হত।

নওয়াব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে ১৮৭২ সনে সরকারী সাহায্যে মফঃস্বলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এসব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের রক্ষণশীলতা এবং জাতিভেদ প্রথা দূর করে এর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার সরকারী প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানান। তাঁর সক্রিয় সমর্থনেই শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব ১৮৫৩ সনে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আবদুল লতিফের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মুহসীন তহবিলকে পুনর্গঠিত করা। তিনি ১৮৭২ সালে হুগলী কলেজ হতে 'দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন তহবিল'-এর প্রদত্ত অর্থ যাতে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থে ব্যয় হয় সেই ব্যবস্থা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ অল্প সময়ের মধ্যেই মহকুমা হাকীমরূপে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর ফলে নীলকর সাহেবরা নীলচাষীদের প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন ও শোষণ করত আবদুল লতিফের কথায় সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিলেন। সরকার অচিরেই একটি নীল কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশেই বাংলাদেশের অনেক জায়গায় নীল ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্রমশ এদেশ হতে নীল চাষ একেবারে লোপ পায়।[২] ১৮৬৩ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। আবদুল লতিফ এ কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর জনহিতকর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতার তালতলার নিকটস্থ একটি রাস্তার নাম 'আবদুল লতিফ লেন' নামকরণ করা হয়। ১৮৮২ সালে তিনি বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদে থেকে তিনি এলাকার উন্নয়নে যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন তার স্বীকৃতিস্বরূপও তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়।

লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ সেই সভার প্রথম এবং একমাত্র মুসলমান সদস্যরূপে মনোনয়ন লাভ করেন। এরপরও তিনি ১৮৭০ ও ১৮৭২ আরও দু'বার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি সিভিল ও মিলিটারী চাকরির পরীক্ষক বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন এবং একই বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ১৮৬৭ সালে আলীপুরে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ আদালতে প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আবদুল লতিফ কৃতিত্বের সাথে দশ বছর চাকুরী করেন। এরপর তিনি কিছুকাল কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি শিয়ালদহের সুবার্বণ পুলিশ আদালতের বিচারক পদে সাত বছর কাজ করার পর সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে বিশেষ অনুরোধে তিনি ভূপাল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। মাত্র কিছুকাল কাজ করে তিনি ভূয়সী প্রশংসা এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন।

আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সাথে 'খান বাহাদুর' এবং ১৮৮০ সালে 'নওয়াব' খেতাব লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে সি-আই-ই এবং ১৮৮৭ সালে মহারাণীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষে তিনি 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। এ সবই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পুরস্কার।[৩] তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী-শিক্ষক হিসেবে, বিচারক হিসেবে এমন কি সমাজসেবক হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাই প্রসিদ্ধ লেখক হান্টার বলেছেন, 'সংস্কারক হিসেবে তিনি বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুসলমান।' অন্য এক প্রসঙ্গে স্যার রিচার্ড টেম্পল বলেছেন : 'আবদুল লতিফ উদারপন্থী এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন জ্ঞানী মুসলমান।[৪]

---

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, শিক্ষা ও পরিকল্পনা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৯২
২. ডঃ মোঃ আব্দুল হক তালুকদার,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৩. ডঃ মোঃ আব্দুল হক তালুকদার,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।
৪.[illegible] (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৪ সালের এক বিধান বলে সরকার শহর ও মফঃস্বলের সমস্ত কাজীর পদ বিলোপ করেন। ফলে বহু মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে। তাঁদের দূর্দশা লাঘবের জন্য আবদুল লতিফ সচেষ্ট হন এবং একটি আইন পাস হয়। ফলে মুসলমান ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের পদ সৃষ্টি হয় এবং বেকার মুসলমানগণ তাদের চাকুরী ফিরে পান। ১৮৬৫ সালে কলকাতায় প্রথম যে আদমশুমারি হয় 'জাস্টিস অব পীসে'র সদস্য হিসেবে তিনি এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর মতামত বিশেষভাবে গৃহীত হয়। মেরী কার্পেন্টারের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতি' নামে যে জনহিতকর সমিতি গঠিত হয় আব্দুল লতিফ সেই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এমন কোন মহৎ প্রতিষ্ঠান বা কাজ ছিল না, যার সাথে তিনি যুক্ত থাকেন নি। আলীপুরে ১৮৭৬ সালে কিশোর অপরাধীদের জন্য একটি শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শোধনাগারে তাঁর অবদান ছিল অত্যাধিক।[১] নওয়াব আব্দুল লতিফের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তীতে নওয়াব আবদুল জব্বার, নওয়াব শামসুল হুদা, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুল করিম গযনবী প্রমুখ ব্যক্তি মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১৮৭৬ সালে তুরস্কের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য যেমন মন্টেনিগ্রো, বসনিয়া, সার্বিয়া হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে যুদ্ধে আহত তুর্কি সৈন্যদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য যে সমিতি গঠিত হয় নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি আরও যেসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন সেগুলো হল, 'সেন্ট্রাল টেক্সট্ বোর্ড কমিটি', 'ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি', 'এসিয়াটিক সোসাইটি', 'বেথুন সোসাইটি', 'এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স', 'ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রভৃতি।

শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে মুসলমানদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলাদেশে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান অবিস্মরণীয়। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ সনে কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইংরেজী শেখার পথ সুগম হয়ে পড়ে। তাঁর এবং কতিপয় শিক্ষানুরাগীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ। প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনে নওয়াব বাহাদুরের অবদান স্মরণ করে ১৯১৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক সভায় লর্ড কারমাইকেল তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে নওয়াব আব্দুল লতিফের মর্মর মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছিল।

নওয়াব আবদুল লতিফের চিন্তা ছিল জীবন যুদ্ধে মুসলমানগণ যেন হিন্দুদের পেছনে পড়ে না থাকে। তারা যেন আরবী-ফার্সী ধর্মীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর সাথে পরিচিত হয়ে তার ভাল-মন্দ দিক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় এবং প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে। অনেক জীবনীকারের মতে স্যার সৈয়দ আহমদেরও আগে তিনি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফ অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস পরিহার করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আপোষ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য বাঙালী মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দেবার শপথ নিয়ে ১৯২৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এ আন্দোলন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে খ্যাত। ক্ষণস্থায়ী হলেও এ আন্দোলন এদেশে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাধারা বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উপসংহারে এ কথা বলা চলে যে, তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৭ সনে সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও ঐক্য স্থাপনের লক্ষে সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (National Mohammedan Association) প্রতিষ্ঠা এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞান পরিষদ' নওয়াব আবদুল লতিফের 'মুসলমান সাহিত্য সমাজের' সত্যিকারভাবে সবকিছু স্বজাতির কল্যাণে ওয়াকফ করে দেন।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি, প্রথম শ্রেণীর বিচারক, প্রথম শ্রেণীর আইনজীবী, প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, প্রথম শ্রেণীর সমাজ সংস্কারক ও সমাজসেবক, প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক, প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক ও প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক হিসেবে ভারত উপমহাদেশে যদি কোন মনীষীর মুল্যায়ন হয় তবে তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি।

১৮৪৯ সালের ৮ই এপ্রিল হুগলী জেলার চুচুড়ায় আমীর আলী এক সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হুগলী জেলা স্কুল থেকে প্রথম সারির মেধা তালিকায় অবস্থান নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করে আমীর আলী প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি নিয়ে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তারপর ১৮৬৭ সালে বি.এ., ১৮৬৮ সালে এম.এ. এবং ১৮৬৯ সালে বি.এল. পাশ করে ষ্টেট স্কলারশীপ নিয়ে বিলেতে লিংকন্স ইন হতে ১৮৭৩ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। কর্ম জীবনের শুরুতে আমীর আলী আইনি

---

১. ড. মোঃ আব্দুল হক তালুকদার,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

ব্যবসা শুরু করতে না করতেই ১৮৭৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ও ১৮৮৪ সালে 'টেগোর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৭৫-৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলিম আইনের অধ্যাপকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ১৮৬৪ ও ১৮৭৩-৮৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯০-৯৪ সালে আমীর আলী কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী মুসলমান বিচারপতি ছিলেন। পারিবারিক কারণে ১৯০৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করলে সেখানে ১৯০৯ সালে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি ছিলেন এ সম্মানের প্রথম অধিকারী। তাঁর আইন-জ্ঞান ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কেমব্রীজ, কোলকাতা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যথাক্রমে এল. এল. ডি., ডি. এল. ও ডি. লিট ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করে।[১] তার প্রতিভা, সেবা ও যশস্বীতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৮৬৪ সালে 'খানবাহাদুর', ১৮৭৫ সালে 'নওয়াব' ও ১৮৮৭ সালে 'সি.আই.ই' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৮৭৭ সালে তাঁরই উদ্যোগে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং তিনি এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৭৪ সালে আমীর আলী কোলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি হুগলীর ইমাম বাড়ীর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৯ সালে লন্ডলে বসবাসকালে সেখানে মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষা ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান :

মুসলমান সমাজের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমীর আলী সংগ্রাম করেছেন।[২] সেজন্য কখনও সাংগঠনিক তৎপরতা, কখনও তথ্যনির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনী আবার কখনও রাজনীতিতে ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে তাঁর সংগ্রামকে সফল করে তুলতে চেয়েছেন। আর এক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রামের চূড়ান্ত সফলতা তিনি দেখে না গেলেও সংগ্রামী চেতনার যে বীজ বপন করেছেন তা সমস্ত বিশ্বব্যাপীই মুসলমান সমাজকে যুগ যুগ ধরে আন্দোলিত করে চলেছে।

সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করে ১৮৭৮ সালে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমীর আলী নিজেই বলেছেন, "আইনগতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে এ সমিতি গঠিত হয়েছে। তা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে চলবে। তা মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য হতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচলন করতে চেষ্টা করবে। তা ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক জীবন সুসংহত করে তাদের পুনর্জাগরণের পথ সুগম করবে। তা ভারতের বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।"[৩] ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এ সমিতির প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ সমিতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি আদায় করা হয়। সমিতি নিজেও ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে তাকে কলেজ মানে নিয়ে আসার কৃতিত্ব এ সমিতির। সমিতি নারী শিক্ষার অচলাবস্থা দূরীকরণেও চিন্তা-ভাবনা করেছিল। তাছাড়া সমিতি শহরের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা দানের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ, বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন, ১৮৭৭ সালের ১০ ধারা আইনের সংশোধন ইত্যাদি ব্যাপারেও সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম স্বার্থ রক্ষা ও মুসলিম জাগরণের সুযোগ তৈরীর জন্য সমিতি সরকারের সাথে বৈরীভাব প্রদর্শন না করে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলার কৌশল গ্রহণ করে। ১৮৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সমিতির উদ্যোগে বড়লাট রিপনকে সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে ২৮ পরিচ্ছদ দীর্ঘ এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকপত্র ছিল সৈয়দ আমীর আলীর অনুধ্যানের ফল। ঐ স্মারকপত্রে তিনি "মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষার পশ্চাৎবর্দিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাস ভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এগুলোর অবসান কামনা করেছেন।"[৪] সৈয়দ আমীর আলীর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর এ স্মারকলিপির অনুলিপি সকল প্রাদেশিক সরকার, শিক্ষা বিভাগ, সভা সমিতি ও হান্টার কমিশনের কাছে পাঠানো হয় এবং শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

---

১. ড. আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানের ইতিহাস, পৃ. ১৫৬
২. ড. [illegible], প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৩. ড. আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানের ইতিহাস, পৃ. ১৬০
৪. ড. [illegible], প্রাগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করার জন্যই মুখ্যত সৈয়দ আমীর আলী 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। সেজন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর শক্তিশালী শাখা গড়ে তোলা হয়। এসব শাখাসমূহ অঞ্চল ভিত্তিতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। কারও কারও মতে ভারতের মুসলিম লীগ সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনেরই পরিণত ও বিকশিত রূপ।[১]

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন উৎসর্গীত সমাজসেবক। কর্ম জীবনের শুরু থেকেই তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিচারক হিসেবে কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি সমাজসেবা অব্যাহত রাখেন।[২] সৈয়দ আমীর আলী একনিষ্ঠ সমাজসেবক, কিন্তু তাই বলে অমুসলমানদের প্রতি আদৌ অসহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রস্তাবও ছিল এই যে, "ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"[৩]

সৈয়দ আমীর আলী শুধু একজন চিন্তাশীল দার্শনিক ও সংস্কারকই ছিলেন না; "তিনি একজন অসাধারণ পন্ডিত ও সার্থক লেখকও ছিলেন।"[৪] তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল দি ক্রিটিক্যাল ইক্জামিনেশন অব লাইফ অব মহম্মদ (১৮৭৩), পার্সোনেল ল অব মহম্মদ (১৮৮০), মোহামেডান ল, (১৮৮৪) দি স্পিরিট অব ইসলাম (১৮৯১) লিগ্যাল ষ্টেটাস অব উইম্যান ইন ইসলাম (১৮৯১), এ সর্ট হিস্ট্রি অব সেরেসন্স (১৮৯৮), ক্রিশিয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্টেন্ড পয়েন্ট (১৯০৬), ইসলাম (১৯০৬)। তাছাড়াও তৎকালীন সময়ে কোলকাতা ও লন্ডনের নামকরা পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সকল লেখাতেই ইসলামের আদর্শ বর্ণিত হয়েছে এবং আদর্শ সমাজ ও জীবন লাভের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তিনি ১৯২৮ সালের ৯ই আগষ্ট ইন্তিকাল করেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা (১৮৩৪/১৮৪০-১৯০৩)

অবিভক্ত বাংলায় রক্ষনশীল মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সব সমাজ দরদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেছা অন্যতম। ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ব্যক্তিত্ব, উদারতা, দানশীলতা ও সমাজসেবামূলক কার্যাবলীতে মুগ্ধ হয়ে 'নওয়াব' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন।[৫] নওয়াব ফয়জুন্নেছা ১৮৩৪ সালে মতান্তরে ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে কুমিল্লা জেলার (তৎকালীন ত্রিপুরা) লাকসামের অন্তর্গত পশ্চিম গাঁওয়ের এক মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহমদ আলী চৌধুরী পশ্চিম গাঁওয়ের জমিদার ছিলেন। পারিবাারিক পরিবেশেই তিনি আরবী, ফার্সী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন।[৬] লাকসামের জমিদার মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর ফয়জুন্নেছা তার জমিদারী ও ১৮৭০ সালে মাতৃবিয়োগের পর মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁর জমিদারী হতে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা। এ বিশাল সম্পত্তির সম্পূর্ণটাই তিনি জনকল্যাণে ওয়াক্ফ করে দেন। ১৯০৩ সালে নওয়াব ফয়জুন্নেছা ইন্তিকাল করেন।

সমাজকল্যাণে নওয়াব ফয়জুন্নেছার অবদান :

নওয়াব ফয়জুন্নেছার সমাজসেবামূলক কার্যাবলীকে দু'টি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন করা যায়। প্রথমত, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত, সমাজসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফয়জুন্নেছার অবদান :

শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে নওয়াব ফয়জুন্নেছার অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় কুমিল্লা শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পশ্চিম গাঁওয়ে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটি নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি 'নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারী ডিগ্রী কলেজ' হিসেবে পরিচিত। এছাড়া পশ্চিম গাঁওয়ে এম. ই. স্কুল এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় ফয়জুন্নেছার আর্থিক সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অসহায় ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য তিনি তাঁর জমিদারী আয় থেকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। নারী শিক্ষাক্ষেত্রে ফয়জুন্নেছার অবদানকে বেগম রোকেয়ার অবদানের পরই স্থান দেয়া হয়ে থাকে।[৭]

---

১. ড. আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪
২. ড. আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭
৩. ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৪. ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৫. আব্দুস সত্তার (সম্পা.), ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-১৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪১-৪২
৬. মোঃ মতিয়ুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (সম্পা.), ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ঃ রূপজালাল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪-১৬

সমাজসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলী :

সমাজসেবা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে নওয়াব ফয়জুন্নেছার অবদান তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। সমাজসেবা, দানশীলতা এবং উদারতার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নওয়াব' উপাধি লাভ করেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের জন্য দেয়া শ্রেষ্ঠতম সম্মান 'নওয়াব' উপাধি লাভ করেন। কুমিল্লা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস (Doglas) ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেন। এটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি জমিদারদের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। ফয়জুন্নেছা প্রকল্পটির সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় অর্থ নিঃশর্তভাবে দান করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে ফয়জুন্নেছা সুস্পষ্টভাবে বলেন, "What Faijunnessa gives as a Gift, not as a loan to be paid."[১]

নওয়াব ফয়জুন্নেছার জনহিতকর কার্যাবলীর মধ্যে নিজ গ্রামে স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও কুমিল্লা সদর হাসপাতালে একটি মহিলা ওয়ার্ড স্থাপন অন্যতম। রাস্তাঘাট নির্মাণ, মসজিদ তৈরি, পানীয় জলের সুবিধার্থে জলাশয় খনন প্রভৃতি তাঁর জনহিতকর কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য দিক।[২]

১৮৮৪ সালে হজ্ব পালন করতে গিয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেছা মক্কা শরীফে একটি মুসাফিরখানা এবং একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মদীনা শরীফেও একটি মাদ্রাসার জন্য তিনি নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। সমাজসেবার ক্ষেত্রে এসব কার্যাবলী তাঁকে বিদেশেও ব্যাপক পরিচিত দান করে।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা পাল্কীতে চড়ে নিজ জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন মৌজা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা সচক্ষে দেখতেন যা তখনকার জমিদারদের কাছ থেকে আশা করা স্বপ্নাতীত ছিল।[৩]

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সমুদয় সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ওয়াক্‌ফ করে যান, যা আজও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সুমহান স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর জনহিতকর কার্যাবলী এবং দানশীলতাকে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের জনহিতকর কার্যাবলীর সাথে তুলনা করা যায়।

<u>বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১)</u>

বিংশ শতকের প্রথম দিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুপমন্ডুকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত অবরোধবাসিনী নারী সমাজের কল্যাণ ও অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া। তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে মুসলিম নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণকে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী বা মুক্তিধাত্রী হিসেবে স্বীকৃত ও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহির উদ্দিন মুহাম্মদ আবু আলী সাবের এবং মাতার নাম রাহাতুন্নেছা চৌধুরী। আনুমানিক ১৭ বছর বয়সে ৩৮ বছর বয়স্ক বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। বেগম রোকেয়ার জন্ম এমন এক সময়ে যখন সমাজে পর্দার কড়াকড়ি এবং মুসলিম পরিবারে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বেগম রোকেয়ার অদম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইব্রাহীম সাবির, বড় বোন করিমুন্নেছা ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে লেখাপড়া শেখেন।[৪] শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে স্বামীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থতা, বিরামহীন কর্মচাঞ্চল্য, কর্মজীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলায় বেগম রোকেয়া ভেঙ্গে পড়েন এবং ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর ৫২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান :

বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক কর্মধারা ও দর্শন পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করলে কয়েকটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম নারী জাগরণের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, তেমনি সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপুর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি একাধারে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যকর্মী এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। সমাজকল্যাণে বেগম রোকেয়ার বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে রয়েছে -

---

১. উদ্বৃত : মোঃ মতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২. মোঃ মতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩. মোঃ মতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৪. শামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান :

মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন তথা জাগরণের অগ্রদূতী হিসেবে বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও কর্মধারা পর্যালোচনা করলে দু'টি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, নারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ।

দ্বিতীয়ত, অবরোধ প্রথার অবসান।

১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে বেগম রোকেয়া **'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'** প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভাগলপুর থেকে কলকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুলটি স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সালে কলকাতায় স্কুলটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি আধুনিক সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ নীতি **'উদ্বুদ্ধকরণ'** এর সাহায্যে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে চেষ্টা করেন। ১৯২৯ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় কলকাতায় **'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল'** প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

নারী সমাজের সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ সম্পর্কে তার পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক।[৩] তিনি শুধু নারী শিক্ষার প্রসারই চান নি, সমাজ সংস্কারের মাধ্যম হিসেবেও শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন।[৪] অবরোধ ও পর্দা প্রথা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, অবরোধ এবং পর্দা দু'টি ভিন্ন জিনিস। অবরোধ হচ্ছে ঘরে বন্দী, ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং পর্দার ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি। অন্যদিকে পর্দা হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। যার সাথে উন্নতি বা শিক্ষার কোন বিরোধ নেই।

বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক নারী জাগরণের দর্শন সম্পর্কে যে পরিচয় তার লেখনী হতে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে "এ বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক নারীর আত্মাকেও স্বীকার করেনি। একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দান করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দূর্দশার অন্ত নেই।"[৫]

সমাজকল্যাণে বেগম রোকেয়ার অবদান :

বেগম রোকেয়া শুধুমাত্র নারী শিক্ষার প্রসার এবং অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধনের মধ্যেই তার কর্মধারা সীমিত রাখেননি। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে মুসলিম নারী সমাজকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলারও প্রচেষ্টা চালান। মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ এবং অধিকার সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে (১) দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান। (২) বিধবা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা (৩) দু:স্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুটির শিল্প স্থাপন (৪) অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে সহায়তা দান।[৬]

সমবেত এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুসলিম নারীদের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'। অবরোধবাসিনী মুসলিম নারী সমাজ অবরোধের দেয়াল অতিক্রম করে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বীয় অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসে। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সমিতি অংশগ্রহণ করে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[৭] বেগম রোকেয়া বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি **'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি'** এবং **'বেঙ্গল উইম্যান্স এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'** এর আজীবন সদস্য ছিলেন। পতিতাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থ সংস্থা' এর তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতায় স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

---

১. মোরশেদ সফিউল হাসান, বেগম রোকেয়া ঃ সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৩
২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩. দ্রষ্টব্য ঃ 'সুবহে সাদিক', 'ডেলিসিয়া হত্যা' ঃ বেগম রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৪২
৪. সুরাইয়া বেগম, 'বেগম রোকেয়া ঃ নারীবাদী চেতনা ও সাহিত্য কর্ম' সমাজ নিরীক্ষণ, সমাজ-নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬, পৃ. ৬৭
৫. রাণী ভিখারিনী, রোকেয়া রচনাবলী
৬. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪
৭. মোরশেদ সফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার সাহিত্য কর্ম ও সমাজ সেবা :

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্মকে তৎকালীন মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের 'Change Agent' বা পরিবর্তনের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত, অবহেলিত, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বিভিন্ন রূপক ব্যবহার করে নারী সমাজের কর্ম প্রতিভা, কর্মশক্তি, সমস্যা ও তাঁর সমাধান লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। এছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে নারী সমাজের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর সমাজ চেতনা এবং সমাজকে নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনার পরিচয় তার লেখার মধ্যে ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্যে দু'টো বিষয় দরকারী। প্রথমত, স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার। দ্বিতীয়ত,বাল্য বিবাহ রহিত করা।'[১]

পরিপূর্ণ ইতিহাস চেতনা নিয়ে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে নারী সমাজকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবরোধের অভিশাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বেগম রোকেয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও জাগরণের বাণী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের নানাবিধ কুপ্রথা ও কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নারী-পুরুষকে সমাজের দু'টি চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করে নারীদের কল্যাণকে জীবনের মূলব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া তাঁর সামগ্রিক কার্যাবলীর জন্যই মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন স্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "She devoted her life and all the resources to the cause of education for girls." অর্থাৎ, নারী শিক্ষার জন্য তিনি তার সমগ্র জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন।[২]

"সামাজিক কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়ার অভিযান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকল্যাণের স্বপ্ন তাঁকে সংগ্রামে প্ররোচিত করেছিল। সে সংগ্রামে পরিণামে রক্ষণশীলতার পরাজয় ঘটেছে, এটাই তার স্বার্থকতার চরম নির্দশন।"[৩]

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)

বেগম রোকেয়অর আদর্শ ও বিপ্লবী কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সকল মহিলা নারী সমাজের মুক্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান **'বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ'** তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ নারী সমাজের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বেগম শামসুন্নাহার নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেও তিনি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাঁধার সম্মুখীন হননি। কারণ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন তাঁর নানা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন সাবেক মন্ত্রী মরহুম জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার। জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন।[৪] বেগম শামসুন্নাহার কলিকাতায় এসে বেগম রোকেয়ার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ দেখে বিমোহিত হন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিনী বেগম শামসুন্নাহার কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা জীবন শেষ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করার পর লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।[৫]

শিক্ষা ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান :

বেগম রোকেয়ার আদর্শের অনুসারী হয়ে তিনি নারীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। নারীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি' (All Pakistan Women's Association-APWA) নামে যে সংগঠন গড়ে তোলা হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া তিনি আরও অনেক সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য, শিশুকল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী, আন্তর্জাতিক মহিলা মৈত্রী সংঘের আঞ্চলিক পরিচালক প্রভৃতি।[৬] নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সভানেত্রী। তদানীন্তন পাকিস্তানের **মুসলিম পারিবারিক আইন** প্রণয়নে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান ছিল। মুসলিম মহিলাদের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

---

১. [illegible], [illegible] রচনাবলী।
২. [illegible] রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৩. [illegible], [illegible] মানব ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪২২
৪. [illegible] চৌধুরী, শামসুন্নাহার মাহমুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২-১৩
৫. [illegible] চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১
৬. [illegible], ছোটদের শামসুন নাহার, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবার ক্ষেত্রেও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের অবদান অনন্য। তাঁরই নেতৃত্বে শিশুকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগঠন শিশুদের কল্যাণে বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে যাচ্ছে। 'পঙ্গু শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র' (Crippled Children Rehabilitation Centre) স্থাপনেও তার বিশেষ অবদান রয়েছে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ (National Council of Social Welfare) এরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[১]

সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। তার লেখা অনেক বই সুধীজন কতৃক প্রশংসিত হয়। এ সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'বেগম মহল', 'শিশুর শিক্ষা', 'পুণ্যময়ী', 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ 'অবিভক্ত ভারত' থেকে শুরু করে তদানীন্তন পাকিস্তানের ৬০-এর দশক পর্যন্ত এ দেশের নারী সমাজ ও শিশুদের কল্যাণে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৬৪ সালে এই মহিয়সী মহিলা ইন্তিকাল করেন।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ
[জন্ম ১৮৭১: মৃত্যু ১৯১৫]

বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতের বাংলার অধঃপতিত দূর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণ সাধনে যেসব মনীষী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ অন্যতম।

স্যার সলিমুল্লাহ ১৮৭১ সালের ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নওয়াব আহসানউল্লাহ এবং পিতামহ খাজা আবদুল গনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আনোদলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথম জীবনে স্যার সলিমুলাহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করলেও বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে তিনি চাকুরী বর্জন করেন এবং রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করেন। সমাজসেবামুলক কাজের পৃষ্ঠপোষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন।[২] ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

স্যার সলিমুলাহর অবদান :

স্যার সলিমুল্লাহর অবদানকে (ক) রাজনৈতিক (খ) শিক্ষা বিস্তার (গ) সমাজসেবা এ তিনটি দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষণ করা যায়। যেমন:

(ক) **রাজনৈতিক অবদান ঃ** স্যার সলিমুল্লাহর সার্বিক রাজনৈতিক কার্যবলীর মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল দারিদ্র্য পীড়িত পূর্ববাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি। এজন্য তিনি বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের স্বার্থে ঢাকাকে রাজধানী করে পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উথাপন করেন এবং ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। নব গঠিত প্রদেশের মুসলমানদের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি "মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন" গঠন করেন। এতে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয় এবং রাজনীতিতে মুসলমানদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ও উদ্যোগই ছিল প্রধান। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার সলিমুলাহ।[৩] সুতরাং বলা যায়, নওয়াব স্যার সলিমুলাহ রাজনৈতিক অবদান হল বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ প্রতিষ্টা এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা।

(খ) **শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ঃ** বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে স্যার সলিমুল্লাহ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ। কারিগরি ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ তাঁর অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এছাড়া শহীদুলাহ হল প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম অবদান।[৪] ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নিকট তিনি বাংলার জনগণের শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান। যার ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।[৫]

---

১. মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭
২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য কাজী আবুল হোসেন, নবাব সলিমুলাহ' জীবনী গ্রন্থ-১৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ.১০-১৬
৪. আব্দুস সাত্তার (সম্পা), ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-৮ম-খন্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ১৩
৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ জানুয়ারী ১৯৯৫ইং।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) **সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদান ঃ** দু:স্থ, ইয়াতিম ও অসহায়দের সেবায় স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে ঢাকায় ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যা "স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা" নামে পরিচিত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ইয়াতিমখানা হিসেবে সুস্থের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। মিটফোর্ট হাসপাতাল প্রতিষ্টার মাধ্যমে তিনি সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অনন্য কীর্তি রেখে যান। এছাড়া ঢাকার আহসানিয়া মিশনসহ বহু জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।[১]

তাই বলা যায় বাংলার জনগণের সার্বিক কল্যাণে স্যার সলিমুল্লাহর প্রদর্শিত আদর্শ পরবর্তী পর্যায়ে অনেক স্বনামধন্য মনীশীদের ভাগ্যাহত বাংগালীর কল্যাণে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করেছে।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

[জন্মঃ ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ সাল: মৃত্যু: ২৭ এপ্রিল, ১৯৬২ সাল]

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের মুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা তাঁকে বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। ১৮৭৩ সালের ২৬ শে অক্টোবর বরিশাল জেলার চাখারে শেরে বাংরা এ. কে. ফজলুল হক এক সম্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওয়াজেদ আলী এবং মাতার নাম সৈয়দুন্নেছা। তাঁর পিতা একজন সরকারী আইনজীবি ছিলেন।

ফজলুল হক ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ১৮৮৩ সালে ডিভিশনাল বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রাস পরীক্ষা পাস করেন। ১৮৯৩ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাস করেন। ১৮৯৭ সালে আইন পাস করার পর কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

১৯০১ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ সময় তিনি স্থানীয় রাজচন্দ্র কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনায়ও নিযুক্ত ছিলেন। 'সাপ্তাহিক বালক' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করে জনগণের দু:খ-দূর্দশা লাঘবের চেষ্টা করেন। বরিশাল পৌরসভার এবং জেলা বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯০৬ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনে যোগদানের লক্ষে চাকুরী ত্যাগ করে আইন ব্যবসা এবং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন।[২]

শেরে বাংলার কর্মধারাঃ

সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনে শেরে বাংলা ফজলুল হক বিভিন্ন কর্মকান্ড জড়িত ছিলেন। তাঁর কর্মকান্ডের মাধ্যমে আদর্শের যে পরিচয় ফুটে উঠে, সময়ের ধারাবাহিকতায় তাকে প্রধানত চারটি খাতে প্রবহমান দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম : তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এদেশে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের চেষ্টা চালান।

দ্বিতীয়ত: তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বাঙালী জাতীয়তাবদের উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেন।

তৃতয়িত : তিনি মহাজনী তথা জমিদার প্রথা উচ্ছেদের স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

চতুর্থত : তিনি ছিলেন অসাম্প্রাদায়িক অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী।

শিক্ষা বিস্তার :

শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নিয়োজিত রেখেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে। তাঁর শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠন। কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হবার সাথে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্টা হন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবার মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রতিবারই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিজ দায়িত্বে রেখেছিলেন। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদানগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান:

১. [illegible] (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

২. মোঃ মতিয়ুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের' অন্যতম সংগঠক ছিলেন ফজলুল হক। ১৯১২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের উত্থাপিত 'শিক্ষা পরিকল্পনা বিল' এদেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১২ সালে তিনি মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলার গভর্ণরের কাছ থেকে বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য আদায় করার লক্ষ্যে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এডুকেশনাল এসোসিয়েশন' গঠন করেন। কলকাতায় 'কারমাইকেল ও টেলর হোস্টেল' নির্মাণে ফজলুল হক সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলজেকে ১৯২০ সালে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নীত করা ও ১৯২১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্বস্থানীয় উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন।[১]

১৯২৪ সালে জফলুল হক শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় ইসলামীয়া কলেজ এবং মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দানের জন্য 'মুসলিম এডুকেশনাল ফান্ড গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকার প্রাক্কালে মুসলমান মেয়েদের জন্য 'লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ স্থাপন করেন। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ইসলাম ধর্মের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমলেই স্কুল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিল আনীত হয়। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

জনমানসে নিজেকে অমর ও চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বনামে প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল' বরিশালে চাখার ফজলুল হক কলেজ, রাজশাহীতে আদিনা ফজলুল হক কলেজ ইত্যাদি এবং ঢাকার ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার ব্যাপারে ফজলুল হকের মিশনারী উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষ্য করে তৎকালীন ডি.পি. আই. হরনেল সাহেব শেরে বাংলা ফজলুল হককে 'বেনথাম অব বেঙ্গল' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলন :

ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলার জমিদার ও মহাজনদের শোষণ এবং ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের রক্ষা করার লক্ষ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে আন্দোলন শুরু করেন তাই ইতিহাসে কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জমিদার, মজুতদার ও মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে জমিদার ও মহাজনরা কৃষক শ্রেণীর উপর একচেটিয়া শোষণের সুযোগ লাভ করে। জীবনধারণের তাগিদে নিঃস্ব ও অসহায় কৃষক শ্রেণী জমিদার এবং মহাজনদের কাছ থেকে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। চক্রবৃদ্ধি সুদের যাতাকলে এবং জমিদার ও মহাজনদের প্রতারণার নিষ্পেষণে কৃষক তাদের ভিটে-মাটি সর্বস্ব হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জরিত বাংলার কৃষকরদের ওপর ব্রিটিশ সৃষ্ট জমিগদার, মহাজন, রাজা, মহারাজদের প্রতাপ প্রতিপত্তির সীমা ছেড়ে যায়। অত্যাচারিত, শোষিত এবং ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের অমানবিক অবস্থা থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এ.কে. ফজলুল হক কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল-

(১) বাংলার কৃষক প্রজা শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা।
(২) ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত, জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচারের হাত হতে কৃষকদের রক্ষা করা।
(৩) কৃষকদের ঋণভারের দায় থেকে মুক্ত করা।
(৪) বন্ধকী জমি, ঘর-বাড়ি , ভিটে-মাটি উদ্ধার করা।
(৫) জমি হস্তান্তর অধিকার বা ভুমিস্বত্ব প্রথা প্রবর্তন করা।
(৬) সর্বনাশা সুদের ব্যবসার উচ্ছেদ সাধন করা।[২]

কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এ.কে. ফজলুল হক ১৯১৫ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। তিনি নিজ জন্মস্থান বাখরগঞ্জ জেলা (বরিশাল জেলা) থেকে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ঐতিহাসিক কৃষকপ্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাতে তিনি কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোনের চূড়ান্ত কার্যক্রম ঘোষণা করেন। ১৯২৭ সালে ফজলুল হক "কৃষক প্রজা পার্টি" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এটি ছিল তাঁর কৃষক প্রজা শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটি ফসল। অত্যাচারী মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য এ.কে. ফজলুল হক তাঁর

---

১. মোঃ অতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
২. মিজানুর রহমান শেলী (সম্পা), ছোটদের ফজলুল হক, সাহিত্যমালা, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২৫-২৬

সর্বশক্তিকে নিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালের সংবিধানে গণতান্ত্রিক অধিকার আরও সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে ৪০ লাখ কৃষক প্রজা ভোটাধিকার লাভ করেন।১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে কৃষক প্রজা পার্টির বিজয়ের ফলে বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে চলে আসে।[১]

১৯১৩ সালে পাসকৃত 'কৃষি ঋণ আইন' ১৯৩৬ সালে তিনি পুনরায় সংশোধন করেন। ১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে তিনি বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন পাস করেন। বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইনের আওতায় বাংলাদেশে ষাট হাজার ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপিত হয় এবং সাত থেকে আট কোটি কৃষক প্রজার ঋণ মুক্তি, দায় মুক্তি এবং জমি বন্ধকী মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। জমিদারদের স্থলে প্রজারা তাদের ভূমির স্বত্ব ফিরে পায়। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় কুসিদজীবি আইন (Bengal Money Lenders Act) পাস করে ভবিষ্যৎ মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষক শ্রমিকদের মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করেন। জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের পটভূমি রচনার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ সরকার "ফ্লাউড কমিশন" নিয়োগ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয় এবং প্রজারা তাদের ভূমির ওপর স্বত্ব ফিরে পায়।[২]

বাংলার কৃষক শ্রমিক প্রজাদের কল্যাণে এ আন্দেলন সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের কৃষক প্রজাদের যে নি:স্ব ও অসহায় ফেলে; কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সে অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটান। এ প্রসঙ্গে বি.ডি. হাবিবুলাহ বলেছেন, "আব্রাহাম লিঙ্কনের দাস প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের চেয়েও অনেক বেশি কল্যাণকর কাজ ছিল বাংলার ষাট হাজার ঋণ সালিসী বোর্ড সৃষ্টি। বিলেতে উইলবার ফোর্স দাস প্রথা রহিতকরণের যে ব্যবস্থা করেন তাতে যে পরিমাণ কল্যাণ নিহিত ছিল, তার চেয়েও বেশি কল্যাণপ্রসূ হল হক মন্ত্রী মন্ডলের ষাট হাজার ঋণ সালিসী বোর্ড। এতে আট কোটি প্রজার দাসত্ব ও অর্থনৈতিক শৃংখল এক সাথে শেষ হয়"।[৩]

সুতরাং বলা যায় কৃষক ঋণমুক্তি আন্দেলন শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের শোষণ, নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত হতেই কৃষক প্রজাদের মুক্ত করেনি, ভবিষ্যৎ শোষণের জাঁতাকল থেকেও মুক্তি দানের বিধান করেছে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অবদান :

শেরে বাংলা ফজলুল হক দানশীলতা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি গরীব দু:খীদের মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি হিসেব করে দান করতেন না। খাদেমুল ইনসান সমিতি, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম প্রভৃতি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সেবা সমিতি নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

মূলত শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কর্মময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তথা পদক্ষেপই মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি রাধিকা রঞ্জন গুহ মন্তব্য করেন, "ফজলুল হক আমেরিকায় জন্ম নিলে হতেন ওয়াশিংটন, বিলেতে জন্ম নিল হতেন লেনিন এবং ফ্রান্সে জন্ম নিলে হতেন রুশো বিংবা নেপোলিয়ান"।[৪]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

গণতান্ত্রিক আদর্শের অতন্ত্র প্রহরী, স্বাধীকার আন্দোলনের মহান নেতা, বিশাল হৃদয় ও বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শুধু রাজনৈতকি ইতিহাসেরই এক মহানায়ক নয়; এর সাথে সাথে সামাজিক শান্তি রক্ষায় নিবেদিত সেবক এবং অবহেলিত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রিয় বন্ধু হিসেবে সমাজসেবার ইতিহাসে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯২ সালে কোলকাতায় এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারে সোহরাওয়ার্দীর জন্ম। তাঁর পিতার নাম স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাতার নাম বেগম খুজিস্তা আখতার বানু। স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের প্রধান। অন্যদিকে খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন সিনিয়র কেমব্রীজ পাশ করা প্রথম মুসলিম মহিলা ও সে সময়ের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষার একমাত্র মহিলা পরীক্ষক।[৫]

১. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩. বিবি হাবিবুলাহ, শেরে বাংলা, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৮৭
৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৫ অক্টোবর, ১৯৮৭
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কোলকাতা মাদ্রাসায়। মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এসসি এবং লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী পাশ করেন। তারপর জুরিসপ্রুডেন্সে অনার্স এবং আইনের সর্বোচ্চ উপাধি বি .সি. এল পরীক্ষাও কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করার পর সোহরাওয়ার্দী মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন।[১]

সমাজকল্যাণে অবদান :

সোহ্‌রাওয়ার্দী মানবীয় গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজসেবার নানামুখী কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করে একজন সমাজকল্যাণকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

রাজনীতিতে তাঁর অবদান ঃ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার ভেতরে ও বাইরে অবহেলিত মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি গঠিত হলে তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের শর্তে উক্ত সংগঠনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। কিছুকালের মধ্যে কোলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন হলে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তিনি ডেপুটি মেয়রের পদ গ্রহণ করেন। এ সময়ে সোহরাওয়ার্দী দেশের যুব আন্দোলনেরও সভাপতি নির্বাচিত হন।[২]

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সোহরাওয়ার্দী তাতে সমর্থন জ্ঞাপন করে স্বেচ্ছায় কোলকাতা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটলে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টির সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তারপর সোহরাওয়ার্দী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন এবং অচিরেই নিখিল ভারত লেবার ফেডারেশনের চেয়েও বড় আকারের সংগঠন গড়ে তুললেন। ১৯২৮ সালে পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন হলে তিনি তাতে জয়লাভ করেন এবং পরিষদের স্বতন্ত্র মুসলিম পার্টি গঠন করেন। এ সময়ে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগ গঠন কার্যে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সারা ভারত ঘুরে বেড়াতে শুরু করলে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জিন্নাহ সাহেব কোলকাতায় এসে বেঙ্গল মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এর সেক্রেটারী মনোনীত করেন। "জিন্নাহ সাহেবের প্রেরণায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টি সমগ্র ভারতে প্রসারিত হলো। অনাগত দিনের একটি উজ্জ্বল ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগল। তিনি বিপুল উৎসাহে উদ্দীপ্তি হয়ে উঠলেন। সমগ্র বাংলা তার কর্মক্ষেত্ররূপে দেখা দিল। মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ করবার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গদেশ ভ্রমণে বের হলেন।"[৩] সোহরাওয়ার্দীর জোরালো প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে শেরে বাংলার প্রজা পার্টি অপেক্ষা মুসলিম লীগ অধিক ৭টি আসন লাভে সক্ষম হয়। সে বৎসরই শেরে বাংলার নেতৃত্বের বঙ্গদেশে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে সোহরাওয়ার্দী শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পর আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিবাদের সাথে সাথে সোহরাওয়ার্দীও এর তীব্র বিরোধীতা করেন।[৪] ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে লক্ষ্নৌ শহরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী যোগদানের পর তাঁর সাংগঠনিক কাজের জন্য মিঃ জিন্নাহ তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। তিনি এ পদে থাকাকালীন সময়েই মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কনে; আর তাঁর প্রণীত গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে শেরে বাংলা মুসলিম লীগে যোগদান করেন। "১৯৩৭ থেকে ১৯৪৮ সাল এই এগারো বৎসরকাল শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একচ্ছত্র অধিনায়করূপে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন" ।[৫] ১৯৪৩ সালে তিনি নাজিম মন্ত্রীসভার খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে পঞ্চাশের মন্বন্তরের দূর্যোগ হতে এদেশের লক্ষ লক্ষ-নর-নারীকে রক্ষা করেন। ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জয়লাভ করলে তিনি বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা প্রতিরোধ করে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সফলকাম হন। দেশবিভাগের পর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১
২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২
৩. বন্দে আলী মিয়া, 'ছোটদের সোহরাওয়ার্দী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৮৭ (বাংলা), পৃ. ৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান :

বিশাল হৃদয় নিয়ে বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন বাংলার অবহেলিত, বিপদগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দরদী মানুষ। সোহ্‌রাওয়ার্দী অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, আর সেজন্যই সার্থক শিক্ষা পেয়েছেন মাতা-পিতার কাছ থেকে যার দরুন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন গরীব-দু:খী মানুষকে, সংগ্রাম,করেছেন অত্যাচারিত-অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ে এবং লড়েছেন সুন্দর সমাজের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।

১৯২৬ সালে কোলকাতার সর্বপ্রথম হিন্দু-মসলিম দাঙ্গা শুরু হলে সোহ্‌রাওয়ার্দী লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানুষের রক্ষায় এগিয়ে যান। কোলকাতার সর্বত্র গিয়ে দুর্গত মানুষের সেবাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন ও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় শান্তির বাণী শোনান। তার এরূপ আহ্বানে ধীরে ধীরে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়।[১] "১৯৩১ সালে উত্তরবঙ্গে জলপাবন অতি উগ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রবল বন্যায় শত শত পরিবার গৃহ হারা হল। সহস্র সহস্র গরু, মহিষ ছাগল, ভেড়া বন্যার পানিতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারালো। শত শত নর-নারী ও শিশু খাদ্যের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করলো। অসহায় নর-নারীর সাহায্যের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হয়েছিল। বিপন্নদের সেবার জন্য নিজের শত কাজ ফেলেও হাজির হলেন। সেখানে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছিল।"[২]

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন করে সামাজিক শান্তি রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দাঙ্গাত্তোর পর্যায়ে জীবিত অনাহারী অর্ধাহারী ৯০ হাজার লোককে সোহ্‌রাওয়ার্দী জরুরী ভিত্তিতে খাদ্যসামগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

দানশীলতার ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উদার। তিনি কর্তব্য কর্মে যেমন বজ্রের মত কঠিন ছিলেন তেমনি মানুষের দু:খ-বেদনায় সংবেদনশীল ছিলেন। ব্যারিষ্টার রূপে তিনি প্রতিমাসে ৩০/৪০ হাজার টাকা রোজগার করেছেন। কিন্তু সব টাকা দু'হাতে গরীব দু:খীদের দান করেছেন। তাঁর নিকট পাত্র-অপাত্র ভেদ ছিল না। তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, হাত পেতে কেউ নিরাশ হয়নি। নিজের ভবিষ্যতের জন্য তিনি কিছু মাত্র সঞ্চয় করে রাখেননি। 'মাটির মানুষ শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রণেতা শাসমুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, "উদার হৃদয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে কোন সমাজের নীচুতলার মানুষের সুহৃদ তা নয় সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের বান্ধব হিসেবেও তাকে বহুবার বহুরূপে দেখেছি।"[৩]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন জনসেবাধর্মী সংগঠনের সাথেও প্রত্যেক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সমকালীন সময়ে খ্যাতিমান সমাজসংস্কারক, সমাজসেবক ও সমাজ হিতৈষীগণও তাঁর কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী নি:সঙ্গভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে সমাপ্তি ঘটে বলিষ্ট এক পুরুষের সংগ্রামী জীবনের গৌরবময় ইতিহাস।

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫)

শিক্ষাসংস্কার, সমাজসেবা, সমাজকল্যাণমুখী ব্যাপক সাহিত্য চর্চা, অধ্যাত্মসাধনার সুন্দর-সমৃদ্ধ জীবন লাভের পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাসে সমুজ্জ্বল খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা। তিনি ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের বন্ধ্যাত্ব ঘুছিয়ে পূর্ণতার মানবীয় বিকাশে ও অনগ্রসর-অবহেলিত মানুষের স্বার্থরক্ষার বহুমুখী আয়োজনে আপন চিন্তা ও কর্মকে প্রসারিত করেন। পূণ্য-ধন্য ও আদর্শ সূফী সাধকের জীবনরূপে আধুনিক যুগেও কিভাবে সকল জঞ্জাল প্রাচীর উপড়িয়ে মানুষ ও তার সমাজকে প্রগতিমুখী করে সুখ-আস্বাদনের সুযোগ এনে দেয়, এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন খানবাহাদুল আহ্‌ছানউল্লা। তাঁর জীবনরূপ বস্তুত বিশ্বমানব প্রেমিক রূপেরই বাহ্য প্রকাশ বলা যায়। তিনি এ দশীয় জীবন বৈচিত্র্যে ইসলামী ভাব তরঙ্গ ও আধুনিক জীবনদৃষ্টির এক পরিশীলিত সমন্বয়ধারা গড়ে নিতে পেরেছেন বলেই তাঁর পক্ষে এমনটি হওয়া সম্ভব হয়েছে।[৪]

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩
২. বন্দে আলী মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩. বন্দে আলী মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪. দ্রষ্টব্য: ড. কাজী দীন মুহম্মদ, 'খানবাহাদুর আহ্‌ছানউলা', খানবাহাদুর আহ্‌ছানউলা স্মরকগ্রন্থ, গোলাম মইনউদ্দিন (সম্পাদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২০

জীবন ও কর্মধারা :

সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলাম পরিবারে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুনশী মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন ইরান থেকে আগত নয়াপাড়ার ইরানী পীর মাওলানা সুফী মোহাম্মদ শাহের শিষ্য এবং পিতামহ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। আহ্ছানউল্লার শিক্ষা জীবনের সুত্রপাত এ দু'জনের তত্ত্বাবধানেই শুরু হয়। উভয়ের আগ্রহ এবং যত্নে পাচঁ বছর বয়স পূর্ণ না হতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভার মতিলাল ভ. চৌধুরীর হাতে ন্যস্ত হয়।[১]

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আহ্ছানউল্লা নলতা মধ্য ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে নবম শ্রেণীতে থাকাকালে ভবানী পুরের লন্ডন মিশন সোসাইটি ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন। পারিবারিক চাপে এন্ট্রান্স পরীক্ষার এক বছর পর আহ্ছানউল্লা ফয়জুননেছা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এন্ট্রান্স পাসের পর আহ্ছানউল্লা ১৮৯২ সালে হুগলী কলেজ থেকে এফ.এ. ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৯৫ সালে এম.এ. পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে আহ্ছানউল্লা তাঁর পূর্ণ কর্মজীবন অতিহাহিত করেন। প্রথমে কিছুদিন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে অস্থায়ী শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর তিনি ১৮৯৭ সালে ফরিদপুরের অতিরিক্ত সাব স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্তি পান। এখান থেকেই পরে ১৮৯৮ সালে স্থায়ী অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এক বছরের মধ্যে বাকেরগঞ্জ জেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হন। উক্ত পদে তাঁর সাত বছর কার্যকাল অতিক্রান্ত হয়। এ সময়ে আহ্ছানউল্লা প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত হন এবং রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন। ১৯০৭ সালে সরকার তাঁকে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করেন। চট্টগ্রামের কার্যভার গ্রহণের কিছুদিন পরই চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে সকরার একটি কমিটি গঠন করেন এবং আহ্ছানউলা এ কমিটির সচিব মনোনীত হন। বৎসরাধিক সময়ে প্রস্তুত কমিটি কৃত রিপোর্ট সরকারের মঞ্জুরী লাভ করে। আহ্ছানউলার কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে বিভাগীয় কমিশনার তাঁকে মধ্যবর্তী দু'টি গ্রেড অতিক্রম করে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভুমিকা পালনে সচেষ্ট হন। এ সময়ে তাঁর উদ্যোগ-আয়োজন-তত্ত্বাবধানে শিক্ষায় অনগ্রসর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ও কুমিলা ইত্যাদি এলাকায় স্থানীয় ভিত্তিতে নতুন মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী স্কুল গড়ে উঠতে থাকে ও পুরাতন মাদ্রাসা-স্কুল রক্ষা ও উন্নয়ন ঘটতে থাকে।[২]

চট্টগ্রামে আহ্ছানউল্লার প্রায় সতের বছর কর্মকাল কাটে। এখানে থাকতেই ১৯১৫ সালে তিনি দার্জিলিং হাইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাষ্টার অচ্যুতনাথ অধিকারীর সহযোগে বহুল সমাদৃত ও প্রচারিত 'টিচারস ম্যানুয়েল' গ্রন্থটি রচনা করেন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক ঐতিহ্য তাঁর মন কেড়ে নেয় এবং তিনিও অধ্যাত্ম চেতনায় উজ্জীবিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেনে, "এখানকার জড় অণুপরমাণুমুখর বলিয়া অনুমিত হয়। বালুকণার মধ্যে আত্মার সাড়া পাওয়া যায়, পক্ষীর গুঞ্জনের মধ্যে প্রেমময়ের আভাস পাওয়া যায়, বায়ুর পূর্ণ্য পরশ উপলদ্ধি হয়।"[৩]

সহসাই আহ্ছানউল্লা অধ্যাত্মসাধক সৈয়দ গফুর শাহের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর কাছেই তিনি সস্ত্রীক বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই সাধক পুরুষের ইচ্ছাক্রমে ১৯২০ সালে তিনি মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন। হজরত গফুর শাহের কাছেই তিনি কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জগতের আস্বাদ লাভে প্রেরণায় দীক্ষিত হন।

১৯২৪ সালে আহ্ছানউল্লা বঙ্গদেশের মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সহকারী ডিরেক্টর পদে এই প্রথম একজন ভারতীয়ের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯২৯ সালে তিনি সরকারী আধ্যাত্মসাধনা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। চাকুরীক্ষেত্রে আহ্ছানউলার প্রশংসনীয় ভুমিকার জন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১১ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি লন্ডনস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। ১৯৬০ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আন্ত রিক সেবার জন্য বাংলা একাডেমী তাঁকে ফেলো সম্মানে সম্মানিত করে।

---

১. গোলাম মঈনউদ্দিন, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা: জীবন ও সাহিত্য', জয় পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫-৬
২. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫
৩. উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আহ্ছানউলার অবদান :

সমাজকল্যাণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তিনি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে সর্বাত্মক কল্যাণময়ী বিকাশধারা সূচিত করার অভিপ্রায়ে শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন, সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা, অধ্যাত্মসাধনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

ক। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান :

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক সমস্যা নিরসন, শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে সমকালীন শিক্ষাবিদদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সকলের অগ্রণী এবং পদমর্যাদায়ও অন্যতম শ্রেষ্ট ব্যক্তি।[১] তিনি অর্থবহ ও কার্যকরী শিক্ষা দানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষক সমাজকে দক্ষতাসম্পন্ন ও দায়ত্বশীল করতে 'টিচারস ম্যানুয়েল' নামক পুস্তক রচনা করেন। এতে শিক্ষাদান প্রণালীতে বিধি-নিয়মের কথা বলা হয়। জাতীয় প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলিম তথা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে তিনি উক্ত পুস্তকে বলেন, "বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত। জাতির প্রধান সম্প্রদায়গুলি সমভাবে উন্নত না হইলে জাতীয় জীবন সুগঠিত হইতে পারে না। প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে সমান সুবিধা দান করা এবং সমভাবে উন্নতির পথে চালনা করিয়া জাতীয় অভীষ্ট লাভে সহায়তা করা প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের সর্বপ্রথম কর্তব্য।"[২]

বাংলার মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার অনগ্রসরতা দেখে আহ্ছানউল্লা শুধু চিন্তিতই হননি, বরং এর কারণ উদঘাটন ও নিবারণের পন্থা গ্রহণেও এগিয়ে আসেন। এ বিষয়ে তাঁর রচিত পুস্তক 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান' (১৯৩৭) এ তথ্যনির্ভর, যুক্তিগ্রাহ্য ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তাতে তিনি মুসলমান সমাজের ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারে নিম্নোক্ত অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করেন-

১. সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য; ২. ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থার অভাব; ৩. ভাষাবাহুল্য; ৪. স্কুল কলেজের শিক্ষক ও কতৃপক্ষের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাস্বল্পতা; ৫. স্কুল ও কলেজের হোস্টেলের ব্যায়াধিক্য; ৬. শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে মুসলমানদের অপ্রাচুর্য; ৭. বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মুসলমান প্রতিনিধির অভাব; এবং ৮. ডিস্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি গ্রহণের অভাব।[৩]

তিনি শিক্ষার সার্থকতা খুঁজতেন আধ্যাত্মিক সাধনায় চরিত্র গঠনের মধ্যে। দেশের ধর্মশিক্ষার সমালোচনায় বলেন, "দু:খের বিষয় আমাদের দেশের ধর্মশিক্ষা শুধু বাহ্যিক, উহা অন্তরকে স্পর্শ করে না।" তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আহ্ছানউল্লা তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার ও উন্নতি বিধানে উলেখযোগ্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হল নিম্নরূপ:[৪]

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার প্রথা ছিল। আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় আই.এ.বি.এ. ও এম. এ. পরীক্ষার খাতায় কেবল পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

২. ইতিপূর্বে হাই মাদ্রাসা ও ইন্টারমেডিয়েট মাদ্রাসা থেকে পাশ করা কোন ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে পারত না। তাঁর চেষ্টায় তা রহিত হয় এবং মাদ্রাসার শিক্ষার মান এমনিভাবে উন্নীত হয়, যাতে তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।

৩. অধিকাংশ স্কুল কলেজে মৌলভীর কোন পদ ছিল না। ক্রমে সর্বত্রই মৌলভীর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং পন্ডিত ও মৌলভীর বেতন বৈষম্যও রহিত হয়।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থিত হলে তুমুল বিরোধের সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনা করার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। আহ্ছানউলা এই কমিটির সদস্য ছিলেন এবং এর আবশ্যকতার পূর্ণ সমর্থন করেন।

৫. তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্য নির্বাচিত হয়। মুসলামন ছাত্রদের শিক্ষার জন্য একমাত্র মুসলামন লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রবর্তনের নিয়মও অনুমোদিত হয়।

৭. মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির সুনির্ধারিত নিয়ম প্রচলিত হয়।

৮. পরীক্ষকের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

---

১. মুহম্মদ আবু তালিব, 'সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউলা, স্মারক গ্রন্থ' প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

২. উদ্বৃত: গোলাম মঈনউদ্দিন, খানবাহাদুর আহ্ছানউলাহ: জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩. উদ্বৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৪. দ্রষ্টব্য (ক) গোলাম মঈনউদ্দিন, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা: জীবন ও সাহিত্য; প্রাগৃক্ত, পৃ. ৩০-৩১। (খ) আবদুল জব্বার, শিক্ষা-দীক্ষায় আহ্ছানউল্লা; 'আহ্ছানউলা স্মারক গ্রন্থ,প্রাগুক্ত, পৃ:১২৫-১২৮। (গ) সৈয়দ সাইদ হোসেন, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা স্মরণে' আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫১

৯. মুসলমান ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১০. টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলমান সভ্য নিযুক্ত হয়।
১১. নিউ স্কীম মাদ্রাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।
১২. স্কুল ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমান সদস্যদের ন্যূনসংখ্যা বেঁধে দেয়া হয়।
১৩. ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর কোটা সংরক্ষিত হয়।
১৪. স্কুল পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সভ্য অধিকতর সংখ্যা নিযুক্ত হয়।

খ. সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদান ঃ

জীবনের প্রথমভাগে শিক্ষাক্ষেত্র নিয়েই আহ্ছানউল্লার সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে তিনি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন তেমনি জাতীয় প্রয়োজনে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষামূলক বই-পুস্তক প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'মখদুমী লাইব্রেরী' ও 'এম্পায়ার লাইব্রেরী'। এতে করে এদেশের মুসলমানরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, শিক্ষা গ্রহণ-দানে উৎসাহিত হয়েছে এবং স্বদেশী ভাবধারায় আত্মজাগরণমূলক বা আত্মশক্তি অর্জনমূলক সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত হবার বাস্তব সমর্থন লাভ করেছে।[১]

১৯২৯ সালে আহ্ছানউল্লা সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করার পর নিজ গ্রাম নলতায় ফিরে এসে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সমাসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে লেখেন, "শহর থেকে দূরে সরিয়া মানুষের খেদমত করাই আমি জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিলাম। খেদমতে যে আনন্দ, মখদুমিয়তে তাহা নাই। আমিত্ব দূরীভূত না হইলে মহব্বতের প্রসার হয় না। সৃষ্টির প্রতি প্রেম না জন্মিলে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হয় না। ভ্রাতৃত্ব বিস্তার ও তৎসহ শান্তির সৃষ্টি মদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"[২]

অবসর জীবনের শুরুতেই তার সমাজসেবায় একটি উলেখযোগ্য সুশৃঙ্খল প্রয়াস হল ১৯৩৫ সলে ১৫ মার্চে নলতা গ্রামে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা। ঈর্ষা দ্বেষ, অহংকার, হিংসাবৃত্তিকে দমন করে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।[৩] এ মিশনের উদ্দেশ্য হল: "পলী উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, মৃতদেহের সৎকার, দু:স্থের সাহায্য দান, শিক্ষা প্রচার, জনসাধারণের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা দূর করা, উদারভাবে জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকা, জনসাধারণের মধ্যে তরিকত-সাহায্যে মহব্বত পয়দা করা ইত্যাদি।"[৪]

মানবতার সেবায় ঐকান্তিক বাসনায় গঠিত আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। এখন দেশে ও বিদেশে এর সর্বমোট ৪৮টি শাখা ধর্ম ও সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে।[৫] উক্ত মিশন সমাজসেবায় মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ও মিশনের মহিলা শাখা গড়ে তোলে। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শাখা মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন গণশিক্ষাসহ বিভিন্ন রকম ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা আহ্ছানউলার ভাবাদর্শের ফসল। এ কর্মসূচীর আওতাতেই দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও গ্রামভিত্তিক এবং সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মদ্রাসা ও ইনষ্টিটিউটভিত্তিক মাদকাসক্তি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার আহ্বান জানানো হয়।

গ. সাহিত্যক্ষেত্রে অবদান :

আহ্ছানউল্লা সমাজসেবার মহতী আদর্শকে সামনে রেখেই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর ভাষায়, "সমাজসেবাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু:খের বিষয় অনেকস্থলে ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পাঠকের রুচিকর করতে গিয়া অনেকে নাটক নভেলের অবতারণা করে ধনোপার্জনের উপায় স্থির করেন। রুচি মার্জিত করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য কলুষিত করা উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে সাহিত্য দ্বারা ভাবী সমাজের উন্নতির পথ পরিস্কার করতে হবে; বালকদিগের মনে প্রথম হইতেই ধর্মভাবের বীজ উপ্ত করবার প্রয়াসী হইতে হইবে। ঈশ্বর ভক্তি ও চরিত্রগণ শিশু সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। জাতীয় ইতিহাস, ধর্ম ও শাসননীতি মুসলমান সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৬]

---

১. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, 'চরিতাভিধান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৪
বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ গোলাম মঈনউদ্দিন, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা, জীবন সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫
২. উদ্ধৃতঃ গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩. ড. গোলাম সকলায়েন, 'মানবকল্যাণব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউলা', খানবাহাদুর আহ্ছানউলা স্মারক গ্রন্থ, গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫
৪. মোহাম্মদ মনসুরউদ্দিন খাঁ 'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা', প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১
৫. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে আহ্ছানউল্লা স্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে আহ্বান জানান, “ভাই সকল। হিন্দু-মুসলমানী দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভূলিয়া যাও, ‘হিন্দু বাঙ্গালা মুসলমানী বাঙ্গালা’ এই পার্থক্যবোধ শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও; উভয়েরই সাহায্যে বঙ্গভাষা আরও বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বরা দেশের মঙ্গল সাধন কর। আমিত্ব ছাড়িয়া দাও : এক মনে এক প্রাণে প্রেমময়ের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেম লইয়া জাতি নির্বিশেষে বঙ্গ ভাষার উন্নতিসাধন কর।”[১]

স্বজাতির উন্নতি সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আহ্ছানউল্লাও কামনা করতেন। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সেজন্য আহ্ছানউল্লা জীবনী, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি ধরনের ৮০টি পুস্তক লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হল: টিচার্স ম্যানুয়েল (১৯১৫), বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (১৯১৮), মোছলেম জগতের ইতিহাস (১৯২৫), ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৫), হযরত মোহাম্মদ (১৯৩০), কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলী (১৯৩১), History of the Muslim World (১৯৩১), দরবেশ জীবনী (১৯৩৪), ইছলামের ইতিবৃত্ত (১৯৩৪), হজরতের রচনাবলী, কোরআনের শিক্ষা (১৯৪৯), মহাপুরুষদের অমিয়বাণী (১৯৫০) কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ (১৯৫১), ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি (১৯৫৬), আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ (১৯৬২), বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (১৯৬৪) ইত্যাদি। ছাত্র পাঠ্যপুস্তকগুলো বাদ দিয়ে ধর্ম-ইতিহাস-জীবনী-নীতি উপদেশমূলক গ্রন্থগুলোতেও তিনি ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।[২] এসব বইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে নৈতিক শুদ্ধতা অর্জন ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আত্মসচেতন হয়ে পূর্ণতর জীবনাকাঙ্খার সুখ-সমৃদ্ধ লাভের প্রেরণা আসে বলে সমাজকল্যাণে তা তাৎপর্যপূর্ণ। ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল্যায়নে বলেন, “তিনি বিশ্বাস করতেন, নিরন্তন সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেকে যোগ্যতর করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যেই রয়েছে আত্মোন্নতির চাবিকাঠি। .... এই জন্য শিক্ষাবিদ আহ্ছানউলাহ্ লেখনী ধারণ করেছিলেন।”[৩]

তিনি ১৯৬৫ সালে ইন্তিকাল করেন। মানব সেবার জীবন উদ্দেশ্যের মধ্যেই তার বিচিত্র কর্মসাধনার মূল নিহিত।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)

মুসলিম জাতীয় জাগরণ, মানবীয় দায়িত্ববোধের বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সেবক হলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান। ১৮৭৫ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৮ সারে হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষয়া উত্তীর্ণ হন। মাতৃভাষা বাংলা এবং পরে ইংরেজী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৪]

মাওলানা মনিরুজ্জামান কর্ম জীবনে কুমেদপুর মাদ্রাসার হেডমৌলভী, রংপুর কারা মাদ্রাসার সুপারেনটেনডেন্ট এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজ সেবক, সাংবাদিক, সুবক্তা ও সমাজ সচেতন মানুষ। মানব জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর সমাজসেবা শুধুমাত্র শিক্ষকতায়ই সীমাবদ্ধ নয় ভেবে তিনি ধর্ম প্রচার ও জনসেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকতায় বেশীদিন আটকে ছিলেন না। অচিরেই সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমে নেমে পড়লেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে মনিরুজ্জামান ছিলেন সকল অত্যাচার-নিপীড়ন বিরোধী এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। হিন্দু মুসলমান ঐক্য বিশ্বাসী মনিরুজ্জামান বরাবর কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।[৫] ১৯১২ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন এবং ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দেলনেও অংশ নেন। নিখিল ভারতের জামিয়তে উলামায়ে হিন্দের বাংলা শাখা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে মনিরুজ্জামানের অবদান :

শিক্ষানুরাগী মনিরুজ্জামান মুসলমান সমাজের সচেতনতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রসরতা লাভের জন্য মুসলিম শিক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি ও ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান ইসলাম মিশন স্থাপনের ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল প্রধান। শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর

---

১. উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'আহ্ছানউলা,' আহ্ছানউলা স্মরক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৩. ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, 'সমাজ-শিক্ষা আহ্ছানউলা,' খানবাহাদুর আহ্ছানউলা স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৪. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

অবদানের কথা উলেখ করে সমকালীন পত্রিকা 'মিহির' ও 'সুধাকরে' লেখা হয় "....অধ:পতিত, দারিদ্র্য, পীড়িত, কুসংস্কার বিজড়িত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহেব দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। ..... এই শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত কর্মশীল ও সক্ষম যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এখন পর্যন্ত উহা প্রাপ্ত হয় নাই।[১] তারপরও তিনি দমে যাননি। বরং অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনের বিরামহীন নিরলস কাজ করে যান।

মনিরুজ্জামান শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় মহাসমিতি গঠনের চিন্তা-ভাবনা করতেন। শিক্ষা-সমিতি ও ইসলাম মিশন তাঁর চিন্তাভাবনারই প্রতীকি সংগঠন। তিনি কোলকাতা মোহামেডান ইউনিয়নেরও মফস্বল সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম, গবেষণা, সাংবাদিকতা, সমাজসেবায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকালে তিনি সব সময় শিক্ষা লাভকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন।[২]

খ. সমাজসেবায় অবদান :

সমাজের উন্নতির জন্য তিনি সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সে উদ্দেশ্য জাতীয় মহাসমিতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, "বলতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল-কলেজ, না আছে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোম্পানী, না আছে সমাজের দু:খ-দুর্দশা নিবারণ সভা-সমিতি, না আছে আমাদের সংবাদ পত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থসম্বল, না আছে রাজ দরবারের অধিকার। ... এসো ভাই্ যুবশক্তির দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করতে আত্নবলিদান করি। ঐ এসো, জাতীয় মহা-সমিতি স্থাপনপূর্বক শিক্ষা-বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য কারবার, সমাজের দোষ সংস্কার, উন্নত স্থান পুন:অধিকার করার জন্য ধাবিত হই।"[৩] সমাজ-উন্নতির ক্ষেত্রে রাজ ভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ত্রুটি ও কুসংস্কার, ক্ষতিকর রীতি-নীতি ও সামাজিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মনোনিবেশ করেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-সমিতি ও ইসলাম মিশন তাই সমাজ সংস্কার সাধনকেও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে।[৪] মাওলানা মনিরুজ্জামান কোলকাতার আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও খাদেমুল ইসলাম সমিতির সাথেও জড়িত থেকে সমাজসেবার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রামে কদম মোবারক মসজিদের নিকটে প্রতিষ্ঠিত ইয়াতিমখানাটি সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁরই উজ্জ্বল অবদানের স্বাক্ষর বহন করে।

গ. সাহিত্য চর্চা সাংবাদিকতা ও জাতীয় জাগরণে অবদান :

মুসলিম জাগরণ ও সামাজিক উন্নতি সাধনের ব্রত নিয়ে মাওলানা মনিরুজ্জামান সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চায় আত্ননিয়োগ করেন। তিনি ধর্মান্ধকে প্রশয় না দিয়ে ধর্মের মহত্ত্ব প্রচারে সচেষ্ট হন। সম-সাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মনিরুজ্জামানের প্রথম গ্রন্থ 'তুরস্কে সুলতান' (১৯২১) সুলতান আবদুল হামিদ খানের ধর্ম, দর্শন ও জনসেবা বিষয়ক বহুমুখী কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র। মুসলমানের অগ্রগতি ও ঐক্যের জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি এ বইটি লেখেন। ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) নামক গ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর লেখা 'খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া' ভারতে ইসলাম প্রচার,' কনষ্টান্টিনোপাল, 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'আরঙ্গজেব', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'ইসলামের উপদেশ', 'সুদ সমস্যা', 'সমাজ সংস্কার' ইত্যাদি গ্রন্থ ও বাংলাদেশের মুসলিম জাগরণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মনিরুজ্জামান হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হাবিবুলাহ বাহারের মতে তাঁর উপর ইসলামী চিন্তাবিদ শিবলী নোমানীর বেশ প্রভাব পড়ে; উভয়েই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে জাতীয় জাগরণের উৎস খুঁজেছিলেন।[৫]

মনিরুজ্জামান সোলতান (১৯০১), হাবলুন মতিন (১৯১২) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মুসলমান সাংবাদিকের গোড়াপত্তনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। সাংবাদিকতাকে তিনি মুসলিম অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সে প্রেক্ষিতেই তাঁর কর্মকে বিস্তৃত করেছেন।

তাঁর ভূমিকা মূল্যায়নে ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ বলেন, "মাওলানা সাহেব ছিলেন আলেম, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না । তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী। নানা অর্থ কষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবা করে গেছেন।"[৬] এভাবেই সকল সেবা-কর্মের স্মৃতি অম্লান রেখে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ৭৫ বছররের আয়ুস্কালের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭
২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
৬. উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

জন্ম ও ব্যক্তিগত জীবন :

অবিভক্ত ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত শত অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে পাক-ভারত-বাংলা, উপমহাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের মজলুম জনগণের কল্যাণে যিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন তিনি হলেন মজলুম জননেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই অবিসংবাদিত নেতা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর পাবনা জেলার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৮০ বছর রাজনীতি ও নির্যাতিত জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন।

রাজনীতি ও সমাজকল্যাণ উভয় ক্ষেত্রে মৌলানা ভাসানী যে নেতৃত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তা প্রায় কিংবদন্তীর ন্যায়। ব্রিটিশদের বিতাড়ন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত এ উপমহাদেশে যত আন্দোলন হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১]

অবদানঃ

সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কাজে তার অবদান অতুলনীয়। আসাম এলাকার বিভিন্ন স্থানে তাঁর নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা গড়ে তোলা হয়। ধুবরী শহরের কাছাকাছি নিজস্ব উদ্যোগে বসতি স্থাপন করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই নামানুসারে আজও সে এলাকার নাম হামিদাবাদ। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে তিনি বগুড়া জেলায় 'হাজী মোহসীন কলেজ' একটি কৃষি ফার্ম ও পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। টাঙ্গাইল শহরের অনতিদূরে কাগমারীতে তিনি মৌলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠাতেও তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ও শিল্পপতিদের হুমকী দিয়ে এ দেশের জনগণের কল্যাণে বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা এমনকি হাসপাতাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেন।[২]

স্বাধীনতার পর তিনি জীবনের শেষ বছরগুলিতে জীবনের শেষ বছরগুলিতে জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে গড়ে তোলেন 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'। এখানে অধ্যয়নরত ছাত-ছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণও তাদের গ্রহণ করতে হয়। 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। মূল পরিকল্পনায় নার্সারী থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচী রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরগীর খামার দুগ্ধ ও পশু পালন, মৎস চাষ, তাঁত শিল্প প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৩]

ব্যক্তিগত জীবনে মৌলানা ভাসানী খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। আজীবন তিনি কুঁড়েঘরেই কাটিয়েছেন এবং তাঁর পোশাক ছিল লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ও তালের টুপী। বিশ্বের বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন কিন্তু তার পোশাকের কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৬ সালের ১৬ই নভেম্বর 'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে' এই মহান নেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আঞ্জুমান-ই মুফিদুল ইসলাম

পটভূমি ও পরিচিতি :

"আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলাম" একটি সমাজসংস্কার ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯০৫ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবরাহীম মুহাম্মদ ডুপী, স্যার সলিমুলাহ, এ.কে. এম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সলিমুলাহ প্রমুখ মুসলিম ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংস্থাটি গড়ে উঠে এবং জন্মলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি জনসেবামূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর সলিমুলাহ ফাহমী, আব্দুল হক ফরিদী প্রমুখের উদ্যোগে ঢাকায় আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ব্যাপকভাবে সেবাধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[৪]

---

১. দ্রষ্টব্য, এ. কে. আব্দুল ওয়াহাব, ছোটদের মাওলানা ভাসানী, আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,১৯৭৯, পৃ. ১
২. দ্রষ্টব্য, মহফুজ উলাহ, মাওলানা ভাসানী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ভাসানী সংখ্যা নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ২৮
৩. মহফুজ উলাহ, পুরোগামী জননেতা' সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৪. [illegible] মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশের অবহেলিত, পশ্চাদপদ মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মূলত প্রতিষ্ঠনটি গড়ে তোলা হয়। এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ হল :-

* সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য মুসলমানদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে সৌহার্দমূলক ও পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক সৃষ্টি করা;
* সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে মুসলমানদের চেতনাবোধ জাগ্রত করা এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা;
* হাসপাতাল বা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা;
* লাশ দাফনে অক্ষম এমন দরিদ্র মুসলিম পরিবারকে লাশ দাফনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;
* সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর কারণ ও উৎস পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে জনমতকে সচেতন করা;
* মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার জন্য দরিদ্র শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় , কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা;
* প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও লক্ষ্য আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।[১]

আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলামের উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তিনটি বিভাগের মাধ্যমে-এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন-

দাফন বিভাগ :

এ বিভাগের কাজ হচ্ছে যে কোন ধরনের বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া যে সকল দরিদ্র পরিবার লাশ দাফনে অসমর্থ হয় সে ক্ষেত্রেও দাফনকার্য সম্পন্ন করার যাবতীয় দায়িত্ব এ বিভাগ নিয়ে থাকে। দাফন সম্পন্ন করার পর এরূপ কার্যক্রম আমাদের দেশে এ সংস্থার ভূমিকাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

সাহায্য বিভাগ :

এ সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর বিভাগ হচ্ছে সাহায্য বিভাগ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এতে "সাহায্য বিভাগ" চালু করা হয়। এ বিভাগের সাহায্য কর্মসূচী নিম্নরূপ-

- দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করা;
- বৃদ্ধ, পঙ্গু ও নির্ভরশীলদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা অথবা প্রয়োজনবোধে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- নিরাশ্রয় মুসলিম বালক-বালিকাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা;
- দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ অন্যান্য সময় প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা।

শিক্ষা বিভাগ:

মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'শিক্ষা বিভাগ' চালু করা হয়। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার ফরিদাবাদে একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করে। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া মেয়েদের জন্যও সংস্থা একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করে। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'আবুজর গিফারী কলেজটি'ও আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলামের সাহায্যে পরিচালিত হয়।[২]

'আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর ঢাকায় এ সংস্থা স্থাপন করা হয়। সে সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম

পটভূমি ও পরিচিতি :

আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম সংস্থাটি সর্বপ্রথম গড়ে উঠে ১৮৮৪ সালে লাহোর শহরে মাওলানা কাজী হামিদ উদ্দিন সাহেবের উদ্যোগে। পরে এরূপ সংস্থাই রাজশাহীতে ১৮৯১ সালে মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর প্রচেষ্টায় এবং বরিশালে ১৮৯৩ সালে হেমায়েতউদ্দিন আহম্মদের প্রচেষ্টায় গঠন করা হয়।[৩]

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৭৬
২. আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৩. ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর, অবহেলিত ও দূর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে অগ্রসর ও সমৃদ্ধ করার জন্য মূখ্যত আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমকালীন সময়ে আঞ্জুমানের একটি ছাপানো পুস্তিকায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, 'কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আসিবে, কিসে ন্যায্য জীবিকার (হালাল রুজীর) পথ প্রশস্ত হইবে, কি উপায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় সাহায্য করা যাইবে, এই সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেন্টের আইনগত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্যে প্রচলন-ইহাই এ সভার উদ্দেশ্য।'[১] পরবর্তীতে হেমায়েত ইসলাম যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে তা হল-

১. খ্রীষ্টান মিশনারী ও আর্যসমাজ কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী প্রচারণাকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে খন্ডন করে ইসলাম ধর্মের সঠিকরূপ রক্ষা করা।
২. ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা।
৩. ইসলাম সম্পর্কীয় জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করা, সম্প্রসারণ করা ও মুসলমান যুবকদেরকে ইসলামী জ্ঞান লাভে উৎসাহী করা।
৪. অবহেলিত ও দূর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানকল্পে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৫. ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সাধন করা।
৬. দরিদ্র ও মেধাবী মুসলমান ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত করা।[২]

কর্মতৎপরতা ও সফলতা :

উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে সংস্থা শিক্ষা, সমাজসেবা ও ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উলেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হল-

শিক্ষামূলক কার্যক্রম :

মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্য আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম যেসব কর্মসূচী পরিচালনা করে তাহলো ঃ (১) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্নাতকোত্তরসহ দু'টি আলাদা কলেজ (ইসলামিয়া কলেজ); (২) একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ; (৩) বালকদের জন্য ছয়টি ও বালিকাদের জন্য একটি হাই স্কুল (ইসলামিয়া); (৪) তিনটি জুনিয়র মডেল স্কুল; (৫) মেয়েদের জন্য একটি ভার্ণাকুলার ট্রেনিং স্কুল ইত্যাদি।

সমাজসেবা :

সমাজসেবার ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমগুলো হল- (১) দু'টি বয়স্ক শিক্ষা দান কেন্দ্র; (২) একটি পেশাগত শিক্ষাদান কেন্দ্র; (৩) ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক দু'টি ইয়াতিমখানা; (৪) 'মিলি দারুল আতফান' (গরীব, বিধবা, পরিত্যক্ত অসহায় মা-বাপ বা সন্তান সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র); (৫) 'রেসকিউ হোম' (বিপদগামী মহিলাদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র); (৬) তিব্বিয়া কলেজ (প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসা শিক্ষা কেন্দ্র) ইত্যাদি।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র :

ইসলামী আদর্শ ও জীবনধারায় সকলকে পরিচিত করা এবং ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন করে এর বিকাশ সাধনের জন্য আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম একটি প্রকাশনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত প্রকাশনা কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামী পুস্তক ও কোরআন শরীফের অনুবাদ, আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মীয় পুস্তক ও কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে এসব ব্যবস্থার সাহায্যে সর্বস্তরে ইসলামের মর্মবাণী ও জ্ঞান বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়ে উঠে।[৩]

আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম প্রতিষ্ঠালগ্নের পর তা বিভিন্নমুখী আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলেও পরে নিজস্ব আয় উপার্জনের কার্যকর খাত গড়ে তোলে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে। বর্তমানে এ সংস্থা একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও তা সরকারী বা বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং স্বীয় উৎস (বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেতন, নিজস্ব ঘরবাড়ী ভাড়া, প্রকাশিত বই পুস্তক বিক্রি ও কোরআন শরীফের অনুবাদ বিক্রি, পত্র-পত্রিকা বিক্রি, জনসাধারণের স্বেচ্ছাদান ইত্যাদি) হতে আয় করে আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম একটি উলেখযোগ্য সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

---

১. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪
২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৭৭-৭৮*
৩. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

খাদেমুল ইনসান সমিতি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট সমাজ দরদী "সৈয়দ আব্দুর রব" কর্তৃক বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় 'খাদেমুল ইনসান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যে সময় এই প্রতিষ্ঠান তার কাজ শুরু করে তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণে অন্যান্য আন্দোলন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচী চালু থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করার জন্যই মূলত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ও সমিতির সেবা ও কল্যাণ কর্মসূচীর সহায়তা লাভ করে।[১]

প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় কার্যাবলীতে দু:স্থ ও আর্তমানবতার সেবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এজন্যই তার নামকরণ করা হয় 'খাদেমুল ইনসান' অর্থাৎ 'মানব সেবক'। এ সমিতির সেবা ও কল্যাণ কর্মসূচী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল। অন্যান্য আন্দোলন ও সংস্কার কর্মসূচীসমূহের সাথে এই সমিতির পার্থক্য এখানেই। কারণ ঐ সকল কর্মসূচীসমূহ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কার ও কল্যাণ সাধনের জন্য পরিচালনা করা হয়।

'খাদেমুল ইনসান সমিতি' ফরিদপুরে এর কর্মসূচী শুরু করলেও অতি দ্রুত এবং স্বল্প সময়ে চারিদিকে বিস্তার লাভ করে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তার মূলে ছিল সমিতির ব্যাপক 'ত্রাণ কর্মসূচী'। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঝড়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে এই সমিতি বাংলা, আসাম, বিহার এমনকি উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ শিবির স্থাপন করে 'ত্রাণ কর্মসূচী' পরিচালনার মাধ্যমে দু:স্থ ও আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সেবামূলক কার্যাবলীর এই ব্যাপক বিস্তৃতির পটভূমিতে সমিতির প্রধান কার্যালয় ফরিদপুর থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং যাবতীয় কার্যাবলীকে অধিকরত বাস্তবমুখী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[২] তাছাড়া সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে সুসংহত করারও প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

১. সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিলোপ সাধন করা।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে সৌহার্দমূলক ও পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সকল ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিহত করা।
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল ধরনের পরিস্থিতিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দু:স্থ ও আর্তমানবতার সেবা করা।
৪. কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতি সাধন করা।
৫. বেকার ও নির্ভরশীলদের জন্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. মুসলিম সম্প্রদায়কে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর হাত থেকে মুক্ত করা।
৭. ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ঠিকমত উপলব্ধি করার জন্য মাতৃভাষায় খুৎবা পাঠসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা।[৩]

কার্যক্রম :

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য 'খাদেমুল ইনসান সমিতি' সংগঠিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে সমিতি প্রায় ১৫০টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১১০টি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, পাঠাগার, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে। তাছাড়া একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী পত্রিকাও প্রকাশ করে।[৪]

'খাদেমুল ইনসান সমিতি' কর্তৃক পরিচালিত কার্যাবলীসমূহ আধুনিক সমাজকল্যাণ কার্যাবলীর সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আধুনিক সমাজকল্যাণ কার্যাবলীর মতই সংগঠিত প্রচেষ্টায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চালানো হত। তাছাড়া সমিতির আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কিন্তু তবুও শুধু রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পট পরিবর্তনের জন্য এই মহতী প্রচেষ্টা করুণ পরিণতির শিকার হয়। কারণ ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'খাদেমুল ইনসান সমিতি'কে নতুন করে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল করা সম্ভব হয়নি। তবে এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত এমন একটি বাস্তবধর্মী 'সংস্কার ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান' মাত্র ১৮ বছরে যে বিস্তৃত ও ব্যাপক অবদান রেখেছে তা সত্যই অতুলনীয়।

---

১. আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
২. আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৩. আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪. আব্দুল হালিম মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার

* সমাজকল্যাণ দর্শন ও ইসলামের সম্পর্ক
* সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধের সম্পৃক্ততা
* সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ দর্শন ও ইসলামের সম্পর্ক :

সমাজকল্যাণ বলতে সাধারণত সমাজের সার্বিক কল্যাণকে বুঝায়। অর্থাৎ যার দ্বারা সমাজের মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করা হয়। সমাজের মানুষের কল্যাণার্থে গৃহীত সকল প্রেরণা, প্রচেষ্টা ও কর্মসূচী সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিধিভূক্ত। এর লক্ষ্য হল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। যেসব বিশ্বাস, আদর্শ ও সত্যের উপর ভিত্তি করে সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলী সুদীর্ঘকাল হতে চলে আসছে সেগুলোর সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে সমাজকল্যাণ দর্শন।

সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল বিধায় সমাজকল্যাণের কোন সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন চিন্তা বা দর্শন আজও গড়ে উঠেনি। প্রত্যেক দেশেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সেদেশের আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাই সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজকল্যাণ দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্য সমাজকল্যাণ দর্শনের মধ্যে সর্বজনীন ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। তদুপরি এটা সত্য যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, অনুশাসন এবং অনুভূতি সমাজকল্যাণ চিন্তার সর্বজনীন ভিত্তি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ যেমন শ্রষ্টাকে চিনেছে তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায়ও নিজেকে নিয়োজিত করতে শিখেছে। সমাজকল্যাণ দর্শন বা চিন্তা চিরায়ত ধর্মীয় নীতির উপর অধিষ্ঠিত বিধায় সর্বজনীন সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে না উঠা সত্ত্বেও অভিন্ন কতকগুলো মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য সমাজকল্যাণের অভিন্ন ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তথাপি সমাজবদ্ধ মানুষের কতিপয় অভিন্ন সত্তা রয়েছে। এসব সত্তার স্বীকৃতি, লালন-পালন ও উন্নয়নই আধুনিক সমাজকল্যাণের স্বকীয়তা ও সর্বজনীনতা দান করে। সুতরাং সমাজকল্যাণ দর্শন হল, "এমন সব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যা সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যুক্তিযুক্ত অবস্থা ও গ্রহণযোগ্য কল্যাণ সাধনের চালিকা শক্তি। যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক মঙ্গল বিধান করে। যার ফলে কতিপয় মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।"[১] শিল্পোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা-সমাধানের তাগিদে সমাজকল্যাণে ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে সমাজকল্যাণ সংঘঠিত ও পরিকল্পিত রূপ লাব করে। এক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি দার্শনিক মূল্যবোধ সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ ও দর্শন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে তোলা হয়। যাতে সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। মানবতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনুভূতি ও তাগিদই সমাজকল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি। মানব সমাজের নানাবিধ জটিলতর সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানকল্পে জন্ম নেয় আধুনিক সমাজকল্যাণ, যার লক্ষ্য হল সমাজের সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। যাতে সমাজবদ্ধ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জনসমষ্টি তাদের সামাজিক, মানসিক ও দৈহিক কল্যাণের অধিকারী হতে পারে।[২] আর অন্যভাবে বলা যায়, সমাজকল্যাণ হল এমন একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সুসংগঠিত সেবা কার্যের মাধ্যমে সকল মানুষকে সাহায্য করে। যাতে তারা নিজেরাই সব সমস্যার সমাধান করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনের নিশ্চয়তা লাভ এবং উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজকল্যাণের বিকাশধারাকে ধর্ম সব সময়ই অনুপ্রাণিত এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে আসছে। সমাজকল্যাণ দর্শন ও ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে রয়েছে বহুমাত্রিক এবং যুগপৎ সম্পর্ক। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, "Religion has existed in all times and places. It is organized set of values, beliefs and norms designed to lesson or explain the problems of human life. Human societies always face problems, people always attempt to solve them. Beliefs always play a part in these attempts. To this degree religion will always be with us."[৩]

সমাজকল্যাণের আধুনিক ও সুসংগঠিত যে রূপ দেখা যায়, তার পেছনে ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, অনুশাসন ও মানবীয় দর্শন এবং মানবকল্যাণের সর্বজনীন নীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে। ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমুখী ব্যবস্থাসমূহ সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ে

---

১. [illegible], আধুনিক সমাজকল্যাণ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ১৫৩

২. W.A. Friedlander, **Concepts & Methods of Social Work**, Prenclice Hall Englewood cliffs, N.Y-1962, P.7

৩. G.R. Leslie, R.F. Larson and B.L. Gorman, **Introductory sociology**, 1994, P.460

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। মানবকল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে। দানশীলতাকে ইসলাম ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় নি, বরং বাধ্যতামূলক করেছে এবং সকল কাজের মধ্যে সমাজ সেবাকে উত্তম কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগ যুগ ধরে মানুষ সমাজের দু:স্থ, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম এভাবে সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, যা সমাজ হতে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ইসলামের জীবন দর্শন সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।

আরবী ভাষার শব্দ 'ইসলাম' এর মূল 'সলম' ধাতু থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ শান্তি, সন্ধি, নিরাপত্তা, আনুগত্য, মান্য, গ্রহণ ইত্যাদি।[১] মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ, মান্য ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্জনের নাম ইসলাম। আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম ইসলামেই মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয়, সমষ্টিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি এমন এক চিরন্তন ও মৌল বিধান যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিদ্যমান।[২] আধুনিক অর্থে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তবভিত্তিক বিপ্লব (a realistic revolution)। মুহাম্মদ খালিদের ভাষায়, "Islam is infact ideology (based on Divine Revelation) away of life, universal in its approach and eternal in its application. Being universal in its character it evolve a way of life which was basically 'democratic' and established a social order based on equality, fraternity and justice."[৩] ইসলামের এসব আদর্শ, মূল্যবোধ ও মৌলনীতি আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শন ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন হল ইসলাম।[৪] ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো, মানুষকে সবচেয়ে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সবকিছুর মত মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানূন প্রদান করাই হল ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে[৫] এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের (তাওহীদ) স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য, মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদ মর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য হল, সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।[৬] সুতরাং ইসলাম হল সর্বজনীন একক শক্তি স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি মানবকূলের আনুগত্য প্রকাশ। ইসলামের এরূপ আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশিত পথ নির্দেশনা স্থাপনের মাধ্যমে এমন এক জীবন পদ্ধতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অবিভাজ্যভাবে সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক দায়িত্ব, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সমাজসেবা, গণতন্ত্র, পদমর্যাদা ও অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামগ্রিক সুখ-শান্তি বয়ে আনে।

বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও বিশ্বসৌন্দর্য বিধানের মৌল শিক্ষা ইসলামে রয়েছে। এক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় স্রষ্টার একক কর্তৃত্ব ও অসীম ক্ষমতাকে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বাস করা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মানবীয় জীবনকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময় করে তুলতে সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা দেয় ইসলাম। ইসলামের এই শিক্ষা জীবন দর্শনের দিক-নির্দেশনা দিয়ে মানুষকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। সম অধিকারের ভিত্তিতে সমবেতভাবে জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তুলতে সহায়তা করেছে, সমস্যাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন সমাজকল্যাণের এক সমৃদ্ধ ভিত্তি গড়ে তুলেছে।[৭]

ইসলাম এমন এক আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্বময় ও সমাজ উপযোগী, মানবকল্যাণমুখী, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী ধর্ম যা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী জীবন বিধান ভিত্তিক। ইসলাম সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্রিক ধর্ম হলেও শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোরান ও হাদীস ভিত্তিক উপায়ে সৃষ্টিকর্তা

১. আল-কুরআন, ৮: ৩১; ২:২০৮, ৪:৯০-৯১; ১০:২৫
২. আল-কুরআন, ৩:৩৩
৩. Muhammad Khalid, Welfare State-A case study of Pakistan, Royal book company, Karachi, 1968, P. 53.
৪. আল-কুরআন, ২:১১২
৫. আল-কুরআন, ৫:৩
৬. [illegible], ইসলামের নৈতিক শিক্ষা: মানব মর্যাদা, ইবাদাত ও সৃষ্টিসেবা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, [illegible] ৫৫-৫৮, ২০০৪, পৃ. ৬১।
৭. [illegible], সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৫৯-৬০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ মহান আল্লাহর নির্দেশিত অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিধি-বিধান অনুসরণও বাধ্যতামূলক। ইসলামী রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধের পরিপূর্ণ অনুসরণ যে কোন সমাজকে কল্যাণময়, সুশৃঙ্খল, শান্তিময় ও উন্নয়নমুখী করতে পারে। সুতরাং একটি পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে (as a complete code of life) ইসলাম ধর্ম সমাজকল্যাণের দর্শনকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টি বলে সকলেই সমমর্যাদার অধিকারী। ইসলাম সৃষ্টির উৎস, মৌলিক বংশধারা ও চূড়ান্ত নিয়তির দৃষ্টিতে মানব জাতির ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাস করে। সমগ্র মানব জাতির উৎস একটিই । সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভক্তির মূল উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক পরিচিতি লাভ ও সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করা। এখানে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, সাদা-কালোর মধ্যে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান ও মানুষ হিসেবে সবাই সমান। নারী-পুরুষ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ বলেন, "তিনি সেই, যিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে শ্রেণী মর্যাদায় আর সকলের উপরে উন্নীত করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"[২] ইসলাম মানবতার কল্যাণের জন্য এমন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটাতে চায় এবং এই চরিত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথার্থরূপে বহন করা সম্ভব। এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও শ্রেণীগত পার্থক্য করা চলবে না। তাই মুসলিমদের কাছে মানবপ্রীতি ও মানবকল্যাণের ধারণা অনেক প্রশস্ত, ব্যাপক ও স্পষ্ট। সমাজকল্যাণের দার্শনিক ভিত্তির অন্যতম উপাদান হল মানবতাবাদ তথা মানবকল্যাণ। মানবকল্যাণের এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণ ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক, পদ্ধতিগত ও দক্ষতামূলক কল্যাণ বা সেবা ব্যবস্থার রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং মানবতাবাদের উৎস হিসেবে সমাজকল্যাণ ইসলামের অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শন, যা সকল প্রকার বন্দি দশা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার বাণী প্রচার করেছে এবং স্রষ্টার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্বাধীনভাবে চলার ও চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম নৈরাশ্য থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে এবং দূর্বল মানুষের বুকে শক্তি সঞ্চারে অপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছে। জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান ইসলামে সর্বোচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে, ধর্ম থেকে অধর্ম এবং মঙ্গল থেকে অমঙ্গল পৃথক করার জন্য জ্ঞান অনুশীলনকে অপরিহার্য করা হয়েছে এবং জ্ঞানের মহিমায় জীবনকে পূর্ণতর করে সৃষ্টির সৌন্দর্য উপলব্ধি, উপভোগ ও অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি লাভের উপর ইসলামে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৩] ইসলামের এরূপ নীতি, দর্শন ও নির্দেশিকা সমাজকল্যাণের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইসলামই বিশ্বে একমাত্র ধর্ম ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, অসহায়কে সাহায্য দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রান দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শনকে অতিমাত্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণের প্রতি তাগিদ দিয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর; অসৎ কার্যের নিষেধ কর।"[৪] "এবং তাহাদিগের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[৫] "পরোপকার কর, যেমন: আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"[৬] "আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"[৭]

মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষের জন্য তাই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালবাস। তবেই মুসলিম হবে।" "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" "সে-ই লোকদের মধ্যে ভাল, যে লোকের উপকার করে।" "পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে আসমানে যিনি আছেন (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন।" "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সে-ই আল্লাহর প্রিয়তম যে তার এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারক।"[৮]

এভাবে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে মানবসেবার প্রতি ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণের ও মানবধর্মের মূল কথা হল মানুষের সেবায়

---

১. [illegible], সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানসেবা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৩৩৪
২. আল-কুরআন, ৬:১৬৫
৩. উদ্ধৃত, Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Chatto and windus, London, 1922, P. 360-61.
৪. আল-কুরআন, ৩:১১০
৫. আল-কুরআন, ৫১:১৯
৬. আল-কুরআন, ২৮:৭৭
৭. আল-কুরআন, ৭৬:৮-৯
৮. উদ্ধৃত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনিয়োগ করা। ইসলামে সমাজসেবাকে সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামের মতে, কোন দেশের সম্পদ ভোগের অধিকার সেই দেশের কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর নয়, এমনকি সমষ্টিগতভাবে সেই দেশের সমস্ত জনগণেরও নয়। তাতে পশু-পক্ষি প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের অধিকার আছে। ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবের একত্ব সমগ্র বিশ্বে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বমানবের অধিকার স্বীকার করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে আপন আপন প্রয়োজন মেটানোর প্রণালী এমনভাবে স্থির করতে হবে, যাতে অপর কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রয়োজন মেটানোর অধিকার ও সুযোগ অন্যায়ভাবে ব্যহত না হয়।[১] আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে এবং যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।"[২] মানুষের জন্য মহান আল্লাহর এই অবারিত অনুগ্রহে, আল্লাহ প্রদত্ত সকল সম্পদে সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদে সকল মানুষের সমান সুবিধার কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের উন্নতি ও সমাজকল্যাণ সাধনে শ্রেণী বৈষম্যকে ইসলাম অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায়। এ প্রসঙ্গে তিব্বতের নির্বাসিত বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা দালাইলামা যথার্থ অর্থেই বলেছেন, "Islam is indeed an all inclusive faith and is universal. Islam is as natural as you and I are ------ to get along with others, respect others, not create a mess for other people or mess our own people. Islam is live and let live. Islam is easy to live and is simply peace."[৩]

ইসলাম নিজের সম্পত্তি শুধু নিজের ভোগ, সুখ বা নিজ পরিবারের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয়ের অধিকার কোন মুসলমানকে দেয় নি, বরং তার প্রতিবেশিদের হক রয়েছে তাতে। বিত্তবানদের সম্পদে সর্বহারা অসহায় মানুষের অধিকার রয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা ইয়াতিমদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশির প্রতি উদাসীন, সে সকল উপাসনাকারী অভিশপ্ত।"[৪] সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানের লক্ষ্যে সমাজ সেবামূলক কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফিরিস্তাগণ, আসমানী কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাসে এবং আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, গৃহহীন ও প্রার্থীজনের সাহায্যার্থে নিজ সম্পদ বিতরণে, দাসত্ব মোচনের ব্যয়ে।"[৫]

ইসলাম সর্বক্ষেত্রে পরোপকার, জনসেবা, দানশীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক সমর্থ ও সক্ষম মানুষকে ইসলাম এ কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানায়। ধনী ব্যক্তি যেমন নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে জনসেবা ও জনকল্যাণে কাজ করবে, দরিদ্র ব্যক্তিও তেমনি নিজের শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য, মুখের ভাষা ও মনের দরদ, চিন্তা ও মেধা দিয়ে এক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখতে পারে।[৬] এভাবে ইসলাম জনসেবা, জনকল্যাণ, পরোপকার, সদকা বা পূণ্য কর্মের পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত করে দেয়। কারও আর্থিক অবস্থা তার সমাজকল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইসলাম মানুষকে মানবপ্রীতির এত উঁচু স্তরে উন্নীত করে, যেখান থেকে সৎ ও পূণ্য কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা মানুষের আবেগপ্রবণ মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। এ মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তথা নিজের কল্যাণের চিন্তা না করে দানশীল হয় এবং নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদ দু:স্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করে। এভাবে ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কল্যাণমুখী করে তোলে। এরূপ মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, সেই মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত: সেটাই ইসলাম। এজন্যই ইসলামে দরিদ্র ও আর্তদের সেবা দান, ক্ষুধার্তদের অন্ন দান, প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্ব পালন, দানশীল হওয়া, যাকাত দান ও সমবেতভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলের সমঅধিকার দান ও ভোগ করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পালনের জোরালো নির্দেশ রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম হল সমাজসেবার ধর্ম। ইসলাম এভাবেই সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

---

১. [illegible], "[illegible]", ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ১০২
২. আল-কুরআন, [illegible]
৩. [illegible] Dalai Lama for Harmony of Religions. The New Nation, 28th April, 2006, P.6
৪. আল-কুরআন, সূ-[illegible]
৫. আল-কুরআন, সূ-২:১৭৭
৬. [illegible]।

সমাজকল্যাণে ইসলামের আর এক শিক্ষা হল নারী অধিকার সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নতকরণ। এতে নারীর নিরাপত্তায় তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃত। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"[১]

"পুরুষরা যাহা উপার্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[২]

ইসলামে নারী পুরুষের সমঅধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে এ বিষয়টিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "নারীর প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের প্রতিও তাদের অধিকার রয়েছে।"[৩]

ইসলাম যেমন সাধনার ধর্ম তেমনি কর্মেরও ধর্ম। কর্মহীন ঈমান আর ঈমানহীন কর্ম আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।[৪] ইসলাম বলে "আল্লাহর দেয়া এই অফুরন্ত সম্পদ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষ তা থেকে জীবিকা সংগ্রহ করুক। এও তার ইবাদাত বা উপাসনা।"[৫] মহানবী (স.) বলেছেন, "কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করো, কিন্তু ভিক্ষা করোনা।"[৬] আল্লাহ বলেন, "এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"[৭] সুতরাং ইসলামে আত্মনির্ভরশীল পরিশ্রমকে কল্যাণ লাভের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সকলেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য পরিশ্রম করতে তাগিদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবনমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মের সংস্থান এই জীবনোপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে।[৮] ইসলামের এরূপ আত্মনির্ভরশীলতামুখী পরিশ্রম সমাজকল্যাণের সফলতা ও কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করেছে।

বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে অবাধে স্বীয় প্রবৃত্তির সাধনা মেটানো এবং গর্বভরে তা জাহির করার প্রবণতাকে ইসলাম নিন্দা করেছে। নিষ্কর্ম বা কর্মবিমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রদর্শনেচ্ছাজনিত ভোগ-বিলাস ইসলাম কোনক্রমেই অনুমোদন করেন না। ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি ও অশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ, সম্পদ পরিসঞ্চালন এবং আল্লাহর বাণী সম্প্রচার ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনকে ইসলাম ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রশংসনীয় লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যারা উৎপাদনশীল কাজে তৎপর তারা কার্যত: আল্লাহর ইচ্ছাকেই কার্যকরী করে থাকেন।[৯] অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৌশলগত অবস্থান বিবেচনায় ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক ইনসাফ ও প্রবৃদ্ধিকে মিলিতভাবে অগ্রসর করে নেয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কেবল ব্যক্তির মুনাফার জন্য পরিচালিত হতে পারে না। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রধানত সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হতে হয়।[১০]

এভাবেই ইসলামে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ অত্যন্ত বাস্তবমুখী। ইসলামী শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ক্ষুধা, দারিদ্র, অজ্ঞতা, রোগ প্রভৃতি দূর করে এমন এক শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সবাই সুখ ও শান্তিতে বাস করবে। তাছাড়া ইসলামী শাসনব্যবস্থা সব ধরণের হিংসা, শত্রুতা, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারণ, স্বৈরতন্ত্র, দাসপ্রথা প্রভৃতিকে চরমভাবে ঘৃণা করে। এভাবেই আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব সমাজে আলোর মশাল নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটে এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতায়নের মাধ্যমে সুখী জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। সুতরাং ইসলামের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছে আজকের সুসংগঠিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা।

ইসলাম নৈতিক উন্নয়ন ও চরিত্র গঠনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে যা সত্যিকারের কল্যাণরাষ্ট্রের মূলভিত্তি এবং ইসলামেই বিশ্বের প্রথম কল্যাণরাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। মহানবী (স.) সমতা, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মদীনাতে বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] ইসলামের অনুশাসন এবং অনুপ্রেরণাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে দু:স্থ, অসহায়দের কল্যাণে সংগঠিত কল্যাণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। বায়তুল মাল স্থাপনের মাধ্যমে মানবসেবায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বহি:প্রকাশ ঘটে।[১২] ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করেই খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকে বিশ্বে প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. আল-কুরআন, ৪:৭
২. আল-কুরআন, ৪:৩২
৩. Sayed Amir Ali, op.cit, P.317
৪. আল হাদীস, উদ্বৃত: ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মানব জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১৪৪
৫. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ১৪৫
৬. উদ্বৃত: ঐ, পৃ. ১২৫
৭. আল-কুরআন, ১৩:১১
৮. শাহেদ আলী (সম্পাদিত), ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সিলেট-১৯৬৭, পৃ. ১৭
৯. মাসিক পৃথিবী, অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ. ২৮
১০. ঐ, পৃ. ৩৩
১১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
* শেখ লুৎফর রহমান, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১২. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, কোহিনূর মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজকল্যাণের নানাদিক গভীরতর ও ব্যাপকতরভাবে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। অতীতে মুসলিম শাসকগণের মধ্যে এরূপ দায়িত্ববোধ ও কর্মতৎপরতার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁরা আদর্শ সমাজ গঠনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং নিজেরাও আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচী চালু করেছেন। ফলে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক তৎপরতা পরিচালত হতে দেখা যায়, যার অন্তর্ভুক্ত আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সরাইখানা, নঙ্গরখানা গড়ে তোলা, জন চলাচলের জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পানীয়-জলের সংস্থানের জন্য পুকুর, দীঘি খনন এবং কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধি করণ।[১] এ ধরণের কিছু কর্মকান্ডের প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্দেশ করে ওয়ারমার (Worner) বলেন, "By the twelfth century, Islamic Hospitals were magnificently built and equipped, and Islamic Universities were the centeres of scholarship and culture."[২] সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বণিক, ধর্মপ্রচারক, পরী-আউলিয়া ও দরবেশগণের আগমনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকরী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অন্যান্য আদর্শ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্যের উদার বাণী, মানবতাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রভৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে দুঃস্থ, অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। ধর্ম প্রচারক ও সূফীসাধক, ফকীরগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে খানকাহ দরগা বা আস্তানা নির্মাণ করেন এবং এর পাশেই মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, শিক্ষালয়, বিশ্রামাগার, লঙ্গরখানা, ইয়াতিমখানা, হাসপাতাল, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পুকুর-দীঘি, কূপ ও খাল খনন, বৃক্ষরোপনসহ দরিদ্র ও নির্যাতিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।[৩] এখনও ইসলামের ভাবাদর্শ ও অনুপ্রেরণায় ওয়াক্ফ, যাকাত, দানশীলতা ও মানব প্রেম সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের এক উল্লেখযোগ্য অংশের পরিচয় বাহক।[৪]

সমাজকর্ম পেশায় নৈতিক মানদন্ডের (code of ethics) অংশ হিসেবে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত মানদন্ড ও পেশাগত মানদন্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার উৎস হিসেবে ইসলাম ধর্মের নৈতিকতার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রয়োগ বিদ্যমান। কারণ ইসলাম কোন আঞ্চলিক ধর্ম নয়। প্রধান, বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর যে কোন ধর্মের মানুষের নিকটও ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান। তাই বৃটেন ও আমেরিকার মত খ্রীষ্টান ধর্মপ্রধান দেশের সমাজকল্যাণ এবং সমাজকর্মের দার্শনিক ভিত্তিতেও ইসলামের ধর্মীয় দর্শন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে।[৫]

সুতরাং ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ পর্যালোচনা করে একথা নি:সন্দেহে বলা যায়, আধুনিক সমাজ কল্যাণের বিকাশে ইসলাম ধর্মের অবদান শুধু অপরিসীমই নয়, অতুলনীয়ও বটে।

<u>ইসলামী মূল্যবোধ ও সমাজকল্যাণ মূল্যবোধের সম্পৃক্ততা:</u>

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। সমাজের রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে উঠে। আর সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অন্যতম উপায়। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোন সমাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social process) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চত মানদন্ড (Higher order norms) হিসেবে সামাজের ভাল-মন্দ, প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদন্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে, সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। মিল্টন বলেছেন, "Values are type of beliefs centrally located within total belief system about how one ought or ought not behave of about some end state of existence worth or not worth attainding. Values are at the heart of each person's action toward those ends".[৬]

---

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২. উদ্বৃ. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৩. মো: নুরুল ইসলাম, সমাজকর্ম, ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ২৯৩
৪. M.J. Gazder. Charities-Their past, present & future in Social welfare in India, PCI, New Delhi, 1955, P. 189.
৫. রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৬. As quoted, Rezaul Karim, Op.cit, P. 139.

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকার অর্থে ইসলাম একটা আদর্শ জীবন বিধান; যা বাস্তবে সর্বজনীন এবং প্রয়োগে সনাতন। ইসলাম সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে এক অনন্য সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।[১] ইসলাম সমাজ ও সমাজ জীবনের কর্মধারা পরিচালনার জন্য কতিপয় দর্শন ও মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে যা সমাজ হতে সকল অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারা প্রবাহিত করে। ইসলামের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে সমাজকল্যাণের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। বস্তুত: সমাজের কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্মে যে সকল মূল্যবোধ রয়েছে তা আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে সর্বজনীন অবদান রেখেছে। কেননা বৃহত্তর সমাজ পরিসরে ইসলামী মূল্যবোধ ও সমাজকল্যাণ মূল্যবোধ মানবীয় কল্যাণ সাধনেরই নীতি নির্দেশিকা। উভয় ধরণের মূল্যবোধের এরূপ সম্পর্কাবিদ্ধতা ও সাদৃশ্যতা কিভাবে বিভিন্ন কল্যাণমুখী মূল্যবোধসমূহে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে নিম্নে কয়েকটি সাধারণ মূল্যবোধ পর্যালোচনায় তা দেখা যাবে।

এক: মানবিক মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি ও মূল্য প্রদান সমাজকল্যাণ দর্শনের একটি বিশেষ দিক। সমাজকল্যাণ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে। ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদার যথার্থ স্বীকৃতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও উন্নয়নে তার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। এতে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে, আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে ও স্বাবলম্বী হবার মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। তাই সমাজকল্যাণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিসত্তার মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে।[২] কারণ, ব্যক্তির মর্যাদা ও সত্তার স্বীকৃতি দান ব্যতীত যেমন তার কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধনও অসম্ভব। তাই এতে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে সমাজের সুষম কল্যাণ সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

মানুষের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ইসলামের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। ইসলামের মতে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সৃজনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিয্‌ক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"[৩]

"তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহাকিছু আছে সমস্তই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।"[৪]

এভাবে ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Human being was given superiority over the angels and every human being however low his position and status may be in his society is very much respectable before Allah, his creator, at whose biddings even the angels had to salute him. Such achoknowledgement is the source of all position, repurssion and exploitation."[৫]

দুই: আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রশ্নে ইসলাম ও সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ এক ও অভিন্ন। সমাজকল্যাণ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার চাহিদা, পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলার অধিকার দানে বিশ্বাস করে। কেননা, এটাই হচ্ছে ব্যক্তির চাহিদা পূরণ এবং সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাণের ক্ষমতা। এতে ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে। তাই সমাজকল্যাণ কখনই কারও উপরে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নিজের উপরই ছেড়ে দেয়, যাতে সে তার সম্পদ ও সামর্থের সদ্ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।[৬]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে তার আত্মোপলব্ধি ও অবাধ অধিকারে মর্যাদা দান করেছে। জন্মে তার অবাধ অধিকার, কর্মে তার অবাধ অধিকার, জ্ঞান অর্জনে তার অবাধ অধিকার, দাম্পত্য জীবনে মানুষের অধিকার ইসলাম দিয়েছে।[৭] ইসলামে বর্ণিত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আত্মবিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, "সে সফলকাম হয়েছে, যে আত্মবিকাশ সাধন করেছে (এবং পবিত্রতা লাভ করেছে); আর সে তাঁর স্রষ্টা প্রভূর নাম স্মরণ করে এবং সালাত কায়েম করে।"[৮]

---

১. মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ১৩৬
২. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
৩. আল-কুরআন, ১৭:৭০
৪. আল-কুরআন, ৩১:২০
৫. [illegible] Rahman Bhuiyan, The Appeal of Islam, Islamic Cultural Centre, Chittagong, 1980, P.33.
৬. মোঃ [illegible] রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৭. [illegible], ইসলামের মর্মকথা, পূর্বপাল প্রকাশনী ঢাকা-১৯৬৪, পৃ. ৬৬
৮. আল-কুরআন,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানুষকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিজের কাজ-কর্ম স্বাধীনভাবে পছন্দ করা ও সম্পাদন করার ক্ষমতা দিয়েছে। তাই ইসলামের বিধান মতে, প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝতে পারে এবং তার ক্ষমতা, প্রতিভা, যোগ্যতা ও মেধা বলে সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আলাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।"[১] সুতরাং কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ, সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থি।

তিন: সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদানে ইসলাম ও সমাজকল্যাণ একই মূল্যবোধ পোষণ করে। ইসলাম সাম্যে বিশ্বাসী বলেই সকলের জন্য সমান অধিকার প্রদান করে থাকে। এতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। ইসলামের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূলমন্ত্র। ইসলামের মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ মানুষে মানুষে সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ সাম্য যোগ্যতার নয়, ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিকাশের দ্বারা সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার ও সুযোগেরও সাম্য।[২] অন্যদিকে সমাজকল্যাণেও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধায় সব মানুষের সমান অধিকার দানে বিশ্বাসী। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির স্বার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ দানের প্রতি সমাজকল্যাণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যার ফলে, সমন্বিত প্রচেষ্টায় সমাজের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব।

চার: সামাজিক দায়িত্ব পালন সমাজকল্যাণের অন্যতম একটি মূল্যবোধ। তাই সমাজকল্যাণ মানুষকে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে সমস্যা-সমাধান ও উন্নয়নে প্রয়াসী। একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব পালনও সমাজকল্যাণে স্বীকৃত। ইসলামও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলামের যাকাত, ফিতরা, সাদকা, দানশীলতা এবং সমাজের অসহায়দের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ সামাজিক দায়িত্বের বহি:প্রকাশ। ইসলামের মতে, মানুষ জড় সম্পদ ভোগ করবে মালিকরূপে নয়, আলাহর 'রব' গুণের প্রতিভূরূপে। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু ব্যবহারিক সত্ত্বাধিকার তাদেরকে অর্জন করতে হয় আলাহ্ প্রদত্ত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে। কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রমে অসমর্থ, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মে সংস্থান এই জীবন উপকরণসমূহের নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে।[৩] আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাহার শরীক করিবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী -সাথী, পথচারী এবং তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মগরবীকে।"[৪]

পাঁচ: ইসলামের অন্যতম মূল্যবোধ হল পারস্পরিক গভীর বন্ধন ও সাহায্য-সহযোগিতা। ইসলামের মতে, সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মানুষ সমান। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই স্বরূপ।[৫] ইসলামের সুষ্ঠু সমাজ গঠনের তাগিদ দিয়ে পরস্পর সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহযোগিতা ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্টেগুমারি বলেন, "The basis of this integration of communal life and the sence of brotherhood is the deeply rooted belief of muslims that their community or umma is a charishmatic one, in virtue of its being divinely founded and having a divinely law or in more modern terms, in virtue is being a bearer of values."[৬] একে অন্যের সুখ-দু:খে শরীক হওয়া, পারস্পরিক কুশলাদি জানা ও মঙ্গল কামনা করা ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামে জোরালো তাগিদ রয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, ১৩:১১
২. আবুল হাশিম, 'সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ' ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. শাহেদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৪. আল-কুরআন, ৪:৩৬
৫. আল-কুরআন, ৪৯:১০-১৩
৬. W. Montegomery Watt. What is Islam? Longmmans, Green and Co. London and Harlow, 1968, P. 234.

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা সমাজকল্যাণেরও অন্যতম মূল্যবোধ। দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, সাহায্য-সহযোগিতাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ তথা সমাজকল্যাণের ভিত্তি। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধ ও সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ একে অপরের পরিপূরক।

ছয়: সমাজকল্যাণের ন্যায় ইসলামও সমাজের প্রতি অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। ইসলাম মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেমন, আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (কুরআন) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবন বিধান) মনোনীত করিলাম।"[১] সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন তাই ইসলামের মহান লক্ষ্য। "বিশ্বজগত আলাহরই পরিবার"- এ ঘোষণায় মানবমন্ডলীর সামগ্রিক সত্ত্বারই বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এতে ব্যক্তি, দল, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিক অখন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, প্রভৃতি সকল দিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। সেই সাথে সমাজকল্যাণ বিশ্বাস করে মানুষ একই সঙ্গে পরিবার বা দল, সমষ্টি বা সমাজের সদস্য। কাজেই প্রকৃত কল্যাণে মানুষকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে তার অখন্ড সত্ত্বার স্বীকৃতি দিতে হবে।[২] সুতরাং সামাজিক অখন্ডতার স্বীকৃতির প্রশ্নে ইসলাম ও সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ এক ও অভিন্ন।

সাত: ইসলামের মৌল সামাজিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অপরাপর মূল্যবোধ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্য ও গণতন্ত্রের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামি মানুষকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সৎ ও কর্তব্যপরায়ন চর্মকার, অসাধু ও কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।[৩] আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হ্ইবে ।"[৪]

ইতিহাসের খোলা দৃষ্টিতে দেখা যায়, যারা ইসলামের এরূপ গণতন্ত্র গঠন করেছিলেন। এমনি ছিল তাদের চরিত্র। হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) প্রমুখ জগত বরেণ্য মহাপুরুষগণ সকলেই দীন-হীন কুলি ও মজদুরের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েও সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেছেন। ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা.)-এর অধীনে খুলাফা-ই-রাশিদীনের বরেণ্য জননেতাগণ মানুষের সেবা করেছেন। সেখানে কোন রাজপ্রাসাদ ছিল না, রাজা বৈভব ও ঐশ্বর্য অথবা বিলাসের কোন সামগ্রী ছিল না। বিপুল ধন-সম্পদের মাঝেও তাদের গৃহে অন্ন থাকত না। বিশাল ভূ-খন্ডের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.)-এর পরিধানে ছিল অসংখ্য তালি বিশিষ্ট কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানি ছিল তাঁর খাদ্য। এই প্রতাপশালী শাসক জেরুসালেম প্রবেশ করেছিলেন উষ্ট্রের রশি ধরে আর উষ্ট্র চালক পৃষ্ঠে বসেছিল, মনিব ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ভ্রাতৃত্বের এই মনোরম দৃশ্য, সাম্য ও গণতন্ত্রের এমন অনবদ্য ছবি ইতিহাস কোনদিন দেখেনি।

সমাজকল্যাণও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে বিশ্বাস করে এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধিত হলেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমাজের সবল, দূর্বল সকলের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ বিধানে সহায়তা করে। ফলে সাম্য ও গণতন্ত্র ইসলাম ও সমাজকল্যাণের সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আট: সমাজকল্যাণের আরও একটি অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ হল সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা। সমাজকল্যাণের মতে, সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার অপরিহার্য। সমাজকল্যাণ সম্পদের সুষম বন্টন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। এটা সাম্য ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১. আল-কুরআন, ৫:৩
২. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
৩. শাহেদ আলী (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
৪. আল-কুরআন, ২:১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দূর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক। আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।"[১]

নয়ঃ সম্পদের সদ্ব্যবহার ইসলামের অন্যতম মূল্যবোধ। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জন, বন্টন ও সদ্ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যাকাত, বায়তুল মাল, করজে হাসানা প্রভৃতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদিগকে যে রিযক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদিগের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে।" ধন-সম্পদের অপচয় করোনা। যারা এভাবে ধন-সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।"[২] ইসলামী অর্থনীতি সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম করে। সম্পত্তির মালিক আল্লাহ আর মানুষ এর রক্ষক। মুসলমানকে তার বিষয় সম্পদ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

সমাজকল্যাণ একটি সক্ষমকারী পেশা হিসেবে বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার এবং নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেয়। সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সমাজের অসীম সমস্যা মোকাবেলায় অপচয়রোধ ও সার্বিক ব্যবহারে জোর দেয়া হয়েছে। সম্পদের সদ্ব্যবহার তাই সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ।

দশঃ ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হল "পড়" অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর।[৪] মানব জাতির চির অজ্ঞতা, অন্ধকার, অনৈতিকতা, জুলুম-অত্যাচার, অসভ্য, অকল্যাণ দূর করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটি হল সেই বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রিকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[৫] কেবলমাত্র কুরআনে বর্ণিত এসব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তার (মানুষের) গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথেই অর্জিন হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান। এজন্য ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকলের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। (ইবনে মাজা) জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে (সুদূর চীন দেশে) এবং অবিশ্বাসীদের কাছে যাওয়ারও কথা বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহর পথে জ্ঞানার্জন করে সে পূণ্যের কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর আরাধনা করে, যে জ্ঞান দান করে, সে দান-খয়রাত করে; আর যে উপযুক্ত পাত্রে তা দান করে সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বস্তু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান বেহেস্তের পথ আলোকিত করে; নি:সঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু, নির্জনে তা আমাদের সমাজ; পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী; এ আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে; এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে। বন্ধুমহলে এ আমাদের অলঙ্কার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইহজগতে নৃ-পতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরকালে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়।"[৬] এভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ অসীম স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা করবে এবং জীবন, সমাজ ও জগতকে কল্যাণময় করে তুলবে।

সমাজকল্যাণও জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগকে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়াও মানবাধিকার, সম্পদের সুষম বন্টন, চাহিদা পূরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, শ্রমের মর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি, বিচার নিরপেক্ষতা, বৈষম্যহীনতা, মানব বৈচিত্রে সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি মূল্যবোধ সমাজকল্যাণ ও ইসলামে বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সমাজকল্যাণের মূল্যবোধসমূহ ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

---

১. আল-কুরআন, ৪:১৩৫
২. আল-কুরআন, ৬৩:১০; ১৭:২৬-২৭
৩. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৪. আল-কুরআন, ৯৬:১
৫. আল-কুরআন, ২:১৬৪
৬. Sayed Amir Ali, op.cit. P. 360-61.

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদিঃ

মানব সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপূর্ণতা। সামাজিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় সমস্যা। আর সমস্যা হচ্ছে এমন একটি নিক্ষেপিত ঘটনা, যা সমাজস্থ মানুষের চিন্তা-ভাবনার বা মনোযোগ আকর্ষণের চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন নিক্ষেপিত ঘটনা দ্বারা অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়, তখন সেটি সমস্যারূপে বিবেচিত হয়। আর যখন সমস্যার সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রচলিত সামাজিক সমস্যাকে বিকশিত করা হয়।[১] তাই বলা হয়, সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ও কল্যাণ বিরোধী এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবন যাত্রা ব্যাহত করে এবং যার প্রতিকারের জন্য যৌথ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মোটেরউপর সমাজের মানুষের স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত জীবন যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সামাজিক অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয়। সামাজিক সমস্যা কোন সাময়িক ব্যাপার নয়। এটি কম বেশী স্থায়ী অবস্থা, যা সমাধানের জন্য সংগঠিত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

সমাজই হল সামাজিক সমস্যার মূল উৎস। সমাজের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সামাজিক সমস্যা।[২] আর সামাজিক সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সমস্যাসমূহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও নির্ভরশীলতা। সমাজের বিভিন্ন দিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত বিধায় সমাজের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যাগুলোও পরস্পর সম্পর্কিত। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের যে কোন দিককে কেন্দ্র করে অন্যান্য দিকের উপর বিরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্য সমস্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একক কোন সামাজিক সমস্যা নেই। একটি সমস্যা নিজের যেমন সমস্যারূপে বিরাজ করে তেমনি অন্য সমস্যা সৃষ্টিতেও কারণ হিসেবে কাজ করে।[৩] সমাজের কোন একদিকে এ সংগতি ও বিশৃংখলা দেখা দিলে অন্যান্য দিকের উপর এর প্রভাব পড়ে। এভাবে সামাজিক সমস্যাগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে সমাজে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, দারিদ্র্য একটি অর্থনৈতিক সমস্যা । জনগণের মাথা পিছু আয় কম এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেলে দারিদ্র্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের প্রভাবে সমাজে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি বহুমুখী সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। নিরক্ষরতা যে কোন দেশের একটা অন্যতম সমস্যা। নিরক্ষরতার কারণে অজ্ঞতা, দরিদ্র্যতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।[৪] দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রটি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক সমস্যার পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে। দারিদ্র্যের প্রভাবে জনগণের মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে মূলধনের অভাবে বিনিয়োগ ব্যহত হয়। নতুন বিনিয়োগের অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অভাব দেখা দেয়। ফলে সমাজে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। আবার বেকারত্বের প্রভাবে অপরাধ প্রবণতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা হল দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যাস্ফীতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুক প্রথা, অপরাধ প্রবণতা, মাদকাসক্তি, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, শ্রমিক ও যুব অসন্তোষ, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি।

আধুনিক সমাজ কল্যাণের পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিল্পোত্তর সমাজের উদ্ভূত জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব। শিল্পযুগের ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজকল্যাণ কার্যক্রম প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় সমাজ চিন্তাবিদগণ সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত সমাজ সেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তার ফলশ্রুতিতে উদ্ভব হয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজকল্যাণের। আধুনিক সমাজকল্যাণ সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতির (যেমন সামাজিক জরিপ ও গবেষণা, সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, আত্মসাহায্যের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান, মৌলিক চাহিদা পুরণের নিশ্চয়তা, স্বাবলম্বন ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, জনগণের আয় উপার্জন বৃদ্ধি, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, সামাজিক সমস্যার কার্যকর মূল্যায়ন, সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ, সমাজ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ইত্যাদি।)[৫] মাধ্যমে সামাজিক সম্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সাহায্য করে, যাতে তাদের সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাধান করে স্বনির্ভরতা অর্জনে তারা সক্ষম হয়।কেননা, আধুনিক সমাজকল্যাণই একমাত্র ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যার উদ্দেশ্য সমাজ জীবন থেকে সকল সমস্যা দূর করে এমন এক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে সবাই সুখ ও শান্তিতে বাস করবে।[৬] তাই সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজকল্যাণের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক সমসার সুষ্ঠু সমাধান নির্ভর করে সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নের উপযুক্ত ও দক্ষ প্রশাসন এবং জনগণের সচেতনতা ও সহযোগিতার উপর। এসব ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণের সহজ পদ্ধতি, সামাজিক গবেষণা, সমাজকল্যাণ প্রশাসন ও সামাজিক কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক সমাজকল্যাণের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাজকর্ম। সমাজকর্ম পেশাগত দৃষ্টিকোণ হতে জটিল ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত

---

১. Nisbet and Merton, Contemporary Social Problems, P.4.
২. মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজ কল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ৩৬.
৩. আবদুল হক মজুমদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০. পৃ. ৩২.
৪. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬.
৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আব্দুল হক তালুকদার, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, পৃ. ৩৩-৩৫. আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ, পৃ. ৪২-৪৩, মোঃ আবদুল হালিম মিয়া, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, পৃ. ৩০৪-৩০৫
৬. মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া, স্নাতক সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসন বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৩০৪.

সমাধানে সদা সচেষ্ট। এতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বস্তুত সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যই সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশ।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মূলত আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদেশ-নিষেধের উপর ভিত্তিশীল। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সবক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। মানুষের সাধারণ রুচি ও স্বভাব-প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলাম কল্যাণমূলক সমাজ বিধানে এক সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশর ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা সর্বকালের সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে উপযোগী। তাই ইসলাম এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে তা এমন একটি উন্নত ও যুক্তিসম্মত সমাজ, যেখানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উত্তম দিকগুলোর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ ও সুন্দর, সুশংখলা ও সুখময় করার জন্য ইসলাম এক সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে সমাজে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি মানবতা বিরোধী অপরাধ সমাজে সংগঠিত হতে পারে না।

মুসলমানদের সামাজিক জীবন আল্লাহ্‌প্রদত্ত ও উৎকৃষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তিকে নিশ্চিত করা। শ্রেণী সংগ্রাম, বর্ণাশ্রম এবং সমাজের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থি। কুরআন বা হাদীসের কোথাও শ্রেণী, বংশ বা সম্পদের দরুন শ্রেষ্ঠত্বের কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামে সামাজিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত নিখুঁত, মহৎ ও ব্যাপক। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য মৌল উপাদানগুলো হল : সহযোগী লোকের প্রতি সান্ত্বনা ও সমবেদনা, রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা, বঞ্চিতের ব্যথা উপশম, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সংহতির অনুভূতির জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের প্রশ্নে অন্যান্য লোকের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব। তাই ইসলাম তার মূল্যবোধসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সর্বাধিক উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চায়। মানব কল্যাণের চিরন্তন বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদে আপদে সাহাবাগণের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে ব্যাপ্রত করেছে। ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগযুগ ধরে মানুষ সমাজের দুস্থ অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তাই সমাজ জীবনে সুখ, শান্তি, সাম্য ও সমমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে যা সমাজকল্যাণেরও লক্ষ্য। ইসলাম মানব সমাজের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের এমনকিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সমাজকল্যাণের কর্মকৌশল তৈরী ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা অনেক হলেও মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসেবে নিম্নোক্ত সমস্যাবলীকে চিহ্নিত করা যায় : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, শ্রম সমস্যা, সুদ সমস্যা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, অপরাধ, দুনীতি, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও বিবাহ-বিচ্ছেদ। এ সকল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক ও মানসিক কারণসমূহ বর্তমান। ইসলাম তার যুগোপযোগী অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে তার বিশ্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য, গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অবলম্বনে এসব সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ যথার্থভাবে চিহ্নিত করে তার নিরসনকল্পে কার্যকর নীতি ও প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেননা, ইসলাম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে। সমাজ জীবনে অন্যান্য দিকের মত সমাজকল্যাণ ও এর অবদানে পুষ্ট। সুশৃঙ্খল ও সুখীসমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে বাস্তবমুখী আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি ইসলামে সবার্ধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তৈরী ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের নানাবিধ সমস্যা-সমাধানে তা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যাকাত; ওয়াক্‌ফ, বায়তুল মাল, করযে হাসানা, সাদকা-ই-জারিয়া ইত্যাদি। ইসলামের এসব অনুশাসন ও প্রেরণাই মানুষকে ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দু:স্থনিবাস ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছে।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার প্রতিবেশীদের অধিকার বা অংশ তার সম্পত্তির উপর রয়েছে। সেজন্য ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বন্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাতকে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দয়া করে দেয়া হয় বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীদের আয়কে গরীবদের মধ্যে[১] যারা ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা (দৈহিক, মানসিক বা বাইরের কোন অসুবিধা যেমন বেকারত্ব) ফলে নিজের প্রচেষ্টায় সম্মানজনকভাবে জীবন-যাপনে অপারগ, তাদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দেয়া যাতে "যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তন না করে।" (৫৯:৭)

---

১. নবী করীম (স.) যখন হযরত মুআয (রা.) কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে কিছু কর্তব্য কাজের তালিকা প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল লোকদের শিক্ষা দেয়া যে-আল্লাহ যাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। (বুখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১২৪)

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত বলতে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ টাকা হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকে বোঝায়। হাদীস অনুযায়ী সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর ঘুরে না আসা পর্যন্ত যাকাত দান ফরজ হয় না। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য পছন্দ করে না। এটাকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার চেষ্টাও করে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ধনী মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দূর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হয়, যার নাম যাকাত। এর ফলে যেমন অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য অনেকটা কমে যায়।

দরিদ্র ও অসহায় জনগণের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র দূর করে সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন বজায় রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের লোভ এবং মালিকানা লাভের আকাঙ্খাকে বিধৌত করে এবং দারিদ্র সমস্যা দূরীকরণে তাদের সজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ ও সামাজিক সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, যাতে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে আবর্তিত না হয় এবং গরীবরা যেন আরো গরীব না হয়। যাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। এসব গুণাবলী সমাজ জীবনের সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ আনয়নের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। যাকাত একাধারে ইবাদাত এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। যাকাত ব্যবস্থায়ই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার দর্শন ও আদর্শের অনুসরণে গড়ে উঠেছে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ফলে সমাজকল্যাণের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে একটি সফল পদ্ধতি হিসেবে যাকাত ও সমাজকল্যাণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হল বায়তুলমাল। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভান্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থ ভান্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বায়তুলমাল বলা হয়।[১] ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের নিকট থেকে রাজস্ব হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এখানে জমা হত এবং এখান থেকেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার মিটানো হত। সারা বছরের ব্যয় বহনের পর যে অর্থ রাজকোষে উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়েই জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। বায়তুলমালে সঞ্চিত সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। কেউ যাতে মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। যাকাতের নির্ধারিত আট শ্রেণীর জগণের[২] চাহিদা পূরণ না হলে বায়তুলমাল থেকেই তাদের সাহায্য প্রদান করা হত। খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে বায়তুলমাল একদিকে দু:স্থ, অসহায়, অক্ষম, দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বায়তুলমাল।

ইসলামে মানবকল্যাণের স্বার্থে জাগতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের আর একটি দিক হল ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। সাধারণত কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে, ওয়াক্‌ফ বলে।[৩] ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত হয়। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সমাজকল্যাণ সংস্থা। এর মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে স্থায়ী কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। ওয়াক্‌ফ ইসলামের একটি ঐচ্ছিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। তাই এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যাকাত যেখানে একটি বাধ্যতামুলক সার্বিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সেখানে ওয়াক্‌ফ হল সে কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানে একটি সহায়ক সংগঠন।

ইসলামের অপর একটি সমাজকল্যাণ প্রথা হল করজে হাসানা বা সুন্দর ঋণ অর্থাৎ সুদমুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনাসুদে ও শর্তসাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করজে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা।

---

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'মহানবী (স.) এর অর্থ প্রশাসন' অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী সংখ্যা-১৯৯৬, পৃ. ২৩০।

২. আল-কুরআনে বলা হয়েছে, যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য; ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। (৯:৬০)

৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে এই "সুন্দর করজকে আল্লাহকে করজ দেয়া বলা হয়েছে-"কে সে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) প্রদান করিবে। তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন, আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যাণিত হবে।"[১]

ইসলামের অন্যতম সমাজসেবা কার্যক্রম হল সাদকাহ বা দান প্রথা। যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হলেও শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পরও সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শষ্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শষ্যকণা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাহারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যাহা ব্যয় করিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরষ্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবেনা।"[২]

এভাবেই ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে যেমন মানবতার সেবা করার জন্য তাগিদ দিয়েছে, তেমনি পরোক্ষভাবে সমাজ ও জাতির কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এছাড়াও মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর কল্যাণের জন্যে ইসলামে আরো কিছু দান-সাদাকাহ প্রদানের নিয়ম রয়েছে যা সাধ্যানুসারে সকল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানই করে থাকেন। এসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরা আদায় এবং ঈদুল আযহার সময় কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান। ইসলামের এই অর্থ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করা। তাই সমাজের কল্যাণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কম নয়।[৩]

সুতরাং দেখা যায় যে, আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম মানব সমাজের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে এমন কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সমাজকল্যাণের কর্মকৌশল তৈরী ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে যে সমাজকল্যাণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে ইসলাম তার আর্বিভাবের সূচনা হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে ধরণের কাজই করে আসছে অত্যন্ত সূচারুভাবে; যদিও ইসলামের সেইসব পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান তৎকালে "সমাজকল্যাণ" নামে পরিচিতি ছিল না, পরিচিত ছিল "মানবসেবা" বা "মানবকল্যাণ" নামে। সুতরাং নি:সন্দেহে বলা চলে যে, ইসলামের অনুপ্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ ও অবদানের জন্যই সমাজকল্যাণ কালক্রমে আধুনিকরূপ লাভ করেছে।

---

১. আল-কুরআন ২:২৪৫
২. আল-কুরআন ২:২৬১, ৬২, ৬৫, ৭১
৩. এছাড়াও বিত্তশালী মুসলমান আশুরা, শবে বারআত, শবেকদর ও ঈদে মিলাদুন্নবী এবং নিজের মুরব্বী ও প্রিয় জনদের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গরীব দু:স্থদের মধ্যে নগদ অর্থ, খাদ্য, কাপড়- ছোপড় বিতরণ করে থাকেন। এভাবে ব্যয়িত অর্থ তাদের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকার করতে সমর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Elizabeth Wickenden	:	**Social Welfare in Changing World,** Washington, Department of Health Education and welfare. 1965.
Ronald C. Federico	:	**The Social Welfare Institution,** Lexinton, D.C, Health and Co, 1983
H. L. Wilensky & Charles N lebeaux	:	**Industrial Society and Social Welfare,** Newyork, Russel sage foundation, 1958.
	:	**Encyclopedia of Social Work,** Newyork, The National association of social workers of U.S.A, 1965
Walter Aurhter Friedlander	:	**Introduction to Social Welfare,** New Delhi, Prentice Hall, 1963
Bradford W.Sheafor, Charles R.Horesji, Gloria A. Horesji	:	**Tecknique and Guidliness for Social Work Practice,** Allyan and Bucox, Boston, 1988
Charles D. Garvin	:	**Social Work in Contemporary Society,** 2nd ed. 1998.
Charles Zastraw	:	**Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problems, Services Current Issues,** 1982.
Md. Ali Akbar & Sayed Ahmed Khan	:	**Private Investment in Social Welfare,** College of Social Welfare and Research, University of Dhaka-1971.
Luoise C and others	:	**Social Welfare**, 4th, (ed)
R.C. Fedrico,	:	**Social Welfare in Todays** World, 1990.
lieen Garmbrill	:	**Social Work practics, A Critical thinkers Guide,** Oxford University Press, NewYork.
W.A. Friedlander	:	**Introduction to Social Welfare** (3rd ed), 1969.
B.W. Sheafor, C.R. Horesji,	:	**Teckniques and Guidlines for Social Work Practice,** Allyn and Bacon, Inc, Boston-1988
R.A. Skidmore and M.G. Thackery	:	**Introduction to Social Work,** 1991 The development of National Social Welfare Programes, NewYork, 1959.
Friedlander and Apte.	:	**Introduction to Social Welfare,** New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1982
Nocl and Ritta timms	:	**Dectionary of Social Welfare,** Routledge and kegan Paul, Great Britain, 1977.
Herbert Bisno	:	**Philosophy of Social Work.**
	:	**Encyclopedia of Social Work,** NASW, New York, 1968.
Henry Pratt Fairchild (ed.)	:	**Dictionary of Sociology and Related Sciences,** "Littlefeld, Adams & Co. New Jersy, 1964.
	:	**Encyclopaedia of Social Work in India,** Vol 2, Ministry of Social Welfare, Govt. of India, 1987.
Dr. Md. Ali Akbar	:	**Element of Social Welfare,** CSWRC, Dhaka-1965.
Barker (ed.),	:	**Social Work Dictionary.**
Dr. Rajendra Kumar Sharma	:	**Social Problems and welfare,** Atlantic Publishers and distrtibutiors, New Delhi, 1998.

Samuel Koening	:	**Sociology, an introduction to science of society,** Barness and noble inc. New York, 1969.
David Dressler	:	**Sociology The study of Human Interaction,** Alfred A. Knopt, New York, 1969.
Maurice stack & Walter A. Friendlander	:	**Introduction to Social Welfare**, Prentice Hall, New Jersey, 1968.
Robert L. Barker,	:	**The Social Work Dictionary**, NASW, Press washington D.C, 1995.
	:	**Dictionary of Socialwelfare**, Social services publishers Inc. New York, 1948.
Ogburn and Nimcoff	:	**A Hand book of sociology.**
R.M. MacIver and Charles H. Page	:	**Society: An Introductory Analysis,** Macmillan Press Ltd. London-1949.
Moris Ginsberg	:	Social Change' Sociology and social philosophy, British Journal of Sociology, Sept. 1958.
Mcclung Lee	:	**New Outline of the principles of sociology,** Longmans, New York-1951.
Leslie Larson and Gorman	:	**Introductory Sociology**, 3rd ed.
P.E. Jacob (ed.)	:	**Values and their functions in decision making, Pennsylvania Studies of social values and public policy, 1962.**
William Ogburn	:	Culture and social change, Chicago University Press, USA-1964
David Jary and Julia Jary	:	**Callins Dictionary of Sociology 3rd edition.**
	:	**International Encyclopedia of Social Sciences.** vol. 8. Macmillan company press, New York, 1968.
Dr. Gukulesh Sharma	:	**Human Rights and Social Justice,** Deep and Deep Publications, New Delhi, 1997.
C. D. Garvin	:	**Social Work in Contemporay Society,** 2nd edn. 1998.
Mohammad Khalid	:	**Welfare State: A case study of Pakistann,** Royal Book co., Karachi, 1968.
Rex, A, Skidmore and Thackeray	:	**Introduction to Social Work,** 5^{th} edn. 1991.
Aurther E Fink	:	**The Fiedd of Social Work,** 1949.
Charles S. Sckottland	:	**The Social Security Program in United States,** New York, 1966.
David Macarov	:	**Social Welfare Structure and Practise,** Sage Publication Inc. California, 1995.
Armondo Morales	:	**Social Work: A Profession of Many Faces,** Allyn and Bacon Inc. 1986.
R. C. Mojumdar	:	**Social Work in Ancient and Mediaval India,** in History and Philosophy of Social Work in India,(Wadia ed.), 1961.
M. S. Gore and I. E. Soares	:	**Historical Background of Social Work in India in Social Welfare in India,** Planning Commission of India, New Delhi, 1955.
G. R. Madan	:	**Indian Social Problems**, Vo-2, New Delhi, 1980.
M. I. Gazdar	:	**Charities – Their Past, Present & Future in Social Welfare in India,** PCI, New Delhi, 1955.
Ishwari Prasad	:	A Short History of India.
Sayed Athar Abbass Resvi	:	**A History of Sufism in India**, Vol-2, New Delhi, 1983.
S. Rahman	:	**An Introduction to Islamic Culture and philosophy,** Mullick Brothers, Dhaka-1963.

Dhaka University Institutional Repository

S. Mahmudunnasir : **Islam: Its concepts and History**, New Delhi, 1981.

W.W. Hunter : **Our Indian Musalmans.**

E.B. Taylor : **Primitive Culture**, vol-1, London, 1981.

Abul Hashim : **The Creed of Islam**, Islamic foundation Bangldesh, Dhaka-1980.

Dr. Allama Iqbal : **The Reconstruction of Religious thought in Islam**, Lahore, 1960.

Brifault : **Making of Humanity**, London.

Abdul Vahid (ed.) : **Thoughts and Reflection of Iqbal**, Lahore, 1964.

David de Santillana : **Law and Society** : the legacy of Islam, London.

Kazi Ayub Ali : **An Introduction to Islamic Culture.**

Abul Ala Maududi : **Islamic Law and Constitution** (Tr. Khurshid Ahmed), Dhaka, 1969.

Arnold Toyenbee : **Civilization on Trial**, London, 1959.

H.A. Gibb : **Whither Islam**, London, 1932.

George Barnard Shaw : **The Genuine Islam**, Singapore, Vol-1, 1936.

The New Encyclopedia Britannica,
: Founded 1768, 15th edition, printed in U.S.A. Vol. 5.

Moses Moscowity : **Human Rights and World Order**, Occana publications,
inc. New Yark, Appendix-1.

Gewirth Alan : **Human Rights : Essays on Justifications Application**,
Chichago University Press, 1982.

: **The New Encyclopedia Britanica**, Vol. V, 1978.

Muhammad Zamir : **Human Rights : Issues and International Law**, UPL Dhaka, 1990.

Rev. Bosworth Smith : **Mohammad and Mohammadanism**, London-1875.

Hammudah Abdalati : **Focus in Islam**, Al-Ittehad-al-Islami-al-Alami, Jeddah, 1973.

P. K. Hitti : History of the Arabs, London.

William Muir : **Caliphate: Its Rise, Decline and Fall**, Edinburgh, 1934.

: **Historical Society Journal**, Dacca-1953.

: **Journal of Asiatic Society of Bengal**-1923.

K.M. Ashraf : Life & Condition of the people of Hindustan.

Dr. Mohammad Mohor Ali : **History of Muslims of Bengal**, Vol-IB, Riyadh-1985.

A.K. Banarjee : **Calcutta Review**-1939.

S. Ahmed : **Inscriptions of Bengal**, Vol-iv, 1960.

M.K. Batta Sali : **Ibn Battuta, Coins & Chronology etc.**

: **Inscription in Journal of Asiatic Society of Bengal**, 1870.

: **Journal of Asiatic Society of Bengal**, 1873.

: **Inscription in Epigraphia Indo-Muslimica**, 1917.

: **Inscription in Journal of Asiatic Society of Bengal**, 1874.

: **Journal of the Bihar Research Society**, Part-42, Vol-II, 1956.

F. B. Bart Bradley : **Eminent Bengalees in the Ninetinth Century**,
New Delhi, Inter India Publication, 1985.

A. R. Mallick : **British Policy and The Bengal**, Asiatic Society of Bengal,
Dacca, 1961.

Mainuddin Ahmed Khan : **On Inscription of Haji Shariatullah**, JASP-vo. iii, 1958.

Abdul Karim : **Social History of Muslims in Bengal**, Chittagong-1985.

Dr. Muhammad Enamul Hoq : **A History of Sufism in Bengal**, Asiatic Society of Bangladesh-198.,

Dhaka University Institutional Repository

Dr. M. A, Rahim : **Social and Cultural History of Bengal,** Karachi, 1963.

: **Journal of Asiatic Soceity of Bengal,** 1922.

Amiya Kumar Banarjee : **West Bengal District Gazetteers (Howrah),** Calcutta, 1922.

G.R.Leslic and other : **Introductory Sociology,** 3rd, ed.1994.

Dr. Ahmed Gamil Mazzara : **Islam Democracty and Socialism,** Islamic Revew, April-1962.

: **Welfare Programmes,** Islamic Bank Foundation, Dhaka, 1992.

S.A. Hasan : **The Waqfs Ordinance-1962,** Bangladesh Law Book Company, Dhaka-1999.

Thomas Patrick Hughes : **A Dictionary of Islam,** Premier Book House Anarkali, Lahore, 1964.

Mircea Eliade : **Encyclopedia of Religion,** Vol-15, Macmillan Publishing Company-New York, 1986.

Nasir Jamal : **The Islamic Law and Personal law,** London, 1986.

D.F. Mollah : **Principles of Mohammadan Law,** Calcutta Eastern Law House, 1556.

Mohammad Azharul Islam : **Awaqf Experience of Bangladesh in South Asia,** Country Paper, New Delhi 1999.

M. A, Sabjwari : **Economic and Fiscal System During the Life of Mohammad (Sm.),** The Journal of Islamic Banking and Finance, October-December, 1984.

Dr. Anwar Iqbal Quraishi : **Islam and the Theory of Interest,** Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987.

P.K. Hitti : **The Aryan,** London-1956.

K. S. Lal : **Early Muslim in India,** New Delhi, 1984.

Andre Wink : **Al-Hind -The making of the Indo-Islamic World,** vol-i, E. J. Brill the Natherlands, 1991.

S.M. Taifur : **Glimpses of old Dacca-1965.**

Dr. Hasan Askari : **Bengal: Past & Present,** Vol. LXVII, Serial No-130, 1988.

James Taylor : **A Sketch of the Topography and Statistics of Dhaka,** Calcatta, 1840.

A. R. Mullick : **British Policy and the Muslim Bengal,** Dhaka, 1961.

Gover B. L and Grover : **A New Look at Modern Indian History,** S. Chand and Co. Ltd. New Delhi, 1993.

W.A.Friedlander : **Concepts & Methods of Social Work,** Prenclice Hall Englewood cliffs, N.Y-1962.

Sayed Amir Ali : **The Spirit of Islam,** Chatto and windus, London, 1922.

Kim Vo : **Dalai Lama for Harmony of Religions.** The New Nation, 28th April, 2006.

Mahbubur Rahman Bhuiyan : **The Appeal of Islam,** Islamic Cultural Centre, Chittagong, 1980.

W. Montgomery Watt. : **What is Islam?** Longmmans, Green and Co. London and Harlow, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকবৃন্দ : আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মোঃ আবদুল হালিম মিয়া : সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৫

আব্দুল হক তালুকদার : সমাজকল্যাণ পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

মো: আতিকুর রহমান : সমাজকল্যাণ, কোরআন মহল, ঢাকা-১৯৯৯

মুহাম্মদ আলী আকবর : সমাজকর্ম প্রশিক্ষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ও সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও অবদান, সমাজকর্ম ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ সমাজকর্ম শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী-১৯৯০

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান : সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯০

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : সমাজকর্মে সংশ্লিষ্ট ধারণা ও তত্ত্ব, রোহেল পাবিলকেশন্স, ঢাকা-২০০৩

রেজাউল করিম : সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ইতিহাস ও দর্শন, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৪

আ.স. ম. নূরুল ইসলাম ও মো: হাবিবুর রহমান : কল্যাণনীতি ও কর্মসূচী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য : সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫

মো: নূরুল ইসলাম : সমাজকর্ম, ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

ড. হাবিবুর রহমান : সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা-২০০২

অমর্তসেন : জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, কলকাতা, ১৩৯৭

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন : সমাজবিজ্ঞান পরিচয়

সম্পা দাস : সমাজকর্মঃ প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, বুক চয়েস ঢাকা-২০০৫

ড. মোঃ নূরুল ইসলাম : মানবাধিকার ও সমাজকর্ম, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

গাজী শামছুর রহমান : মানবাধিকার ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকল্যাণ, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসূল : বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা-১৯৭৪

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : ভারতবর্ষের ইতিহাস, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৯১

আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭

মিনহাজ-ই-মিরাজ : তাবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬

আসকার ইবনে শায়খ : মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং.

আবদুল হক দেহলভী : আখবারুল আখিবার, দিল্লী, ১৩৩২ হিঃ

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ : সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তাল, ঢাকা-১৯৬১

দেওয়ান মুহাম্মদ নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : হযরত শাহজালাল (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭

: ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড)

কে আলী : মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৯

মুজিবুর রহমান : ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ- সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ঢাকা-১৯৯১

আমিনুল ইসলাম : মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৫

রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির বগুড়া, ঢাকা-১৯৮৬

সৈয়দ আমির আলী (অনু. দরবেশ আলী খান) : দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

ড. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৬

ড. হাসান জামান : আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৩

[illegible] : মিশকাতুল মাসবিহ, কলিকাতা ১৩৫০ হিজরী

শাহেদ আলী (সম্পা.) : ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা-১৯৬৭

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৭

[illegible] : ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১

[illegible] : মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে মানবাধিকার কর্মীর ভূমিকা, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শওকতুজ্জামান	:	**মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামজল্যাণ**, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫
মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল	:	**সহীহ বুখারী**, দ্বিতীয় সংস্করণ, করাচী, ১৯৬১, ২য় খন্ড
মুহাম্মদ আবুল হাসান	:	**তানযীমুল আশতাত**, ৩য় সংস্করণ, দেওবন্দ, ২য় খন্ড
মুহাম্মদ শাফী	:	**মা'আরিফুল কোরআন**, মহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত,কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প,মদীনা, ১৪২৩ হি.
সাইয়্যেদ কুতুব	:	**বিশ্বশান্তি ও ইসলাম**, গোলাম সোবহান সিদ্দিক অনূদিত, শতদল প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৫
আহমদ মুল্লাজিয়ূন	:	**নূরুল আনওয়ার**, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা।
ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক	:	**ইসলামে মানবাধিকার**, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ সেপ্টেম্বর-২০০৩
অধ্যাপক কে. আলী	:	**মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস**, আলী পাবলিকেসন্স ঢাকা-১৯৭৯
সৈয়দ বদরুদ্দোজা	:	**হযরত মুহাম্মদ (স.): তাঁহার শিক্ষা ও অবদান**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৯৯
গোলাম মোস্তফা	:	**বিশ্বনবী**, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা-১৯৯৩
আব্দুস সহিদ নাসিম	:	**মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ মানবতাবোধ**, মাসিক পৃথিবী, মে-১৯৯৭
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	:	**ইসলাম প্রসঙ্গ**, রেনেসাস প্রিন্টার্স ঢাকা-১৯৬২
আবুল হাশেম	:	**সমাজ পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় ইসলামী মূল্যবোধ**, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ,' ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী	:	**বুখারী শরীফ**, ৮ম খন্ড, দিল্লী, ১৩৬৫ হিজরী।
মুসলিম ইবনে হাজ্জান	:	**সহীহ মুসলিম**, ৪র্থ খন্ড-১৯৮৭
ইমাম আলী আল রিদা	:	**মুসনাদ**, বৈরুত-১৯৬৬
সৈয়দ কুতুব	:	**ইসলামে সামাজিক সুবিচার, ইসলামের আহবান**, ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ঢাকা।
হায়কল	:	**আল-ফারুক উমর**, ২য় খন্ড-১৯৬৪
শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	:	**ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ**, স্কয়ার পাবলিকেসন্স, রাজশাহী-১৯৯৬
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	:	**মহানবীর (স.) অর্থ প্রশাসন**, অগ্রপথিক, সিরাতুন্নবী (স.) সংখ্যা-১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬
	:	**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭
সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনুবাদ আবদুল মান্নান তালিব)	:	**শাশ্বত নবী**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২
রওশন আলী খোন্দকার (সম্পা.)	:	**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স.)**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫
এ কে ব্রোহী	:	**ইসলামী জীবনের আদর্শ**, ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬
অনুবাদকবৃন্দ	:	**হযরত রাসূলে করীম (স.) ঃ জীবন ও শিক্ষা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৭
ফজলুল করিম	:	**আদর্শ মানব**, ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৪৭
মওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	:	**বিশ্বসভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদান**, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা -১৯৮৮
মুহম্মদ তাইয়্যেব (অনুবাদ, মাওলানা আলী আকবর হামিদ)	:	**মানবতার বৈশিষ্ট্য**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬
মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	**ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭
আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী (অনু.)	:	**ইসলামের যাকাত বিধান**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫
আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ	:	**ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও সরকার, ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬
হযরত আলী (রা.)	:	**প্রশাসনের মুলনীতি** (অনু. খালেদ চৌধুরী), **ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬
মোহাম্মদ আজরফ	:	**ইসলাম ও মানবতাবাদ**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০
অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি	:	**ভারত ইতিহাস পরিক্রমা**, কলিকাতা-১৯৯৮
ডঃ এম এ রহিম	:	**বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস**, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা জামালী : সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হি.

মুহাম্মদ ফজলে ইলাহী (অনু.) : সহজ ভাষায় ইসলামের মূল কথা, আঞ্জুমানে হিদায়াতুল উম্মত, ঢাকা-১৯৯৩

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান : ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪

আবুল হাশিম : ইসলামের মর্ম কথা (অনু. মুসলিম চৌধুরী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৬

সৈয়দ বদরুদ্দোজা : হযরত মুহাম্মদ (স.) : তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৭

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৫

মুহাম্মদ মতিউর রহমান : ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা-১৯৯৯

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : আত্ তারীখুল ইসলামী, ঢাকা-১৯৮৮

আল্লামা শিবলী নোমানী : আল-ফারুক (অনু. জাফর আলী খান), ১ম খন্ড।

মুহাম্মদ ইবন সায়াদ : আততাবাকাত, দারুল ইয়াহইয়া, বৈরুত, লেবানন-১৯৯৬, ৩য় খন্ড।

ড. আব্দুল করিম জায়দান
(অনু. মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম) : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯

মাও. একে আজাদ
(অনু. প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম) : আদর্শ খেলাফতের নমুনা, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ঢাকা।

মাও. মুশাহিদ আলী : ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

সাইয়েদ হাসান মুসান্না
(অনু. মাও. শফিউদ্দীন) : ইসলামী সমাজব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮০

মুহাম্মদ মুদ্দাসির হোসেন (সম্পা.) : মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, ১ম খন্ড, রাজশাহী, ১৯৭৯

আল-জাহশীয়ারী : কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব, কায়রো, ১৯৩৮, ৩য় খন্ড।

ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী : রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৪

ড. এম.এ. মান্নান : ইসলামী অর্থনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা-১৯৮৩

রুবেল লেভী : সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম (অনু. ড. গোলাম রসুল), মল্লিক বাদ্রার্স, কলিকাতা, ১৯৯৫

আব্দুস সামাদ : আধুনিক সমাজকল্যাণ, পুঁথিঘর, ঢাকা-১৯৮৭

: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড।

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : যাকাত কি ও কেন? ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৯৫

আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী
(অনু. আব্দুল কাদির) : ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সৃজন প্রকাশনী, ঢকা-১৯৯১

আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী
(অনু. মুহাম্মদ আব্দুল রহীম) : ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৩

খলিফা আব্দুল হাকিম
(অনু. সাইয়েদ আব্দুল হাই) : ইসলামী ভাবধারা, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, লাহোর, ১৯৭০

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, স্কয়ার পাবলিকেশন্স, রাজশাহী, ১৯৯৬

ড. মাহমুদ আহমাদ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন : দারিদ্র বিমোচনে যাকাতঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯৯

মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম : ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

এ. জি. এম বদরুদ্দোজা : যাকাতের ব্যবহারিক বিধান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬,

: ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০

: ইসলামিক মিশন পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০

: যাকাত ফান্ড পরিচিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮

ইমাম আবু ইউসুফ : কিতাবুল খারাজ (উর্দু), করাচী।

হিফজুর রহমান (আবদুল আউয়াল অনূদিত) : ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী মুহাম্মদ শফী,

অনু. মাও. কারামত আলী নিজামী : **ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) : বেহেস্তী জেওর, মুকাম্মাল ও মুদাল্লাল (৩য় খণ্ড) উর্দু।

বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র.)

(অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ) : **আল-হিদায়া** (১ম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮

ফারিশতা জ.দ. যায়াস, অনু. হুমায়ুন খাঁন : **যাকাতের আইন ও দর্শন**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৪

শাহ্ আবদুল হান্নান : **ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা**, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১

আল্লামা কাসানী : **বাদায়েউস সানীয়ে**, ২য় খন্ড, মিসর।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী : **উশর**, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯২

: বাংলাদেশ মসজিদ মিশন বার্ষিক প্রতিবেদন-১৯৯৫

: দৈনিক ইনকিলাব, ৮-৬-৯৪, উপ-সম্পাদকীয়।

শাহ্ আবদুল হান্নান : **ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা**, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : **ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ**, স্কয়ার পাবলিকেশনস, রাজশাহী, ১৯৯৬

মাও.মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : **ইসলামী অর্থনীতিতে 'ওশর' ও 'খারাজ'**, অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫

কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ : **ফাতহুল কাদির**, ৬ষ্ঠ খণ্ড ,আল-মাকতাবা আল রশিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৯৮৫

ইবনুল আবেদীন : **রাদ্দুল মোহতার আলাল দুররিল মুখতার**, ৩য় খন্ড, আল মাকতাবা আল মাজিদিয়া, কোয়েটা-পাকিস্তান, ১৩৮৮ হি.।

গাজী শামছুর রহমান : **ওয়াকফ আইনের ভাষ্য**, ঢাকা ল'বুক হাউস, ঢাকা-১৯৯৭

আলিমুজ্জামান চৌধুরী : **বাংলাদেশে মুসলিম আইন**, অরণি প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১

সম্পাদনা পরিষদ : **দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০

সারাখসী : **মাবসূত**, ১২ খন্ড, কায়রো, ১৩৬৫ হি.।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী : **রিয়াদুস সালেহীন**, ১ম খণ্ড, (অনূদিত), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-ঢাকা-২০০১

আব্দুল হক তালুকদার : **সমাকল্যাণ পরিচিতি**, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০

ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন : **ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ**, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী : **সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং**, (অনু. আব্বাস আলী খান ও আব্দুল মান্নান তালিব), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭৯

ইবনু জারীর : **তাফসীরে তাবারী**, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফা-১৪০১ হি.।

ইমাম আল-রাজী : **তাফসীরে কাবীর**,দারুল ইলম, লেবানন-১৩৯৮ হি.।

মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন : **বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা-১৯৮৮

ড. তারা চাঁদ (অনু. এস. মুজিব উল্লাহ) : **ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮

খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত : **ইবনে বতুতার সফর নামার** (উর্দু) অনুবাদ আযায়েবুল আসফার (২য় খন্ড), দিল্লি, ১৯১৩

লেখকমন্ডলী : **বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩

কে. এম. রইছ উদ্দীন : **বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা**, ঢাকা-১৯৯৬

কাজী দীন মুহাম্মদ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ঢাকা-১৯৮৬

নীহার রঞ্জন রায় : **বাঙালীর ইতিহাস**, কলিকাতা।

আব্দুল মান্নান তালিব : **বাংলাদেশে ইসলাম**, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক : **পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম**, ঢাকা-১৯৪৮

ড. গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশের সূফীসাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

বি.বি. ব্যানার্জী সম্পাদিত : **নিরঞ্জনের রুস্মা**, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

ড. আব্দুল করিম, (অনু. এন.এম. রহমান) : বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুকুমার সেন সম্পাদিত : **শেক শুভোদয়া**, কলিকাতা-১৯২৭

Dhaka University Institutional Repository

সুখময় মুখোপাধ্যায় : **বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর**, কলিকাতা-১৯৬৬

গোলাম আলী আজাদ : **খাজিনাহ্-ই-আমিরাহ্**, কানপুর-১৯০০

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী : **আখবারুল আখিয়া**, দিল্লী, ১৩৩২ হি.।

হুমায়ুন আব্দুল হাই : **মুসলিম সংস্কারক ও সাধক**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬

আনিসুজ্জামান : **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য**, (১৭৫৭-১৯১৮), লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৬৪

আবুল আলা মওদুদী অনু.আব্দুল মান্নান তালিব : **ইসলামী রেনেসা আন্দোলন**, জাতীয় গ্রন্থ বিতান, ঢাকা-১৯৭৫

ডঃ মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, : **দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীন**, দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই জুন, ১৯৮৯

মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য : **বাংলাদেশের ইতিহাস**, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

আর. সি. মজুমদার : **বাংলাদেশের ইতিহাস** (৩য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮১

ডঃ মোঃ আবদুল হক তালুকদার : **সমাজকর্ম**, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৫

এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল : **পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ**, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৪

আব্দুস সাত্তার (সম্পা.) : **ছোটদের জীবনী গ্রন্থ**, ৮ম খন্ড, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬

সুপ্রকাশ রায় : **ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম**, কলিকাতা, ১৯৭২

মুনতাসির মামুন : **তীতুমীর ও দুদুমিয়া**, শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, ১৩৮৭ বাংলা

ড. অতুল চন্দ্র রায় : **ভারতের ইতিহাস ২য় খন্ড**, কলিকাতা, ১৯৮৭

ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : **ভারতবর্ষের ইতিহাস**, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১

অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম : **উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব**, বই বিতান, ঢাকা, ১৯৮৫

ড. অতুল চন্দ্র রায় : **ভারতের ইতিহাস ২য় খন্ড**, কলিকাতা, ১৯৮৭

মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঢালী : বাংলাদেশ দর্শন, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ১৯৯৪

আব্দুস সাত্তার (সম্পা.) : **ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-১৮**, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (সম্পা.) : **ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ঃ রূপজালাল**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

শামসুন্নাহার মাহমুদ : **রোকেয়া জীবনী**, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৭

মোরশেদ সফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া ঃ সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

আনোয়ার বাহার চৌধুরী : **শামসুন্নাহার মাহমুদ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

কাজী আবুল হোসেন : **ছোটদের শামসুন নাহার**, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

কাজী আবুল হোসেন : **নবাব সলিমুল্লাহ** জীবনী গ্রন্থ-১৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮৬

আব্দুস সাত্তার (সম্পা) : **ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-৮ম-খন্ড**, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৮৬

মিজানুর রহমান শেলী (সম্পা) : **ছোটদের ফজলুল হক**, সাহিত্যমালা, ঢাকা-১৯৮৪

বিবি হাবিবুল্লাহ : **শেরে বাংলা**, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৮৭

বন্দে আলী মিয়া : **ছোটদের সোহরাওয়ার্দী**, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৮৭ (বাংলা)।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ : **'খানবাহাদুর আহ্ছানউলা', খানবাহাদুর আহ্ছানউলা স্মরকগ্রন্থ**, গোলাম মইনউদ্দিন (সম্পাদিত), ইসলামিক ফাউনডেশন, ঢাকা, ১৯৯০

গোলাম মইনউদ্দিন : খানবাহাদুর আহ্ছানউলাঃ জীবন ও সাহিত্য, জয় পাবলিসার্স, ঢাকা, ১৯৮৮

শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

এ. কে. আব্দুল ওয়াহাব : **ছোটদের মাওলানা ভাসানী**, আহমদ পাবলিশিং হাউস,ঢাকা,১৯৭৯

মাহফুজ উল্লাহ : **মাওলানা ভাসানী**, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ভাসানী সংখ্যা নভেম্বর, ১৯৭৬

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : **সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন**, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫

ড. ওয়াকিল আহমদ : **উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ : **ইসলামের মর্মকথা**, পূর্বপাল প্রকাশনী ঢাকা-১৯৬৪

আবদুল হক মজুমদার : **সমাজকল্যাণ পরিচিতি**, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০০